বাংলা পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে বাঙালি

(১৯৩৯-২০০০)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

যশোধরা গুপ্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জয়দীপ ঘোষ

সহযোগী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৩২

২০২২

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

'বাংলা পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে বাঙালি (১৯৩৯-২০০০)' submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Joydeep Ghosh, Associate Professor, Dept. of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree of diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor   Candidate

Dated: Dated:

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	i - xi
স্বীকৃতি	xii - xiv
প্রথম অধ্যায়: **বাংলা বিজ্ঞাপনের ইতিহাস**	১- ৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: **বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা বিজ্ঞাপন**	৩৫ - ১৩৮
তৃতীয় অধ্যায়: **অর্থনীতি ও বাংলা বিজ্ঞাপন**	১৩৯ - ১৯১
চতুর্থ অধ্যায়: **জাতীয়তাবাদ ও বাংলা বিজ্ঞাপন**	১৯২ - ২৩৫
পঞ্চম অধ্যায়: **বাংলা বিজ্ঞাপন ও মেয়েদের কথা**	২৩৬ - ৩০৭
ষষ্ঠ অধ্যায়: **বাংলা সাহিত্যে বাংলা বিজ্ঞাপন: একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা**	৩০৮ - ৩৮১
সপ্তম অধ্যায়: **উপসংহার**	৩৮২ - ৪০১

পরিশিষ্ট

এক. **'মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন'**/ লেখকের নাম অনুল্লেখিত এবং **'এদেশের মাসিকে বিজ্ঞাপন কম কেন'**/ লেখকের নাম অনুল্লেখিত	৪০৩ - ৪০৪
দুই. **'বিজ্ঞাপনের বাহন'**/লেখকের নাম অনুল্লেখিত	৪০৫ - ৪০৯
তিন. **'ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন'**/ ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ	৪১০ - ৪১২
চার. **'বিজ্ঞাপনে বলো'**/ দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল	৪১৩ – ৪১৮

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি	৪১৯ - ৪৩৭
ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি	৪৩৮ - ৪৪৪
বাংলা পত্রপত্রিকা পঞ্জি	৪৪৫ – ৪৫০
ইংরেজি পত্রপত্রিকা পঞ্জি	৪৫১
বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত পত্রপত্রিকার তালিকা	৪৫২ - ৪৫৫

মুখবন্ধ

কলেজস্ট্রিট, ডালহৌসি অথবা গোলপার্কের ফুটপাথ থেকে আমার বাবা শ্রীদেবাশিস গুপ্ত দিনের পর দিন অজস্র পুরনো পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেছেন, তাঁর নিজের আগ্রহে। ফলে শৈশব থেকেই এইসব পত্রিকা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সুযোগ আমি পেয়েছি। লেখার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিখ্যাত শিল্পী'র অলংকরণ আমাকে তখন থেকেই মোহিত করে রেখেছে। কেবলমাত্র গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধই নয়; পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত পাতার পর পাতা জোড়া বিজ্ঞাপনগুলির থেকেও চোখ ফেরাতে পারিনি। ক্রমে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেখা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অবশ্যই সেই 'দেখা'-র চোখ আমাকে বাবা-ই তৈরি করে দিয়েছিলেন আমার "এটা কী?", "ওটা কেন?"-র উত্তরে। উচ্চ-মাধ্যমিক দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হই। এ সময় থেকে বাবা'র সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাস্টারমশাইরাও আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে মুগ্ধতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করলেন। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব'র নানান জটিল দিকগুলিকে যেমন বুঝতে শুরু করলাম, তেমনই জীবনের নানান প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব'র উত্তরও বই পড়ে পেয়েছি। বড় হওয়ার পরে কিছুটা পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে যখন বাবার পুরনো-নতুন পত্রিকাগুলির পাতা উল্টোলাম পুনরায়, আগে দেখা বিজ্ঞাপনগুলির সঙ্গেই আবার নতুন করে পরিচয় হল।

এই পুনঃ-পরিচয় পর্বে বুঝতে পারলাম বিজ্ঞাপনপগুলি কেবলমাত্র পণ্যের বার্তা নিয়েই পাঠকের কাছে আসছে না, ধারাবাহিকভাবে দশকের পর দশক ধরে এগুলিকে লক্ষ করলে এই বিজ্ঞাপনগুলির মাধ্যমে পরিবর্তমান সমাজের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, ফুটে ওঠে সমাজের নানান দিক। কিছু বিজ্ঞাপন সাধারণ, কাজের কথাটুকুই সেখানে একমাত্র প্রকাশিত, কিন্তু কিছু বিজ্ঞাপন ছবিতে-কপিতে এমনই শিল্পিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে তা সুসাহিত্যের ঘ্রাণ নিয়ে আসে।

অনেকদিন ধরে এইগুলিকে নাড়াচাড়া করেছি ঠিকই, কিন্তু এ নিয়ে গবেষণা করার সামান্যতম ভাবনাও আমার মাথায় ছিল না। গবেষণা করবার দিন যখন আগতপ্রায় এবং নানান প্রিয় বিষয়ের মধ্যে থেকে একটিকে নির্বাচন করার দ্বন্দ্বে আমি মুহ্যমান, তখন বাবা আমাকে বললেন বাংলা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নিয়ে কাজ করার কথা। আমি আমাদের মাস্টারমশাই, বর্তমানে আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষকে বিষয়টি জানাতে তিনি আমাকে যারপরনাই উৎসাহিত করলেন। বাবা এবং মাস্টারমশাইয়ের এই সম্মিলিত উৎসাহ প্রদানে আমি মনস্থির করলাম এবং বাংলা বিজ্ঞাপনের যে সুদীর্ঘ পথ, তারই মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়কে বেছে

নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই গবেষণাপত্রটির সম্বন্ধে একটি কথা সর্বাগ্রে মাথায় আসে, তা হল সাহিত্যের ছাত্র হয়ে এবং বাংলা সাহিত্য বিভাগের গবেষক হয়ে এই যে বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে বেছে নিলাম, তার কারণ কী? এই গবেষণা কি সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি রাখে না? এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার আছে।

সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের যে যোগ, তা আমার এই গবেষণার একটি বড় অংশ। বিভিন্ন সাহিত্যিকরা বিজ্ঞাপনকে কেমনভাবে দেখেছেন, মৌলিক কথাসাহিত্যে বিজ্ঞাপন বিষয়টি কেমনভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে তা খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর বইয়ের ক্ষেত্রে বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে দেখতেন বিজ্ঞাপনকে। নিজেও তিনি বহু বিজ্ঞাপনের চরিত্র হয়ে এসেছেন, তাঁর কবিতা, ছড়া বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনো বিজ্ঞাপিত পণ্যের সুখ্যাতি করে লেখা তাঁর মন্তব্যটি শোভা পেয়েছে বিজ্ঞাপনে। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথই নন, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রথম সারির লেখকদের ছবিতে, মতামতে, কবিতায় ভরে থেকেছে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা। ব্যবহৃত হয়েছে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি, কখনো ছবিতে গল্প। বিজ্ঞাপনের জগতে যুক্ত থেকেছেন বহু লেখক, কবি। সত্যজিৎ রায়ের কর্মজীবনের সূত্রপাতই বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরির মাধ্যমে। বাংলা বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য লগ্ন হয়ে থেকেছে দীর্ঘ সময় ধরে। বাংলা বিভাগে গবেষণা করার কারণেই, বিষয়টিকে আমি কেবলমাত্র সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিনি।

তবে এখানে আরেকটি দ্বিতীয় কথাও বলার আছে। সাহিত্য বিষয়টির মধ্যে একটা inter disciplinary স্বভাব রয়েছে বলে মনে হয়। সে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিবিধ বিষয়কে ছুঁতে চায়, অবশ্যই সাহিত্যকে হাতিয়ার করেই। বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা, অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা এগুলি তো চর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বটেই, তার সঙ্গে যদি একেবারে প্রথাগত পরিধির বাইরের কিছু বিষয়কেও এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত করা যায়, তাহলে তা হয়তো মূল স্রোতকেই সমৃদ্ধ করতে পারবে বলে মনে হয়।

এই ছিল প্রাথমিক ভাবনা।

অতঃপর, গবেষণার জন্য আমি বেছে নিলাম মূলত ছয়টি দশককে, ১৯৩৯-২০০০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব সমগ্র পৃথিবীজুড়ে গভীরভাবে পড়েছিল, আমাদের দেশটিও সেই ভয়াবহতার হাত থেকে রেহাই পায়নি। বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই আমাদের দেশে এই দশকের গুরুত্বপূর্ণতম ঘটনাগুলি ঘটে। গবেষণার প্রেক্ষাপট তৈরির কাজে তার

পূর্বের দশকগুলির সাহায্য আমাকে অবধারিতভাবে নিতে হয়েছে, কখনো কখনো আগের শতাব্দীর কিছু বিজ্ঞাপনের দ্বারস্থও হতে হয়েছে। কিন্তু গবেষণাপত্রটি মূলত আবর্তিত হয়েছে পূর্বোক্ত ছ'টি দশককে কেন্দ্র করে। বাংলা ছাপাখানার প্রচলনের অল্প পর থেকেই বাংলা মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের সূচনা। কিন্তু বাংলা বিজ্ঞাপনে বাঙালির সমসময়, রাজনীতি, ক্ষুধা, দারিদ্র, অভাব-ইত্যাদি তার যে সামাজিক যাপন; তা প্রত্যক্ষত বিজ্ঞাপনে ধরা পড়তে শুরু করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। ঠিক এই কারণেই গবেষণা পত্রের সূচনাকাল হিসাবে এই সময়টিকেই ধরা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এই গুরুতর সময় থেকে শুরু করে থামা হয়েছে একবিংশের দ্বারপ্রান্তে এসে। যদিও স্বাভাবিকভাবেই উক্ত সময়ের পরবর্তীকালের বিজ্ঞাপনও ব্যবহার করেছি আমার বক্তব্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিপুল সংখ্যক পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও অগণ্য। অজস্র বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করলেও, বাদ পড়েছে প্রচুর বিজ্ঞাপন। তা একান্ত আমার অপারগতা। পি এইচ ডি'র কাজ শেষ হলেও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের আন্তরিক নেশায় আগামী দিনেও এই সংগ্রহের কাজটি জারি থাকবে। তা কোনও অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ না করলেও মনকে আনন্দ দেবে নিঃসন্দেহে।

এই গবেষণাপত্রে আমি লেখার সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে বিজ্ঞাপনের বহু ছবি ব্যবহার করেছি। কেবলমাত্র বর্ণনার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনগুলির বৈচিত্র ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব ছিল। ছবিগুলির তলায় আমি পত্রিকা এবং তার প্রকাশকাল উল্লেখ করেছি। আমি যে পত্রিকা থেকে বিজ্ঞাপনগুলি পেয়েছি, সেগুলির তথ্যই দিয়েছি; কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই বিজ্ঞাপনগুলি শুধু ওই উক্ত পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্যম্ভাবীভাবেই তা আরও নানান পত্রিকায় প্রকাশ পায়, আমি কেবলমাত্র আমার ব্যবহৃতগুলির উল্লেখ করেছি। বহু বিজ্ঞাপন ব্যবহারের লোভ সংবরণ করতে হয়েছে গবেষণাপত্রটির আয়তনের কথা মাথায় রেখে। মাস্টারমশাই জয়দীপ ঘোষ নির্দয়ভাবে বাদ দেওয়ার কথা বারংবার বলেছেন, বাদ দেওয়ার কাজটি কৌশলীভাবে না করতে পারলে গবেষণাপত্রটি নিয়ে বিপদে পড়তে হত।

বাংলা পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে বাঙালি (১৯৩৯-২০০০), এই শিরোনামের ছত্রছায়ায় সমস্ত গবেষণাটিকে ভাগ করা হয়েছে মোটামুটিভাবে সাতটি অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়টি হল 'বাংলা বিজ্ঞাপনের ইতিহাস'। পাঁজিতে প্রকাশিত কাঠখোদাই ছবিবহুল বিজ্ঞাপনগুলিকে বাদ দিলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলি মূলত ছিল বিজ্ঞপ্তি। বিশেষ কোনও একটি বার্তা দিয়ে প্রকাশিত হত বিজ্ঞাপনগুলি। এগুলির মধ্যে থাকতো নানান রকম ঘোষণা। বিস্তৃত বিবরণধর্মী বিজ্ঞাপনগুলি তাদের চরিত্র পরিবর্তন করতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীতে। পরিবর্তমান সমাজ-অর্থনীতিতে মানুষের জীবনযাত্রায় গভীর বদল আসে। বদলায় পেশার ধরন। গ্রাম থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ চাকরির সন্ধানে উঠে আসেন শহরে। বিজ্ঞাপন সেই পরিবর্তনের প্রভাবকে ধারণ করেছিল তার নিজের দেহে। কপিতে বদল এসেছে। পাঠককে আকৃষ্ট করতে ব্যবহার করা হয়েছে রঙিন ছবি। কখনো কপির বদলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ছবিটিতেই। বিজ্ঞাপনের বহুবর্ণিল যাত্রাপথের সূচনাপর্বটিকে একটু ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞাপনগুলির সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বকেও আলোচনাভুক্ত করা হয়েছে, যাতে গবেষণাপত্রটির একটি চালচিত্র নির্মিত হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে 'বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা বিজ্ঞাপন'-এর কথা। বাঙালি কারা অথবা তাদের কোনও সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে কিনা, সেই প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। তবুও নানান প্রসঙ্গ সূত্রে বাঙালির একটা কেন্দ্রিয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে খুঁজতে চেয়েছেন বিভিন্ন মানুষ। বাঙালি বারেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার আড্ডা, পোশাক, সাহিত্যপ্রীতি, দেশভ্রমণ, দুর্গাপুজো, মিষ্টি খাওয়া অথবা আনন্দ-নগরী কলকাতাকে কেন্দ্র করে। এগুলিকে বাদ দিয়েও বহু মানুষ বাঙালি, বাংলার থেকে দীর্ঘ ভৌগোলিক দূরত্বে বাস করেও বহু মানুষ আদ্যন্ত বাঙালি রয়ে গেছেন আমৃত্যু; তবু পূর্বোক্ত বিষয়গুলি যেন বাঙালির চিহ্ন, যা সে বংশ-পরম্পরায় ধারণ করেছে তার যাপনে। যা তাকে বিশেষরূপে 'বাঙালি' করে তুলেছে। বিজ্ঞাপন মূলত জনপ্রিয়তার চর্চায় বিশ্বাসী, বাঙালির আদরে লালিত বৈশিষ্ট্যগুলি কেমনভাবে বিজ্ঞাপনকেও বৈচিত্রময় করে তুলেছে, এই অধ্যায়ে তাই দেখা হয়েছে। তবে একবিংশ শতাব্দীতে, বিশ্ব অর্থনীতির গভীর পরিবর্তনের ফলে সেইসব শতাব্দীলালিত চিহ্নগুলি যে ক্রমক্ষীয়মান, তাও বুঝতে বাকি থাকেনি।

তৃতীয় অধ্যায়টি হল 'অর্থনীতি ও বাংলা বিজ্ঞাপন'। যদিও অর্থনীতি বলতে বোঝায় দেশীয় অর্থনীতি, তবুও এই অধ্যায়ের আলোচনা আবর্তিত হয়েছে বাংলার অর্থনীতি এবং বাঙালি জীবন ও বিজ্ঞাপনে তার প্রভাবকে কেন্দ্র করে। অবশ্য সমগ্র দেশের অর্থনীতি যে বাংলার অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলত দেশের অর্থনীতির সাপেক্ষেই অগ্রসর হয়েছে আলোচনা। আলোচনার সুবিধার্থে ভারতবর্ষের অর্থনীতির প্রসঙ্গকে

ভাগ করা হয়েছে দুটি ভাগে। একটি ভাগে রয়েছে ভারতের বৃহত্তর অর্থনীতি, রাজনৈতিক-সামাজিক প্রসঙ্গের সঙ্গে যা ওতোপ্রতভাবে জড়িত; সেই দিকটি কেমনভাবে প্রভাবিত করেছে সমকালীন বাংলা বিজ্ঞাপনকে। দ্বিতীয় ভাগে যা দেখানো হয়েছে, তা একেবারে ঘরের কথা। কেমন করে দেশের অর্থনীতি প্রভাব ফেলেছে দৈনন্দিন গৃহস্থালীতে, এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনে, সেই দিকটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে ভারতবর্ষে বিশ্বপুঁজির দরজা খুলে গেছে এবং ১৯৯৪ তে 'পঞ্চম বেতন কমিশন'-এ মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর আয় বেড়ে গেছে অনেকটা। বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে মধ্যবিত্ত ক্রেতার মন। কে কোন বিলাসদ্রব্য কিনে চমকে দেবেন প্রতিবেশীকে, তাই নিয়ে সাড়া পড়েছে। এইসব শীতল ঈর্ষাকে দক্ষতা আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিজ্ঞাপন তার অবয়বে ধারণ করেছে। অর্থনীতির এই ক্রমান্বয়িক পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলা বিজ্ঞাপন কেমনভাবে পা মিলিয়ে চলল দশকের পর দশক ধরে, তার কপিতে কীভাবে জেগে রইল একটি দেশের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের চিহ্ন, সে কথাই লেখা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায় 'জাতীয়তাবাদ ও বাংলা বিজ্ঞাপন'। আমাদের দেশের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উত্থানের যে ইতিহাস, তা নিয়ে এই অধ্যায়ে কথা বলা হয়নি। যে বিষয়টি নিয়ে এখানে মূলত কথা বলা হয়, তা হল অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিষয়টি কীভাবে ক্রমশ গড়ে উঠলো তাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে এবং এই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সূত্র ধরেই আসবে বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ। এই অধ্যায়টিকে ১,২ দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে আলোচনার সুবিধার্থে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশীয় শিল্পদ্যোগের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের গভীর যোগসূত্র তৈরি হয়। সরাসরিভাবে ইংরেজ সরকারের বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে দেশজ সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহারের উদ্যোগ আরম্ভ হয়। বিশেষভাবে দেশীয় সামগ্রী ব্যবহারের আহ্বান থাকতো বিজ্ঞাপনগুলিতে। আজকের দিনে যেখানে প্রসাধন সামগ্রী'র বিজ্ঞাপনে সুন্দরী মেক-আপ পরিহিতা মডেলদের ছবি ব্যবহারই একমাত্র দস্তুর, নাহলে পণ্যের কাটতি ভালো হবে না, সে কালে বিজ্ঞাপনে দেখা যেত দেশনায়কদের মুখ। তাঁদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাতে ক্রেতা দেশীয় সামগ্রী ক্রয় করতে উৎসাহ বোধ করেন। সরাসরিভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত নন, তেমন লেখক-শিল্পীরাও কোনও পণ্যের শংসাপত্রে বিশেষভাবে পণ্যটিকে স্বদেশী বলে চিহ্নিত করে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত 'স্বদেশী' কাজল কালির বিজ্ঞাপনটির কথা মনে পড়ে যায়।

দেশভাগের পরবর্তী চিত্রটি দাঁড়ায় অন্যরকম। এতদিন পর্যন্ত যে স্বদেশ রক্ষার লড়াই চলেছে, স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে সেই দেশের সংজ্ঞাটিই কিঞ্চিৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে যায় এ দেশের মানুষের কাছে। আজন্ম যে জমি-জায়গাকে আপন ভেবে এসেছেন তাঁরা, গতকাল পর্যন্ত যা ছিল নিজের দেশ, হঠাৎ-ই রাতারাতি দেখা যায় তা পরিণত হয়েছে বিদেশে। অভিজ্ঞতা না থাকলে সে যন্ত্রণাকে যথাযথভাবে অনুভব করা যদিও অসম্ভব, তবু কী দুর্বিষহ হতে পারে সেই দেশ বদলের অভিঘাত, তা আন্দাজ করা যায়। ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে নতুন ভারতবর্ষে শুরু হল সদ্যোজাত দেশকে পত্রে-পুষ্পে বিকশিত করার আয়োজন। বিজ্ঞাপনও সেই প্রকল্পের বাইরে রইলো না। বারংবার প্রচার করা হল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের বার্তা। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের একটা স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র (Nation State) হিসাবে উত্থান হল। এই নেশন স্টেট এক কৃত্রিম সংগঠন। কোনও মিলের দ্বারাই যেখানে কয়েকটি অঞ্চলের মানুষকে এক করা সম্ভব হয় না, তখন এই ‘নেশন’-এর ছত্রছায়ায় তাদের এনে ফেলাই ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। এই ‘নেশন’-এর বোধটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে নির্মাণ করে বহু বিজ্ঞাপন।

স্বাধীনতা পূর্ব এবং উত্তর সময়কালে পরিবর্তিত জাতীয়তাবাদের ধারণা কেমনভাবে বিজ্ঞাপনে প্রভাব ফেলে গেছে, এই অধ্যায়ে তা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল ‘বাংলা বিজ্ঞাপন ও মেয়েদের কথা’। আমাদের সমাজ নারীদেরকে কিছু বিশেষ ভূমিকা এবং অবস্থানে দেখতে পছন্দ করে। সেই ভূমিকায় সে যদি সফল হতে পারে, তাহলে সমাজের চোখে তার সম্মান বজায় থাকে, কিন্তু সে ভূমিকায় যদি সে ঘটনাচক্রে ব্যর্থ হয়, অথবা সমাজের চোখে যা সাফল্য, সেই সাফল্যের তোয়াক্কা না করে নিজের মনোমত পথটি খুঁজে নেয় তাহলে সমাজ তাকে কালিমালিপ্ত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আমাদের সমাজ, নারীর অবস্থান, তার উপরে সামাজিকভাবে ঘটে চলা অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে নারী-মুক্তির আন্দোলনের পথটিও বিস্তৃত। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর-এর মত মানুষ সম্পূর্ণ স্বার্থহীনভাবে, অজস্র প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেও তাঁদের হাতে সেই নারীমুক্তির প্রথম মশালগুলি জ্বালিয়ে যান। তারপর সেই মশালের হস্তান্তর ঘটেছে।

যে ধারণা জনপ্রিয়, বিজ্ঞাপন তার বাইরে পা ফেলতে তেমন ভরসা করে না সাধারণত। তাই সমাজনির্মিত নারী-পুরুষের অতি পরিচিত স্টিরিওটাইপগুলি বিজ্ঞাপনে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। ‘মাতৃত্ব’, ‘সতীত্ব’, ‘পতিব্রতা’ ইত্যাদি ধারণাগুলির জয়গাথা রচিত হয়েছে বিজ্ঞাপনের ছত্রে ছত্রে। সৌন্দর্যেরও একটি ধরাবাঁধা সংজ্ঞা তৈরি করেছে

বিজ্ঞাপন। অপরদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়েছে 'সাহসী', 'নির্ভীক', 'রুক্ষ' কিছু ছবি। 'toxic masculine' ভাবমূর্তিটিকে জল-হাওয়া দিয়ে দিব্যি আরাধনা করা হয়েছে। কখনও বা ছদ্ম রাগ-অভিমানের অন্তরালে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে এই সমাজনির্মিত 'পৌরুষ'-এর ধারণাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন পরিবেশনের ধরন পাল্টালেও মোটের উপর গতে বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গির তেমন বদল এসেছে মনে হয় না। তবে বর্তমানকালের বিজ্ঞাপনে মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে একধরনের ছদ্ম-স্বাধীনতার আচ্ছাদন ব্যবহার করেছে বেশ নিপুণভাবে। যা দেখলে কখনো প্রায় প্রকৃত স্বাধীনতা বলেই ভ্রম হয়। সমাজ তাকে এখন গৃহকোণ সামলানো এবং সন্তান প্রতিপালনের বাইরে গিয়ে চাকরির অনুমতি দেয়, এমনকি তাকে সময়ে সময়ে বিদেশি সাজ-পোশাক করতেও বাধা দেয় না। কিন্তু চমক লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়, এত কিছু তো নারীকে এমনিই দেওয়া যায় না, তাই তার সঙ্গে সেই বিগত সময়ের নারীর মতন নারী হয়ে ওঠার গুণগুলিকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ মেয়েরা যতই ঘরের বাইরে বেরিয়ে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মেলাক, তাকে সু-গৃহিনী হওয়ার শর্তগুলি ভুললে চলবে না। কোন রান্নায় কোন মশলা দিতে হয়; জটিল পড়াশোনা করতে গিয়ে কোনওমতে ভুললেই সব নম্বর কাটা। সেকালের বিজ্ঞাপনের 'সতী নারী'দের এই যুগে একটু চিনির মোড়ক দিয়ে বলা হচ্ছে 'দশভূজা'। দুই হাতের নারী হলে চলবে না, হতে হবে দশ হাতের অধিকারী, নাতো সমাজ কিছুতেই তাকে স্বীকৃতি দেবে না। এসবের পরেও, কয়েক দশক আগেই হোক, অথবা একবিংশ শতকে এমন কিছু নারীকেন্দ্রিক বিজ্ঞাপন তৈরি হয়েছে যে আশান্বিত করে, বহন করে আনে প্রকৃত স্বাধীনতার ঈঙ্গিত। এই অধ্যায়ে আমাদের সমাজ, সমাজের চোখে নারী এবং বিজ্ঞাপনে তার প্রভাব নিয়ে, উদাহরণ সহযোগে কথা বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়টির নাম, 'বাংলা সাহিত্যে বাংলা বিজ্ঞাপন : একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা'। এই অধ্যায়ের শিরোনামটিকে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের বিপুল আয়তন এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে, ঠিক কোন কোন গল্প, উপন্যাস অথবা কবিতায় এসেছে বিজ্ঞাপনের কথা অথবা কোন গল্পের প্লটে বিজ্ঞাপন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে- ইত্যাদি প্রতিটি খুঁটিনাটি খুঁজে বের করতে গেলে কেবলমাত্র এই বিষয়টিই প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার দাবি রাখে। এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক, বাবা, বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় এবং কিছুটা নিজের প্রচেষ্টায়, মূলত স্মৃতিকে নির্ভর করে কিছু গল্প-উপন্যাস চিহ্নিত করেছি। বিজ্ঞাপন সেসব কাহিনিতে কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো বা পরোক্ষে দিব্যি আপন ভূমিকা পালন করেছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো কাহিনির প্রধান চরিত্রই হয়ে উঠেছে বিজ্ঞাপন।

এইখানে যে কথাটি উল্লেখ্য তা হল, গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়টিতে খুব নির্দিষ্ট কোনও তত্ত্বে পৌঁছোনোর চেষ্টা করা হয়নি। এই অধ্যায়টি মূলত বিবরণধর্মী।

সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ উপসংহার অংশটিতে মূলত দুটি বিখ্যাত বইকে সামনে রেখে গবেষণার একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি ও বক্তব্যের দিকে এগোতে চাওয়া হয়েছে। বইদুটির একটি হল Theodor W. Adorno (১৯০৩-১৯৬৯) এবং Max Horkheimer (১৮৯৫-১৯৭৩)-এর *Dialectic of Enlightenment : Philosophical Fragments* এবং অপরটি Adorno'র *The Culture Industry : Selected Essays on Mass Culture*। এই বইদুটিতে 'Culture Industry' শব্দবন্ধ তাঁরা ব্যবহার করেছেন এবং বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে এই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'রই একটি অংশ হিসেবে তাঁরা বুঝতে চেয়েছেন। অ্যাডোর্নো এবং হর্খহাইমার এই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'কে সমস্ত সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে পুরো বিষয়টিকেই বাতিল করে দিতে চেয়েছেন তাঁদের সমাজবোধের জায়গা থেকে। কিন্তু সামগ্রিক গবেষণার শেষে এই গবেষণাপত্র এটাই দেখাতে চেয়েছে যে, সমাজে বিজ্ঞাপনের ঋণাত্মক প্রভাব নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এর শক্তি এবং সামর্থ্যের দিকেও যদি আমরা খানিক সচেতন না হই তাহলে সাংস্কৃতিক ভাবে তো বটেই, রাজনৈতিক প্রত্যয়ের অর্থেও তা হয়তো ভুল হয়।

বিষয়ের ভিত্তিতে আরও প্রয়োজনীয় অধ্যায় সংযোজন করলে গবেষণাপত্রটি নিঃসন্দেহে আরও পূর্ণতা পেতো, বস্তুত গবেষকভেদে, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে অধ্যায় বিভাজন অন্যরকম হতে পারতো। কিন্তু আমার তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শে এবং নিজের বিবেচনায় এই অধ্যায়গুলিকে অনিবার্য এবং প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। গবেষণাপত্রের আয়তনের কথা মাথায় রেখে আরও কিছু অধ্যায়ের ভাবনা মাথায় এলেও তাকে আপাতত দূরে সরিয়ে রাখতে হয়েছে।

অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের শেষে একটি কথা বলা বাঞ্ছনীয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপন নিয়ে কাজ খুব বেশি না হলেও কিছু মনোজ্ঞ গবেষণাধর্মী গ্রন্থ নির্মিত হয়েছে, লেখা হয়েছে বেশ কিছু প্রবন্ধও। তাহলে এই গবেষণাপত্রটি সেগুলির থেকে কোথায় কিঞ্চিৎ পার্থক্যের দাবি রাখে তা একটু উল্লেখ করা কর্তব্য।

সিগনেট প্রেস থেকে অসিত পাল-এর *আদি পঞ্জিকা দর্পণ* বইটির প্রথম অধ্যায় ('ধরাখানা যেন বিজ্ঞাপনে ভরা')-টিতে পঞ্জিকায় প্রকাশিত অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর, মূলত পঞ্জিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নিয়ে বিস্তৃত

আলোচনা রয়েছে। সঙ্গে ‘চিত্রাবলি’ অংশটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সেইসব বিজ্ঞাপনের শ’দুয়েক ছবি। তবে সঙ্গত কারণেই এখানে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞাপনের ব্যবহার করা হয়নি।

রঙ্গন চক্রবর্তীর *এক জীবন বিজ্ঞাপন* বইটি অতীব সুখপাঠ্য। বিজ্ঞাপন জগতের নানান চমকপ্রদ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই বইটিতে পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন ধরে বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থায় অতি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনগুলির জন্মমুহূর্তের সাক্ষী থেকেছেন তিনি, কখনো বা তিনিই সৃষ্টি করেছেন বিজ্ঞাপনের জগতে প্রায় ‘মিথ’-এ পরিণত হওয়া কিছু কপি। তবে এই বই মূলত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, লেখকের সুললিত গদ্যের কারণে এটি আরও মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। রঙ্গন চক্রবর্তীর আরেকটি বই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে, নাম *বিষয় বিজ্ঞাপন*। এই বইয়ে বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে কিছুটা কর্পোরেট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। বাণিজ্য এবং বিজ্ঞাপন জগতের কিছু বিশেষ বিশেষ শব্দও এই বইতে ব্যবহৃত হয়েছে।

জয়ঢাক প্রকাশনার *বাংলা বিজ্ঞাপন* পরিক্রমা বইটিতে বিজ্ঞাপনের আদি যুগ থেকে শুরু করে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরিক্রমা করেছেন ঋত্বিক। সমগ্র আলোচনাকে পাঁচটি কালখণ্ডে ভাগ করে করা এই কাজ স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, খুঁটিনাটিবহুল। এই পাঁচটি পর্বের বিজ্ঞাপনে ঠিক কী কী বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে, তার উল্লেখ আছে বইটিতে।

হিরণ্ময় মাইতি’র *রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন ও সেইসময়* বইটির শিরোনামই বইয়ের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করে।

রবিন ঘোষ *বিজ্ঞাপনের ভাষা* বইতে বিজ্ঞাপনের ভাষাকে নানান আঙ্গিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। সোমব্রত সরকার *বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন* এ ১৭৭৮ থেকে ২০১৪, এই কালপর্বকে আলোচনা করেছেন। ন্যাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত *আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ* বইয়ের মাধ্যমে বাংলা হরফের যে যাত্রাপথের শুরু, সেখান থেকে একেবারে এই বইটি প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টির গ্রন্থ বিজ্ঞাপনের ইতিহাসের ধারক এই বইটি।

বোতলের নানাপ্রকার কৌতুক বা পুরানো কলকাতার দোকানদারি আর পণ্য পসরার বিজ্ঞাপন ঔষধ-আতর-তৈলাদি বইয়ের লেখক কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত। বইটি ১৮৯০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের পণ্য-পসরার বিজ্ঞাপন সংবলিত পুস্তিকা অথবা পঞ্জিকার নানান বিচিত্র বিজ্ঞাপনের কৌতূকপ্রদ বিবরণ রয়েছে এই বইটিতে।

যে কয়টি বইয়ের উল্লেখ এখানে করা হল, তার প্রায় প্রতিটিতেই উনিশ শতকের বিজ্ঞাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ শতকের স্বাধীনতা-পরবর্তী কালপর্বের বিজ্ঞাপনের বিবরণ, বৈশিষ্ট্য, সমাজতত্ত্ব নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়েছে এমন মনে হয় না।

অতি সম্প্রতি, ২০২১ সালে সমীর ঘোষের *প্রসঙ্গ : বাংলা বিজ্ঞাপন* বইটি চোখে পড়লো। বইটিতে তিনি বিষয়ভিত্তিকভাবে বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞাপনের ছবিতে, আলোচনায় বইটি বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তবে, এই বইটির সংযোজনী অংশে 'একটি দুর্লভ গ্রন্থ : উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন' শিরোনাম দিয়ে সন্তোষকুমার দে প্রণীত *উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন* বইটির কথা বলেছেন। লেখকের আরেকটি বই *বিউটি ট্রিট* -এর উল্লেখও করেন তিনি। এইখানেই বলে রাখি, প্রথম বইটি ১৯৪৯ এ প্রকাশিত এবং বিজ্ঞাপন বিষয়ে আগ্রহীদের পক্ষে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক হলেও, এই দিকে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁদের কাছে বইটি খুব দুর্লভ নয় ইদানীং আর। ইন্টারনেটে সমগ্র বইটির স্পষ্ট পি ডি এফ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বইটিও তেমন দুষ্প্রাপ্য নয়।

এছাড়া বিশ শতকের অথবা বিশ্বায়ন পরবর্তী পর্বের বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং সমাজতত্ত্ব নিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন, গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। প্রতিভাস প্রকাশিত, শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত *বহুরূপে ভাষা : প্রয়োগের বাংলা ব্যবহারের বাংলা* বইটির দ্বিতীয় খন্ডে শোভন তরফদার 'বিজ্ঞাপনের ভাষা' নামের একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, মূলত ভাষাতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ১৪২০ বঙ্গাব্দে *চার্বাক* পত্রিকার বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্যায় অবিন চক্রবর্তী লিখিত 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে?-বিজ্ঞাপন, বাজার ও ব্যক্তিসত্তা' অথবা ভাদ্র-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ঋতংকর মুখোপাধ্যায়ের 'জনপ্রিয়তা ও বিজ্ঞাপনের বুলাদি' কিংবা ২০১৬ সালে *অনুষ্টুপ* পত্রিকায় সুমন ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধ 'পঞ্জিকা : বিজ্ঞাপনের আঁতে-পাতে', ইত্যাদি অবশ্য উল্লেখের দাবি রাখে। এ ছাড়াও বিজ্ঞাপন নিয়ে নানান লেখালেখি হয়েছে।

তবে এসবের পরেও একটি সামগ্রিক গবেষণার অবকাশ থেকেই যায়। সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের দিকটি নিয়ে কেউই তেমন বিস্তারিতভাবে কথা বলেননি। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বাঙালি, বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বাংলা বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে এই গবেষণাপত্রে ধরতে চাওয়ার চেষ্টা করেছি। শিরোনাম থেকে একটি জিনিস মোটামুটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাংলা বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে 'বাঙালি' ও এই গবেষণাপত্রের একটি কেন্দ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপন বিষয়ক কাজের সংখ্যা সীমিত।

ইংরেজি ভাষাতে বিজ্ঞাপন নিয়ে কিছু অসামান্য বই হাতে পাওয়ার দৌলতে একইসঙ্গে মুগ্ধতা এবং আফশোসের দুটি পরস্পরবিরোধী অনুভূতি তীব্র হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে বাংলা ভাষায় এই বিষয় নিয়ে এরকম বই থাকলে কত ভালো হত। বইগুলি রঙিন ছবিতে, লেখাতে সর্বাঙ্গসুন্দর। কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করে রাখি। Claude Hopkins এর *Scientific Advertising*, Julian Sivulka প্রণীত *Ad Woman*, Bob M. Fennis এবং

Wolfgang Stroebe লিখিত *The Psychology Of Advertising*, Charles Forceville এর *Pictorial Metaphor in Advertising*, Tom Reichert এর *The Erotic History of Advertising*, Ambi Parameswaran এর লেখা *Nawabs Nudes Noodles*, The British Library প্রকাশিত *Try It Buy It Vintage Adverts*, Arun Chaudhuri-র লেখা *Indian Advertising Laughter & Tears*, Anand Halve এবং Anita Sarkar এর *Adkatha*, David Ogilvy'র *Ogilvy on Advertising*; এই বইগুলির সান্নিধ্য অতীব সুখকর। বিজ্ঞাপন বিষয়ে একটি মোটামুটিভাবে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা গবেষণার শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে দেওয়া হয়েছে।

এই গবেষণাপত্রে কালপুরুষ বাংলা হরফের ১২ নম্বর ফন্ট, উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জিতে ১১ নম্বর ফন্ট এবং প্রতিটি বাক্যের মধ্যে ১.৫ স্পেস ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত *আকাদেমি বানান অভিধান* -এর বানানবিধি মানা হয়েছে। *MLA Handbook for Writers of Research Papers* এর সপ্তম মুদ্রণ অনুসরণ করে এই গবেষণাপত্রের তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি লিখিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ্য, ভারতীয়দের ক্ষেত্রে তাঁদের যে পরিচয়, তাতে নামটাই মুখ্য, পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে যদিও বিষয়টি বিপরীত, পদবী-মুখ্য পরিচয়েই তাঁরা অভ্যস্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, Shakespeare, Einstein, Shelley ইত্যাদি অতি বিখ্যাত মানুষরা প্রত্যেকেই পরিচিত তাঁদের পদবী (Surname)-এর মাধ্যমে। এই কারণেই তথ্যপঞ্জি এবং গ্রন্থপঞ্জিতে নাম-পদবীর যে ক্রম *MLA Handbook* ব্যবহার করার কথা বলে, আমরা সেই ক্রমকে বাংলা নামের ক্ষেত্রে মান্য করার পক্ষপাতী নই। আমরা বাংলা-হরফে-লেখা লেখকনামের ক্ষেত্রে নামটি আগে এবং পদবীটি পরে ব্যবহার করেই তথ্যপঞ্জি এবং গ্রন্থপঞ্জি সাজিয়েছি।

শেষে একটি কথা। ছবি-লেখায় মেলানো এই গবেষণাপত্রের হরফসজ্জা ও 'পেজ-মেকিং' আমার নিজের করা। এ জন্য কোনো প্রফেশনাল/বিশেষজ্ঞের সহায়তার সুযোগ আমি পাইনি। এই কারণে সামগ্রিক পৃষ্ঠা-সজ্জায় অল্পবিস্তর ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েই গেল। সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

যশোধরা গুপ্ত
চন্দননগর

স্বীকৃতি

স্বীকৃতি অংশে আসি তাঁদের কথায় যাঁদের সহায়তা ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব ছিল না।

প্রথমেই বলতে চাই আমার তত্ত্বাবধায়ক, মাস্টারমশাই অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষের কথা। বিষয় নির্বাচনের প্রাথমিক মুহূর্ত পেরোবার পরে যখন আমার মাথায় বিষয়টি ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তখন থেকে পরম সহিষ্ণুতা এবং যত্নের সঙ্গে তাকে একটু একটু করে যথাযথ চিন্তার রূপ দিতে সাহায্য করেন তিনি, হয়ে ওঠেন ভাবনার সঙ্গী। নতুন কোনও বইয়ের সন্ধান পেলেই তিনি অবিলম্বে তা আমার জন্য সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে এমন বইও ছিল যেগুলি সরাসরিভাবে আমার 'কাজ'-এ লাগবে না হয়তো, কিন্তু রঙিন পাতা ভরা ছবিতে তা এমনই সুন্দর, শ্রমসাধ্য কাজে উৎসাহ বেড়ে যেত। অতঃপর শুরু হল তত্ত্বাবধায়কের কথা অনুযায়ী বিজ্ঞাপন সংগ্রহ এবং বিবিধ বই পড়ার কাজ। এই কাজে আমাকে নিয়তই উৎসাহিত করেছেন জয়দীপ ঘোষ। কাজটি করবার সময়ে কখনো আমার একার কাজ বলে মনে হয়নি। প্রতিটি অধ্যায় শুরুর আগে তিনি "আমাদের কাজ" বলে উৎসাহিত করতেন। কখনো কখনো লেখা শুরু করেও লিখতে না পেরে বিপন্ন বোধ করলে তিনি আমায় এগোনোর পথ দেখিয়েছেন। অজস্র ছবির ব্যবহারে বারে বারে ছবির ক্রম এলোমেলো হয়েছে, ছবির মাপ পরিবর্তন করতে গিয়ে শব্দ, বাক্য ভেঙেচুরে গেছে। স্যার সেই এলোমেলো হয়ে যাওয়া লেখা, ছবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্রীকেও যেভাবে সামলেছেন, 'কৃতজ্ঞ' শব্দের ব্যাপ্তি তার কাছে ক্ষীণ হয়ে যায়।

আমার Research Advisory Committee তৈরি হয় তিনজন অধ্যাপককে নিয়ে। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য স্যমন্তক দাস, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা এবং আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ। তাঁরা আমায় অতি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন প্রতিটি মিটিঙে এবং মিটিং-এর বাইরে সাধারণ কথায়, আড্ডায়। যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও রকম দরকারে আমি তাঁদের পাশে পেয়েছি। এই মাস্টারমশাইদের আন্তরিকতায়, ভালোবাসায় বহুবার তুচ্ছ কারণে উত্যক্ত করতেও কুণ্ঠা বোধ করিনি। ছোটখাটো শব্দের পরিবর্তন থেকে শুরু করে, অধ্যায়গুলিকে কী পারম্পর্য মেনে সাজাবো, সবকিছুতেই তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন। কখনো তাঁদের সিদ্ধান্ত আমার কাজের উপর চাপিয়ে দেননি। কাজে কখনো ক্লান্তি বোধ করলে উৎসাহিত করতে, মনোবল দিতে এগিয়ে এসেছেন।

এইভাবেই হয়তো কাজ শেষ করতে পারতাম। কিন্তু গভীর শোকের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে এই R.A.C-এর একজন মাস্টারমশাই অধ্যাপক স্যমন্তক দাস সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। কাজ শুরুর সময় থেকেই অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিয়মিত আমার কাজের খোঁজ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতেও তিনি আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, বলেছেন সম্পূর্ণ কাজটি তিনি দেখতে উৎসাহী। এই অপ্রত্যাশিত, বেদনাদায়ক ঘটনায় আমি বিমূঢ়।

নিয়মানুসারে অধ্যাপক স্যমন্তক দাসের প্রয়াণের পরে একটি নতুন উপদেষ্টা সমিতি তৈরি করা হয়। যাতে অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ এবং অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা'র সঙ্গে যুক্ত হন তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক পার্থসারথী ভৌমিক। আমার এই গবেষণাকার্যের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে তিনি এলেও, অত্যন্ত যত্ন এবং গুরুত্বের সঙ্গে তিনি গবেষণার বিষয়টিকে বিবেচনা করেছেন এবং আমায় তাঁর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মতামত, পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

শুধু এই কমিটির সদস্যরাই নন, আমার বিভাগের অন্যান্য মাস্টারমশাইদের কাছেও আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে সেই স্নাতক স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে শিখিয়ে, পড়িয়ে, প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। এই মাস্টারমশাইরা পাশে না থাকলে আজ যেটুকু আমি শিখেছি জীবনে, তার প্রায় সবটাই বাকি থেকে যেত। অধ্যাপক শম্পা চৌধুরী, অধ্যাপক আব্দুল কাফি, অধ্যাপক বরেন্দু মন্ডল, এঁরা আমার রিসার্চ অ্যাডভাইসরি কমিটির উপদেষ্টা না হয়েও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাকে জানিয়েছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাছে এই গবেষণার কাজে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কোভিড পরিস্থিতির নানান বিধি-নিষেধের মধ্যেও তাঁরা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, চন্দননগর গ্রন্থাগারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA (CSSSC) তাঁদের 'হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল কালেকশন' দেখতে দিয়েছেন। সেখানে অতীব দুষ্প্রাপ্য বিজ্ঞাপনের চমকপ্রদ সংগ্রহ আমাকে বিস্মিত করেছে, বহু অদেখা বিজ্ঞাপন দেখার সুযোগ সেখানে আমার হয়।

আমার বাবা দেবাশিস গুপ্ত তাঁর যথেষ্ট ব্যস্ততার মধ্যেও বলামাত্রই তাঁর বিপুল ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমার প্রয়োজনীয় বই অথবা পত্র-পত্রিকা বার করে দিয়েছেন। কখনো আমার সঙ্গে ছবি সংগ্রহের বিপুল কাজ তিনিও ভাগ করে নিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁকে কখনো ক্লান্ত বা বিরক্ত হতে দেখিনি। বস্তুত কোভিড পরিস্থিতিতে আমি

কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি বাবার এই ব্যক্তিগত সংগ্রহের কারণেই। তাঁর কাছেই আমার প্রথম বিজ্ঞাপন দেখতে উৎসাহ বোধ করার হাতেখড়ি, শিল্পীদের হাতের টান দেখে চট করে চিনে ফেলতে তিনিই আমাকে শেখান। আমার মা দোলনচাঁপা গুপ্তও যখন যা বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে, আমার প্রয়োজন হতে পারে ভেবে পাঠিয়ে রেখেছেন। কখনো কখনো তাঁর উৎসাহ প্রদানে আমি রাগ করেছি, কিন্তু শেষপর্যন্ত এঁদের ছাড়া আমি অচল। কী বলে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই!

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁদের সাধ্যমত যখন যা বিজ্ঞাপন পেয়েছেন অথবা বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বইয়ের নাম জানতে পেরেছেন, আমাকে জানাতে দেরি করেননি। আমার বন্ধু শিঞ্জিনী সরকার, মধুরিমা গুহরায়, ঐন্দ্রিলা সেনগুপ্ত, শ্রীতমা সাউ, মনোজিৎ সিকদার, বিকিরণ ধরের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। আমার বন্ধু দেবাঙ্গন বসু তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অজস্র প্রয়োজনীয় বইপত্র, বিভিন্ন বিশেষ লেখা অথবা দুষ্প্রাপ্য বিজ্ঞাপন অনুরোধ করা মাত্র এনে দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে ঋণী হতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।

নিজের বন্ধুরা ছাড়াও আমার বাবার বন্ধু শ্রীবিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত একখানি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস উপহার দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর সংগ্রহে থাকা নানান প্রয়োজনীয় সংবাদপত্রের কাটিং তিনি নির্দ্বিধায় আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু (অসমবয়সী হলেও তাঁকে আমরা বন্ধু ভাবতেই স্বস্তিবোধ করি) শ্রীঅরুণাভ ঘোষ এই কয়েকটি বছরের বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপন বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত, এই প্রসঙ্গে অবশ্যপাঠ্য প্রবন্ধের নাম, বিবিধ বিজ্ঞাপন আমাকে সরবরাহ করেছেন। আমার পিসি শ্রীমতী চন্দ্রাবলী গুপ্ত তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও, সামাজিক মাধ্যমগুলিতে কোনও বিজ্ঞাপন দেখলে অবিলম্বে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এই সমস্ত বন্ধু এবং বন্ধুস্থানীয়রা আমাকে সাহায্য করেছেন সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। তাঁদের কাছে সাহায্য চাওয়ার আগেই তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নিঃস্বার্থভাবে।

উপরোক্ত প্রত্যেকের সাহায্যেই আজকে এই গবেষণাপত্রের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়েছে। আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা সামান্য কয়েকটি বাক্যে এইখানে প্রকাশ করবার চেষ্টা করলাম।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা বিজ্ঞাপনের ইতিহাস

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পেরিয়ে ধনতন্ত্রের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন হয়। পরিবর্তিত বাজারের ধারণার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। বাজার-কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন সমধর্মী পণ্যের ভিড়ে নিজের পণ্যটিকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত করবার প্রতিযোগিতা চালু হয়। যে প্রতিযোগিতা ছিল বিশেষভাবেই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফসল। ঠিক এই কারণেই, উনিশ শতকে 'বিজ্ঞাপন' শব্দটি প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হত নিছকই 'বিজ্ঞপ্তি'-অর্থে। সেখান থেকে ক্রমে তার বিজ্ঞপ্তি-ধর্মিতা পেরিয়ে 'বিজ্ঞাপন' শব্দটি কিছু বাড়তি তাৎপর্য পেতে আরম্ভ করে। 'বিজ্ঞপ্তি' থেকে আধুনিক বিজ্ঞাপনের তাৎপর্যের দিকে যাত্রাটি বর্ণিল এবং বহুমাত্রিক, সেই যাত্রাপথটিকেই তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দশকে এস. পি. চ্যাটার্জী'র সম্পাদনায় *কাজের লোক* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই পত্রিকার বিষয় এবং উদ্দেশ্য ছিল এর আগে প্রকাশিত সমস্ত বাংলা পত্রিকার থেকে আলাদা। এই পত্রিকাটিতেই প্রথম বাঙালির কর্মসংস্থানের প্রশ্নটিকে তুলে ধরা হল। উনিশ শতকের তাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চার কাগজগুলিকে পাশে সরিয়ে এই প্রথম এমন এক কাগজ বেরোল, যার মধ্যে টাকাপয়সা, রোজগার সংক্রান্ত ব্যবহারিক দিকগুলি ফুটে উঠেছিল। ততদিনে গ্রামীণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করেছে, কলকাতার সমস্ত অনুপস্থিত জমিদার (absentee landlord)-দের ভাঙনপর্ব শুরু হয়ে গেছে। এই যে একদিকে গ্রাম উঠে আসছে শহরে এবং কলকাতা শহরের নিজস্ব পুঁজিরও তখন ক্ষয়প্রাপ্ত দশা; ক্রমে গ্রাসাচ্ছদনের জন্য মানুষ চাকুরিমুখী হতে শুরু করলেন। সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের বিভিন্ন চাকরি তারা করতে আরম্ভ করলেন, কারণ অধিকাংশের কাছেই ব্যবসা করবার মতন পুঁজি ছিল না। কলকাতায় সেসময় গ্রাম থেকে জীবিকার সন্ধানে উঠে আসা জনস্রোতের প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের বিপুল প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)-এর *জোড়াসাঁকোর ধারে* বইটির কথা। এই বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে জোড়াসাঁকো'র প্রখ্যাত ঠাকুর পরিবারের বিচিত্র, চমকপ্রদ সব কাহিনির অসামান্য স্মৃতিচারণ। বইটির পঞ্চম অধ্যায়ে এই বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকাদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ যে সময়ের বর্ণনা দিচ্ছেন, তখনও বিংশ শতাব্দী শুরু হতে একটি-দুটি দশক বাকি। অনেকগুলি

ঘর, অনেকগুলি মহল, অনেকটা বাগান এবং দুটি বাড়ি মিলিয়ে ছিল একখানি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। এই বিশাল বাড়ির চাকর-বাকর, দাস-দাসী'র সংখ্যা কম ছিল না। অজস্র কর্মচারী বহুবিধ পেশায় যুক্ত ছিলেন। এ বাড়ি ছিল বংশ-পরম্পরায় বহু পরিবারের রোজগারের উৎসস্থল, নিজেই যেন একটি industry। ভিস্তিখানা, তোশাখানা, বাবুর্চিখানা, নহবতখানা, দপ্তরখানা, কাছারিখানা, স্কুলঘর, নাচঘর, দরদালান, দেউড়ি-এক বাড়িতে এহেন নানান ভাগাভাগি থাকায় কর্মচারীদের সংখ্যা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না।

একখানি পদ ছিল, হুঁকোবরদারের। সেই পদে কাজ করত একাধিক লোক। তাদের কাজ ছিল বাবুদের হুঁকো সেজে দেওয়া। এই হুঁকোবরদারদের একজনই এ পরিবারের বালকদের তামাক খেতে শেখায়।

> এই বিশ্বেশ্বরই আমাদের তামাক খেতে শিখিয়েছে; বড়ো হয়েছি-বিশ্বেশ্বর গিয়ে মার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এল। বললে, বাবুরা বড়ো হয়েছেন, তামাক না খেলে চলবে কেন? মা বললেন, 'তা, ওরা খেতে চায় তো খাওয়া।' বাড়ির বাবুরা তামাক না খেলে তারও যে চাকরি থাকে না।[১]

বাড়ির কিশোরদের মধ্যে তামাকের নেশা না ধরিয়ে দিলে বংশ-পরম্পরায় রক্ষিত তাদের কাজটিও যে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই তারা ছোট ছেলেদের তামাক খাওয়ার প্রশিক্ষণ দিত।

এই যে উনিশ শতকের ধনী পরিবারগুলিকে কেন্দ্র করে যে বিপুল, অজস্র পেশার চল ছিল, বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেগুলি ক্রমে বিলুপ্তির পথে পর্যবসিত হতে থাকে। পুঁজিতে টান পড়ায় এগুলি আস্তে আস্তে উঠে যেতে শুরু করে। জমিদারী প্রথা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, ভাঙতে শুরু করে যৌথ পরিবার। রয়ে যায় নবোদ্ভূত চাকরি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসার ধারণা।

এই নতুন পরিস্থিতিতে মানুষকে কিছুটা সড়গড় করে তুলতে, নতুন কর্মসংস্থানের সন্ধান নিয়ে, নতুন বাজারের সঙ্গে পরিচিত করবার সুবাদেই বেরোচ্ছে *কাজের লোক*-এর মতন পত্রিকা। দেশীয় বাজারের চরিত্র পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবেই যেহেতু এই পত্রিকাগুলির প্রকাশ, তাই এগুলির হাত ধরেই তৈরি হয়ে উঠছে বিজ্ঞাপনের তত্ত্ব। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে যুক্ত হচ্ছে বাণিজ্য। এই ক্ষেত্রটিকে প্রস্ফুটিত করতে বিজ্ঞাপনের দিকে মনোযোগী হওয়া ছিল একটি অপরিহার্য পথ। *কাজের লোক*-এর একটি সংখ্যায় লেখা হল :

> এদেশের ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে এক মুহূর্তের জন্যও মস্তিষ্ক চালনা করেন না, বিজ্ঞাপন দিতে হয়, সেইজন্য দিয়া থাকেন মাত্র। সে বিজ্ঞাপনের কোন পরিবর্তনও করেন না, করিতে জানেন না, সেইজন্য যত টাকা বিজ্ঞাপনে

> ব্যয় হয়, তাহার আর পুনরুদ্ধার হয় না। ইহাঁরা বলেন, মাসিক বা সাময়িক পত্রে একবার মাত্র বিজ্ঞাপন বাহির হয় সুতরাং তাহার বিশেষ সুফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এ যুক্তি ভ্রমাত্মক।
>
> আমি আপনি প্রতিদিনই দৈনিক পত্র পাঠ করি, কিন্তু প্রাত্যহিক অসংখ্য বিজ্ঞাপনের মধ্যে কয়টা দেখিয়া থাকি? আমরা কদাচিতই দৈনিকের বিজ্ঞাপনে মনোযোগ দিতে সক্ষম হই, কারণ সময়ে কুলায় না, পরদিবস নূতন কাগজ আসিয়া পড়ে। সুতরাং well written and catchy সুলিখিত এবং নয়নাকর্ষক ও বড় বিজ্ঞাপন ব্যতীত সহসা সে বিজ্ঞাপনে স্বেচ্ছায় মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা কম।
>
> কিন্তু মাসিক পত্রিকা লোকে অবসর সময়ে পাঠ করেন, একখানা মাসিক পত্রে আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয়, বিষয়, গল্প উপন্যাসাদি থাকে, লোকে স্বযত্নে পাঠ ও করিয়া থাকে, এবং পাঠ শেষ হইলেও ভবিষ্যতের জন্য রক্ষাও করিয়া থাকেন। এদেশের পাঠকের হস্তে দৈনিক কাগজের পরমায়ু একদিন বা দুইদিন। পরদিনই বাতিল কাগজের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। মাসিকের বিজ্ঞাপন গৃহিণীদের হস্তেও যায়, বালকেও পড়ে। জগতের সর্ব্বত্রই ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ধারণা আছে যে, “women are best buyers” “স্ত্রীলোকগণই উৎকৃষ্ট খরিদদার।” মাসিকপত্র সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম, সুতরাং ব্যবসায়ীর চক্ষে মাসিক পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিবার উৎকৃষ্ট কাগজ, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে।[২]

উপরে যে অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেই অংশটিতে বিজ্ঞাপনকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করবার অত্যন্ত প্রাথমিক কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলি দেওয়া আছে। উনিশ শতকের বিজ্ঞাপনগুলিতে তো বটেই, বিশ শতকেও একটি দীর্ঘ সময় ধরে দীর্ঘ কপি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবশ্য পরবর্তীকালে বড় কপি হলেও কপির ভাষা হয়েছে অত্যন্ত সাবলীল, কখনো কখনো সাহিত্যধর্মী। আবার কখনো একটি দুটি লাইনের কপি সেজে উঠেছে বাহারি ছবিতে। কিন্তু বিজ্ঞপ্তি’র পথ পেরিয়ে বিজ্ঞাপনের এই প্রথম যুগে বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতন হলেও তার প্রয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট আনাড়ি ছিলেন। ফলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যটিই বহুক্ষেত্রে চরিতার্থ হত না। ম্রিয়মান কপির প্রতি স্বভাবতই পাঠকরা তেমন মনোযোগী হতেন না। তাই প্রয়োজন হয় সুলিখিত, দৃষ্টিনন্দন কপির।

এই প্রবন্ধের লেখকও বিজ্ঞাপনের সেই “well written and catchy” দিকটির কথা উল্লেখ করেছেন।

এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আরেকটি কথা। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে দৈনিক সংবাদপত্রের গড় আয়ু এক-দুই দিনের বেশি নয়। ফলে সংবাদের ভিড়ে অতি অল্পক্ষণ বিজ্ঞাপনে চোখ পড়লেও তা স্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হতে সময় লাগে না। কিন্তু মাসিকপত্রের বিষয়টি এ প্রসঙ্গে অধিকতর লাভজনক। পরিবারে ছেলে-

বুড়ো নির্বিশেষে এই বস্তু সকলের হাতে তো যায়ই; তার সঙ্গে এগুলির একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন বাড়ির গৃহিনীরা। মহিলারা খরিদ্দার হিসাবে উৎকৃষ্ট, এ কথাও প্রাবন্ধিক লিখতে ভোলেন না।

> মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপনের হার কম, স্থান অধিক, দুইকথা বিক্রেয় জিনিস সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় ইহা স্মরণ রাখা উচিত। পেটেন্ট, ঔষধ, পোষাক পরিচ্ছদ, প্রভৃতির বিজ্ঞাপন মাসিক পত্রিকাতেও স্থান পাওয়া উচিত। দৈনিক পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় যে সুফল হয় না, তাহা যেন কেহ না মনে করেন। দৈনিকের গ্রাহক, পাঠক অধিক নিত্য পাঠ করিতে করিতে পাঠকের বিজ্ঞাপনে মনোযোগ নিশ্চয়ই পড়িয়া থাকে, কাজও হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য- সাময়িকপত্রও ব্যবসায়ীর উপেক্ষনীয় নহে। বেশ মোটা বর্ডার দিয়া মাসিকের বিজ্ঞাপনকে চিত্তাকর্ষক করিয়া দিলে তাহা পাঠকের চক্ষু এড়াইতে পারে না। সুফল হয়।
>
> পাশ্চাত্য অভিজ্ঞগণ বলেন, মাসিকপত্রের বামদিকের পৃষ্ঠাপেক্ষা দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠা মূল্যবান, প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাথার উপরও মূল্যবান স্থান। 'The right handed page is better than left hand page. Top of columns or page will be generally better than elsewhere'...[৩]

যথেষ্ট গবেষণা করেই যে এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, তা এই অংশটি থেকে বোঝা যায়। 'পাশ্চাত্য অভিজ্ঞগণ'-এর মতামত পর্যন্ত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠকালে পাঠকদের চোখ বাঁ পৃষ্ঠার চাইতে ডান পৃষ্ঠার প্রতি অধিক নিবদ্ধ হয়, এবং পৃষ্ঠার নিম্নভাগের চাইতে উপরের অংশই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রদানের ক্ষেত্রে শ্রেয়তর তাও জানানো হয়। বাতলে দেওয়া হয় বিজ্ঞাপনকে চিত্তাকর্ষক করবার নানান প্রয়োজনীয় পন্থা।

সব মিলিয়ে এই ধরনের প্রবন্ধগুলি পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করবার পক্ষে যে যথেষ্ট কার্যকরী ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

১৯১৬ সালে *কাজের লোক* পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধাংশে মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ কেন প্রয়োজনীয় এবং বিজ্ঞাপন ঠিক কেমন হলে, তার অবস্থান পাতার কোন নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে হলে তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, তার একটা সহজ স্পষ্ট ছবি এই প্রবন্ধটিতে তুলে ধরা হয়েছিল গত শতাব্দীর শুরুতেই। এমনকি মাসিক পত্রিকা পরিবারের কাদের কাদের হাতে পৌঁছোতে পারে, এবং তাদের মধ্যে পণ্যগুলির দ্বারা কারা সবচাইতে বেশি প্রভাবিত হতে পারেন, সেই হিসাবও চমৎকার ভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

বিনয়কুমার সরকারের সম্পাদনায় *আর্থিক উন্নতি* (যে পত্রিকার পরিচয় পত্রিকা কর্তৃপক্ষ নিজেরাই দেন, 'ধনবিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্র') নামে একটি পত্রিকা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে বেরোতে শুরু করে।

বাঙালী তথা ভারতের আর্থিক ইতিহাসের নানান খবর এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। এই পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭) শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, এম্.এ'র 'ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এখানেও পূর্বোক্ত প্রবন্ধের মতই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়ে কী কী সুবিধা হতে পারে এবং কী কী প্রণালী অনুসরণ করলে বিজ্ঞাপন কার্যকরী হতে পারে, তা স্বল্পপরিসরে, সহজ, পাঠকবোধ্য ভাষায় লেখা আছে।

> অনেকের ধারণা যে বিজ্ঞাপনে অর্থ-ব্যয় করা অর্থ নষ্ট করা মাত্র। যত টাকা দিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তত টাকা খরচ কমাইয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিলে বাজারে মাল বিক্রয় হইবে বেশী। কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক না হইলেও যে ভাবে এ মতটী ব্যক্ত করা হয় তাহা একেবারেই অগ্রাহ্য। ইহা সত্য যে, যে মালের বিক্রয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে করা হইবে তাহার দাম যত কম হইবে বিক্রয় ততই বাড়িতে থাকিবে। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয়েরও মাল-বিশেষে, বাজার-বিশেষে এবং অনেক সময় কাল-বিশেষে একটা সীমা আছে, যাহা অতিক্রম করিলে মালের পড়তাই বাড়িয়া যায়, বিক্রয় বেশী হয় না। কিন্তু এ সব হইতেছে, 'বিশেষ' বা অসাধারণ অবস্থার ব্যাপার; আপাততঃ এই সকল দৃষ্টান্তের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া এ কথা খুব বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় না।...
>
> বিজ্ঞাপনে খরচ বৃদ্ধি পায় এই যুক্তি সেই ব্যবসায়ীরাই দিয়া থাকেন যাঁহারা বিজ্ঞাপনের আর্থিক মর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই। তারপর, এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা বিজ্ঞাপন যে কি তাহা ভাল করিয়া বুঝেন না। এই সব ব্যবসায়ীদের অনেকে বিজ্ঞাপনে বহু অর্থব্যয় করিয়া নিরাশ হইয়াছেন এবং অবশেষে বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞান সম্বন্ধেই হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-প্রদান কেবল কতকগুলি বিনুনি কথার ফাঁকা আওয়াজ করাই নয়। ক্রেতার ঝাঁকে যেমন তেমন করিয়া দুটো কুচ্-কাওয়াজ করিলে খরিদ্দার শিকার করা যায় না। প্রকৃত বিজ্ঞাপন একটী পূর্ব্ব-কল্পিত অভিযান-এর পথঘাট গোড়া থেকেই বাঁধিয়া নিতে হয়; কোন্ সুড়ুঙ্গের পথে প্রবেশ করিয়া কোন্‌খানে নিষ্ক্রান্ত হইলে ক্রেতার সম্মুখীন হইতে পারা যাইবে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া আগেই ঠিক করা দরকার। চিন্তা না করিয়া যখন তখন যেমন তেমনভাবে বিজ্ঞাপন দিলে কাজত হয়ই না বরং তাহাতে প্রচুর অর্থনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।...
>
> এসব কথা অনেকের জানা নাই বলিয়াই এদেশে সংবাদপত্রের স্তম্ভে আমরা বিজ্ঞাপনের এত উদ্ভট নিদর্শন দেখিতে পাই। অনেক বিজ্ঞাপন-দাতাই দেখিতে পাই চীৎকার করিয়া বিজ্ঞাপিত জিনিসের গুণ-কীর্তন করেন। ফলে বিজ্ঞাপন মানে দাঁড়াইয়াছে বিশেষণের ছড়াছড়ি আর অত্যুক্তির কসরৎ। আবার কোথায়ও দেখিতে পাই বিজ্ঞাপনদাতারা "অত্যাশ্চর্য ঘটনা","সুবর্ণ সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ" ইত্যাদি উত্তেজনাকারক শিরোনামা বা হেড্‌লাইন

> ব্যবহার করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। সম্প্রতি দেখিতেছি উদ্ভট রকমের চেহারা প্রভৃতি দিয়াও এই প্রকার চেষ্টা কখন কখন করা হয়। বলা বাহুল্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেই বিজ্ঞাপন কৃতার্থ হইতে পারে না। তা ছাড়া, অনেক বিজ্ঞাপনদাতাই বিজ্ঞাপন স্থানের স্বল্প কলেবরের মধ্যে সপ্তকান্ড রামায়ণ লিখিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। ইঁহারা ভাবিয়া ও দেখেন না যে সাধারন পাঠকের পক্ষে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের সমগ্র বংশ-তালিকা বা গুণের ফিরিস্তি লইবার অবকাশ কত কম। তা ছাড়া, অনেক সময় বেশী পাঠ্য-সামগ্রী থাকার দরুণ বিজ্ঞাপন দুরূহ-পাঠ্য হইয়া দাঁড়ায়। সব চাইতে আমাদের দেশীয় বিজ্ঞাপনে যে জিনিষটার বেশী অভাব সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের সজ্জা বা "লে আউটের" অভাব। বিজ্ঞাপন এক হিসাবে মুখ্যতঃ ছবিমাত্র। এই কথাটা বিজ্ঞাপন দাতাদের বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক। অবশ্য বাংলাতে বিজ্ঞাপনের বিশেষ অসুবিধা এই যে, বাংলা অক্ষরের চেহারার বৈচিত্র্য এবং আকারের পার্থক্য অতিশয় অল্প। ইংরাজী অক্ষরের এই হিসাবে সম্পদ্ অপর্য্যাপ্ত।...[৪]

ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থের এই প্রবন্ধে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব এবং বাংলা ভাষায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলির ত্রুটি জানানো হয়েছে। কিছুটা বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে এমন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা হয়েছে এখানে। কেবলমাত্র উত্তেজক শব্দ ব্যবহার করাই বিজ্ঞাপনের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে না। দীর্ঘ বহু পৃষ্ঠার কপিও বস্তুটিকে আদৌ প্রচারিত করতে পারে না তো বটেই, পরিবর্তে পাঠককে পণ্যটি সম্পর্কে উদাসীন করে তুলতে পারে। প্রাবন্ধিক বিশেষ করে বিজ্ঞাপনদাতাদের ছবিকেন্দ্রিক হতে বলছেন। দীর্ঘ লেখা পড়বার পরিশ্রম পাঠক না করলেও, ছবির দিকে তাঁদের চোখ পড়তে বাধ্য। এমনকি অক্ষরের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলে ইংরাজী বিজ্ঞাপনের মত বাংলা বিজ্ঞাপনকেও মনোগ্রাহী করে তোলা গেলে ফল হত, একথা বলছেন ক্ষেত্রমোহন। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে কোম্পানীর নাম বা দ্রব্যটির নামই উজ্জ্বল অক্ষরে দেওয়া উচিত, তার চাইতে যদি কর্মচারী বা সত্ত্বাধিকারীর নাম বড় হয়ে যায় তাহলে তা বিজ্ঞাপন জ্ঞানেরই অভাব, এ কথাও তিনি বলেন। শেষপর্যন্ত তিনি খবরের কাগজ ছাড়াও তৎকালীন প্রচারের অন্যান্য মাধ্যমগুলিকেও ব্যবহার করতে বলছেন বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য। হতাশ হচ্ছেন এ দেশের অধিকাংশ মানুষই বিজ্ঞাপন প্রদানের কৌশল আজও ঠিক করে রপ্ত করতে পারেননি বলে। এবং এই বলে শেষ করছেন যে, "বিজ্ঞাপনই হইল বিক্রয়-ব্যবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ" এই বলে।

তাঁর প্রবন্ধে বর্ণিত পরামর্শ অনুযায়ী চললে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সমরক্ষেত্রে সফল হওয়া সম্ভব তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

এই অধ্যায়ে "বিক্রয়-ব্যবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ" বাংলা বিজ্ঞাপনের জন্ম লগ্নের ইতিহাসটি একবার খুঁজে দেখা হবে, তার সঙ্গে এ দেশের বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি বিষয়েও জেনে নেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপন শব্দের আভিধানিক অর্থটি হল বিশেষরূপে জ্ঞাপন। কিন্তু যোগাযোগ বিদ্যার পরিভাষায় এই 'বিশেষরূপে' শব্দটির একেবারে সুনির্দিষ্ট একটি তাৎপর্য আছে। অর্থের বিনিময়ে কোনও কিছুর প্রচার, তা পণ্য হোক অথবা সেবা কিংবা ধারণা, তাকেই 'বিজ্ঞাপন' বলে। কোনও নবাগত বাণিজ্যিক পণ্যের গুণাগুণ ঘোষণা করে প্রচার, কিংবা কোনও নতুন ধারণা বা তথ্য জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্য উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে গণমাধ্যমে প্রচার করে। একসঙ্গে বহু মানুষের কাছে পৌঁছোবার সুবিধা থাকার কারণে বিজ্ঞাপনদাতারা সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক অথবা মাসিক পত্র, বেতার, টেলিভিশন, পোস্টার, বিলবোর্ড ইত্যাদি মাধ্যমকে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করেন।

এক হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে থীবসের ভগ্নাবশেষে লিখিত বিজ্ঞাপনের দেখা মেলে প্রথম। হাপু নামক এক মিশরীয় তাঁতি প্যাপিরাসে লিখিত একটি বিজ্ঞাপন দেন তিন হাজার বছরেরেরও বেশি আগে। তা সংরক্ষিত আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। শেম নামে একটি পলাতক কৃতদাসকে খুঁজে দেওয়ার বর্ণনা ছিল এই বিজ্ঞাপনে। একে বিজ্ঞাপনের চাইতে বলা ভালো বিজ্ঞপ্তি। এবং সেই ক্রীতদাসকে ধরে দিতে পারলে অথবা কেবলমাত্র সন্ধান দিতে পারলেই পুরস্কারের ঘোষণা ছিল সেই বিজ্ঞাপনে। আঠারো শতকের ইংল্যান্ড আমেরিকার পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিজ্ঞাপনের ধরন প্রায় একইরকম ছিল। ক্রীতদাস থেকে চরিত্রহীনা স্ত্রী, সকলেরই খোঁজ চেয়ে হত বিজ্ঞাপন।

কলকাতার ফিরিঙ্গি শাসকদের আত্মপ্রচারের কাজে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই 'গেজেট' প্রকাশ করা হত। সেই গেজেটেও থাকতো দাস-দাসী কেনবার জন্য বিজ্ঞাপন। কারুর বাড়ির দাস পালিয়ে গেলে, তাকে যেন না কেনা হয়, অথবা সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কারের ঘোষণা কিংবা সেই দাস বাড়িতে কী কী চুরি করেছে, তার ফিরিস্তি দেওয়া হত এই বিজ্ঞাপনে। গর্বের সঙ্গে জানানো হত, সেই ক্রীতদাসের শরীরে তার মনিবের নাম খোদাই করা আছে। সহজেই অনুমেয়, সেই দাস বা দাসী কেন পালিয়ে গেছে মনিবের বাড়ি থেকে।

সোমব্রত সরকার লিখছেন-

> সংবাদপত্রে এখন যে 'হারানো প্রাপ্তি', 'নিরুদ্দেশ' ইত্যাদি কলামের জায়গা হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে কি খুব একটা থীবসের ভগ্নাবশেষে মেলা প্রথম বিজ্ঞাপনের ভাষাগত পার্থক্য আছে? বোধহয় নয়। বরং বলা যায় সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। গ্রীক 'Iuchoma' এবং রোমান 'Tabellaee'-কে রাস্তার ধারে আধুনিক 'বিলবোর্ড' এবং 'হোডিং'-এর প্রাচীন সংস্করণ হিসেবে ভাবা যেতেই পারে। ওই সময়েই রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন এঁকে রাখা হত যাতে মানুষজন, পথচারী সহজেই বুঝে যেতে পারে কোথায় কী ধরনের জিনিস পাওয়া যায়। যেমন- মদের দোকানের চিহ্ন ছিল ক্রীতদাসদের মদ বয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, রুটি যারা বিক্রি করত তাদের প্রতীক গমকল, দুধ বিক্রেতাদের ছাগলের ছবি। এগুলো সাধারণত দেওয়ালে খোদাই করে তার ওপর কাঠকয়লা, চক দিয়ে আঁকা হত। আবার কখনও পাথর, পোড়ামাটিতেও তৈরি করে নেওয়া হত এইসব প্রতীক রূপ। পোম্পাইয়ের ধ্বংসাবশেষেও এমনই সব দেওয়াল চিত্রের দেখা মিলেছে। লাল চক এবং কাঠকয়লা দিয়ে লাতিন ভাষায় লেখা নানা ধরনের বিজ্ঞাপনের মধ্যে পাওয়া গেছে বাড়িভাড়া দেওয়ারও বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনটির বয়স প্রায় দু'হাজার বছর- ৭৯ খ্রিস্টাব্দ।[৫]

ছাপা বিজ্ঞাপন বেরোনোর আগেই রঙিন সাইনবোর্ডের ব্যবহার শুরু হয়। ১৪৩৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে গুটেনবার্গ আবিষ্কার করলেন মুভেবল টাইপ বা ছাঁচে ঢালা ছাপার হরফ। ১৪৫৬ সালে ছেপে বের হল 'বাইবেল'। বিজ্ঞাপনের আদিপর্ব থেকেই ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বিজ্ঞাপনে ছিল বিস্তর ফারাক। ইংল্যান্ডের বিজ্ঞাপন ছিল আলংকারিক, জমকালো, অপরদিকে আমেরিকার বিজ্ঞাপনে পেশাদারিত্ব ছিল বেশি, ভাষা ছিল সাদামাটা ও স্পষ্ট। আঠারো শতকের শেষার্ধে ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞাপনের নাম। ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হিকি'র *বেঙ্গল গেজেট* ১৭৮০ সালে কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য এই কাগজের উপরে বড় করে লেখা 'হিকির বেঙ্গল গেজেট' এর তলায় একইরকম বড় হরফে 'or' দিয়ে লেখা থাকত 'Calcutta General Advertiser'। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব ঠিক কতটা ছিল তা এর থেকে বুঝতে পারা যায়।

অর্থাৎ, বিজ্ঞাপনের প্রচার শুরু হয় বহু শতাব্দী আগে। তপন বাগচী তাঁর 'বিজ্ঞাপনের জগৎ' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> বিজ্ঞাপনের প্রচার শুরু কবে থেকে হয়, তা এখনও গবেষণার বিষয়। ব্যবিলনীয় সভ্যতার সময়েও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা ছিল, ইতিহাসবিদগণ সে ব্যাপারে কিছু তথ্যপ্রমাণ পেয়েছেন। পম্পেই ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি বিলবোর্ড খুঁজে পাওয়া যায়, যাতে পণ্যের প্রচারমূলক বক্তব্য ছিল বলে জানা যায়। মধ্যযুগে জাহাজের নাবিকরা বন্দরে নোঙর করলে তাতে পণ্যের গুণ উল্লেখ করে মানুষকে কেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। এটিও এক ধরনের বিজ্ঞাপন। অবশ্য গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞাপন তার নিজস্ব চেহারা পায়। তবে প্রথম বিজ্ঞাপন হিসেবে

ধরা হয় ১৪৮০ সালে ব্রিটেনে পাওয়া একটি হ্যান্ডবিলকে। এতে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ ক্রয়ের আহ্বান প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৬০০ সালে ব্রিটেনে। এর প্রায় ১০০ বছর পরে আমেরিকার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ১৭০৪ সালে *দ্য বোস্টন নিউজলেটার* নামের একটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের সংবাদপত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে কলকাতা থেকে প্রকশিত হিকির *দ্য বেঙ্গল গেজেট, অরিজিনাল ক্যালকাটা জেনারেল এডভাটাইজার* পত্রিকায়।[৬]

এই প্রবন্ধেই পাই হিকির গেজেটেই প্রকাশিত হত নানান তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল বিজ্ঞাপন। চোদ্দ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের ভিতরকার দুই ‘কাফরী’ ছেলেমেয়ের চাহিদা প্রকাশ করে বিজ্ঞাপন দেন কলকাতাবাসী জনৈক ভদ্রলোক। এদের যথেচ্ছরকম দেহভোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, এ কথাও নিঃসংকোচে ঘোষণা করা থাকে বিজ্ঞাপনে। পুরুষশাসিত সমাজের একটি ভয়াবহ ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বোঝা যায় নারী ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হত সেই সময়ে।

সেকালে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রকশিত হত, সেগুলিকে মোটের উপর কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনই প্রকাশিত হত রাজস্ব বিভাগের পক্ষ থেকে। যথসময়ে খাজনা পরিশোধ না করতে পারা জমিদারদের জমি নিলামে উঠতো। কিন্তু নিলামের আগে, সেই জমিদারির গুরুত্ব অনুযায়ী কয়েক সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত। এই মধ্যের সময়টিতে খাজনার টাকা জমা পড়লে নিলাম রদ হয়ে যেত। জমিদারদের বাড়তি কিছু সময় চাওয়ার অধিকারও ছিল। গোলাম মুরশিদ জানাচ্ছেন,

জমিদারি নিলামের প্রথম বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিলো রাজস্ব বিভাগের Preparer of Reports জোনাথান ডানকানের নামে। তিনি বেনারসে চলে যাবার পর ১৭৮৭ সালের জুলাই মাস থেকে এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে জর্জ চার্লস মেয়ারের নামে। তারপর ১৭৯০-এর দশকে প্রথমে কালেক্টরগণের নামে এবং তারপর রাজস্ব বিভাগের সচিবের নামে এই জাতীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

যে আমলের কথা বলছি, তখন লবণ আর আফিম উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ছিলো কম্পানির। সেজন্যে কম্পানিই উৎপাদিত লক্ষ লক্ষ মণ লবণ আর শত শত সিন্দুক আফিম ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে। লবণ এবং আফিম দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক পদাধিকার বলে প্রথমে ছিলেন ডানকান এবং তারপরে মেয়ার। সেজন্যে ডানকানের নামেই লবণ এবং আফিম বিক্রির প্রথম দুটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। ডানকান চলে যাবার

পর কয়েক মাস এ দায়িত্ব পালন করেন মেয়ার। তারপর ১৭৮৮ সাল থেকে লবণ আর আফিম বিক্রির দায়িত্ব বর্তে ভিন্ন একজন তত্ত্বাবধায়কের ওপর।[৭]

রাজস্ব বিভাগের পরে যে সরকারি দপ্তর থেকে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো, তা হল পাবলিক ডিপার্টমেন্ট। সরকারের নতুন আইন থেকে আরম্ভ করে কলকাতা নগরীর মালিকানাহীন কুকুরনিধন পর্যন্ত নানান অতি বিচিত্র বিজ্ঞাপন এই দপ্তরের নামে প্রচারিত হত।

এই গেজেটে কিছু বিজ্ঞাপন নিয়মিত ছাপা হত, যেমন কচ্ছপের স্যুপ, সোডা ওয়াটার, থাকার জন্য মেস বা হস্টেল, ঘর ভাড়া ইত্যাদি।

বাংলা ছাপা বইতে ছবি ছাপার কাজটি প্রথম করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮১৬ সালে 'অন্নদামঙ্গল' বই প্রকাশের মাধ্যমে এই কাজের সূচনা। তিনি নিজেই এই প্রচেষ্টাকে ব্যতিক্রমী মনে করেছিলেন। সে কারণে সরকারি গেজেটেই তিনি এর বিজ্ঞাপন দেন।

উপনিবেশের শাসনে বাংলা গদ্যের যে ধারাবাহিক বিকাশ, সেই বিকাশ কীভাবে বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষাকেও ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিল, পরিবর্তিত হচ্ছিলো, সেটাই কিছুটা দেখিয়েছেন গোলাম মুরশিদ তার *কালান্তরে বাংলা গদ্য* বইতে।

গোলাম মুরশিদ জানাচ্ছেন, তিনি ১৭৮৪ থেকে ১৮০০'র মধ্যে প্রকাশিত দু'হাজারের বেশি বাংলা বিজ্ঞাপন খুঁজে পান। অথচ ১৮১৮ সালের আগে কোনও বাংলা পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোনও বাংলা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল, সেটাকেই প্রথমে অবিশ্বাস্য বলে বোধ হয়। আসলে এই সব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল *Calcutta Gazette* নামক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকায়। এই বিজ্ঞাপ্তি-বিজ্ঞাপনগুলি থেকে সেকালের গদ্যের বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করা যেতে পারে।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের তুলনায় খবর থাকতো সামান্যই। এসব বিজ্ঞাপনের মধ্যে বেসরকারী বিজ্ঞাপন থাকতো কেবল ইংরেজি ভাষায়। সরকারী বিজ্ঞাপনও বেশিরভাগ থাকতো ইংরেজিতে। কিন্তু যে সব বিষয়ে স্থানীয় জনগনকে জানানো দরকার ছিল, সে সব ইংরেজি ছাড়া দেশীয় ভাষাতেও ছাপা হত।

এই যে ইংরেজি পত্রিকাতেও বাংলা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল, তার কারণ হিসাবে এখানে গোলাম মুরশিদ লেখেন,

> ঔপনিবেশিক শাসকদের ভাষা, ইংরেজি এবং তখনকার রাজভাষা, ফারসিতে বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন প্রকাশের অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকায় বাংলায় বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন প্রকাশের কারণ অতো সহজে বোঝা যায়

> না। আমার ধারণা, মুসলিম শাসন-আমলের রাজভাষার প্রতি নতুন শাসকদের কোনো প্রেম ছিলো না। বরং এই ভাষা ধীরে ধীরে কিভাবে মুছে ফেলা যায়, কম্পানির শাসকরা সেই পন্থা সম্পর্কেই চিন্তাভাবনা করছিলেন। শাসনযন্ত্র চালিয়ে নেবার জন্যে যতোটুকু ফারসির প্রয়োজন, তাঁরা ততোটুকু ফারসিই ব্যবহার করতে তৈরি ছিলেন। কিন্তু দেশীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধ করে রাতারাতি ইংরেজির প্রচলন সম্ভব অথবা বাঞ্ছিত ছিলো না, হয়তো সেজন্যেই, ঔপনিবেশিক শাসকরা ফারসির পরিবর্তে বাংলা ভাষার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা পৃষ্ঠপোষণা দেখাতে আরম্ভ করেন। তাঁরা এই পৃষ্ঠপোষণার মাধ্যমেই সম্ভবত বাংলাকে ফারসির বিকল্প হিশেবে খাড়া করতে চেয়েছিলেন।[৮]

এই ছিল দেশীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞাপনের আদি পর্বের ইতিহাস। গ্রন্থকার পরবর্তী অধ্যায়জুড়ে এই সময়কার বিজ্ঞাপনের ভাষাগত, বিষয়গত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

অসিত পালের *আদি পঞ্জিকা দর্পণ* থেকে জানতে পারা যায়-

> সামগ্রিকভাবে মানুষের চাহিদাকে মাথায় রেখে বিজ্ঞাপনের পসরা সাজাতে সক্ষম হল পঞ্জিকা, তাও অনেক-বছর বাদে। কিন্তু এর মধ্যে কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েই চলেছে, ছোট-বড়-মাঝারি সব ব্যবসায়ীরাই কমিশন এজেন্ট লাগিয়ে তাদের ব্যবসা চালান, বই প্রকাশকরা ঝাঁকা মুটে লাগিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘরে ঘরে বই পৌঁছে দিচ্ছেন, পাঠকও তার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী বই ঘেঁটে কিনতে পারছেন। সাক্ষাৎ চলমান বইয়ের দোকান। ঝাকাওয়ালারা বছরে আট মাস এই কাজ করতেন, বাকি সময় চাষবাস, ১৮৫৯ খ্রি. লঙ সাহেব তার এক প্রতিবেদনে বলছেন, 'এরাই বাংলা বইয়ের সেরা বিজ্ঞাপন। পাঠকরা জীবন্ত একজন প্রতিনিধিকে দেখতে পান, এমন একজন যিনি বইটি দেখাতে পারেন'।[৯]

বাংলা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নিয়ে কথা বলতে গেলে বাংলা ভাষায় উনিশ শতক থেকে কী কী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে তা একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। ঋত্বিক প্রণীত *বাংলা বিজ্ঞাপন পরিক্রমা* থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানা যায়।[১০] বাংলা ভাষায় বাংলায় প্রথম যে পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তার নাম *দিগ্‌দর্শন*। এর ঠিক পরবর্তী বছর, অর্থাৎ ১৮১৮ তে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনারি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় *সমাচার দর্পণ*। এরপরেই *সংবাদ কৌমুদী, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত* ইত্যাদি একের পর এক আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

বাংলার ইতিহাসের দিক থেকেও নানান উল্লেখযোগ্য বাঁকবদল শুরু হয় এই সময় থেকে। ১৮০৫ সাল থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে। ভারতবর্ষে ব্যবসার একচ্ছত্র অধিকার কোম্পানির হাত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে। বাংলায় মিশনারিদের আগমন

ঘটতে থাকে। এরই মধ্যে ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ। এবং ১৮২১-এ ক্যালকাটা সংস্কৃত কলেজ। ১৮২৯ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলি'জ ইন্সটিটিউশন (পরবর্তী স্কটিশ চার্চ কলেজ) স্থাপিত হয়। এদেশে নারী শিক্ষার প্রচলন করেন মেরি কুক, তিনি কলকাতায় আসেন ১৮২৩ সালে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দু বালিকাদের জন্য প্রায় তিরিশটি স্কুল খোলেন। ১৮৪৯ সালে ড্রিংকওয়াটার বেথুন হিন্দু ফিমেল স্কুল নামে বালিকাদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। রামগোপাল ঘোষ, পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মতন সমাজ সংস্কারকেরা এই কাজে বেথুন সাহেবকে যথোচিত সহায়তা করেন। পরবর্তীতে এই স্কুলের নামই 'বেথুন স্কুল' হয়। উল্লেখ্য, এই স্কুলটিতে প্রান্তিক শ্রেণির বালিকারাও শিক্ষার সুযোগ পেতেন।

বাংলা বিজ্ঞাপন বিপুল ভাবে ছাপা হতে আরম্ভ করল পাঁজিতে। বস্তুত পাঁজির জনপ্রিয়তার সঙ্গে সেকালে আর কোনও কিছুই পাল্লা দিতে পারত না। এই পঞ্জিকার ক্ষেত্রভূমিকে ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করেছিলেন সফল ভাবে। বাঙালির ঘরে ঘরে লক্ষ্মী ঠাকুরের সঙ্গে জনপ্রিয়তায় আর কেউ তুলনীয় নন। তারই পাশে প্রতিযোগিতায় এসে দাঁড়ালো পঞ্জিকা। সংবাদপত্র সেসময়েও অনেক বেরিয়েছে। কিন্তু পঞ্জিকার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতায় এদের কারুরই ছিল না। যে বই শ্রবণ করলে পুণ্য অর্জন হয়, তার বিজ্ঞাপনও যে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য, এই বিষয়টিকে ব্যবসায়ীরা কাজে লাগান। পাঁজিতে ব্যবসায়ীরা তাঁদের পণ্যসম্ভার সাজিয়ে তুলেছিলেন। একটি জিনিস কিনলে তার সঙ্গে আরেকটি আকর্ষণীয় জিনিস বিনামূল্যে, এই বাণিজ্য কৌশল আজও জনপ্রিয়, বহু ক্রেতাই হয়তো বিনামূল্য জিনিসটির লোভে মূল বস্তুটি কেনেন, সেটি তার দরকার না থাকলেও; এই কৌশল পাঁজির আমল থেকেই পুরোদমে চালু হয়েছিল। ক্রেতাকে প্রলোভিত করতে নানান উদ্ভট, অবিশ্বাস্য উপহারের ছড়াছড়ি লেগেই থাকতো পাঁজিতে। চলত একটি পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের প্রতিযোগিতাও। সেই সময়কার সমাজচিত্রে বেশ পরিপূর্ণ ছবি এই বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে টুকরো টুকরো আকারে ধরা রয়েছে। দেখে নেওয়া যাক কী কী বিজ্ঞাপনে ভরে থাকতো গোলাপি রঙের সাধাসিধে বইটি। যৌন রোগের সমস্যা মূলক বিজ্ঞাপন, আয়ুর্বেদ ওষুধ, আয়ুর্বেদ ডাক্তারি, রবি বর্মার লিথোছবি, ম্যাজিক লণ্ঠন, চুলের তেল, কালীঘাটের পট, বই, ঘড়ি, মুষ্ঠিযোগ, প্ল্যানচেট, বন্দুক, তাবিজ। লক্ষ্যণীয়, মূলত এই পঞ্জিকাতে থাকতো চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞাপন। সাহেব ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসা করার ক্ষমতা ব্ল্যাক টাউনের বাসিন্দাদের ছিল না। বেশীরভাগ রোগীই মারা যেত বিনা চিকিৎসায়। ফলে

পাঁজিতে প্রকাশিত এই সব কবিরাজী চিকিৎসকদের বিজ্ঞাপন, তাবিজ, বৃদ্ধকে যুবা করার ওষুধই ছিল তাদের জীবনধারণের ভরসা। সেখানে আবার স্বঘোষিত চিকিৎসকদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা চলত।

অসিত পাল তাঁর পঞ্জিকা বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থে লিখছেন,

> দীর্ঘকাল বাঙালির গড়পড়তা আয়ু ছিল ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে। মধ্যবিত্তের সংখ্যার থেকে গরিবের আধিক্য ছিল বেশি। চেহেরা রোগা, পেটটি মোটা, সারা বছরই নানা রোগে জীর্ণ, মেয়েরা তো আরও কষ্ট পেত, তাদের চিকিৎসার সুযোগ কম, ওরা শুধু ভুগে যেত, এটাই যেন ছিল তাদের ভবিতব্য। যৌন সমস্যা নিয়ে কবিরাজদের মধ্যে লড়াই চলত, প্রত্যেকেরই দাবি দারুণ ওষুধ আবিষ্কার করে মানুষের জীবন থেকে যৌন সমস্যাকে চিরতরে বিদায় দিয়ে জীবনকে করে দিত হাসি-খুশি উজ্জ্বল। কবিরাজরাও জানতেন, এক শ্রেণির পুরুষ বাড়িতে বউ থাকলেও বহু নারীগমন তার অভ্যাস বা সামাজিক মর্যাতা ভাবত। এদের পয়সা আছে, রোগ ওদের কোনও না কোনও সময়ে ধরবেই, চিকিৎসা বিজ্ঞান তত সহজলভ্য ছিল না। ওকে কবিরাজের প্রয়োজন, ওরও কবিরাজের প্রয়োজন, তার বহু নারীগমন স্বচ্ছন্দে চলার জন্যে। জীবন ভোগের জন্যই যেন তৈরি। মাথার উপরে কবিরাজ আছে।[১১]

এই পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে পাঠকদের কথা মাথায় রেখে দুটি জিনিসের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হত। বিজ্ঞাপনদাতারা বুঝেছিলেন বিজ্ঞাপনের ছবি যদি আকর্ষণীয় হয়, তবে পাঠক দ্রব্যটির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারবেন না। কেবলমাত্র ছবিই নয়, ভাষার দ্বারাও পাঠককে আকৃষ্ট করার কথা তাঁরা ভাবতেন।

পঞ্জিকায় ছবি ব্যবহার অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়। পঞ্জিকার প্রতি সাধারণ মানুষের আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে পঞ্জিকার চার ভাগের প্রায় তিনভাগই ব্যবহার করা হত বিজ্ঞাপনের কাজে। বিজ্ঞাপন থেকে আসা অর্থে পঞ্জিকা প্রকাশকরা অর্থের দিক থেকে বেশ বলীয়ান হয়ে উঠেছিলেন উনিশ শতক থেকেই। এই বিজ্ঞাপনকে ভালো করে লক্ষ্য করলে এই বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা, রুচি, শিক্ষা, চাহিদা, অর্থনৈতিক অবস্থা সমস্ত কিছুর একটা প্রায় স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যেত। একটা গোটা বাংলার সংস্কৃতিকে এই গোলাপি দুই মলাটের মধ্যে ভরা ছিল। বিশ শতক থেকে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি তে বদল আসতে শুরু করে। পরিবর্তিত হয় সাহিত্যের ভাষা, কিন্তু পঞ্জিকার ভাষায় কোনও পরিবর্তন আসেনি সে ভাবে। ক্রেতার কাছে নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে এবং তাকে প্রলুব্ধ করতে, শিল্পীর কল্পনা দিয়ে কাঠখোদাই করা নানান ছবি ছাপা হত। এই ছবিরও একটা আলাদা চরিত্র ছিল বিজ্ঞাপনের মতই। আর্ট কলেজের বা স্বশিক্ষিত শিল্পীরাই এই ছবি তৈরি করতেন। যা বছরের পর বছর ধরে

পঞ্জিকায় ছাপা হত। পরবর্তীতে ধাতুর ব্লকে ছবি ছাপার যুগ এলেও পঞ্জিকায় মূলত কাঠখোদাই ছবিই ব্যবহার করা হত। এই ছবিগুলি পঞ্জিকার বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল। সাহেবরা তাদের বইপত্র ছাপার জন্য যে সমস্ত নকশা বিদেশ থেকে আমদানি করতেন, অনেক সময়ে পঞ্জিকার প্রচ্ছদেও সেসব নকশা ব্যবহার করা হত। বইয়ের প্রয়োজনে অন্য পেশার মানুষেরাও অনেক সময়ে খোদাই কাজ শিখে নিতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের কথা স্মরণীয়। আর একজনের কথা মনে করা উচিত, যিনি প্রিয়গোপাল দাস। প্রথাগত আর্ট শিক্ষা তিনি না পেলেও পত্র-পত্রিকায় তাঁর সৃষ্টি দেখে সমঝদারেরা মুগ্ধ হতেন। বিজ্ঞাপন এবং অক্ষর শিল্পে তিনি ছিলেন অতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর আগে যাঁরা অক্ষরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা বটতলার বই, পোস্টার-হ্যান্ডবিলে প্রিয়গোপালের মতন অক্ষর নিয়ে এমন কারুকাজ করেননি।

বিজ্ঞাপনে যে সমস্ত ছবি ব্যবহৃত হত, তা যদি একবার জনপ্রিয়তা পেত, তবে তা বছরের পর বছর ধরে ছাপা হত। নানাপ্রকার যৌন রোগ, বলবর্ধক ঔষধ, সালসা, জ্বর-প্লীহার বটিকা, কেশবর্ধক ঔষধ, তৈল, রতিবিজয় বটিকা, সুগন্ধি ইত্যাদি নানাবিধ বিচিত্রধর্মী বিজ্ঞাপনের সঙ্গে দেবশিশু, ফিরিঙ্গি রমণী, শয্যাশায়ী লোক, শিবঠাকুর, রতি-বিজয়ী রাজা-রাণী, সুন্দরী যুবতী ইত্যাদির ছবি ব্যবহার করা হত। বিজ্ঞাপিত দ্রব্যগুলির মতই ছবিগুলিও ছিল আশ্চর্য এবং আকর্ষক, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রলোভনের কারণেই পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের অধিকাংশতেই থাকতো আয়ুর্বেদিক ওষুধের বিজ্ঞাপন।

এইবার, পঞ্জিকার বিজ্ঞপন প্রসঙ্গটি সরিয়ে রেখে উনিশ শতকে অন্যান্য মাধ্যমে যে বিজ্ঞাপন ছাপা হত তার চরিত্রের দিকে একটু যদি মন দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকায় 'বিজ্ঞাপন' শিরোনাম দিয়েই আসলে যা প্রকাশিত হত, তা বিজ্ঞপ্তি। তিনটি তেমন বিজ্ঞপ্তি তুলে দেওয়া হল-

১.

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী

শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ

এবং

শ্রীমতী থাকমণি রায়

নং ২১০/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের উত্তর

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী

শ্রীমতী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায়।

১০৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মফঃস্বলেও যাইয়া থাকেন।

-বামাবোধিনী পত্রিকা, আগস্ট, ১৮৮২

২.

আমার অন্তঃপুরে পরিবারদিগের মধ্যে থাকিবার উপযুক্ত একজন শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। কোন ভদ্র বংশীয়ার আবেদন সাদরে গ্রাহ্য হইবে। বেতন মাসিক ২০ কুড়ি টাকা। বাসা খরচের প্রভৃতির ব্যয় লাগিবে না। রীতিমত খোরাক পোষাক পাইবেন।

ঠিকানা

তাজহাট, মাহিগঞ্জ পোঃ অঃ রঙ্গপুর

শ্রীগোবিন্দলাল রায়।

-বামাবোধিনী পত্রিকা, জুন, ১৮৮৪

৩.

Wanted a Governess for the young Ranis and Raj Kumar of Dighapattya. She must be well versed in Bengali, and needle work and must have some knowledge in English. A Hindu elderly lady or a Brahmo lady will be preferred. Salary Rs. 75 rising to Rs. 100.

Applications should be sent to Babu Aswini Kumar Banerji, Guardian of the boards of Dighapattya, Rampore Bauleah, and Rajshahye Districts.

-এডুকেশন গেজেট, ২৬. ৭. ১৮৮৯

উপরোক্ত তিনটি বিজ্ঞাপন স্বপন বসুর গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত।[১২] যদিও এগুলিকে বিজ্ঞাপন বলে প্রচার করা হত, তবু এইগুলির উদ্দেশ্য কোনও পণ্য কেনার জন্য মানুষকে আহ্বান করা নয়। কোনও জরুরি তথ্য পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনেই এইগুলি দেওয়া হত।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) ওরফে পাঁচু ঠাকুর তাঁর লেখালেখি শুরু করেন উনিশ শতকের সাতের দশকে। মূলত হাস্যকৌতূক এবং ব্যঙ্গ রচনাকার হিসাবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত এবং স্মরণীয় হন। তাঁর প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পঞ্চানন্দ'-তে বিদেশী আচারের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন 'পাঁচু ঠাকুর' বা 'পঞ্চানন্দ' নামে। তাঁর 'পাঁচু-ঠাকুর' নামের বইটি তীক্ষ্ণ গদ্যে পরিপূর্ণ ছিল। তারই মধ্যে তিনি 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামে কয়েকটি লেখা লেখেন। উনিশ শতকে যে ধরনের বিজ্ঞাপন খুব বেশি মাত্রায় জনপ্রিয় ছিল তা ছিল কবিরাজি ওষুধ, আরক, টাকের মহৌষধ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন। কখনও বলবর্ধন করতে, কখনও বা ক্রনিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে, কখনও যৌন সমস্যা থেকে সমাধানের বার্তা নিয়ে আসতো এই বিজ্ঞাপনগুলি। পাঁজি থেকে শুরু করে এমনি পত্র-পত্রিকা, সর্বত্রই এই বিজ্ঞাপনগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারতো না। এই বিজ্ঞাপনগুলির ভাষা-ভঙ্গিমা ছিল অনেকক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট গতে বাঁধা। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যই কোনও পণ্যের প্রচার। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনগুলি কিছু অধিকমাত্রায় প্রচার-প্রবণ ছিল। নানান আকর্ষক শব্দ ব্যবহার করে নানা শ্রেণির গোপন অথবা প্রকাশ্য রোগে ভোগা আশাহীন পাঠককে আশার আলো দেখাত বিজ্ঞাপনগুলি। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই জনপ্রিয় ধরনটির আশ্রয় নেন তাঁর ফিচারগুলিকে মনোরঞ্জক করে তুলতে। বিজ্ঞাপনের আকারে তিনি সেই 'অব্যর্থ মহৌষধ' অথবা 'এন্টি-বোকামি-মিকশ্চার' এর কথা বলেন তিনি। সেই লেখার ভাষাও যেন অবিকল একটি বিজ্ঞাপন, কিন্তু তার মধ্যে মিশে থাকে ধারালো শ্লেষ।

মহৌষধ! অব্যর্থ মহৌষধ!!

পঞ্চানন্দের এন্টি-বোকামি-মিকশ্চার।

অর্থাৎ

বোকামি-নাশক আরক।

এই ঔষধ সেবন করিলে, নিরেট বোকামি, পুরুষতান্ত্রিক বোকামি, দৈবাৎ বোকামি, দায়ে পড়িয়া বোকামি প্রভৃতি যত প্রকার বোকামি আছে বা হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় সারিয়া যায়। না সারিলে, কবুল জবারের পত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরত দেওয়া যায়।...

যাঁহারা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ চাহেন, ভারত-মাতাকে গাউন্-বনেট্ পরাইয়া নাচাইতে চাহেন, বাঙ্গালার বদলে ইংরেজী চালাইতে চাহেন, গলার জোরে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।[১৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা বিংশ শতাব্দীর সূচনায় যে সমস্ত পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে, সে সময়ে বিজ্ঞাপন জিনিসটাকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ কী ভাবে দেখছেন, পাঁচু ঠাকুরের লেখাকে তারই একটা উদাহরণ বলা যেতে পারে। একই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তা এবং দৃষ্টি আকর্ষণী ক্ষমতার ধরনকে কিছুটা ব্যঙ্গ করছেন কিন্তু এই মাধ্যমকে অস্বীকারও করতে পারছেন না।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থেরও কিছু আগে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষাংশে এম্-এ, বি-এল জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় *প্রবন্ধ-লহরী* নামের একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ লেখেন। নামের পাশে শিক্ষাগত ডিগ্রি বসানোর একটা প্রথা সেসময়ে বেশ সাধারণ ছিল। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের শেষ বা বিংশ শতাব্দীর সূচনায় যাঁরা প্রবন্ধ বা গদ্য গ্রন্থ লিখছেন, তাঁরা প্রায় কেউই বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যেতে পারছেন না। বহু বিষয়ের মধ্যে তাঁদের গ্রন্থের সূচিপত্র আলো করে থাকে একটি বা দুটি বিজ্ঞাপন-শীর্ষক প্রবন্ধ। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য যে কোনও উপায়ে ক্রেতার কাছে পৌঁছে যাওয়া, তাদের মনের গভীর চাহিদাগুলি, অসম্পূর্ণতা, অপ্রাপ্তি বা ভয়ের দরজায় অনুরণন তৈরি করা। বিজ্ঞাপন সেই পঞ্জিকার সূচনাপর্ব থেকে সে কাজ বেশ সফলভাবে করেছিল তার প্রমাণ এই প্রবন্ধ গুলির মধ্যেই রয়ে যায়। বিজ্ঞাপনের সুফল-কুফলের দিকগুলিকে চিহ্নিত করে সে সময়ের বুদ্ধিজীবীমহল বিজ্ঞাপনকে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত পাঠকের কাছে। কোথাও আছে সতর্ক-বার্তা, কোথাও বা উপকারী দিকগুলিকে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়াস; কখনও আবার কীভাবে বিজ্ঞাপন অধিক মনোগ্রাহী হয়ে উঠতে পারে তার জন্য অতি-প্রয়োজনীয় কিছু উপদেশ দিচ্ছেন প্রাবন্ধিক নিজেই। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের গুরুত্বকে কখনও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন, অথবা কখনও প্রশংসা বা প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠিতে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের মতন এমন গুরুতর বিষয়টিকে তাঁরা কেউই এড়িয়ে যেতে পারেননি।

জ্ঞানেন্দ্রলালও বিজ্ঞাপনের এই সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভ দুই দিককেই তুলে ধরেন।

> সংসারে বিজ্ঞাপনটা যে কেবল সংবাদপত্রেই দেওয়া হয় তাহা নহে। আমার সময় সময় বোধ হয়, সংসারে যেন কোন না কোন আকারে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে, সংসারে যেন কেহই একটা না একটা বিজ্ঞাপন খাড়া না করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহে না। যেন চতুর্দ্দিকে "আমায় দেখ দেখ গো" "আমায় দেখ গো" এইরূপ বলিয়া সকলেই চীৎকার করিতেছে। যেন আমাকে অন্য লোক না দেখিলে, অন্য লোক আমার নাম না শুনিলে, আমার জীবন বৃথা যাইল- যেন সংসারে জীবনের একমাত্র এবং কেবলমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে প্রচার করা, আপনার নাম অন্যের কণ্ঠে নিনাদিত করা, আপনার কীর্ত্তিকলাপ অন্যের হৃদয়ে খোদিত করা। এইরূপ আত্মঘোষণাতে যে নীচতা আছে তাহার প্রতি লোকে দৃষ্টি করিতে চাহে না।
>
> প্রায় সকল মানুষই যেন বিজ্ঞাপন দিবার জন্য, আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য ব্যাকুল। কেহ বহি লিখিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি কবি, কেহ বক্তৃতা করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন, আমি স্বদেশপ্রেমী; কেহ কথোপকথনে বা নিজের রচনাতে নানা প্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন, আমি পন্ডিত; কেহ বা গাড়ি ঘোড়া হাঁকাইয়া, বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি ধনী; কেহ বা প্রকান্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি দ্বারা বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি লক্ষপতি...[১৪]

এখানে সরাসরিভাবে পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনের কথা না বললেও, মানুষের বিজ্ঞাপন-প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক। 'বিজ্ঞাপন' শব্দটিই তার অবয়বে যে আত্মপ্রচার ধারণ করে, সেই প্রবণতাই যদি মানুষও বহন করে, তার প্রতি অনুযোগ করেন তিনি। পণ্যদ্রব্যের প্রচারধর্মের দ্বারা যদি জীবন্ত মানুষ আক্রান্ত হন, তা খুব উপযুক্ত কাজ নয় বলেই মনে করেন জ্ঞানেন্দ্রলাল। ক্রেতাদল বিজ্ঞাপনের মাছ। এবং ভাষা-ছবির মাল-মসলা, চার, টোপে সেই সব মাছ যে বঁড়শিতে নিজেকে যেচে সমর্পণ করেন; এ কথা তিনি কিছু অফসোসের সঙ্গেই জানান।

বিজ্ঞাপনকে সৎ-অসৎ, সাধু-অসাধু ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেছেন। একদিকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপকারী জিনিসের সন্ধান পেয়ে, দীর্ঘদিন রোগে ভোগা রোগীর রোগমুক্তি ঘটে অন্যদিকে ফুলে ফেঁপে ওঠে শহরের বারাঙ্গনারা; মূল বিষয় উপার্জন, তার জন্য মানুষ নানান মাধ্যম অবলম্বন করে, এই তাঁর মূল কথা। তবে বারাঙ্গনাদের প্রসঙ্গে তিনি কিছু অধিক বিব্রত হন, তা তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট-

> সংসারে অনেক রকমের বিজ্ঞাপন দিয়া লোকে অর্থ উপার্জ্জন করে। মহানগরীর রাজবর্ত্মে বারাঙ্গনারা নিজের দেহরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহা দ্বারা পথিকগণকে নরকে আকর্ষণ করিবার জন্য কতই চেষ্টা করে। ইহারা বিজ্ঞাপনে কি বলিতেছে? "এস পথিক, তুমি আমাকে পয়সা দেও, আমি তোমার নিকট আমার সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্ম বিক্রয় করিতেছি।" ঘৃণিততম-নীচতম এই সকল পাপীয়সীদিগের জীবন। কিন্তু সংবাদপত্রে যাহারা বারাঙ্গনাদিগের

কটাক্ষবৎ মিথ্যাপূর্ণ চটুকে ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদিগের জীবন কি বারাঙ্গনাদিগের জীবনের ন্যায় ঘৃণিত নহে? প্রলোভন, প্রতারণা, ঘৃণিত বিজ্ঞাপন, উভয়েরই অস্ত্র,- অন্যের অর্থ অবৈধরূপে গ্রহণ করা, উভয়েরই উদ্দেশ্য- নরকে উভয়েরই বাসস্থান।[১৫]

বারাঙ্গনাদের প্রসঙ্গে অন্যের অর্থ 'অবৈধরূপে' গ্রহণ করা বিষয়টিকে এত সহজভাবে কয়েকটি শব্দে ঘৃণাভরে প্রকাশ করা যায় কিনা, তা তর্কসাপেক্ষ। বারাঙ্গনাদের পাতা ফাঁদে, তাদের 'কুৎসিত', 'ঘৃণিত' 'নরকে' কিছু মানুষ ঠিক মাছের মতই সারল্যে আত্মসমর্পণ করেন কিনা সেও অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু ঊনবিংশ, বিংশ পেরিয়ে একবিংশেও এই প্রান্তিক মানবীদের বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি যে অনেক ক্ষেত্রে প্রায় একই রয়ে গেছে, তা আন্দাজ করা যায় এই প্রবন্ধাংশ থেকে। আর বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গের অন্তরালে সমাজের কিছু গোপন, রহস্যময়, আধো-অন্ধকার ছবিগুলি ধরা পড়তে থাকে।

তবে এই প্রাবন্ধিক বিজ্ঞাপন বিষয়টিতে শুধুমাত্র অনাস্থা প্রকাশই তিনি করেননি। 'অসৎ'-এর বিপরীতে সৎ-কে এনেছেন। এতক্ষণ তার প্রকাশভঙ্গিমায় 'সাধু বিজ্ঞাপন'-কে প্রায় সোনার পাথর বাটি বলেই মনে হচ্ছিলো। প্রবন্ধ এগোবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতও কিছু পরিবর্তিত হয়-

আমরা আর অসৎ বিজ্ঞাপনের আলোচনা করিতে পারিতেছি না। এখন সাধু বিজ্ঞাপনের আলোচনা করা যাউক। সংসারে যে যাহা করিতেছে, যে যাহা বলিতেছে, যে যাহা লিখিতেছে, তাহাতেই কোনও না কোন প্রকারে সত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিতেছে। বিজ্ঞানের বড় বড় পুস্তক, আবিষ্কৃত সত্যের বিজ্ঞাপন মাত্র। ভাল ভাল কবিতা, এক প্রকার সঙ্গীতময় সত্যের বিজ্ঞাপন। আর মধুর পবিত্র সঙ্গীত- স্বর্গ রাজ্যের বিজ্ঞাপন। আর ধর্ম্মকার্য্য, পরোপকার, দয়া, প্রেম- পবিত্র আত্মার অস্তিত্বের বিজ্ঞাপন। অজ্ঞান-আঁধারে লোকে দিশাহারা হইয়া পৃথিবীতে ফিরিতেছে। জ্ঞানী মহাজন যাঁহারা, তাঁহারা উন্নতির ঠিক পথ কোন্ দিকে তাহা দেখাইবার জন্য, সময়ের রাজবর্ত্মে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া বিজ্ঞাপন মারিয়া দিতেছেন, পুস্তকের খুঁটিতে "সাইন বোর্ড" টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারক যাঁহারা, স্বর্গ বা স্বর্গরাজ্যের পথ কোন্ দিকে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, দেশে দেশে বিজ্ঞাপন দিতেছেন।

আর দেখুন, মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মান্ডপতি স্বয়ং কত স্থানে, কত রকমে, কত বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন। আকাশে নীল কাগজের উপর, হীরকের অক্ষরে, প্রতিরাত্রিতে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা কি দেখিতে পান না? আপনারা স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাই শুনিয়াছেন। কিন্তু দেখুন, সমুদায় আকাশে, হীরক অক্ষরে কে বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন। ঐ বিজ্ঞাপন কি প্রকাশ করিতেছে? অযুত বৃন্দ জগৎ- অনন্ত ব্যাপ্তি, অনন্তগতি, জ্যোতির্ম্ময়তা, সুনিয়ম- মধুর মহীয়ান্ বিশ্বব্যাপী গভীর সঙ্গীত। বলিহারি এই বিজ্ঞাপনের!! আকাশে কেন, জগতের

যে দিকে চান, সে দিকেই বিজ্ঞাপন- সমুদায় সৃষ্টি বিজ্ঞাপন-জ্বলদক্ষরে অসংখ্য অসীম, অনন্ত, অবিনশ্বর, সত্য দিবানিশি প্রচার করিতেছে।[১৬]

প্রবন্ধটির প্রথমাংশের বক্তব্যের সঙ্গে শেষাংশের ধরনে বেশ কিছু প্রকাশগত পরিবর্তন হয় লেখকের। 'বিজ্ঞাপন' শব্দটিকে সাধারণ প্রচলিত, পণ্য ও বিক্রয়ের আওতা ছাড়িয়ে তিনি নিয়ে যান বহুদূর। যা প্রাত্যহিক উদাহরণ ছাড়িয়ে কিছুটা দার্শনিকতাকে স্পর্শ করে। আমাদের সমাজে, উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী বাঙালির মধ্যে 'বিজ্ঞাপন' বিষয়টিকে নিয়ে দ্বন্দ্বের একটা স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ে এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে। আজ একবিংশ শতাব্দীতেও যাকে প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* বইটির প্রথম খন্ড (১৮৪০-১৯০৫)-এ 'সেলাইয়ের কল' নামে একটি *সংবাদ প্রভাকর*-এর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি ১২৬০ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিনের। বাংলা পত্র-পত্রিকায় পরবর্তীকালে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর পাঁচ-ছয়-সাতের দশক পর্যন্ত নানা কোম্পানির সেলাইয়ের কলের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এই কলগুলি ছিল মধ্যবিত্তের স্বপ্নপূরণের চাবিকাঠি। বাহারি পোশাকের স্বপ্ন দেখা পরিবারের সাধ্য ছিল না নামী কোম্পানির তৈরি পোশাক কেনা এবং পরার। সেই পোশাকের আদলে নিজেদের মনোমত জামা-কাপড় বানিয়ে নিতে সাহায্য করত এই সেলাইয়ের কলগুলি। বড় সেলাইয়ের কলের কোম্পানি বাড়িতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের পাঠাতেন গৃহকর্ত্রীকে কলে সেলাই করার শিক্ষা দিতে। আজ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিও বাড়ির কাজে অতিরিক্ত যন্ত্রনির্ভর। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি সেই যুগের কথা বলে যখন এই একটি কল বিস্ময় হয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রবেশ করেছিল।

বাগবাজার নিবাসি ধনরাশি শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হৌসে আমেরিকা হইতে ছয়টা অত্যাশ্চর্য্য নূতন কল আসিয়াছে, তদ্দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে জামা, চাপকান, ইজার, পেন্টলন প্রভৃতি নানাপ্রকার পোসাক ও গণিচটের থলে পর্য্যন্ত সেলাই হইয়া থাকে। ঐ যন্ত্রগত সূচের এমত দ্রুতগতি ও চমৎকার কার্য্য স্থিরতা যে তাহা একভাবে গমন করিয়া এমত সেলাই করে যে বড় বড় দর্জ্জিরাও সেইরূপ করিতে পারে না, ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চ জাতিরা অসামান্য বুদ্ধির দ্বারা যদিও অনেক প্রকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তথাচ তাঁহারা এ প্রকার প্রয়োজনীয় আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারে নাই, যে ব্যক্তির বুদ্ধির প্রাখর্য্য দ্বারা আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তিনি কিরূপ অদ্বিতীয় লোক বিজ্ঞমন্ডলী বিবেচনা করিবেন।

> এই যন্ত্র সাধারণের পক্ষে সামান্য প্রয়োজনীয় নহে, এক দিবসে এক কালে ৬০০০ থলিয়া সেলাই হইয়া থাকে, অতএব ঐ কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের কত উপকার হইবেক তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য, ঐ যন্ত্র দর্শনার্থ অনেকেই গমন করিতেছেন, আমারদিগের কোন কোন বন্ধু তদ্দ্বারা কাপড় সেলাই করিয়া লইয়া সেলাই দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছেন।[১৭]

গৃহকর্মের প্রায় প্রতিটি পর্বে নানান যন্ত্র আজ যেভাবে মধ্যবিত্তের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হয়ে উঠেছে, তাতে রুটি করা থেকে কাপড় কাচা, এমনকি কাপড় প্রায় শুকনো হয়ে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত নানান তাক্ লাগানো যন্ত্রের কৌশল আমাদেরকে আর বিন্দুমাত্র বিস্মিত করে না। এই তালিকায় প্রতিদিন সংযোজনের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু আজ থেকে দেড়শো বছরেরও বেশি সময়ের আগে বাংলায় এই নেহাত নিরীহ কাপড় সেলাইয়ের মেশিনটি যে ভয়ানক দ্রষ্টব্য ও বিস্ময় উৎপাদক হয়ে উঠেছিল, তা এই প্রতিবেদনে স্পষ্ট। প্রতিবেদনটি পড়লে কিছুটা সময় ভ্রমণের অনুভূতি হয়।

উনিশ শতকের গোটা থেকে কলকাতার ব্যবসায়ী সমাজ ধীরে ধীরে বলিষ্ঠ হতে আরম্ভ করে। সাহেবরা নিজেদের স্বার্থে স্থানীয় মানুষদের কাজে লাগাতে লাগাতে স্থানীয়রাও ক্রমশ ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে বেশ প্রখর হয়ে উঠতে থাকে। ছাপা পত্র-পত্রিকাকে সাহেবরা তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। ব্যবসার কাজে, মানুষকে জানান দেওয়ার জন্যই ব্যবহৃত হত পত্রিকাগুলি। তবে সেসব মূলত ইংরেজি ভাষায় ছাপা হওয়ার ফলে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ছাড়া বাকিদের আওতার বাইরে ছিল সেসব। তার পাঠকরা ছিল বিদেশি। অসিত পাল তাঁর *আদি পঞ্জিকা দর্পণ* গ্রন্থে এইরকম পত্রিকায় প্রকাশিত এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের কথা জানান।

> ১৭৯৯ খ্রি. ১৪ নভেম্বরের এক বিজ্ঞাপনে লালবাজারে জনৈক মি. স্মিথ অদ্ভুত এক বিজ্ঞাপন দিলেন। যদিও এই অদ্ভুত শব্দটা আমি সময়ের প্রেক্ষিতে বলছি, তখন অদ্ভুত ছিল না ধরে নেওয়া যায়। ২৩০ নং লালবাজারের দোকানে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বিক্রির জন্যে এনে রেখেছেন। এ ছাড়াও তিনি জানাচ্ছেন চার মাস বয়েসের দুটো বাঘের ছানা ও একটা চিতা বাঘও বিক্রির জন্যে রাখা হয়েছে। ক্রেতাদের স্বচক্ষে এসে দেখে যেতে বলেছেন এবং দেখেশুনে দাম ঠিক করতে, আর হ্যাঁ, বাঘ দেখার বখশিস হিসাবে এর রক্ষককে আট আনা দিতে যেন না ভোলে। বিজ্ঞাপনদাতা বেশ হিসেব কষেই বিজ্ঞাপনটি গড়েছেন, বাঘ বিক্রি হোক বা না হোক বাঘ দেখিয়ে কম রোজগার হবে না। কেননা ঐ সময় আট আনার মূল্য কম ছিল না।

> সেই সময় গেজেটে কিছু বিজ্ঞাপন প্রায় নিয়মিত ছাপা হত যেমন কচ্ছপের স্যুপ, সোডা ওয়াটার, থাকার জন্যে মেস বা হোস্টেল, ঘর ভাড়া ইত্যাদি।[১৮]

অসিত পাল নিজে বলেছেন, আজকে এই বিক্রয়ের জন্য রাখা বাঘ অথবা কচ্ছপের স্যুপের বিজ্ঞাপন পড়ে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য লাগলেও সে সময়ের প্রেক্ষিতে তা হয়তো খুব অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা ছিল না। এরই মোটামুটি পাঁচ দশক পরে, ১৬ আষাঢ়, ১২৬১ অর্থাৎ ২৯ জুন, ১৮৫৪ সালে 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় বাংলা ভাষায় 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামে এমনই এক 'আশ্চর্য্য' খবর পাওয়া যায়, ফলে সে খবর হয়তো শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ছাড়িয়ে আরও কিছু পাঠকের মধ্যেও পৌঁছোতে পেরেছিল। কারণ এখানে ভাষাগত সমস্যাটাও ছিল না-

> প্রায় পাঁচ মাস অতীত হইল অতি আশ্চর্য্য এক গোবৎস জন্মিয়াছে, তাহার সপ্ত পাদ, একত্র যোড়া দুই দেহ কিন্তু এক মস্তক, এক্ষণে এ বৎস ধর্ম্মতলার শ্রীযুক্ত হন্টর কোম্পানির আড়গড়ার সম্মুখে ১১৩ নং ভবনে রহিয়াছে যাঁহারা দর্শনেচ্ছা করেন তাঁহারা উক্ত বাটিতে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন, দর্শক যদ্যপি একাকী হয়েন তবে অর্দ্ধমুদ্রা আর সপরিবারে অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র সহিত দেখিতে ইচ্ছা করিলে ১ মুদ্রা দিয়া ডি উইলসন কোং বাটিতে কিম্বা পূর্বোক্ত ভবনে দ্বারের নিকটে টিকিট ক্রয় করিয়া প্রত্যহ দেখিতে পাইবেন ইতি।[১৯]

এই বিজ্ঞাপনে যদিও আশ্চর্য বাছুর দেখতে আহ্বান করে সেই পথে বিজ্ঞাপনদাতার কিছু পয়সা লাভের উপায় রয়েছে, তবুও এতে কোনও সরাসরি পণ্য ক্রয়ের ডাক নেই। এর মধ্যে বিজ্ঞাপনের চাইতে বিজ্ঞপ্তির বৈশিষ্ট্য বেশি মাত্রায় রয়েছে। কোনও ব্যক্তি মারা গেলে সেই মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র নীলামে উঠবে, সে সংবাদও বিজ্ঞাপন শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

এতো গেল পশ্চিম বাংলার ছবি, সেসময়ে দেশ ছিল অবিভক্ত, আলোচিত প্রতিটি বিজ্ঞাপনই মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। পূর্ব বঙ্গে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ধরনও কি একই ছিল প্রায় সমসময়ে? তা একবার যাচাই করে নেওয়া যাক। মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র* বইয়ের প্রতিটি খন্ডে উনিশ শতকের ঢাকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের খোঁজ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের শুরুতে পূর্ববঙ্গ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকপত্র প্রকাশিত হত। *সেবক, অঞ্জলি, কল্যাণী, আরতি, আশা, ভারত সুহৃদ, ধূমকেতু* ইত্যাদির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই পত্রিকা গুলিতে নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত, পত্রিকায় ঘোষণা করা হত বিজ্ঞাপনের হার।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। টাইটেল পেজ প্রতি পৃষ্ঠা প্রতিবারে ৩ তিন টাকা।

অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতিবারে ২ টাকা। অন্য কোনরূপ বন্দবস্ত করিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া স্থির করিতে হইবে।

কল্যাণী প্রতিমাসে বাহির হইবে। শ্রী বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ, মাগুরা- যশোহর।[২০]

পূর্বোক্ত *অঞ্জলি* পত্রিকার পৌষ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় দেখি-

বিজ্ঞাপন

ডাক্তার আর, সি, দাসের সকল প্রকার জ্বর ও প্লীহাদির একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ

সর্ব্ব-জ্বর-হর মিশ্র

এই মহৌষধের অত্যাশ্চর্য্য শক্তিতে আজ সকলেই বিমোহিত এই মহৌষধকে সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। সুদূর ব্রহ্ম দেশেও এই ঔষধের আদর হইতেছে। যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন একবার ব্যবহার করুন। জ্বর না সারিলে মূল্য ফেরৎ দিব।।[২১]

এই বিজ্ঞাপনটি মনে করিয়ে দেয়, সদ্য অতীতের, এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ বা দ্বিতীয় দশকের একটি বিজ্ঞাপনের কথা, যে বিজ্ঞাপনে দর্শক-শ্রোতাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় টুথপেস্টে নুন থাকলে তা অশেষ কার্যকরী। সাধারণ ক্রেতা-দর্শকরা অধিকাংশই রসায়ণ এবং ডাক্তারিশাস্ত্র বিষয়ে তেমন কিছু জানেন না। ফলে টুথপেস্টে নুন থাকলে বা না থাকলে কী আলাদা সুবিধা হতে পারে তা তাঁরা স্বভাবতই বুঝতে পারেন না কিন্তু টুথপেস্টে একটি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত পদার্থ থাকার আকর্ষণে ক্ষমতায় কুলোলে তাঁরা সেই দ্রব্যটি হয়তো কিনে ফেলেন। এ হল এক ধরনের বিজ্ঞাপন-কৌশল। একটি দ্রব্যের কোনও একটি বিশেষ গুণকে উল্লেখ করে তার বিক্রি বাড়িয়ে তোলা। তেমনই ১৩০৭ বঙ্গাব্দে *অঞ্জলি* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘সর্ব্ব-জ্বর-হর মিশ্র’র বিজ্ঞাপনে জানানো হয় “সুদূর ব্রহ্ম দেশেও এই ঔষধের আদর হইতেছে।” ব্রহ্ম দেশে এই ঔষধের আদৌ আদর হচ্ছে কিনা, সে অন্য প্রশ্ন, কিন্তু এই ধরনের বাক্য সেকালেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, যেমন আজও করে। এবং এই বিজ্ঞাপনটিকে আর ঠিক বিজ্ঞপ্তি বলা চলে না। এ একেবারে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত বিজ্ঞাপনই বটে।

জনমানসে বিজ্ঞাপনের প্রভাব খারাপ না ভালো, এ নিয়ে বিতর্ক কেবল মাত্র ঊনবিংশের শেষে অথবা বিংশের শুরুতেই হত এমন নয়, এ বিতর্ক চলেছে দীর্ঘদিন। আজও এই বিতর্কের ধারা অব্যাহত। প্রভাব মন্দ হোক, অথবা ভালো; শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কখনোই বিজ্ঞাপনের মতন সর্বব্যাপী মাধ্যমকে অস্বীকার করতে পারেননি। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে সত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *বৈষয়িক বাংলা* নামে একটি প্রবন্ধের বইতে নানান বিষয়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধও স্থান করে নেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে দেশের অর্থনীতি, সবকিছুতেই বিজ্ঞাপনের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, এই কথা বলা হয়।

> সাধারণত, ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার বহুবিধ পদ্ধতি বিজ্ঞাপনে অনুসৃত হয়- এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে যেমন প্রশংসার্হ দিকের অভাব নাই তেমনি অনেক নিন্দার্হ দিকও বিদ্যমান। আকবর বাদশাহর আমলের

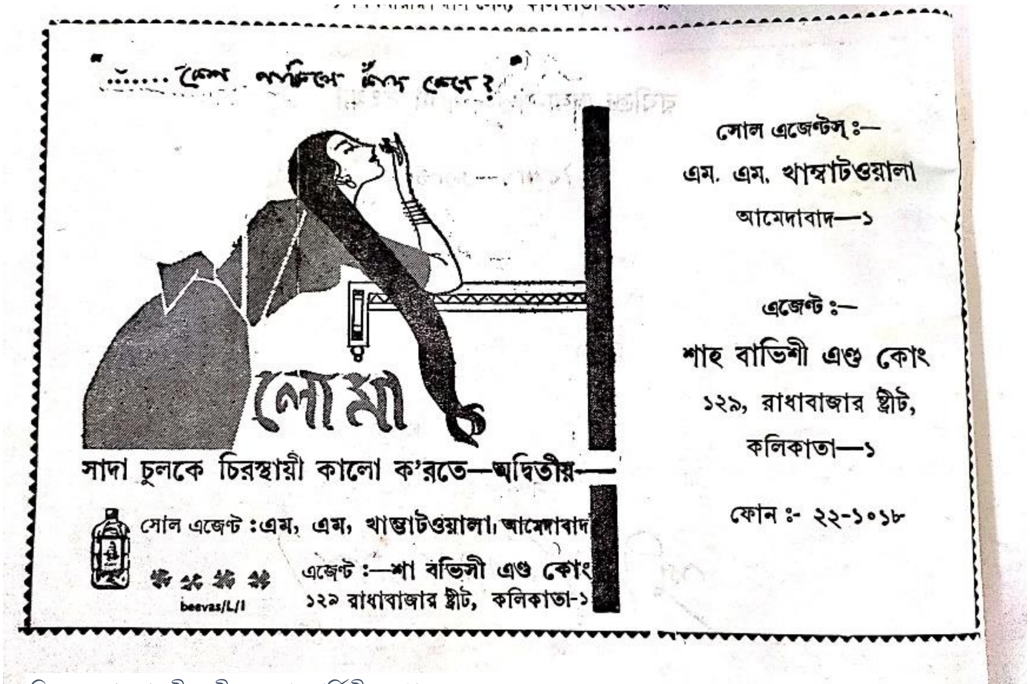

চিত্র ১.১ গল্পভারতী, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬৮

> ঐতিহ্যমন্ডিত পরিবেশের চিত্র রচনা করিয়া কী ভাবে প্রথম তাম্রকূট ভারতে আসিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া কোনও সিগারেট কোম্পানি যখন বিজ্ঞাপন দেয়তখন একদিকে ক্রেতার মনকে ইতিহাসে আকৃষ্ট করা হয়, অন্যদিকে নিজ কোম্পানির সিগারেটের কথাটিও বলা হয়। কেশবতী রমণীর ছবি দিয়া যখন পাশে লিখিয়া দেওয়া হয়,- 'কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?' তখন এক পরিচিত লোকগীতির ঐ ছত্রটি যেমন পাঠকমনকে আবিষ্ট করে তেমনই নিজের কেশ তৈলটির প্রচারও হইয়া যায়। কিন্তু যখন এক অশ্লীল ছবি দিয়া কোনও সিনেমার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় (হয়তো সেই ছবিটি পর্দার বুকে আদৌ প্রতিফলিত হয় না), তখন সেই ছবি অর্বাচীন-যুবার মাথা ঘুরাইয়া দেয়, প্রেক্ষাগৃহে প্রচুর দর্শক টানিয়া আনে;

কিন্তু সাধারণভাবে দেশের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, জনসাধারণের রুচি-বিকারের সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। বহু অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রাচীরে প্রাচীরে লিপ্ত থাকিয়া প্রতিদিন ধীরে ধীরে দেশের যুবশক্তির সর্বনাশ করিতেছে, এই সকল বিজ্ঞাপন সরকারী নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে।[২২]

উপরের অংশটি পড়লেই বোঝা যায়, বিজ্ঞাপনে শ্লীল-অশ্লীল, সৎ-অসৎ, নৈতিক-অনৈতিকের দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে ছিল এবং আজও আছে। বিজ্ঞাপনের ইতিহাস খুঁজতে গেলে এই দ্বন্দ্বের ছবিটি চোখে খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে।

বিজ্ঞাপন বিষয়ে কেবল নৈতিক দ্বন্দ্বই যে উনিশ-বিশ শতকের পত্রিকাগুলির একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি, তা আলোচনার একেবারে শুরুতেই দেখা গিয়েছিল *কাজের লোক* এবং *আর্থিক উন্নতি* পত্রিকায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকেই কেমন গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে বিজ্ঞাপনের বাণিজ্যিক দিকটি নিয়ে, কী করলে বিজ্ঞাপন আরও দৃষ্টি-নন্দন হতে পারে, তা নিয়ে সহজবোধ্যভাবে আলোচনা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত, সন্তোষকুমার দে লিখিত *উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন* বইটিও ভরে রয়েছে বিজ্ঞাপন বিষয়ক নানান তথ্যে, তার মধ্যে অধিকাংশ তথ্যই বিজ্ঞাপনের মত বহুবিস্তৃত মাধ্যমটিকে পাঠকমনে উপলব্ধিযোগ্য করে তোলার প্রয়াস। পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপন বিষয়ে নানা আলোচনা হলেও গত শতাব্দীর চারের দশকে একটি সম্পূর্ণ বই বিজ্ঞাপন নিয়ে লেখা বেশ অবাক করার মতন বিষয়। বইয়ের নামটিও বেশ উল্লেখযোগ্য। সেই বইয়ের 'নিবেদন' অংশে গ্রন্থকার বলেছেন বিজ্ঞাপনের অগ্রগতির কথা। একদা কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে যে প্রচার হত, আধুনিককালে বিজ্ঞানের সহায়তায় সেই প্রচার বহুব্যাপ্ত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞাপনের ব্যাপক ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা গেছে। এই বইটি লেখা গত শতকের চারের দশকের একেবারে শেষভাগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন সদ্য অতক্রান্ত। গ্রন্থকার এও উল্লেখ করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এবং পরে, অল্পকালের মধ্যে বিজ্ঞাপনশিল্পের সবিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। শেষে লেখক জানান ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞাপন বিষয়ে বহু গ্রন্থ আছে, বাংলা ভাষায় সেই অভাব-পূরণের জন্যই এই বই।

বইটি বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে 'পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন' অধ্যায়টিতে লেখক বলছেন-

প্রাচীন সংবাদপত্রে যথেষ্ট সংখ্যায় বিজ্ঞাপন থাকত না, যাও বা থাকত, তা সব বিজ্ঞপ্তি বা ইস্তাহার ধরনের। অধিকাংশ ঘোষণায় শিরোনামায় 'বিজ্ঞপন' বা 'বিজ্ঞপ্তি' কথাটা পর্যন্ত লেখা থাকত, ক্রমে শিল্পজাত বস্তুর বিজ্ঞাপনও চালু হল, কিন্তু সে সব বিজ্ঞাপন প্রায় ক্ষেত্রেই অক্ষর সাজিয়ে লেখা হত। বিজ্ঞাপনে চিত্র সংযোগ খুব বেশি দিনের

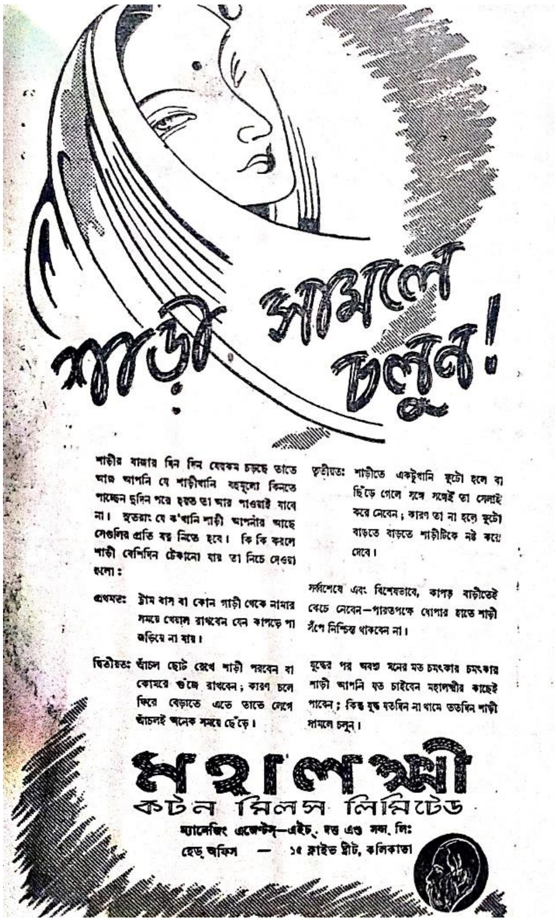

চিত্র ১.২ শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫০

ঘটনা নয়। ব্লক তৈরির ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞাপনে চিত্র সংযোগ বিশেষ জনপ্রিয় হয়েচে। তার পূর্বেও কাঠের ব্লক দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত, বিশেষ করে পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে কাঠের ব্লক খুব বেশী ব্যবহৃত হত।

যে সময় এ দেশে মসলিন তৈরী হয়ে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে যেত তখনও তার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের দরকার হয়নি। যন্ত্রযুগে কলকারখানার প্রসারের সাথে সাথে নিত্য ব্যবহার্য কাপড়ের জন্যও বিজ্ঞাপন রচিত হয়েছে।...

ক্রমে সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে তাগিদ যেতে লাগল- বিজ্ঞাপনের জন্য। যারা সেই তাগিদ দিয়ে ফিরতেন, তাদের কাজ মুখ্যত ছিল কাগজের পক্ষ হতে ‘স্থান’ (space) বিক্রয় করা। এই যে এক শ্রেণীর দালাল সৃষ্টি হল এদের মধ্যেও ক্রমে প্রতিযোগিতা সুরু হ’ল। তারা কেউ বিজ্ঞাপনদাতার হয়ে বিজ্ঞাপনটি মনোজ্ঞ ভাষায় লিখে দিতে লাগলেন। এইভাবে তারা বিজ্ঞাপনদাতার সহায়তা করতে করতেই বুঝতে পারলেন যে তাদের পারিশ্রমিক যদিও কাগজওয়ালাই দেন তবুও তাদের উপার্জনের উৎস বিজ্ঞাপনদাতা। দীর্ঘকাল তারা কাগজের মালিকের বেতনভুক্ত বা কমিশনভোগী কর্মচারী ছিলেন। ক্রমে তাদের সম্বন্ধটা কাগজওয়ালার চাইতে বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন-প্রকাশক সংবাদপত্র এই উভয়ের মধ্যস্থ দালালের পৃথক সত্তা সৃষ্ট ও স্বীকৃত হল, প্রতিষ্ঠিত হল পৃথক ভাবে বিজ্ঞাপন ব্যবসায়। ক্রমে এক শ্রেণীর কাজ করতে করতে তারা সেই কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে লাগলেন। সংবাদপত্র ব্যতীত আরো দশ রকম মাধ্যমের সহায়তায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা গেল।[২৩]

এই সব প্রচার ব্যবসায়ী বা দালাল বলতেই বোঝানো হয়েছে বিজ্ঞাপন সংস্থা বা Advertising Agency গুলির কথা। এই প্রচার ব্যবসায়ীরা কীভাবে তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেন, ধাপে ধাপে তারও হিসাব দিয়েছেন গ্রন্থকার। ‘বিজ্ঞাপনদাতা’, ‘মাধ্যম’, ‘কার্য নির্বাহক’, ‘সংযোগসাধক’, ‘পরিপ্রেক্ষক’, ‘গবেষণা’, ‘খরচের হিসাব’,

‘নক্সা বা প্রাথমিক চিত্র’, ‘কথা’, ‘খসড়া ছবি’, ‘সমাপিত ছবি’, ‘আলোকচিত্র’, ‘রঙ্’, ‘ছাপাখানার হরফ’, ‘ব্লক’, ‘শিল্প বিভাগ’, ‘প্রুফ’, ‘প্রমাণ পত্র’-এই আঠারোটি ধাপ পেরিয়ে কীভাবে একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর বিজ্ঞাপনের জন্ম হয়, তারই বিবরণ দিয়েছেন লেখক সমগ্র অধ্যায় জুড়ে।

বিজ্ঞাপনকে নানান পত্র-পত্রিকায় সমালোচকরা কীভাবে দেখেছেন, তার সু-প্রভাব, কু-প্রভাবের দিক, তার নৈতিক-অনৈতিকের প্রশ্নগুলিকে যেভাবে তুলে ধরেছে এই বই। সেই সঙ্গে তার অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক দিকগুলি, কেমন করে আসতে পারে ছাপা বিজ্ঞাপনের সাফল্য তা নিয়েও এই বইতে রয়েছে মনোজ্ঞ আলোচনা। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো বুদ্ধিজীবী, লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও বিজ্ঞাপন ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র পন্ডিত (১৮৭৯-১৯৬৮) একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়াসে দুটি সচিত্র সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন *জঙ্গিপুর সংবাদ* এবং *বিদূষক* নামে। সংবাদপত্রের পরিচালকের কাছে বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দুটি পত্রিকাও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ও পরিবেশনের দিক থেকে হয়ে উঠেছিল অনন্য। বিজ্ঞাপনের পরিবেশনে ছিল দক্ষতা। দাদাঠাকু স্বয়ং সেই বিজ্ঞাপন অংশটির প্রতি যত্নবান ছিলেন।

কৃশানু ভট্টাচার্য লিখছেন-

> প্রথমেই ‘জঙ্গিপুর সংবাদে’র বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পত্রিকার প্রকাশের পর ৪র্থ সংখ্যার প্রথম বিজ্ঞাপন
>
> চোখে পড়ে। বিজ্ঞাপনটি ছিল ‘দি গুলশন আনোয়ার সার্কাস কোম্পানীর’। সে সময়ে রঘুনাথগঞ্জের ডাক্তারখানা সম্ভবতঃ বর্তমান পুরনো হাসপাতাল বলে পরিচিত মহকুমা স্বাস্থ্য অধিকর্তার কার্যালয়ের মাঠে সেই সার্কাস বসেছিল। সেই সার্কাসে হাতি, ঘোড়া, ভালুক, বানর প্রভৃতি জন্তুর খেলা, বাই-সাইকেল, বার ও তারের নানারকম ক্রীড়ার আয়োজন ছিল বলে বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল। পত্রিকার একটি গোটা পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হতে থাকে। এরপর জঙ্গিপুর সংবাদে ডাঃ নন্দলাল পালের সস্তায় স্টেশনারী মালের দোকানের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো সম্পূর্ণ পাতা জুড়ে। মশক কাঁধে ভিস্তির ছবি ও ছবির ভিতর দোকানে পাওয়া যায় এমন সব জিনিষের তালিকা বিজ্ঞাপনটিতে দেওয়া ছিল। এছাড়াও ছিল জঙ্গিপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন।
>
> ...

'বিদূষকে' বিজ্ঞাপনের জন্য প্রথম সংখ্যা থেকেই ঘোষণা দেবার পর এইসব আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো। এর মধ্যে সি. কে সেন এন্ড কোং এর বিজ্ঞাপনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদূষকে প্রকাশিত জবাকুসুম তেলের একটি বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে সি. কে সেন এন্ড কোং-এর সবকটি উৎপাদনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে যেতো। বিজ্ঞাপনটির শিরোনামা 'গৃহিণীর পত্র'-

'প্রিয়তম,

এবার আমার শরীর ভাল নাই, খোকারও অসুখ, খুকীরও জ্বর। এই কটি ওষুধ আনিও। কলুতলার কবিরাজ সেন মশাইয়ের ঘর থেকে-

জয়মঙ্গল রস খুকীর জ্বরে করবে গুণ,

বাসারিস্ট এনো, খোকা কেশে হচ্ছে খুন।।

কূটজাসর এনো মায়ের রক্ত অতিসার।

সুরবল্লী কষায় এনো ঢাকতে আমার হাড়।।

মকরধ্বংজ সি কে সেনের ভেজাল কিছু নাই,

তেজস্কর ওষুধ এরা নাইকো পাড়াগাঁয়ে।।

লইবে আর এক দ্রব্য এদের নিকটে,

আছে কিনা আছে দেখ তোমার ঘটে।।

নিকটে আসতে পারো যদি বুঝি খরচ করে,

ওটা লেখা আছে স্পষ্ট পত্রের ভিতরে।।'

পত্রটিতে কলকাতায় চাকুরীরত স্বামীর উদ্দেশ্যে স্ত্রী জবাকুসুম তেল আনতে বলছেন। কবিতার প্রতিটি লাইনের প্রথম অক্ষর পরপর সাজালে বাক্য দাঁড়ায়-'জবাকুসুম তেল আনিও'।[২৪]

একদা যে বিজ্ঞাপন ছিল কেবলই বিজ্ঞপ্তি মাত্র, যার মাধ্যমে কেবল কিছু তথ্য পৌঁছে দেওয়া হত পাঠকের কাছে সেই বিজ্ঞাপন বিংশ শতকের আগমনে প্রাণ পায়। তাতে সাহিত্যের ছোঁওয়া লাগে।

বাংলা বিজ্ঞাপনের সুত্রপাত থেকে উনিশ শতকের বিজ্ঞাপন পেরিয়ে বিশ শতকের শুরুর দশক গুলিতে কেমন হয়েছিল তার চেহারা, তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ইতিহাসে খানিক চোখ বুলিয়ে নেওয়া গেল। এবার আসা যাক বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির কিছু প্রাথমিক ইতিহাসে। নিধি ট্যান্ডন এর একটি গবেষণা পত্র, *Growth of Advertising Industry In India* তে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞাপন সুচারু ও সময়োপযোগী ভাবে গড়ে তুলতে এই বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির ভূমিকা অসীম। সেই কথাই সন্তোষকুমার দে'র পূর্বোক্ত বইতেও আমরা দেখতে পাই। নিধির গবেষণাপত্রের একটি অংশ তুলে দেওয়া হল-

> There has been a long tradition of advertising in India since the first newspapers published in India in the 19th Century carried advertising. Two British advertising agencies J. Walter Thompson and D. J Keymer were the ones who laid the foundations of professional advertising in India. The first advertising agency was established in 1905, B. Datram and Company, followed by the India-Advertising Company in 1907, the Calcutta Advertising agency in 1909, S. H. Bensen in 1928, J. Walter Thompson Associates through its Indian associate, Hindustan Thompson Associates in 1929, Lintas (Lever International Advertising Services) in 1939 and McCann Erikson in 1956. Under the more socialist political environment of the 1960s and 1970s there was little incentive for companies to to advertise because advertising was not tax deductible. In the 1970s there was a 58% growth in the number of registered agencies from 106 in 1969 to 168 in 1979, and this included a growth in Indian agencies. The first advertising appeared on state television in 1986. The Advertising Club of Mumbai celebrated its silver jubilee in March 1980.[২৫]

ভারতীয় বিজ্ঞাপনের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বছরগুলি চিহ্নিত করে দিয়েছেন নিধি তার প্রবন্ধে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভারতের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিকির গেজেটকে অবলম্বন করে ভারতীয় বিজ্ঞাপনের পথ চলা শুরু হয়। সে সময়ের বিজ্ঞাপনকে যে বিজ্ঞপ্তি বলা যেতে পারে, তা আগেই দেখা গেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঔপনিবেশিক শিল্পশিক্ষার সূত্রপাতেই বিজ্ঞাপনী শিল্পের প্রচলন। পঞ্জিকার কাঠখোদাই চিত্র বা লিথোছবিগুলির পরে, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পেশাদারী শিল্পী মহলে বিজ্ঞাপনী চিত্রের গুরুত্ব বাড়তে থাকে এবং বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ, বিজ্ঞাপন, পোস্টার এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে তা ক্রমশঃ পরিণত

রূপ লাভ করে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যপূর্ণ লোকশিল্প এবং আধুনিক গ্রাফিক ডিজাইনের মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য ১৯৪৭ সালে Indian Institute of Art in Industry প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে সরকারী আর্ট স্কুলে কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ খোলা হয়। এবং সেখান থেকে শিল্পীদের মসৃণ, লোভনীয় জীবিকার পথ খুলে যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে বিজ্ঞাপনী চিত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে কলকাতা শহর স্বভাবতই তার স্থান করে নেয়, কারণ যে J. Walter Thompson এবং D. J. Keymer-এর মতো প্রতিষ্ঠান কলকাতাতেই অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রতিভাবান বেশ কিছু বিজ্ঞাপনী শিল্পী কলকাতাকেই তাঁদের কাজের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গ্রহণ করেন। "To remind India that printing is a craft, interior decorating an art, an industrial design a highly skilled profession..."- Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSSC) আয়োজিত, ২০১১ সালের প্রদর্শনীর স্মরণিকাটিতে উদ্ধৃত ছত্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬]

এই স্মরণিকা থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যায়-

১৯৪৭ সালের বিজ্ঞাপনী চিত্রের অধিকতর প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত Indian Institute of Art in Industry- সংস্থাটি শিল্পের মর্ম বোঝাতে তৎপর হয়েছিল সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষকে। এর আগে, ১৯৪১ সালে কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে কমার্শিয়াল আর্টের প্রথম প্রদর্শনীর সঙ্গে এই শিল্প বিষয়ক আন্দোলনের সূত্রপাত।

অচিরাৎ এই প্রদর্শনী একটি অত্যন্ত সফল বার্ষিক অনুষ্ঠানের রূপ নেয়। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে। এই প্রদর্শনী লন্ডন শহরে পাড়ি দেয়। ভ্রমণ বিষয়ক পোস্টার, প্রচ্ছদ অলংকরণ, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপনী চিত্র বিষয়ক যে প্রতিযোগিতা হত তা পরবর্তীকালে অজিত মুখার্জি সম্পাদিত Institute of Art in Industry'র বার্ষিক মুখপত্রে তা প্রকাশিত হত।

বাংলা পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদপত্রে নানান দেশীয় ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। *প্রবাসী* এবং *ভারতবর্ষের* মতো পত্রিকা, অথবা *Hindusthan Standard, যুগান্তর* বা *আনন্দবাজার*-এর মতো সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিপুল পরিমাণে বিজ্ঞাপন ভান্ডারের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের টেক্সট এবং লাইন ড্রয়িং-এর প্রাধান্য ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। আদিযুগের কাঠখোদাই ব্লক বা লিথোগ্রাফির স্থান নেয় বহুবর্ণের ব্লক এবং ফটো অফসেটের ছাপা পদ্ধতি। এছাড়া, দেশলাই বাক্সের লেবেল, রাস্তার হোর্ডিং বা সাইনবোর্ড ইত্যাদিতেও বিজ্ঞাপনের নতুন ধাঁচের ছবির প্রভাব পড়তে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে খাদ্য বা ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিনোদন জগতের বিজ্ঞাপনও দেখা যেতে থাকে।

পাঁজিতে প্রকাশিত কাঠখোদাই ছবিবহুল বিজ্ঞাপনগুলি বাদ দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী যে বিজ্ঞাপন ছিল মূলত বিজ্ঞপ্তি, কোনও একটি বিশেষ বার্তা দিয়ে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে থেকেছে নানান ঘোষণা, যে বিজ্ঞাপনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকতো বিস্তৃত বিবরণ, সেই বিজ্ঞাপনই বিংশ শতাব্দীতে এসে বদলাতে শুরু করল। কেবল বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছবিই নয়, রঙিন ছবি আকৃষ্ট করলো দর্শককে। কখনো কখনো দীর্ঘ কপির বদলে কয়েকটি শব্দে মূল কথাগুলি বলে, বাকি পাতা আলো করে থেকেছে ঝলমলে রঙিন ছবি। সেই বিজ্ঞাপনগুলির কয়েকটি দেখে এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাবে।

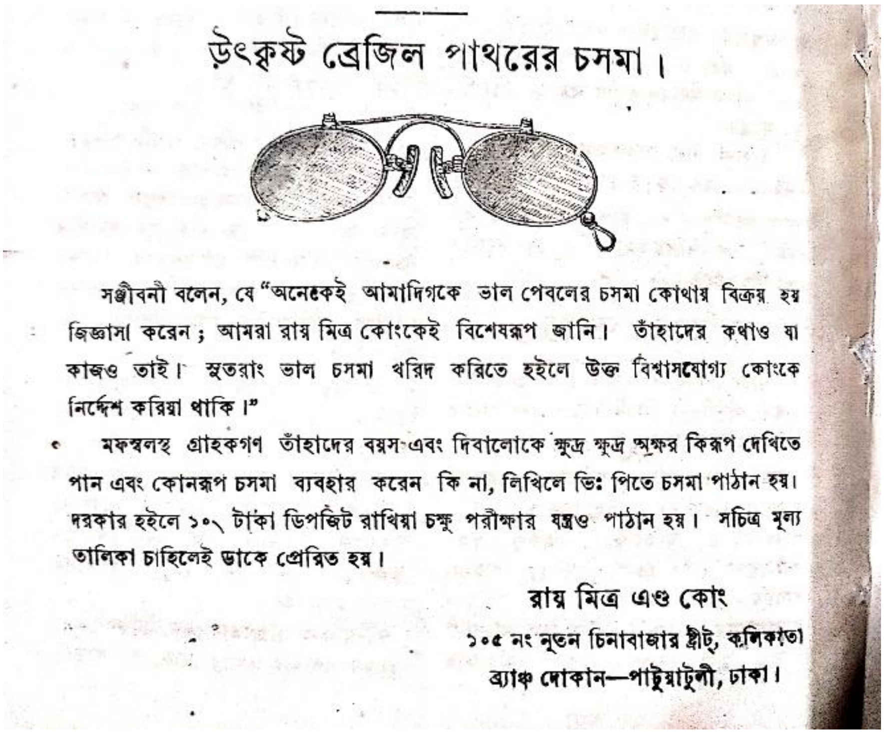

চিত্র ১.৩ বঙ্গদর্শন, ১৩১১

১৩১১ সালের বঙ্গদর্শনে 'উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চসমা'র বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে। কেবলমাত্র চশমার বর্ণনা নয়, তার সঙ্গে সেই 'ব্রেজিল পাথর' নামক আশ্চর্য উপাদানের চশমাটির ছবিও দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞাপনে। এই চশমা কেনার আগে সংস্থাটি জেনে নিতে চাইছেন এর খরিদ্দারের বয়স, তিনি সূর্যের আলোয় ক্ষুদ্র হরফ দেখতে পান কিনা অথবা তিনি আগে কেমন চশমা ব্যবহার করতেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই এই চশমা প্রদান করা হত বলে মনে হচ্ছে এই বিজ্ঞাপন থেকে।

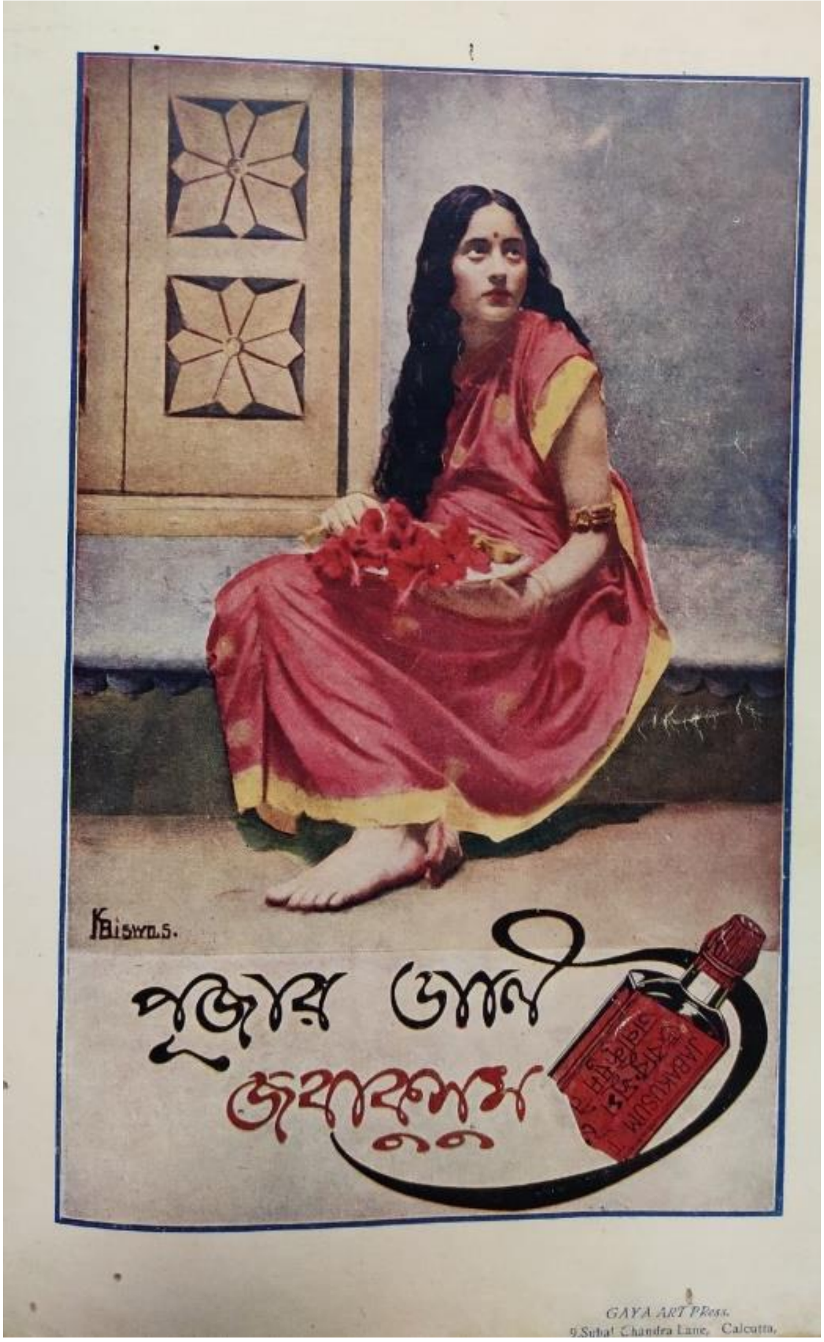

চিত্র ১.৪ ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩৩১

জবাকুসুমের পাতা জোড়া এমন অপূর্ব রঙিন বিজ্ঞাপনটি দেওয়ার লোভ সংবরণ করা যায় না শেষপাতে। আগের বিজ্ঞাপনটির সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের তফাৎ বিশ বছরের। এই বিজ্ঞাপনটি দেখে বোঝা যায়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই মোটামুটিভাবে বহুবর্ণী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থেকেছে বিজ্ঞাপনে। তবে রঙিন অথবা সাদা-কালো, এই বিষয়টি পরবর্তীকালে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। পাতাজোড়া ঝলমলে বিজ্ঞাপন যেমন আকর্ষক, তেমনই সাদা-কালোয় বুদ্ধিদীপ্ত কপিতে, ছবিতে, কবিতায়, ব্যঙ্গ-কৌতূকে সেজে ওঠা বিজ্ঞাপনগুলি দশকের পর দশক ধরে মোহিত করে রেখেছে আগ্রহী মধ্যবিত্তকে। তার মধ্যে বহু বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে চিরকালীন। সেই দ্রব্য বহুকাল অন্তর্হিত হয়েছে হয়তো বাজার থেকে, কিন্তু পুরনো পত্র-পত্রিকার পাতা জুড়ে, অথবা বংশ পরম্পরায় মানুষের স্মৃতি থেকে স্মৃতিতে বাহিত হয়েছে সেই সব বিজ্ঞাপন।

বাংলা বিজ্ঞাপনের একেবারে প্রথমযুগের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা গেল, বিংশ শতকের বিজ্ঞাপনের বহুবিধ পরিবর্তন, ধরন নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র:

১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *অবনীন্দ্র রচনাবলী,* প্রথম খন্ড, কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ২০৪।

২. এস. পি. চ্যাটার্জী (সম্পাদিত), "মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন", *কাজের লোক,* ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯১৬, পৃষ্ঠা ১১।

৩. এস. পি. চ্যাটার্জী (সম্পাদিত), "এদেশের মাসিকে বিজ্ঞাপন কম কেন", *কাজের লোক,* ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯১৬, পৃষ্ঠা ১১-১২।

৪. ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, "ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন", *আর্থিক উন্নতি,* বিনয়কুমার সরকার (সম্পাদক), ৫ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮।

৫. সোমব্রত সরকার, *বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন: ১৭৭৮-২০১৪,* কলকাতা: বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২১, পৃষ্ঠা ১২-১৩।

৬. তপন বাগচী, "বিজ্ঞাপনের জগৎ", *দুই শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র,* মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০০, পৃষ্ঠা ৫১৭।

৭. গোলাম মুরশিদ, "অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনের ভাষা", *দেশ,* সাগরময় ঘোষ (সম্পাদক), ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩০।

৮. গোলাম মুরশিদ, "বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন ও পত্রপত্রিকার পরিচয়", *কালান্তরে বাংলা গদ্য,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩৭।

৯. অসিত পাল, *আদি পঞ্জিকা দর্পণ,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৫।

১০. ঋত্বিক, *বাংলা বিজ্ঞাপন পরিক্রমা: ১৯৫০ পর্যন্ত,* কলকাতা: জয়ঢাক, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৯-৬৯।

১১. অসিত পাল, *আদি পঞ্জিকা দর্পণ,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৮।

১২. স্বপন বসু (সম্পাদক), *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ,* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৬৭৫।

১৩. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিজ্ঞাপন ১ নং", *পাঁচুঠাকুর,* কলিকাতা: 'শ্রী নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত', ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯১।

১৪. জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, “বিজ্ঞাপন”, *প্রবন্ধ লহরী*, কলকাতা : ‘শ্রী শরচ্চন্দ্র তরফদার দ্বারা প্রকাশিত’, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৪।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪-১৫।

১৭. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ১৮৪০-১৯০৫ (প্রথম খন্ড)*, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯১।

১৮. অসিত পাল, *আদি পঞ্জিকা দর্পণ*, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৪।

১৯. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ১৮৪০-১৯০৫*, প্রথম খন্ড, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৮১।

২০. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, সপ্তম খন্ড, কলকাতা : ভারবি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১২-১৩।

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮।

২২. সত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষয়িক বাংলা*, কলকাতা : চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

২৩. সন্তোষকুমার দে, “পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন”, *উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন*, প্রকাশস্থান ও প্রকাশকের উল্লেখ নেই, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮।

২৪. কৃশানু ভট্টাচার্য, “দাদাঠাকুরের বিজ্ঞাপন বিচিত্রা”, *সাংবাদিক দাদাঠাকুর*, কলকাতা : প্রকাশক অজ্ঞাত, ২০০১, পৃষ্ঠা ৬১-৬৫।

২৫. Tandon, Nidhi, “Growth of Advertising Industry In India”, *International Journal of Recent Scientific Research*, Vol.9, January, 2018, page 23623-23624.

২৬. Guha-Thakurta, Tapati. *The City in The Archives : Calcutta’s Visual Histories*. Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta-CSSSC (An exhibition from the archival collection). CSSSC : Kolkata. 2011. Page 12.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা বিজ্ঞাপন

১

বাঙালি কে বা তার কোনও সুনির্দিষ্ট একটা সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে কিনা, এটা একটা অমীমাংসিত প্রশ্ন। একে নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা খুব মুশকিল। তাকে ভৌগোলিক পরিচয় দিয়ে বাঁধা যায় না, কারণ আমরা যাকে বঙ্গদেশ বলছি, বলাই বাহুল্য তার বাইরে অনেক বাঙালি আছেন। আসাম, ত্রিপুরাকে বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেও, তার বাইরে অনেক বাঙালি আছেন সারা পৃথিবী জুড়ে। আবার ভাষাগত পরিচয় দিয়েও তাকে ধরা মুশকিল এই কারণে যে, প্রথম কথা, এমন অনেক বাঙালি আছেন যাঁদের মাতৃভাষা বাংলা, কিন্তু তাঁরা নানান সূত্রে এখন আর বাংলা জানেন না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যাঁদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা বাংলা জানেন। তার থেকেও বড় কথা, বাংলা ভাষার প্রতি এক ধরনের অনীহা বা হীনমন্যতাবোধ যত বাড়ছে, তত বাঙালির সংজ্ঞা আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। সাংস্কৃতিক কোনও একটি নির্দিষ্ট পরিসরে বাঁধাও তাঁদের নানান কারণে মুশকিল। তার মধ্যে একটা হল, ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান নামক একটি আলাদা রাষ্ট্রিক পরিসর তৈরি হল, ফলে এপার বাংলা-ওপার বাংলার সাংস্কৃতিক যে দূরত্ব, সেই দূরত্বও ক্রমাগত বাড়তে থাকলো। যত সময় পরিবর্তিত হবে, এই দূরত্ব আরও বাড়বে স্বভাবতই। দুই বাংলার চলাচল অনেক কমে আসে, ফলে এই বাংলার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের যে সাংস্কৃতিক দূরত্ব, তা কমবে কিন্তু আমার পাশে বাংলাদেশের যে বাঙালি, তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক দূরত্ব বাড়বে।

এই প্রশ্নটা অমীমাংসিত বটে, কিন্তু তবুও নানান প্রসঙ্গসূত্রে বাঙালির একটা কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে খুঁজতে চেয়েছেন বিভিন্ন মানুষ। তাঁদের একজন হলেন নীহাররঞ্জন রায়।

বাঙালি দেব-দেবীর কল্পনা, এটা যে বিশেষভাবে বাঙালিরই হৃদয়াবেগের একটা বৈশিষ্ট্য, সেই বিষয়টা দেখতে পাই নীহার রঞ্জন রায়ের *বাঙ্গালীর ইতিহাস* বইতে। দেবতাদের মর্ত্যের ধূলিতে নামিয়ে পরিবার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছে বাঙালি। এ কথা সত্যি, যে গণেশকে মহারাষ্ট্র যেভাবে পুজো করে, সেখানে গণেশ কিন্তু শেষপর্যন্ত শৌর্যের দেবতা। কিছুতেই বাঙালির আদরের দুলালটি নয়। আমাদের গাদা গাদা খড় খেয়ে 'পেটটি নাদা' করা

'গণেশ দাদা' নয়। অথবা উত্তরভারত যেভাবে হনুমানকে পুজো করে, সেখানে সে হল শক্তির প্রতীক। নীহাররঞ্জনও বারবার সেই কথাটিই বলেছেন।

> বাঙলার সাধনায় দেবতারা ধরা দিয়েছেন মানুষের বেশে, মানুষের মতো হইয়া; মানুষের মাপেই যেন দেবতার পরিমাপ। তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই নানা স্থানে নানা সুত্রে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মানবিকতার প্রতি বাঙালি চিত্তের এই আকর্ষণের আভাস প্রাচীন কালেই নানাদিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।[১]

নীহাররঞ্জন আরেকটি কথা এখানে জানান, খুব বড় যে ক্লাসিকাল গড়ন, তা মন্দিরেরই হোক অথবা কাব্য-কবিতারই হোক; সেই ক্লাসিকাল গড়নে বাঙালির খুব একটা রুচি নেই। ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো, দক্ষিণভারতের মতো প্রসারিত, বিশাল কোনও স্থাপত্য বাঙালি তৈরি করেনি।

> প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠন নৈপুণ্যের পরিচয় বিশেষ নাই। শুধু স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই নয়, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী মনন ও কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই। সারনাথের বুদ্ধ-প্রতিমায়, মধ্যভারতে উদয়গিরির ভাস্কর্যে, এলিফান্টা ও এলোরার ভাস্কর্যে, দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ-প্রতিমায় যে গভীর দুঃসাহসী মনন ও ভাবনা-কল্পনা বিস্তার, ভাব ও আয়তন উভয়ত, বাঙলার ভাস্কর্যে তাহার পরিচয় কোথাও বিশেষ নাই। কিন্তু, সূক্ষ্ম কমনীয়তা, হৃদয়ের আবেগ এবং ইন্দ্রিয়ালুতার গভীরতায় আবার তাহার তুলনা বিরল; তবে এ-সমস্তই স্বল্পায়তনে, সংকীর্ণ ভাবসীমায় সীমিত।
>
> ...সৃষ্টিভাবনার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে ছোট ছোট গীতিকবিতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর অনুরাগের মধ্যেও। প্রাচীন বাঙালী কোনো মহাকাব্য রচনা করে নাই, সার্থক, বৃহৎ ও গভীর ভাবকল্পনার কোনো নাটকও নয়। ধোয়ীর পবনদূত ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ তো গীতিকাব্যই; গোবর্ধনের সপ্তদশীও তাহাই। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত কিংবা শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতকেও বৃহৎ ও গভীর ভাবনা-কল্পনার কাব্য বলা চলে না, যদিও ইহাদের পরিসর একেবারে তুচ্ছ করিবার মত নয়। বস্তুত, বৃহৎপরিসরের কাব্য, এমন কি ছোট ছোট, রসহীন অথচ পান্ডিত্যপূর্ণ, রূপকালংকারবহুল কাব্য বোধহয় প্রাচীন বাঙালীর খুব রুচিকর ছিল না; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত গীতির পদ ও ছড়া, যে ধরনের পদ ও ছড়া আমরা চর্যাপদ, দোহাকোষ, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই। তা ছাড়া ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক, গীতিকবিতার মূল রূপটি অর্থাৎ সংকীর্ণ পরিসরে হৃদয়ের গভীর আবেগ ও প্রাণস্পর্শটি যাহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এমন শ্লোক ও খন্ড কবিতাও বাঙালীর খুব প্রিয় ছিল, যেমন কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় বা সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের পদ ও শ্লোক। বস্তুত, এই ধরনের গীতিকবিতা-সংগ্রহ বা চয়নিকার ধারার উদ্ভব এই বাংলাদেশেই, এবং মধ্যযুগে পদ্যাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বৈষ্ণব মহাজনদের

পদসংগ্রহ এই ধারায়ই চলিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, গীতিকবিতার প্রতি এই অনুরাগই মধ্যযুগীয় বাঙলা-সাহিত্যের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর প্রসার ও সমাদৃতির মূলে। গীতিকবিতাতেই যেন বাঙালীর প্রতিভা মুক্তি পাইয়াছে, এবং এই গীতিকবিতাই বাঙালীর চিত্তে আজও সাড়া জাগায়। মহাকাব্যের বিরাট প্রসার ও গভীর আবর্ত যেন তাহার তত রুচিকর নয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর সাহিত্যে কোথাও মননের গভীর গাম্ভীর্য ও ভাবকল্পনার বিরাট প্রসার নাই; তাহার পরিবর্তে আছে প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ালু গভীরতা ও সীমিত ব্যাপ্তির মধ্যে ভাবানুভূতির তীব্রতা। ইহাই বাঙালীর সৃজন প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।[২]

বাঙালির এই পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম কমনীয়তার ছাপ বিজ্ঞাপনেও পড়েছে। কবিতায় এসেছে দুটি লাইনের ছড়া, ব্যবহৃত হয়েছে বৈষ্ণব কবিদের সেই চিত্তগ্রাহী পদ।

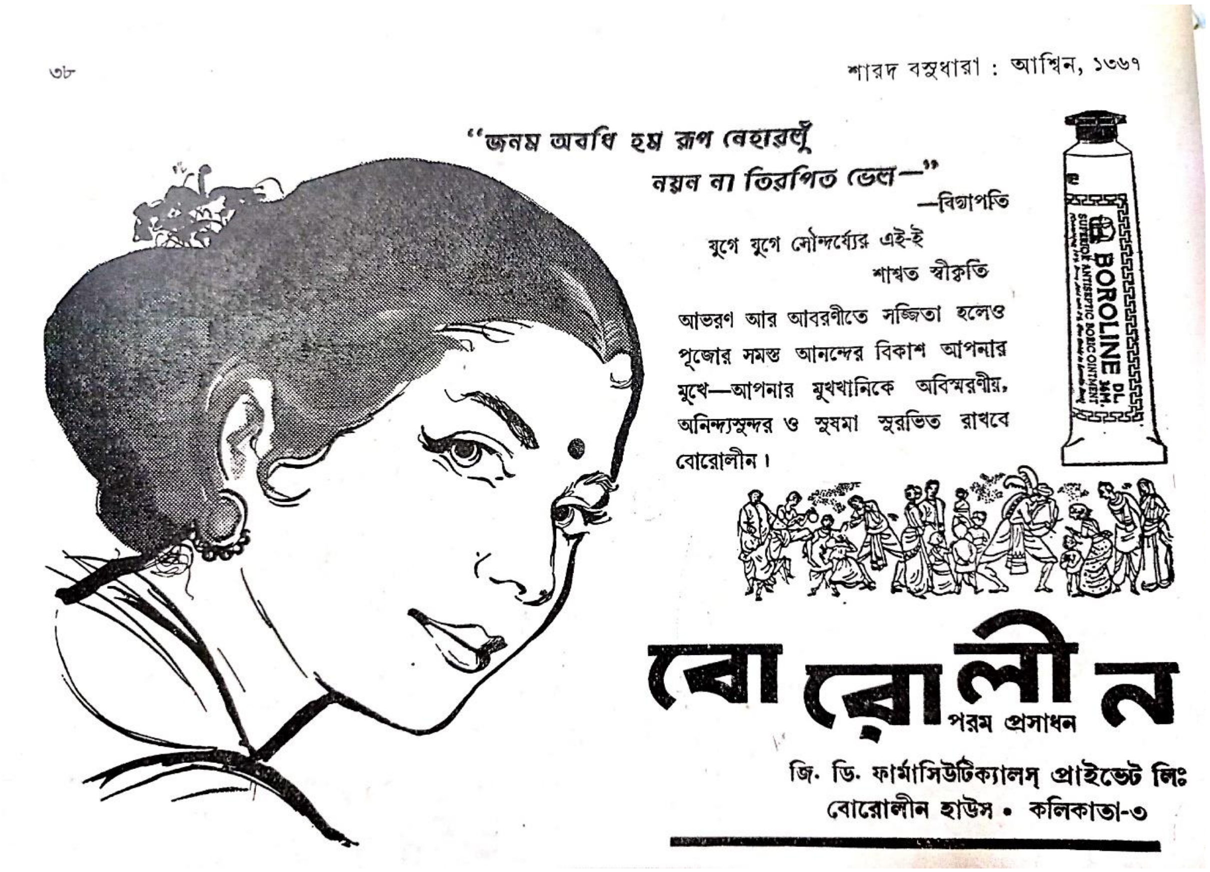

চিত্র ২.১ শারদ বসুধারা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম খন্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৭

গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে, *শারদ বসুধারা* পত্রিকার থেকে বোরোলিনের এই বিজ্ঞাপনটি গৃহীত হয়েছে। নীহাররঞ্জনের বক্তব্যের সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের গভীর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বাঙালির গীতিকবিতার প্রতি অনুরাগই শত শত বছর ধরে সমাদর করেছে বৈষ্ণব কবিদের কাব্যকে। এই বিজ্ঞাপনেও সেই কমনীয়তাই তিনটি অনুষঙ্গে

মিলিত হয়েছে। বিদ্যাপতির "জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ", সঙ্গে বাঙালির উৎসবের একটি টুকরো ছবি এবং নারীর লাবণ্যভরা মুখ। বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি ছিলেন। বাঙালি তিনি ছিলেন না। তাঁর কাব্যও 'বাংলা' ভাষায় লেখা নয়, লেখা ব্রজবুলিতে। তবে সে ভাষা শতাধিক বছর ধরে বাঙালি হৃদয়ের এত নিকটে অবস্থান করার কারণে ভাষাগত দূরত্ব ঘুচে গেছে। বোরোলিনের এই বিজ্ঞাপনটি বাঙালি হৃদয়ের আবেগ, অনুরাগ, বেদনার মূল সুরটিকে ধরে রেখেছে।

আর এইখান থেকেই শুরু হয় সংকট। বাঙালির সংজ্ঞা নির্ধারণের সংকট।

অতুল সুর তাঁর *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন* বইতে বাঙালির সংজ্ঞা দিচ্ছেন।[৩] বাঙালি সংস্কৃতিকেও সংজ্ঞায়িত করছেন তিনি, কিন্তু সেই সংজ্ঞা থেকে বাঙালি মুসলমান বাদ পড়ে যাচ্ছেন বলে তাঁকে আবার আলাদা একটি অধ্যায়ে দিতে হচ্ছে "বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়"। কিন্তু এরপরেও যখন তিনি বাঙালি সংস্কৃতির লৌকিক রূপ বলছেন, তখন তার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্যও পাওয়া যায় না, যা মুসলমান বাঙালির লৌকিক সংস্কৃতির অন্তর্গত। দুটো সংস্কৃতিকে সহজে মেলাতে অসুবিধা হচ্ছে বলেই এই বিভাজন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাঁর বইটিতে।

আহমদ শরীফ *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব* বইতে "বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়" অধ্যায়ের প্রথম বাক্যেই লেখেন "বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল।" বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ই জটিলতা আছে তা এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে জানতে পারা যায়। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণে এই বাঙালির সৃষ্টি, তার জটিল হিসাব আহমদ শরীফ এখানে দেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মূলত উল্লেখ্য "বাঙালী-বাঙলাদেশী" অধ্যায়টি। সেখানেও গ্রন্থকার, যিনি এক নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ, তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে-

> প্রগতিশীলেরা শুধু বাঙালী হলেও অন্যরা হয়তো আগে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ এবং পরে বাঙালী আর কেউ কেউ আগে বাঙালী পরে হিন্দু, মুসলিম ইত্যাদি। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তির ও মন-মননের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে শেষোক্ত দুটো শ্রেণী গড়ে উঠেছে। অতএব মাপে-মানে-মাত্রায় বাঙালীত্বে পার্থক্য রয়েছেই।[৪]

একটা সামগ্রিক বাঙালি নৃতাত্ত্বিক বা ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সবাই সুন্দর করে খাপে খাপে মিলে যে নেই, তা আহমদ শরীফ স্বীকার করছেন।

শেষপর্যন্ত ‘বাঙালি’ বা ‘বাঙালিত্ব’ শব্দগুলি দিয়ে যে কোনও অতিনির্দিষ্ট পরিসর তৈরি করা প্রায় অসম্ভব, তা অতুল সুরের দ্বিধা অথবা আহমদ শরীফের স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই বোঝা যায়। সাংস্কৃতিক বাঙালির চিহ্নগুলিকে খুব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করা অসুবিধাজনক।

বস্তুত এক জায়গা থেকে অপর জায়গার যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হচ্ছে, তত বেশি করে আমরা সকলেই একটা মিশ্র সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছি। যত দিন যাচ্ছে, যে কোনও জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কি, কীভাবে আমি একটা জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করবো, সেইটা নির্ণয় করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ছে। কারণ যত বেশি চলাচল বাড়ছে, যত বেশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে, তত তফাৎ গুলি মুছে যাচ্ছে।

বাঙালি পুরুষ একদা ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন, এখন আর পরেন না নিয়মিতভাবে। ঐতিহ্যবাহী পোশাকে বদল এসেছে। বদলেছে শাড়ি পরার ধরন, খাদ্যাভ্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ইদানীংকার প্রতিটি রেস্তোরাঁ ই হয়ে উঠেছে ‘মাল্টি কুইজিন’। স্বাভাবিকভাবেই তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

কতকগুলি মানদণ্ডের সাহায্যে বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সর্বজনীন এবং সর্বজনগ্রাহ্যভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন।

তাহলে আমরা কী করতে পারি? সর্বজনীন কোনও সংজ্ঞা না থাকলেও জনপ্রিয় ধারণায় বাঙালির কতকগুলি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রশ্নাতীত নয়, তা নিয়ে প্রচুর তর্ক করা যায়, অথচ সেগুলিকে অস্বীকারও করা যায় না। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকেই আমরা আরেকবার তাকাতে পারি এবং বাংলা বিজ্ঞাপনের সূত্রে বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে ধরা পড়ে, তাও দেখে নিতে পারি।

২০০২ সালে *দেশ* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনিটি ছিল ‘নতুন সহস্রাব্দে বাঙালির জীবনযাত্রা’। সেসময় *দেশ* এর সম্পাদক ছিলেন অভীক সরকার। সম্পাদকীয়’র ও আগের পৃষ্ঠায় সূচিপত্র অংশে প্রকাশিত রচনার তালিকাটির উপরে বাঙালি বিষয়ে লেখা ছিল অল্প কয়েকটি বাক্য। সেইখানেই কিঞ্চিৎ সগৌরবে জানানো হয় বাঙালি তার পুরনো মূল্যবোধ, সৌজন্য, রুচিবোধ ইত্যাদিকে মুছে এগিয়ে যেতে পারে ভিন্নধর্মী কিন্তু সমসাময়িক সংস্কৃতির দাবিতে। পরিবর্তিত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের ছবি নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় অল্প কয়েকটি বাক্যের মধ্যে বুনন করা হয়েছে এখানে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া থেকে শুরু করে পরিবারের নতুন সদস্য হিসাবে

আমদানি হওয়া নতুন গাড়ি, হেঁশেলের একঘেয়েমির পরিবর্তে সপ্তাহান্তে রেস্তোরাঁয় ভোজন অথবা চা এর মতো মদও যুক্ত হয়ে যাওয়া বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে- সবকিছুরই উল্লেখ করা হয় একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদটিতে।

এই সংখ্যাতেই শংকর 'বাঙালির ব্যালান্সশিট : কে বাঙালি? কেন বাঙালি?' বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

যেখানে কাদের বাঙালি বলা হবে, এবং কাদের নয়, সেই দ্বিধার চিহ্নগুলিকে একত্রিত করে পরপর উল্লেখ করেন প্রাবন্ধিক। একই সঙ্গে যুক্তি এবং প্রতিযুক্তি খাড়া করে তোলেন তিনি 'বাঙালি' হবার পক্ষে।

বঙ্গে যারা বসবাস করেন তারা বাঙালি; এই সহজ সূত্রটি ঘোষণা করেই পরের বাক্যে বলেন বাংলা ছেড়ে পেটের দায়ে এবং লোভনীয় ভবিষ্যতের আকর্ষণে যাঁরা ভিনরাজ্যে বা ভিনদশে বসবাস করছেন, তারা কি তবে বাঙালি নন? সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অগণন বাঙালি কোন অপরাধে তাঁদের বাঙালিত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন? অতএব, ভৌগোলিকভাবে এই বিষয়টির সমাধান সম্ভব নয়।

এরপরে আসে বাংলার বায়ুর প্রসঙ্গ। যাঁরা একবার বাংলার 'বাঙালি' বায়ু সেবন করেছেন, তাঁরাই বাঙালি। কিন্তু এই যুক্তি খন্ডন করা আরও সহজ। জন্মসূত্রে বাঙালি কিন্তু সারাজীবনে একটিবারও বাংলায় আসার সুযোগ না পাওয়া মানুষ, আজীবন বাংলার বাইরে জীবন কাটিয়েও নিজেদের বাঙালি ভাবতে ভালোবাসেন, অপরদিকে আজন্ম এই বাংলায় কাটিয়েও নিজেদেরকে তথাকথিত 'বাঙালি' না ভেবে আত্মশ্লাঘা অনুভব করা 'বাঙালি'র সংখ্যা নতুন সহস্রাব্দে আদৌ বিরল নয়।

এরপরে স্বভাবতই উঠে আসে বাংলা ভাষার প্রসঙ্গ। বাংলা ভাষা যাঁরা বলেন তাঁদের সঙ্গেই 'বাঙালি' পরিচয়টি ওতোপ্রতভাবে যুক্ত। এই যুক্তিটিও শেষপর্যন্ত খারিজ হয়ে যায়। শংকর লিখছেন-

> বাংলা ভাষাটাই সবচেয়ে বড় যোগসূত্র, বাংলাদেশের শেখ, আলি, চৌধুরী আর পশ্চিমবাংলার সাহা, সেন, লাহিড়ির বাঙ্গালিত্ব-বন্ধন বাংলা ভাষার মাধ্যমে। আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু একবার আমাকে বলেছিলেন, এই বন্ধনটাই শেষপর্যন্ত টিকবে। ধর্মের কারণে দেশবিভাজন হলেও ভাষার বাঁধনটা কেটে দিতে কেউ সাহস পেলো না। ধর্ম প্রথমে হাঁড়ি আলাদা করেছে, পরে ভদ্রাসন ভাগ হয়েছে, তবু বাঙালিত্বর অবসান হয়নি এই উপমহাদেশে।
>
> -এবারেও পাশ করা গেল না, যদিও বন্ধুবর নীতিশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি ইংরিজিতে খন্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন বাঙালিকে ভাষার যোগসুত্রে বেঁধে ফেলবার শেষ চেষ্টায় 'বেঙ্গলি স্পিকিং পিপ্‌ল'-এর ইতিহাস ইংরিজি ভাষায় রচনা করেছেন। বড়ই কঠিন একটা প্রশ্ন সামনে পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি আনুগত্য

প্রদর্শন না করলে কি বাঙালি হওয়া যাবে না? দীর্ঘকাল কলকাতায় বসবাসকারী বঙ্গপ্রেমী কয়েকজন বন্ধু সহাস্যে নিজেদের হিন্দিস্পিকিং বেঙ্গলি বলে পরিচয় দেন! সংখ্যায় কম বলে এঁদের উড়িয়ে দেওয়া যে যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে, তার ইঙ্গিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ইতিমধ্যে ক্রমশই বড় আকার ধারণ করছে। নতুন প্রজন্মের এক অংশের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে তাতে অচিরেই আমরা নতুন একধরনের বাঙালির মুখোমুখি হব যারা বাংলায় কথা বলতে পারবে, কিন্তু বাংলা লিখতে বা পড়তে পারবে না।

খোদ বাংলার হেড অফিসে বসেই এই অবস্থা, একটু দূরে চলে গেলে অবস্থা আরও জটিল। অদ্ভুত এক প্রজন্ম যারা কেবল লিখতে পড়তে নয়, বাংলা বলতেও অক্ষম। কিন্তু বঙ্গজননীর স্নেহাশ্রয় থেকে তারা বঞ্চিত হতে চায় না!

এমনই কয়েকজনের সঙ্গে এবার মার্কিন প্রবাসে গিয়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেখা হল। এইসব ছেলেমেয়ের বাবা-মায়েরা এসেছেন বাংলাদেশ থেকে অথবা এপার বাংলা থেকে। বাংলাদেশের কয়েকটি ছেলেমেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল নিউ ইয়র্কে-আমাদের বাবা মায়েরা আমাদের বাংলা শেখানোর জন্যে এত জোর-জবরদস্তি করেন কেন বলুন তো? বাংলা না জানলে বাঙালি হওয়া যাবে না, এটা কি ভাল নিয়ম? আমাদের ‘বেঙ্গলিনেস’ তো আমাদের রক্তেই রয়েছে!

মোদ্দা শিক্ষাটা হল, বাংলা হটাও এই স্লোগান বাঙালিরাও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তুলছে অথবা তুলবে। এদের নিয়ে আমরা কি করব?[৫]

শংকর এই প্রবন্ধটি লেখার পরে দুই দশক অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে এই বাংলা বলতে না চাওয়া বাঙালির পরিস্থিতির আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের বাইরে, অথবা বিদেশের কথা বাদ দিয়ে এই কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতেও বাংলাভাষা বেশ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে, মোটামুটি আর্থিক সম্বল থাকলে অভিভাবকরা আর সন্তানদের পাঠাতে চান না; তা সামগ্রিকভাবে সরকারি বা সরকারি অনুমোদিত স্কুলে পড়াশোনার মান নিয়ে সংশয় থাকার কারণে, না ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে সন্তানরা পড়লে তা সামগ্রিকভাবে একটি ‘স্টেটাস সিম্বল’ হয়ে উঠতে পারে বলে; সেই বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় এই বাংলা মাধ্যম সরকারি বা সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও হয়ে পড়ে তথৈবচ। তার উপরে বহু বছর ধরে এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এই রাজ্যে চলেছে তীব্র টালবাহানা। ফলে বাংলা ভাষা এবং বাঙালির নৈকট্যের প্রশ্নটি কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

অতঃপর দ্বারস্থ হতে হয় বাঙালির রান্নাঘরের। মাছের ঝোল ভাত, অথবা শেষ পাতে দই সন্দেশই কি তবে চিরকালীন বাঙালিত্বের চিহ্ন হয়ে থাকবে?

কিন্তু খাদ্যাভ্যাস ব্যাপারটি একদিকে যেমন মানুষভেদে পরিবর্তনশীল, অন্যদিকে তেমনই পরিবর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্যাভ্যাসও পরিবর্তিত হয়, একথা পরীক্ষিত। গত শতাব্দীর নয়ের দশকের মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি তার সাক্ষী। 'বাঙালি' আর 'অবাঙালি'র খাবারের দূরত্ব ঘুচে গেছে অনেকাংশে।

পরপর এইভাবে বাঙালি হবার 'শর্ত'গুলি একে একে খারিজ হয়ে যেতে থাকে। এইভাবে সিদ্ধান্তহীনতায় মথিত হতে হতে প্রবন্ধের শেষ অংশে এসে শংকর লেখেন-

> এরপর আর কি বলার থাকতে পারে? নতুন সহস্রাব্দের বাঙালির রুচি ও রসনা দুই আলাদা। শুধু ভরসা একটাই। যত কিছু পরিবর্তন সব বহিরঙ্গের। প্রত্যেকের বুকের মধ্যে যে-বাঙালিটি বসবাস করছে তার কোনও পরিবর্তন নেই। তাই স্বদেশে অথবা প্রবাসে যেখানেই বাঙালির দর্শন মেলে তাকে খুঁজে নিতে এবং আপন করে নিতে একটুও কষ্ট হয় না। এই অপরিবর্তনীয় অথচ সদা পরিবর্তনশীল স্বদেশবাসীর কথা ভেবেই বাঙালির ইতিহাসের অবিস্মরণীয় লেখক নীহাররঞ্জন রায় কবি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়ে উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন : "সার্থক জনম আমার/জন্মেছি এই দেশে/ সার্থক জনম মা গো/ তোমায় ভালবেসে।"[৬]

একটা ইতিবাচকতায় শেষ হলেও প্রবন্ধের শিরোনামটির প্রশ্নচিহ্নগুলির সমাধান হয় না সার্বিকভাবে। এবং পুনরায়, আজ দুই দশক পরে বাঙালির 'বাঙালিত্ব'র অন্তরঙ্গ বোধটি কতটুকু অবশিষ্ট আছে, তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিচার করা যাবে এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে।

পূর্বে যে সমস্ত প্রাবন্ধিক, গবেষকদের মতামত নিয়ে আলোচনা করা গেল, দেখা যাচ্ছে তাঁরা কেউই বাঙালিত্বের কোনও নির্দিষ্ট ও চিরকালীন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারছেন না। বাঙালি লেখকরাও খানিক দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন বাঙালি এবং বাঙালিত্বের সংজ্ঞা নির্ণয়ে। শংকরের পরে সুনীল গাঙ্গুলীর মতামত দেখা যাক। ১৯৯১ সালে *সানন্দা* পত্রিকার 'বাঙালিয়ানা' সংখ্যায় সুনীল গাঙ্গুলী একটি প্রবন্ধ লেখেন, নাম 'বাঙালি কে বাঙালি কোথায়?'[৭]

হিন্দু না হলে যথোপযুক্ত বাঙালি হওয়া যাবে না, এই বোধ অনেক হিন্দু বাঙালি দীর্ঘদিন ধরে, এমনকি আজও বহন করে চলেছেন। সুনীল লিখছেন মুসলমানদের পদবী নেই, এই বিষয়টি নিয়ে হিন্দুরা একদা খুবই ধাঁধায়

পড়তেন। এমন অনেক মুসলমান পরিবার কলকাতা শহরে আছে, যাঁরা বাংলা বলেন না। কিন্তু এর বিপরীত উদাহরণও অজস্র। যাঁদের সাত পুরুষের বাস বাংলায় এবং বাংলা ছাড়া অন্য ভাষাই তাঁরা জানেন না। অথচ, বাংলা ভাষা এবং বাঙালিত্ব রক্ষার দাবিতেই পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয়। অতএব ঠিক কারা বাঙালি, এই প্রশ্নের সমাধান হয় না।

> বাঙালি নামে সত্যিই কোনো জাতি আছে কি? নাকি এটা একটা গুজব? নীহাররঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাস লিখেছেন, তা নিতান্তই ভৌগোলিক ইতিহাস। তিনি শুধু আদিপর্ব লিখেই ক্ষান্ত হলেন, বাকিটা লিখলেন না। এই আদিপর্ব রচনা করেছিলেন তিনি জেলখানায় বসে। ঐ বই সম্পর্কে আমি একবার মন্তব্য লিখেছিলাম যে, নীহাররঞ্জন রায়কে আবার জেলে পাঠানো উচিত পরের পর্ব রচনার জন্য। যা হতো অতি মূল্যবান সম্পদ।[৮]

এর পরে একের পর এক বাঙালির নানাবিধ ত্রুটিগুলি তুলে ধরলেন সুনীল। কয়েকটি ছোট অনুচ্ছেদে বাঙালির সংস্কৃতি থেকে রাজনীতির নানান গোলমাল এবং অধঃপতনকে চিহ্নিত করলেন। কিন্তু শেষে এও বললেন যে বাঙালির যেসব দোষ আর ভন্ডামির কথা তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন তার প্রতিটিই তাঁর মধ্যেও বর্তমান। পূর্ববর্তী ঐতিহ্যগুলিকে তারা অনেকাংশে বিসর্জন দিলেও তারা এখনো আত্মসমালোচনা করতে ভোলেনি। তাদের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি একটি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বাঙালির কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন *সানন্দা*-র সেই একই সংখ্যায়। যদিও সেই সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরে তিন দশকেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় বাঙালির সেই বাহ্যিক চেহারাতেও পরিবর্তন এসেছে বিস্তর। বাঙালি বকবক করতে ভালোবাসে, যার বেশির ভাগ কথাই বোকা বোকা, স্বজাতির নিন্দায় পটু, অন্যের ভালো দেখলে ঈর্ষাজর্জর হয়ে পড়ে, চোখে মুখে লেগে থাকে আলস্য, জ্বর, পেটের অসুখ যার চিরসঙ্গী, পেটে যদিও পটল দিয়ে সিঙি মাছের ঝোলের বেশি কিছু সহ্য হয় না কিন্তু লোভ আছে ষোলো আনার ওপরে আঠারো আনা, বাঙালি পুরুষেরা স্ত্রীর ন্যাওটা, বাঙালি বাড়ির বাচ্চাদের ডাকনামও মার্কামারা, ঝগড়া, ভাব, সোহাগ, চুলোচুলি সব মিলিয়ে বাঙালি আতিশয্যপ্রবণ- এই কথাই বলেন লেখক। এ ছাড়া তার অনুকরণ, পদলেহন ইত্যাদি চরিত্রও বর্তমান। ঔপনিবেশিক পর্বে যার পরিচয় পাওয়া যায়। বাহ্যিক এই বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরলেও আন্তরিকভাবে বাঙালিকে ‘পারিবারিক জীব’ বলেন প্রাবন্ধিক।

> আর একটা দিক হল ভেতরের দিক। শান্ত, সমাহিত, সুর ভাল লাগে, ভাল লাগে রং-রেখা-ছবি, ভাল লাগে কবিতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাহাড়, সমুদ্র। সেখানে বাঙালি শুনতে পায় বিবেকের ঘূণ পোকা কাটছে, বাঙালির শান্ত

জীবন কুটীর। স্ত্রীকে নিয়ে স্বতন্ত্র ফ্ল্যাটে গিয়েও বাঙালি সন্তান রাত জাগে বিবেকের দংশনে- আমার পিতা! আমার মাতা! বাঙালিয়ানার অপর দিক হল- বাঙালি পারিবারিক জীব।[৯]

যদিও তিন দশকে এই ছবি অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত, তা সত্ত্বেও নানান বিভ্রান্তির মধ্যেও মিলে যায় বাঙালির কিছু বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে সর্বজনীন নয়। তবু, আজও নানান তর্ক বিতর্কের পরও বাঙালির ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে কয়েকটি ধারণা প্রচলিত আছে।

মাছে ভাতে বাঙালি, মাছ খাওয়াটা বাঙালির একটা কেন্দ্রিয় লক্ষণ, এভাবে বললে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে বাংলা নদীমাতৃক দেশ। এপার বাংলা-ওপার বাংলা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি মাছ খেতে ভালোবাসে। বাঙালি সম্পর্কে বাংলার বাইরেও এমন ধারণা আছে যে বাঙালি মাছ খায়। এছাড়া আড্ডা, তার পোশাক, মিষ্টি খাওয়া, দুর্গাপুজো, পুজোর ছুটিতে ‘দেশ’ভ্রমণ, সাহিত্য-প্রীতি, তার আবেগের কলকাতা শহর- এমন কতকগুলি চিহ্ন আছে যেগুলো দিয়ে তাকে জনপ্রিয় ধারণায় চিহ্নিত করা যায় মোটামুটিভাবে। বিজ্ঞাপন যেহেতু সেই জনপ্রিয় ধারণাগুলিকে নিয়েই কাজ করে, ফলে বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরেও আমরা এক ধরনের বাঙালি পরিসর, মন, মধ্যবিত্ত জীবনকে কিছুটা খুঁজে পেতে পারি।

বাঙালির কয়েকটি অতি পরিচিত চিহ্নের সঙ্গে এই পরিচয়টিও জড়িয়ে গেছে, তা হল বাঙালি আড্ডাবাজ। নদীর ঘাট থেকে মহিলাদের দ্বি-প্রাহরিক আড্ডা, চন্ডীমন্ডপ, হাট-বাজার অথবা জমিদার বাড়ির উঠোন একদা ছিল আড্ডার পরম রমণীয় স্থান। ঔপনিবেশিক আমল থেকে সেই আড্ডার ধরন পরিবর্তিত হতে শুরু করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে নতুন জীবনবোধ সবকিছুর সঙ্গে পরিবর্তন করেছে আড্ডার চরিত্রও। তবে বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশের কেন্দ্র হিসাবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশকগুলিতে সেই ‘আড্ডা’র চিত্র লক্ষ্যণীয় রকমভাবে পরিবর্তিত। অধ্যায়ের এই অংশটিকে বোঝার সুবিধার জন্য কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজনীয়।

২.১ বাঙালির আড্ডা

বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘আড্ডা’ প্রবন্ধে প্রথমেই জানাচ্ছেন আড্ডা ব্যাপারটা বিশেষ করে বাংলাদেশের সজল মাটিতেই তার পূর্ণতা পেয়েছে।

> আড্ডা জিনিসটা সর্বভারতীয়, কিন্তু বাংলাদেশের সজল কোমল মাটিতেই তার পূর্ণবিকাশ। আমাদের ঋতুগুলি যেমন কবিতা
>
> জাগায়, তেমনি আড্ডাও জমায়। আমাদের চৈত্রসন্ধ্যা, শ্রাবণের রিমঝিম দুপুর। শরতের জ্যোছনা-ঢালা রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল- সবই আড্ডার নীরব ঘন্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শোনে, কেউ শোনে না। যে-দেশে শীত-গ্রীষ্ম দুই-ই অতি তীব্র, সেখানে আড্ডার ক্ষীণতা অনিবার্য। বাংলার কমনীয় আবহাওয়ায় গাছপালার ঘন শ্যামলিমার মতোই আড্ডার উচ্ছ্বাস।[১০]

বাংলার ঋতুগুলির বৈচিত্র্যের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে আড্ডার আমেজ। শীতের দুপুর অথবা শ্রাবণসন্ধ্যা, আড্ডার পক্ষে সবই উপযুক্ত। 'মিটিং' বা 'পার্টি' বললে আড্ডার অন্তর্লীন অর্থ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয় না। আড্ডার মধ্যেকার ঘরোয়া, কিঞ্চিৎ অগোছালো কিন্তু অমলিন, স্বস্তিদায়ক অথচ আন্তরিক আবেদনটিই আড্ডার মূল সুর বেঁধে দেয়। সবকটি মানুষ সমমার্যাদার না হলে সে আড্ডা জমে না, অথচ সমমার্যাদার মানুষ যত্রতত্র একত্রিত হলেই তা আবার আড্ডা হয়ে ওঠে না। তার জন্য চাই অনুকূল পারিপার্শ্বিক। আরাম এবং আড়ম্বর একই পংক্তিতে আড্ডায় এসে না বসলেই ভালো হবে। তার মধ্যে যদি লেগে থাকে গৃহকর্ত্রীর হাতের ছোঁওয়া, তিনিও যদি স্বচ্ছন্দে খানিকক্ষণ এসে যোগ দিতে পারেন আড্ডায়, তবে সে আড্ডা হয়ে ওঠে যথাযথ। খাদ্যের আয়োজন সামান্য হলেও কিছু আসে যায় না, চা-এর সঙ্গ বড় গুরুত্বপূর্ণ এখানে। জোর করে মেকি কথার অবতারণার পরিবর্তে চুপ করে থাকা যেন এখানে ভালো।

বাঙালির আড্ডা-সংস্কৃতির সঙ্গে চা পানের সম্পর্ক যে সুতীব্রভাবে অবিচ্ছেদ্য, এ কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই একটি পানীয় প্রায় সকলেরই জুটে যায়। বাড়িতে জ্বালানির অভাব থাকলেও পাড়ার মোড়ে মোড়ে, অলিতে গলিতে চা এর দোকানগুলিতে গিয়ে একবার দাঁড়াতে পারলেই ধোঁয়া ওঠা চা অল্প কটি টাকাতে আজও পাওয়া যায়। চা পাতার প্রকারভেদ আছে, তবে আজও ধনহীনরা চা পানে বঞ্চিত হন না।

এই জনপ্রিয়তম বস্তুটির জাতীয় পানীয় হয়ে ওঠার পিছনে এক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আছে।

গৌতম ভদ্র'র *From An Imperial Product To A National Drink : The Culture of Tea Consumption in Modern India* বইতে চা এর নানাবিধ বিজ্ঞাপন, পোস্টার, বিলবোর্ড, ক্যালেন্ডার, কার্টুন, ছবি, অলংকরণ, ফটোগ্রাফ, লবি কার্ডের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঔপনিবেশিক পণ্যের বাঙালি জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটিতে সেঁধিয়ে যাবার ইতিহাসটি সংক্ষেপে ধরা আছে।

গৌতম ভদ্র উল্লেখ করছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০)-এর 'রামসুক তেওয়ারি' কবিতার কথা। বুন্দি অথবা রেওয়া প্রদেশের বাসিন্দা রামসুক যখন কলকাতায় আসে, তখন সে মস্ত পালোয়ান, ভুট্টার ছাতু, লিট্টি, মিছরির সরবত, চানা ইত্যাদি ছিল তার প্রধান খাদ্য। কিন্তু হায়, বাংলায় কেবলমাত্র দুইখানি বর্ষা পার করেই সে হয়ে ওঠে পাক্কা চা-খোর। তার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে থাকে দ্রুত, এবং ক্রমে তার পুরাতন গেঞ্জিখানি ঢোলা পাঞ্জাবিতে পরিণত হয়। শেষকালে- "অবশেষে অসুখের সংবাদ পাইয়া/ দেশ থেকে ধেয়ে এলো দেশোয়ালি ভাইয়া।/ করে দিল প্রথমেই চা খাওয়াটা বন্ধ-/ বে-ভাষায় বললে সে কত কী যে মন্দ।"; অর্থাৎ বোঝা গেল, চা পানেই তার এমন শারীরিক বিপত্তি।

এই কবিতাটি মজার, হালকা আমেজে লেখা হলেও, চা পানকে কেন্দ্র করে যে এক ধরনের মতান্তর, অস্পষ্টতা, দ্বিধা ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বহু টানাপোড়েনের পথ পেরিয়েই চা সামাজিক এবং পারিবারিক পানীয়ের মান্যতা পায়। ১৮৪০ সাল থেকে ভারতবর্ষে নানাবিধ বিলিতি সংস্থা চা-এর লাভজনক ব্যবসা ফেঁদে বসে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই ইংল্যান্ডে চা সাধারণ মানুষের পানীয় হিসাবে জনপ্রিয়তা পায়। এই সময়ে আসাম এবং উত্তরবঙ্গে বিপুল পরিমাণে 'Black Tea' উৎপাদিত হতে শুরু করে। তথাপি, ১৮৮০ সাল পর্যন্ত, ভারতবর্ষে কিন্তু চা পানের প্রচলন কেবলমাত্র শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ ভারতীয় পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে প্রভূত প্রচারের মাধ্যমে চা নামক পানীয়টিকে এ দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। রাত্রি শেষে ঘুম ভেঙে উঠে ধূমায়িত চায়ের কাপে তৃপ্তির চুমুক একদা কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা উচ্চবিত্তদের বিলাসিতারই অঙ্গ ছিল। চা শ্রমিকদের উপরে ঔপনিবেশিক প্রভুতের অমানবিক অত্যাচার প্রাথমিকভাবে এ দেশের মানুষকে চা পান থেকে বিরত করে। এছাড়া চা পান যে শারীরিকভাবে ক্ষতিকর, এই ধারণাও জনমানসে প্রচলিত ছিল।

গৌতম ভদ্র'র লেখা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক-

> Once in place though, the geography of tea drinking could only expand in the sub-continent as tea touched the lives of ordinary people as a cheap and invigorating drink. But this needed time and some concerted effort. In order to be acceptable to Indians of diverse backgrounds tea had to present itself through metaphors, signs and allusions, catering to the numerous needs and life practices of multiple groups of the Indian

population throughout the last century. Around 1901, a commission set up by the Indian Tea Association began to distribute "pice packets" as a means of promoting tea among the poorer classes. But a consistent policy of tea promotion in the domestic market had been envisaged only since 1914. The Tea Cess Committee- renamed the Indian Tea Market Expansion Board [henceforth abbreviated as ITMEB] in 1937, later Central Tea Board in 1948 and subsequently replaced by Tea Board India in 1954- has successfully expanded the domestic market through various promotional drives initiated even as recently as the 1960s. As a legacy of these activities, what we have today is a rich archive of colonial documents showing how tea, the once celebrated beverage of the Raj, has become a necessary part of the daily life of an ordinary Indian, irrespective of caste and class, ranging from Kumudranjan Mallick, the village headmaster and poet, to the fictive, yet typical Ramsuk Tewari, the quintessential subaltern.[১১]

উদ্ধৃত অংশটি পড়ে একটি বিষয় আজকের পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, চা এর জনপ্রিয়তায় বিজ্ঞাপনের ভূমিকা ছিল সীমাহীন। পাঁচ-ছয়ের দশকের বিজ্ঞাপন গুলির মধ্যেও চা তৈরির পদ্ধতি, চা পান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, সে কথা লেখা থাকে। 'রামসুক তেওয়ারি'র শক্তিশালী চেহারা বেহাল হয়ে পড়ার জন্য দায়ী যে চা নামক পানীয়টি আদৌ নয়, চা পান যে বিষ পানের সমার্থক নয়, তা বাঙালিকে বোঝাতে অনেকগুলি দশক সময় লেগেছিল।

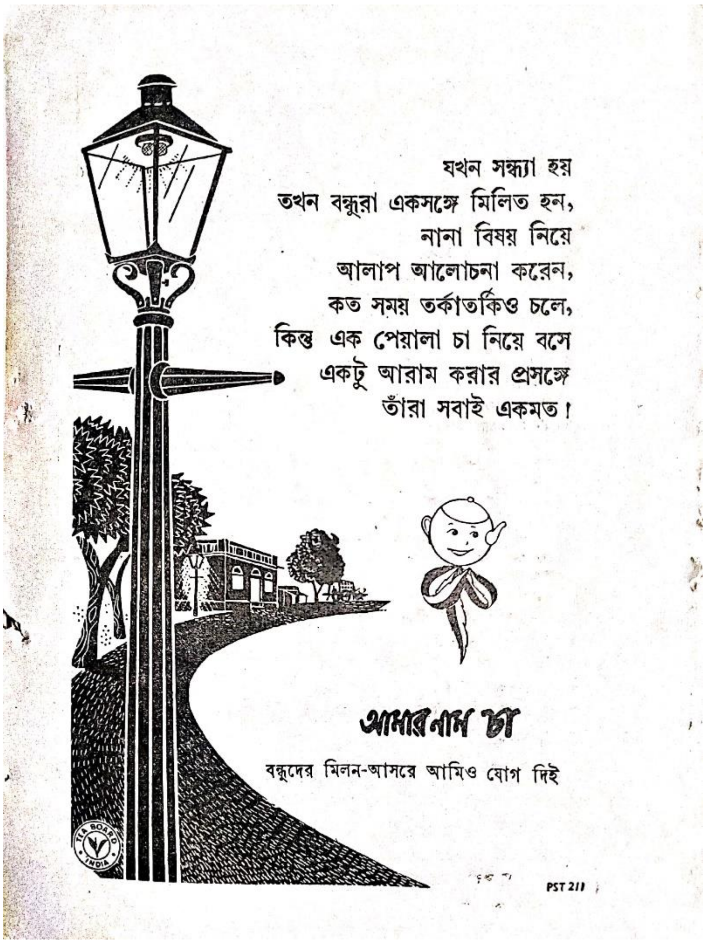

চিত্র ২.২ শারদীয়া গঙ্গোত্রী, ১৯৭৪

নারী-পুরুষ উভয়ের প্রাসঙ্গিক উপস্থিতিতে আড্ডা হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গসুন্দর। বাঙালির এই আড্ডার প্রসঙ্গটি ঘুরে ফিরে এসেছে বিজ্ঞাপনে।

ভারতীয় টি বোর্ডের বিজ্ঞাপনে বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে উঠে এসেছে সান্ধ্য আড্ডার প্রসঙ্গ। রাস্তার বড় আলোটি যখন জ্বলে ওঠে সন্ধে নামার মুখে, সেসময় তারই পাশের পথ বেয়ে, ঐ দূরের বাড়িটিতে পৌঁছোতে পারলেই সেখানে হয়তো কেউ অপেক্ষা করে আছেন তাঁর বন্ধুদের জন্য। গল্পের বিষয় বদল হয় প্রতিদিন। আলোচনা কখনো কখনো তর্কাতর্কিতেও পৌঁছোয়। কিন্তু সব চাইতে মধুর সময়টি আসে যখন, তখন সবার মতপার্থক্য ঘুচে যায়। ঐ একটি বিষয়ে প্রত্যেকে একমত। আড্ডাকে পরিপূর্ণতা দেয় গৃহকর্ত্রীর হাতের ধূমায়িত পেয়ালা ভরা চা। একটি বিনীত চা এর কেটলি'র হাসিমুখের ছাপ এই চা এর বিজ্ঞাপনগুলিতে বাধ্যতামূলক ছিল। বিজ্ঞাপনের কপিটি সংক্ষিপ্ত হলেও বাঙালির আড্ডার ছবিটিকে তুলে ধরেছে সুন্দর করে। যদিও কপির মধ্যে কোথাও 'বাঙালি' প্রসঙ্গটির উল্লেখ নেই, কিন্তু এই 'বন্ধুদের মিলন-আসর'-এর ছবিটি এতই পরিচিত বাঙালির কাছে বছরের পর বছর, যে চা খাওয়ার প্রচলন হবার পর থেকে আড্ডা এবং চা একাত্ম হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধেও চা এর কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি আড্ডাকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন। কিন্তু আড্ডা বিষয়টি বহুমাত্রিক।

আড্ডা বিষয়টি যে বিশেষ করে বাঙালি, সে কথা সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর *চাচা কাহিনী* তে বিশেষভাবে উল্লেখ করছেন। একেবারে প্রথম অধ্যায়েই জার্মানির রেস্তোরাঁয় বাঙালি আড্ডার কথা আছে। বাংলা ছেড়ে, এমনকি দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে জার্মানি শহরের বাঙালি তার আড্ডা বসাতে দ্বিধা করেননি। মজার বিষয় হল এই আড্ডায় অন্য ভারতীয়রা তেমন পাত্তা পেতেন না। সেখানে হয় কথা হত বাংলায়, নয়তো জার্মান

ভাষায়। সেখানে শ্রীধর মুখুয্যে বাঙালিকে প্রাদেশিক বললে, চাচা পৃথিবীর সর্বত্র বাঙালির আশ্চর্য উপস্থিতির উল্লেখ করেন।

> '...এই বার্লিন শহরেই দেখ; আমরা জনা চল্লিশ ভারতীয় এখানে আছি। তার অর্ধেকের বেশী বাঙালী। মারাঠি, গুজরাতী কটা এক হাতের এক আঙুল, জোর দু আঙুলে গোনা যায়। ত্রিশটা লোক যদি বিদেশের কোনো জায়গায় বসবাস করে তবে অন্ততঃ তার পাঁচটা এক জায়গায় জড় হয়ে আড্ডা দেবে না? মারাঠি, গুজরাতিরা আড্ডা দেবার জন্য লোক পাবে কোথায়?'
>
> আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'লোক বেশী হ'লেও তারা আর যা করে করুক আড্ডা দিতে পারত না।...'[১২]

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত'র *আলেখ্য দর্শন* বইটি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ১৯৯০ এর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। ক্ষীণকায় বইটি কয়েকটি অতীব সুখপাঠ্য প্রবন্ধের সংকলন। এই বইয়ের 'আড্ডা' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে, গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হয়। কলকাতার সাহিত্যিক সমাজের আড্ডার এক ধারাবাহিক চিত্র তাঁর প্রবন্ধের অল্প পরিসরেও অত্যন্ত সুচারুভাবে ধরা পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র হয়ে তিনি ঠাকুর পরিবারের আড্ডার প্রসঙ্গে এসেছেন। সঙ্গে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সেই উপন্যাসগুলির কথা, যেখানকার নায়ক-নায়িকারা আড্ডাপ্রিয়। *গোরা, ঘরে বাইরে*র মধ্যে আড্ডার চাইতে যেন তর্কই বেশি, তার তুলনায় *প্রজাপতির নির্বন্ধ* অথবা *নৌকাডুবি*-তে আড্ডার পরিমাণ বেশি।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসময়েই খিদিরপুরে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসতো জমাটি আড্ডা। তাঁর নিমন্ত্রণ পত্র তৈরি হত ছোট ছোট কবিতা দিয়ে। এবং সে সব কবিতাগুলি সুখাদ্যের উল্লেখে সুস্বাদু হয়ে উঠতো।

ফুলকো লুচি, ভাজা কপি এবং থাবা থাবা মাংসের আহ্বান উপেক্ষা করা অতি বড় সংযমীর পক্ষেও অসুবিধাজনক।

শরৎচন্দ্রের আড্ডা উল্লেখও পাওয়া যায়। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতো সাহিত্যিক আড্ডা। তার মধ্যে বিখ্যাত ছিল *যমুনা, ভারতবর্ষ* কিংবা *ভারতী*র আড্ডা। আড্ডার মধ্যে আরও নানান বিচিত্র কান্ড-কারখানা এসে যোগ দিত, প্ল্যানচেট যার মধ্যে একটি। পরবর্তীতে আসে *কল্লোল, কালিকলম*-এর আড্ডা। বুদ্ধদেব বসুর তাঁর 'আড্ডা' প্রবন্ধে যেমনভাবে আড্ডা'র বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন, এই প্রবন্ধের উদাহরণগুলি

থেকেও সেভাবেই একান্ত আড্ডা-র কয়েকটি চিরকালীন ছবি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তার একটি হল চা পান। চা ছাড়া আড্ডা যে অসম্পূর্ণ, তা নানান প্রবন্ধ থেকে টি বোর্ডের বিজ্ঞাপন, সবেতেই প্রতিষ্ঠিত।

বড়দের পত্রিকার মতন, ছোটদের পত্রিকার অফিসও আড্ডার থেকে বঞ্চিত হত না। শোনা যায় *সন্দেশ, মৌচাক*-এর আড্ডা এককালে বিখ্যাত ছিল। *সন্দেশ* ছিল পারিবারিক কাগজ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে শুরু করে সুবিনয় রায়, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার এবং পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায় *সন্দেশ*-এর নাম আলো করে রেখেছেন। সেই সুকুমার রায় নিজে 'মানডে ক্লাব' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্লাবের নিজস্ব একখানি গান এবং একটি হাতে লেখা পত্রিকাও ছিল। পত্রিকা'র নাম 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'।

মানসী ও মর্মবাণী ছিল সেকালের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা। উত্তর কলকাতার ডি এম লাইব্রেরির দোকানের কাছে একটি আড্ডা বসত গজেন্দ্রনাথ ঘোষের বসতবাটিতে। আড্ডা চলাকালে বাড়ির মেয়ে-বৌ'দের পেয়ালা পেয়ালা চা এবং খিলি খিলি পান সরবরাহ করা ছিল কাজ।

কলকাতার শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে স্বমহিমায় বিরাজ করতো আড্ডা। দক্ষিণ কলকাতায় কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়িতে গজেনবাবুর বাড়ির অনুরূপ একখানি আড্ডা বসত। আড্ডার নাম ছিল 'রসচক্র'। এই আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন কালিদাস রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধেশ রায়। গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন বিশ্বপতি চৌধুরী। যিনি অধুনা বিস্মৃত হলেও একদা বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন তিনি।

বাংলা ভাষার প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডার উল্লেখপর্বে প্রাবন্ধিকের মনে পড়ে যায় তাঁদের ব্যক্তিগত আড্ডার কথা। কালিদাস রায়ের আড্ডার মতন সে আড্ডাও বসতো দক্ষিণ কলকাতায়। স্থান ছিল হিন্দুস্থান পার্কের পুলিনবিহারী সেনের বাড়ি। এই আড্ডায় চা-এর সঙ্গে ব্যবস্থা থাকতো জিলিপি-সিঙ্গাড়ার। জিলিপি খাওয়ার প্রাবল্যেই আড্ডা'র নাম হয় 'জিলিপি ক্লাব'। এই ক্লাবে তেমন কোনও নিয়মের ব্যবস্থা ছিল না।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখছেন,

> একজন বললেন, 'বেশি নিয়ম রাখবার দরকার নেই। নিয়ম করলেই নিয়ম ভাঙতে হয়। তার চাইতে একটা বোঝাপড়া থাক যে এটা আমাদের মতো হতচ্ছাড়াদের ক্লাব, যারা এখনও পর্যন্ত সেরকম সুবিধেমতন চাকরি জোগাড় করতে পারেননি।' এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকের কথা। তখনকার দিনে সুবিধে করতে পারা

> মানে চার অক্ষরের মাইনের চাকরি। একজন চালাক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, 'কেউ যদি ক্লাবে ঢুকবার পরে ভাল চাকরি পেয়ে যায় তার কি হবে?' সমস্বরে এর উত্তর এল, ক্লাব থেকে তার নাম কাটা যাবে। তবে সবচেয়ে বড় নিয়ম, যা আমরা মোটামুটি মেনে চলতাম, এখানে 'মহিলা ও রাজনীতির প্রবেশ নিষেধ'।[১৩]

মহিলারা যে আড্ডা'র পক্ষে তেমন ভাবে কাম্য নন, সে কথা বুদ্ধদেব বসুও তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। চা-পান অথবা মুখরোচক আহারাদি সরবরাহ পর্যন্তই তাঁদের দৌড়।

এ প্রবন্ধেই প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত আড্ডার গল্পলেখকদের কথাও বলেন। কেবল আড্ডা'র ঢং-এ গল্প লিখলেই তা 'আড্ডর গল্প' হয় না। তাঁর মতে রাজশেখর বসু ছিলেন প্রকৃত আড্ডার গল্প লেখক। তাঁর জটাধর বকসী অথবা কেদার চাটুজ্যে কথিত গল্পগুলির কথা মনে পড়ে। তার সঙ্গে আরও কিছু মহান বাঙালি লেখকের অসামান্য গল্পের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসতে বাধ্য। অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত লিখতেন সম্বুদ্ধ নামে, তাঁর 'শিকার কাহিনি'র কথক কান্তি চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র'র ঘনাদার গল্প, টেনিদার 'কুট্টি মামার দন্তকাহিনি', 'কুট্টি মামার হাতের কাজ', 'কাঁকড়া বিছে', 'ক্যামোফ্লেজ' ইত্যাদি গল্প, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরুধর কথিত কাহিনি, মহাশ্বেতা দেবীর মহিম কবিরাজের হাড় হিম করা ভূতের গল্প অথবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র তারাদাসের লেখা 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প'গুলি বলা হয়েছে আড্ডার ঢঙে, মূলত আড্ডার আসরেই কথকরা তাঁর শ্রোতাদের শোনাচ্ছেন এই গল্পগুলি। বহুবিধ বাঙালির বিচিত্রবিধ আড্ডাকে কোনও সংজ্ঞায় যে অসম্ভব, কাহিনিগুলির বৈচিত্রই তা প্রমাণ করে। শুধু একটি জায়গায় সবাই একমত হবেন যে, বাঙালিকে আড্ডা থেকে দূরে রাখা অসাধ্য। তার শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে আড্ডা বয়ে চলেছে বংশ পরম্পরায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীও তাঁর 'আড্ডা' নামের প্রবন্ধে বাঙালির আড্ডা বিষয়ে তাঁর মতামত দিচ্ছেন। তিনি বলছেন আড্ডাবাজরা বলতে চান বাংলার বাইরে নাকি আড্ডা ব্যাপারটা নেই। এই কথাটিই তিনি নিজের মতন করে ব্যাখ্যা করছেন। আড্ডাকে তিনি তুলনা করছেন মাছের সঙ্গে, বিশেষত ইলিশ মাছের সঙ্গে, ইলিশ কেবল বাংলায় মেলে এমনটা নয়, স্থানভেদে কেবল তার নাম বদলে যায় মাত্র। তবে ফারাক কোথায়? সেই ফারাকটিকেই তিনি ধরছেন স্বাদের নিরিখে-

> উপযুক্ত সর্ব মস্ত একই বস্তু-দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচালঙ্কা দিয়ে আমরা যে রকম ইলিশদেবীর পুজো দি বাদবাকিরা ওরকমধারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে, শুধু আমাদের মতো তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না।[১৪]

অর্থাৎ, আড্ডা বিষয়টি পৃথিবী জুড়ে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করলেও, বাঙালি শিশুকাল থেকে বড় হতে হতে এবং তারপর তার সমগ্র জীবনভর আড্ডাকে হৃদয়ে যে ভাবে যত্ন-আত্মি করে, ঠিক সেই আকারে আড্ডা বস্তুটিকে সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনও দেশে বা ভারতের আর কোনও এলাকাতেও পাওয়া যায় না। বাঙালি স্থান-কাল ভেদে আড্ডার ব্যাপারে যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা দৃষ্টান্তযোগ্য। বিভিন্ন বাঙালি সাহিত্যিককেও এই মত সমর্থন করতেই দেখা যায়।

পরবর্তী বিজ্ঞাপনের ছবিটি বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক নিয়ে যে অধ্যায়ে কথা বলা হয়েছে, সেখানেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সেখানে ব্যবহারের কারণ অন্য, এখানে সম্পূর্ণ অন্য কারণে সেই বিজ্ঞাপনটি ব্যবহার করা যাক। *দেশ* পত্রিকায় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে বিজ্ঞাপনটি গৃহীত। 'হারকিউলিস' সাইকেলের বিজ্ঞাপন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে চারজনের আসর। চলছে তাস খেলা। বিজ্ঞপনের কপিটিতে আছে কেবলই মধ্যবিত্ত পরিবারের সাইকেল কেনবার প্রসঙ্গ।

চিত্র ২.৩ দেশ, ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

অতএব সেইদিকে আলোচনাকে না নিয়ে গিয়ে কেবলমাত্র যদি ছবিটির দিকে তাকাই তাহলে একটি সর্বাঙ্গীন বাঙালিয়ানার চিত্র পাব। চারজন আড্ডাধারীর পোশাকের দিকেই প্রথম চোখ যায়, প্রত্যেকে পরে আছেন ধুতি। তার সঙ্গে কেউ পরেছেন ফুলহাতা শার্ট, কেউ বা পাঞ্জাবি, কেউ সাধ করে একখানি জহরকোট অথবা কেউ নিতান্তই একটি ফতুয়া। কোলবালিশ সহযোগে আরাম করে শতরঞ্জিতে বসার ঘরোয়া ছবিটিতে ফুটে উঠেছে গত শতাব্দীর ছয় সাতের দশকের মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকদের ছবি। তাঁদের মুখ-চোখের মধ্যে, শিল্পীর হাতের

টানে ফুটে উঠেছে সৌজন্যপূর্ণ ভঙ্গি। অথচ পরিবেশের অনাড়ম্বর ভাবটিও চোখে পড়ার মতন। শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত এঁরা, বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত নন। সংসার চালাতে হয় হিসাব করে, তাই আড্ডার ফাঁকেও সাধ করে কেনা সাইকেলটিতে তালা লাগানো হল কিনা, সে খেয়াল রাখতে তাঁরা ভোলেন না।

আড্ডার একচ্ছত্র অধিকার কেবল বন্ধুদের না হয়ে তা পারিবারিকও হতে পারে। তার জন্য কেবল বৈঠকখানা ঘর নির্দিষ্ট না থেকে পাড়ার রোয়াক থেকে বাঁড়ির রান্নাঘরের পাশের প্রশস্থ জায়গা, গড়ের মাঠ থেকে বাড়ির ছাদ, সবই হতে পারে। পটলডাঙার চারমূর্তি তো চাটুজ্যেদের রোয়াকে আড্ডা দিয়েই বাঙালির হৃদয়ের আসনটি চিরকালের মতন অধিকার করে নিল। অতএব বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে আড্ডার কিছু অতিনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করলেও, তাকে ঠিক সেই গন্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখা যায়নি। তেমনই একটি বিজ্ঞাপন দেখা যাক। বিজ্ঞাপনটি খাস জনতা কেরোসিন কুকারের। যে কুকার রন্ধনকে করে তোলে জটিলতা ও পরিশ্রমহীন। আজকের দিনে রান্নাকে সহজ করবার অজস্র যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে গৃহকর্ম সম্পূর্ণ লাঘব করার উপায়, অনলাইনে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা। তবে বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, সে সময়ে কেরসিন কুকারটি পেয়েই দিব্যি সবকিছু আনন্দময় হয়ে উঠেছে। সম্ভবত সন্ধেবেলার চা বসেছে। যেহেতু "রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন", তাই পরিবেশটি ছবিতে ঘরোয়া আড্ডার রূপ নিয়েছে। আরাম কেদারায় ধুতি-ফতুয়া পরা পরিবারের বয়োঃজ্যেষ্ঠ মানুষটির হাতে খবরের কাগজ এবং মুখে হাসি। যেন তিনি তাঁর হাঁটুতে মাথা রেখে, মনোহারী পোশাক পরে বসে থাকা নাতনিটির সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুই মহিলার সঙ্গেও গল্প করছেন। একজন তারই মধ্যে উল বুনছেন। বাচ্চা মেয়েটির বাবা হয়তো খানিক পরেই ফিরবেন অফিস

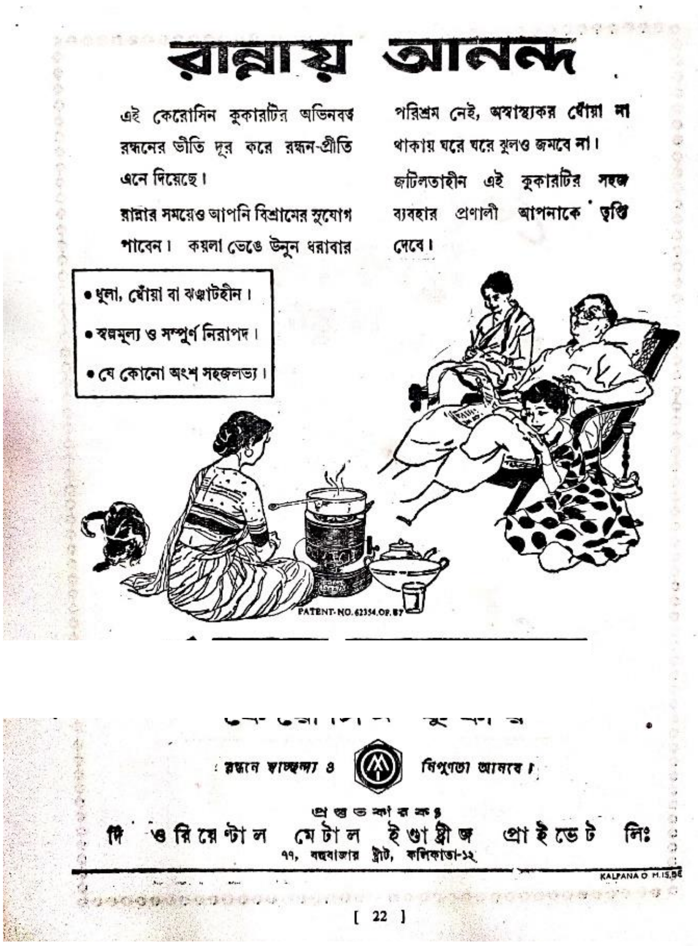

চিত্র ২.৪ গীতবিতান, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৬৮

থেকে, এখন সেই প্রতীক্ষাতেই কাটছে পরিবারের সকলের। পাশে বেড়ালটি খেলায় মগ্ন। সব মিলিয়ে গত শতাব্দীর বাঙালি পরিবারের মনোরম সান্ধ্য ছবিটি কী সুন্দর ফুটে উঠেছে বিজ্ঞাপনে। ছবিটুকু দেখার পরে দর্শকের কল্পনায় ফুটে ওঠে একটি সুখী মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প। না বলেও বলা হয়ে যায় অনেককিছু।

একত্রে আরামে কয়েকজন বসে, কাজ করতে করতেই অথবা নিতান্ত অবসরে দু দন্ড সময় কাটানোই বাঙালিদের জীবনে রূপ নিয়েছে আড্ডার, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত *চেহারায়*।

২.২ বাঙালির ভ্রমণ

আড্ডা বস্তুটির খুব কাছাকাছি অবস্থান করে দেশভ্রমণ বিষয়টি। যে কোনও রকম দেশভ্রমণের সঙ্গে একে মিলিয়ে ফেললে গোল বাঁধবার সম্ভাবনা বিস্তর। তাই বলা ভালো বাঙালির দেশভ্রমণ। নতুন দেশ দেখার আনন্দের সঙ্গে যেখানে একদা পরতে পরতে মিশে ছিল হাওয়াবদল করে শরীর সারিয়ে তোলা, খাওয়াদাওয়া করে মন ভালো করা এবং বন্ধুদের সঙ্গে আমোদে-আহ্লাদে সময় কাটানোর বিষয়।

রাজশেখর বসু'র 'কচি-সংসদ্' কাহিনি স্মরণে আসা এ প্রসঙ্গে নিবৃত্ত করা কঠিন।

দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে নানান রোমহর্ষক ঘটনাবলীর পরে নকুড় মামার ভাগিনেয় কেষ্ট এবং ভুবন বোসের ভগ্নী পদ্মমধু বোসের শুভবিবাহ সম্পন্ন হলে কচি-সংসদ্ ছত্রভঙ্গ হলেও অন্য একটি ঘটনা ঘটে, তৈরি হয় অন্য একটি ক্লাব।

> কচি-সংসদ্ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কেষ্ট আবার একটা নূতন ক্লাব স্থাপন করিয়াছে-হৈহয় সংঘ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হৈহয় ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহার মেম্বার-সস্ত্রীক আমি ও কেষ্ট। এই বড়দিনের বন্ধে আমরা হাওড়া হইতে পেশাওআর পর্যন্ত হইহই করিতে যাইব।[১৫]

এই কয়েকটি বাক্যে গন্তব্য 'পেশাওআর' বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি যাত্রাপথের 'হইহই'টিই ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, তা নিয়ে সংশয় জন্মায়। সব মিলিয়ে বর্ণিল হয়ে ওঠে বাঙালির ভ্রমণ।

ব্রিটেনে রেলপথ চালু হওয়ার মাত্র তিন দশকের মধ্যে, গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ হবার কারণেই ভারতবর্ষে রেলরাস্তার পত্তন হয়। ১৮৫৩ সালের ১৬ ই এপ্রিল বোম্বাইয়ে প্রথম রেলগাড়ি চলে, বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত। বাংলায় ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানি, তারই এক বছরের মধ্যে, হাওড়া থেকে রেল চালু করে। তারিখটি ছিল ১১ ই অগাস্ট, ১৮৫৪। এটি ছিল একটি 'ট্রায়াল রান'। গাড়ি চলেছিল চুঁচুড়া পর্যন্ত। এই ধরনের পরীক্ষামূলক ট্রেন চালু হবার পরে, তারই চারদিন পরে ১৫ ই অগাস্ট তারিখে হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত দস্তুরমতো ট্রেন চালু হয়ে যায়।

এই তথ্যগুলি এরকম সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ আছে সুকুমার সেনের *রেলের পা-চালি* নামক ক্ষীণকায় গ্রন্থে।[১৬]

বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের সূত্রপাতে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে, পূর্ব রেলওয়ের প্রচার বিভাগ থেকে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয় *বাংলায়-ভ্রমণ*[১৭], প্রথম ও দ্বিতীয় দুই খন্ডের একত্র মূল্য ছিল দেড় টাকা। বইটি সম্পাদনা করেন অমিয় বসু। বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় জানানো হয়, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বাংলার যে সমস্ত অংশ পূর্ববঙ্গ রেলপথের যাত্রাপথের মধ্যে পড়ে, সেই সব স্থানের বর্ণনাই ছিলো। সেই গ্রন্থের সব সংখ্যা দুবার মুদ্রণের পরে নিঃশেষিত হওয়ায় এই দ্বিতীয় সংস্করণের পরিকল্পনা করা হয়। যাতে গ্রন্থের "বাংলায় ভ্রমণ" নামটি সব দিক থেকেই সার্থক হতে পারে। পূর্ব-ভারত, বাংলা-নাগপুর ও আসাম-বাংলা রেলপথের সহযোগিতা লাভ করে গ্রন্থটি আরও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এতে তৎকালীন 'সমগ্র বাংলা'র বর্ণনা অন্তভুক্ত করা হয়। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির বাঙালিরা যাতে ভ্রমণের সুবিধা পান, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। রেলপথের নিকটবর্তী স্থান ছাড়াও রেলস্টেশন থেকে মোটরবাস, স্টীমার, নৌকায় যে যে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন স্থানে যাওয়া যায়, তার বিবরণও আছে।

তৎকালীন বাঙালির ভ্রমণপিপাসা ত্বরান্বিত করবার জন্য উপযুক্ত ছিল এই বই। বইয়ের শুরুতে দেওয়া ছিল কলকাতার মানচিত্র এবং পূর্ববঙ্গ রেলপথের মানচিত্র। অধ্যায়গুলি 'বাংলার সাধারণ পরিচয়', 'বাংলার রাজধানী কলিকাতা', 'কলিকাতা ও হাওড়ার সহিত লাইট রেলওয়ের দ্বারা সংযুক্ত প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইত্যাদি বেশ কিছু অধ্যায় এবং উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। ভ্রমণোপযোগী স্থানগুলিকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করে উপস্থাপন করা ছিল পাঠকের সামনে।

এই গ্রন্থ প্রকাশেরও প্রায় তিন দশক আগে বোম্বের প্রেস থেকে 'FROM THE HOOGHLY TO HIMALAYAS' বলে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় Eastern Bengal State Railway-র উদ্যোগে। মানুষের আগ্রহোদ্দীপক হিমালয়-সংলগ্ন স্থানগুলির চিত্রবহুল বর্ণনা মেলে এই বইটিতে। দার্জিলিং শহরের প্রতি বাঙালির কৌতূহল, আবেগ, ভালোবাসার সূত্রপাতে এই বইটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বইটির মুখবন্ধের একটি ছোট্ট অংশ তুলে দেওয়া হল।

> This book is intended to serve as a guide to the more important and, from the average visitor's point of view, more interesting places reached by the Eastern Bengal State Railway. The usual guide-book references to hotels, details of routes and time tables are omitted, because in India these things are constantly changing. An inquiry at the offices of the E.B.S.R will be found more helpful on such matters than many pages of directions.[১৮]

পাহাড়ে চড়ার নেশায় বা তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে পাহাড়ভ্রমণ নয়। একেবারে আম-বাঙালির দৃষ্টিকোণ থেকে, তার পাহাড় দেখার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারে এই বইটি। তৎকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বাসযোগ্য হোটেল অথবা যাত্রার পথ প্রায়শই পরিবর্তন হওয়ার কারণে তা যাত্রাকালে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের অফিস থেকে জেনে নেওয়াই বেশি সঙ্গত হবে বলে জানানো হয় এই মুখবন্ধে। বইটি পরিপূর্ণ কলকাতা, ঢাকা, বস্তুত সমগ্র বাংলা, বিশেষত দার্জিলিঙের মনোমুগ্ধকর ফটোগ্রাফে। বইটি হাতে পেলে, আজকের দিনেও সব ফেলে তৎক্ষণাৎ পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার সাধ জাগে।

রেলওয়ের কথা পড়তে পড়তে মনে পড়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসের কথা। ভবানী তিলু, নিলুকে গল্প শোনান তাদের দেশে নতুন রেলের লাইন বসেছে। চুয়োডাঙা পর্যন্ত পাতা হয়েছে লাইন। অল্পদিনের মধ্যেই সেই লাইন দিয়ে কলের গাড়ি চলবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে বাংলায় যে রেলযাত্রার প্রচলন হয়, তারই প্রতিফলন ধরা আছে উপন্যাসে।

তিলু, ভবানীর চোখের সামনে পালটে যায় তাদের পরিচিত গ্রাম।

> কত কি পরিবর্তন হয়ে গেল গ্রামে। রেল খুললো চাকদা থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত। একদিন তিলু ও নিলু স্বামীর সঙ্গে আড়ংঘাটায় ঠাকুর দেখতে গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে। ওরা গরুর গাড়ি করে চাকদা পর্যন্ত এসে গঙ্গাস্নান করে সেখানে রেঁধেবেড়ে খেলে। সঙ্গে খোকা ছিল, তার খুব উৎসাহ রেলগাড় দেখবার। শেষকালে রেলগাড়ি এসে গেল। ওরা সবাই সেই পরমাশ্চর্য জিনিসটিতে চড়ে গেল আড়ংঘাটা। ফিরে এসে বছরখানেক ধরে তার গল্প আর ফুরোয় না ওদের কারো মুখে।[১৯]

এই ছিল রেল চালু হওয়ার পরে সেকালের মধ্যবিত্ত বাঙালির দেশ দেখার প্রথম যুগের কথা। একটি দিনের দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতাই তার কাছে সে সময়ে ছিল মহার্ঘ্য। গল্প করে বলবার বহুদিনের রসদ। তারপরে ধাপে ধাপে সেই উৎসাহ বেড়ে চলে রেলপথের উন্নতি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। তার পূর্বে মানুষের তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা যে বহুক্ষেত্রেই অতীব পরিশ্রমসাধ্য, যন্ত্রণাদায়ক এবং বিপদজনক ছিল, তার বর্ণনা এই উপন্যাসেই আছে চমৎকারভাবে। হেঁটে হেঁটে, 'সেথো'র দেখানো পথে পিঠে পুঁটুলিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বেঁধে, বৃদ্ধ মানুষদের অতিক্রম করতে হত সুদীর্ঘ পথ। তীর্থযাত্রার বাসনা তাঁদেরই ছিল সর্বোচ্চ। পথে ছিল ডাকাতের ভয়। গন্তব্যে পৌঁছোবার আগেই মৃত্যু হত কতজনের। পূরণ হত না স্বপ্ন।

বাঙালির সেই স্বপ্নপূরণের দুয়ারটি খুলে দেয় ভারতের রেলওয়ে ব্যবস্থা।

তবে সে স্বপ্নপূরণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। বাংলায় রেললাইন খোঁড়ার ফলে জমা জল বেরোতে না পেরে জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মশা। ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম।

মনে পড়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাতের অতিথি' গল্পের কথা, যার শুরুর বাক্যেই বলা হয়ে গেছে এ ঘটনা বহুদিন আগের, যখন ভারতবর্ষে প্রথম রেল এসেছে। সেই সময়েই মৃত্যু দেবতার ক্রূর দৃষ্টি পড়েছিল এই বাংলা দেশের উপরে। কীট-পতঙ্গের মতন মৃত্যু হয়েছিল মানুষের। মৃত্যুদূতের আগমনবার্তা কেউ পায়নি, একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ নামে এক গৃহস্থ ছাড়া। যাঁর বাড়িতে একটি রাতের জন্য স্বয়ং মৃত্যু আশ্রয় নিয়ে গভীর রাত্রে শ্মশানের থেকে মৃত্যুদূত মশাদের ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

> কঙ্কাল খল্‌খল্‌ করে হেসে বললে, 'কে আমি? আমি অগ্রদূত, আমার সঙ্গীরা সব আসছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আসছে। বাংলাদেশ ছেয়ে যাবে- ঘরে ঘরে মড়াকান্না উঠবে, তারপর চিতায় আগুন দেবার লোকও থাকবে না- ঘরে ঘরে পচা মড়া পড়ে থাকবে...[২০]

গল্পটিকে ভূতের গল্প হিসাবে বিবেচনা করা হলেও অন্যান্য ভূতের গল্পগুলির সঙ্গে এর পার্থক্য হল এই গল্পের সূত্রপাতের ঘটনাটি। দেশে রেললাইন খোঁড়া এবং সেই খানাখন্দে মশার জন্মবৃত্তান্তের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মৃত্যুর ইঙ্গিত।

কিন্তু এইসব বিপত্তি পেরিয়ে পরবর্তী ইতিহাস হল শিশু অপুর মত আগ্রহের সঙ্গে রেলের জানলা দিয়ে সারারাত অতি উত্তেজনা ভরে বাইরে তাকিয়ে থাকবার ইতিহাস। চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়লে বা সাধের চোখ দু খানি খোয়া গেলেও যা বন্ধ করবার উপায় ছিল না তার।[২১]

বাঙালির আড্ডার সঙ্গে বাঙালির ভ্রমণ, এই দুটি বিষয়ের আসল সূত্রের জায়গাটি হল, এই দুটিই আসলে মূলত অপ্রয়োজনীয়, অকারণের, যেখানে কোনও উপযোগবাদিতার লেশমাত্র নেই। একেবারে কারণহীন যে আনন্দ, সেখানে বাঙালির আড্ডা এবং বাঙালির ভ্রমণ একাত্ম হয়ে যায়। কথা হল বাঙালির ভ্রমণ সম্পূর্ণভাবেই অকারণের আনন্দ নয়, যার একটি অংশে অবশ্যই আছে প্রয়োজন, যেমন পুণ্য অর্জনের জন্য তীর্থভ্রমণ অথবা স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য হাওয়া বদল এই বিষয়গুলি। এগুলি থাকলেও, এই ভ্রমণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, বাঙালি কোনও কারণে কোথাও যাচ্ছে না। তার হাতে কিছুটা টাকা জমেছে, সে ধনী নয়, তাই তাকে সংসারের খরচ থেকে সঞ্চয় করতে হয় এবং তার হাতে পাওয়া গেছে কিছুটা ছুটি- শুধু এই দুটি শর্ত মিলে গেলে সে এমনি এমনিই বেরিয়ে পড়তে চায়। গন্তব্যস্থলটা তার বড় কথা নয়, যাত্রাপথের আনন্দটাই হয়ে ওঠে প্রধান বিষয়। এই হল বাঙালির ভ্রমণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পুরীতে হোটেল গড়ে উঠেছে মূলত দুই জায়গায়, একটি হল সমুদ্রতীরকে কেন্দ্র করে, অপরটি পুরীর মন্দিরকে ঘিরে। মন্দিরলগ্ন হোটেলগুলিতে বাঙালিদের সংখ্যা অতি ক্ষীণ। বেড়াতে গেলে আজও দেখা যায় সমুদ্রপাড়ের আস্তানায় বাঙালিদের বসবাস। তা বলে বাঙালিরা মন্দির দর্শন বা পুজো দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তা নয়। তবে সে যায় মূলত সমুদ্রতটে। মন্দির হল প্রয়োজনের বিষয়ভুক্ত, আর সমুদ্র, বালি, ঝিনুক ইত্যাদি নিতান্ত অপ্রয়োজনের বিষয়। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য যে কোনও জাতির ভ্রমণের নিরিখে এটি হল বাঙালির ভ্রমণে অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এ প্রসঙ্গে দুজন শ্রেষ্ঠ বাঙালির উদাহরণ দেওয়া যাক। লেখকের কল্পনার নির্মাণ এই দুই বাঙালি, বছরের পর বছর পাঠক হৃদয়কে লুণ্ঠন করে চলেছেন। প্রথম জন হচ্ছেন ব্যোমকেশ বক্সী, দ্বিতীয় জন প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা।

ব্যোমকেশ বাংলার বাইরে বিভিন্ন সময়ে গেছেন নানা জায়গায়, কাজের জন্য, শরীর সারানোর জন্য। সত্যবতী, অজিতও সঙ্গে গেছেন। কিন্তু সেটা ঠিক বেড়াতে যাওয়া নয়। কিন্তু এইখানে মনে পড়ে 'রক্তের দাগ' উপন্যাসের কথা। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যাক।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম বসন্তঋতু আসিয়াছে। দক্ষিণ হইতে ঝিরঝির বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কলিকাতা শহরের এখানে-ওখানে যে দুই চারিটা শহুরে গাছ আছে তাহাদের অঙ্গেও আরক্তিম নব-কিশলয়ের রোমাঞ্চ ফুটিয়াছে। শুনিয়াছি এই সময় মনুষ্যদেহের গ্রন্থিগুলিতেও নূতন করিয়া রসসঞ্চার হয়।

ব্যোমকেশ তক্তপোশের উপর কাত হইয়া শুইয়া কবিতার বই পড়িতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল। আজকাল বসন্তকালের সমাগম হইলেই মনটা কেমন উদাস হইয়া যায়। বয়স বাড়িতেছে।

সন্ধ্যার মুখে সত্যবতী আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম সে চুল বাঁধিয়াছে, খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়াইয়াছে, পরনে বাসন্তী রঙের হাল্কা শাড়ি। অনেক দিন তাহাকে সাজগোজ করিতে দেখি নাই। সে তক্তপোশের পাশে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে ব্যোমকেশকে বলিল, "কী রাতদিন বই মুখে করে পড়ে আছ। চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি গিয়ে।"

ব্যোমকেশ সাড়া দিল না। আমি প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় বেড়াতে যাবে? গড়ের মাঠে?"

সত্যবতী বলিল, "না না, কলকাতার বাইরে। এই ধরো-কাশ্মীর-কিম্বা-"

ব্যোমকেশ বই মুড়িয়া আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া বসিল, থিয়েটারী ভঙ্গিতে ডান হাত প্রসারিত করিয়া বিশুদ্ধ মন্দাক্রান্তা ছন্দে আবৃত্তি করিল-

"ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণ গমনে

কিন্তু পাথেয় নাস্তি

পায়ে শিক্‌লি মন উড়ুউড়ু

এ কি দৈবের শাস্তি।"[২২]

সত্যবতীর হাসি হাসি মুখে ওই উক্তি, "চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি গিয়ে", এই বেড়িয়ে আসার পটভূমি তৈরি হয় একেবারে শুরুর বাক্যগুলিতে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে প্রথম বসন্ত ঋতুর আগমনে সত্যবতী সেজেগুজে এসে দাঁড়ায় ব্যোমকেশ, অজিতের ঘরটিতে। সত্যবতীর বেড়াতে যাবার জন্য এই যে আবদার, তার কোনও কারণ নেই, তার কোনও গন্তব্যও নেই, "কোথাও বেড়িয়ে আসি" টুকুই তার মনোবাসনা। কোনও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নয়, কোনও পুণ্য অর্জনের জন্য নয়, কোনও কিছুর জন্য নয়। এই যে অকারণের বেড়ানো, এই অকারণটুকুই

বাঙালির ভ্রমণকে সংজ্ঞায়িত করে দেয়। ঠিক আড্ডার মতনই এও এক 'অপচয়'। অর্থ-সময়ের এই 'অপচয়' মিলেই বাঙালি বিশেষরূপে বাঙালি হয়ে ওঠে।

সত্যবতী অকস্মাৎ কাশ্মীর যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলে ব্যোমকেশ মন্দাক্রান্তা ছন্দে আবৃত্তি আরম্ভ করে, এবং সেই কয়েকটি পংক্তিতেই ধরা পড়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভ্রমণ-পিপাসুর আসল ট্র্যাজিডিটি। মন বাঙালির সর্বদা উড়ু-উড়ু, কিন্তু তার হাতে টাকা নেই। বাঙালি মধ্যবিত্তের হাতে অনেকদিন পর্যন্ত টাকা ছিল না এটা সত্যি। ১৯৭৫ সালে Leave Travel Concession বা LTC চালু হবার পরে বাঙালি মধ্যবিত্ত একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বাড়ির লোকদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার তবু একটা ব্যবস্থা করতে পারলো। টাকা না থাকলেও স্বপ্ন দেখাতে ভাঁটা পড়ে না।

ব্যোমকেশ কাহিনির পরবর্তী অংশ আমাদের সকলের জানা। কাশ্মীর যেতে সকলে ইচ্ছুক হলেও সেখানে যাওয়ার খরচ যে কম করে হাজারটি টাকা, তা ব্যোমকেশ মনে করিয়ে দেয়। খরচ নিয়ে ব্যোমকেশ-সত্যবতীর মান-অভিমানের মধ্যে প্রায় সমস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের চেনা ছবিটি দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে অবশ্য সত্যকামের আবির্ভাবে বেড়াতে যাওয়ার বিষয়টির হিল্লে হয়ে যায়।

একদিকে এই "ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণ গমনে" এবং অন্যদিকে "পাথেয় নাস্তি"র টানাপোড়েনে বাঙালিকে ভুগতে হয়েছে দীর্ঘকাল। বাঙালি সেই আর্থিক সংকটের কথা মাথায় রেখেই তার ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছে। ফলে বাঙালির ভ্রমণ পরিকল্পনা-রুচি কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এই অকারণের ইচ্ছাটা তার অনন্য এবং বহুকালের।

এইখানে ফেলুদার কথাও বলতে হয়। ফেলুদা আরেকটু পরের দিককার মানুষ। পাঠকের সঙ্গে সে প্রথম বেড়াতে যাচ্ছে লাখনৌতে। তারপর পুরী, কাশ্মীর ইত্যাদি বহু জায়গায় সে বেড়াতে যায়। এর কোনওটাই তীর্থভ্রমণ নয়। ফেলুদা ব্যোমকেশের থেকে বেশি পরিমাণে বেড়াতে যেতে পারে।

'হত্যাপুরী'র থেকে একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। পুরীতে প্রাথমিকভাবে ফেলুদা কোনও রহস্যের সমাধান করতে যায় না। কলকাতায় ক্রমাগত লোডশেডিং চলছে। ফেলুদা বলে-

> 'সত্যি, কল্লোলিনী তিলোত্তমা বড় জ্বালাচ্ছে। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ক্রমাগত কাজের ব্যাঘাত, পড়াশুনার ব্যাঘাত, মশার কামড়ে চিন্তার ব্যাঘাত-এগুলো বরদাস্ত করা কঠিন।'

'উড়িষ্যাতে ত একসেস্ তাই না?'

লালমোহন বাবুর এই প্রশ্ন থেকে এল পুরীর কথা, আর পুরী থেকে এল সী-বীচের কাছে নতুন তৈরী নীলাচল হোটেলের কথা, যার মালিক শ্যামলাল বারিক লালমোহনবাবুর বাড়িওয়ালা সুধাকান্ত বাবুর ক্লাস ফ্রেন্ড।[২৩]

কথায় কথায় প্রায় অকারণেই ঠিক হয়ে যায় পুরী যাওয়া হবে। পুরী যেতে কোনও অজুহাত লাগে না। মন্দির দর্শন অথবা পুণ্য অর্জনের কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, কেবলমাত্র যাওয়ার আনন্দেই জগন্নাথ এক্সপ্রেসে চড়ে ফেলুদাদের মতই যুগ যুগ ধরে বাঙালি পুরী যাচ্ছে।

এই কাহিনিতে সেকালের মধ্যবিত্ত বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্রটি সুন্দর করে ধরা পড়ে। উল্লেখ্য, 'হত্যাপুরী' 'সন্দেশ' পত্রিকার ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

লালমোহন বাবুর অর্থনৈতিক অবস্থা নিতান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালির তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি ভালো বলেই বোধ হয়। কারণ তাঁর নিজস্ব গাড়ি আছে। তথাপি নীলাচল হোটেলে একবেলা থেকেই তাকে সিক্স-স্টার হোটেল বলে লালমোহনবাবু ঘোষণা করলেন।

ফেলুদা বলল 'হোটেলে সুইমিং পুল না থাকলে সেটা পাঁচ তারার পর্যায়ে ওঠে না; আর পাঁচের উপর রেটিং নেই। আপনি কি দুশো গজ দূরে ওই সমুদ্রটাকে নীলাচলের নিজস্ব সাঁতারের চৌবাচ্চা বলে ধরছেন? তাহলে অবিশ্যি আপনার রেটিং-এ ভুল নেই।'

আসলে দুপুরে খাওয়াটা বেশ ভালো হয়েছিল। লালমোহনবাবুকে লোভী বলা চলে না, তবে তিনি রসিক খাইয়ে তাতে সন্দেহ নেই। বললেন, 'কাঁচকলার কোফতা এত উপাদেয় হয় জানা ছিল না মশাই। এদের কুকিং-এর জবাব নেই। তাছাড়া তক্‌তকে বেডরুম-বাথরুম, সদালাপী ম্যানেজার, ইন্সট্যান্ট পাখা-বাতি, সমুদ্রের নৈকট্য-সিক্স স্টার বলবনা কেন মশাই?'[২৪]

আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালির চাহিদার নিরিখে চার দশক আগের উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালির এই চাহিদাগুলিকেও অতি সংক্ষিপ্ত বলে বোধ হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর-স্নানাগার এবং ইলেকট্রিক পাখাবাতির চাহিদাকে আজকের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চাহিদার দিকে তাকিয়ে অতীব তুচ্ছ বলে বোধ হয়।

কয়েকটি দশক আগে, আজকের দিনে ব্যবহৃত নামী কোম্পানির 'ট্রলি ব্যাগ'-এর পরিবর্তে লেপ-কম্বল 'হোল্‌ডল্ '-এ বেঁধে বাঙালি বেরিয়ে পড়তো তার দেশ ভ্রমণে।

এই বাঙালির হুজুগে বেড়ানোর বিষয়টিই তাকে বাকি সব ভারতীয় জাতির থেকে আলাদা করে দেয়। এই অকারণের আনন্দের সঙ্গেই বাঙালির আড্ডা এবং ভ্রমণ মিলে থাকে।

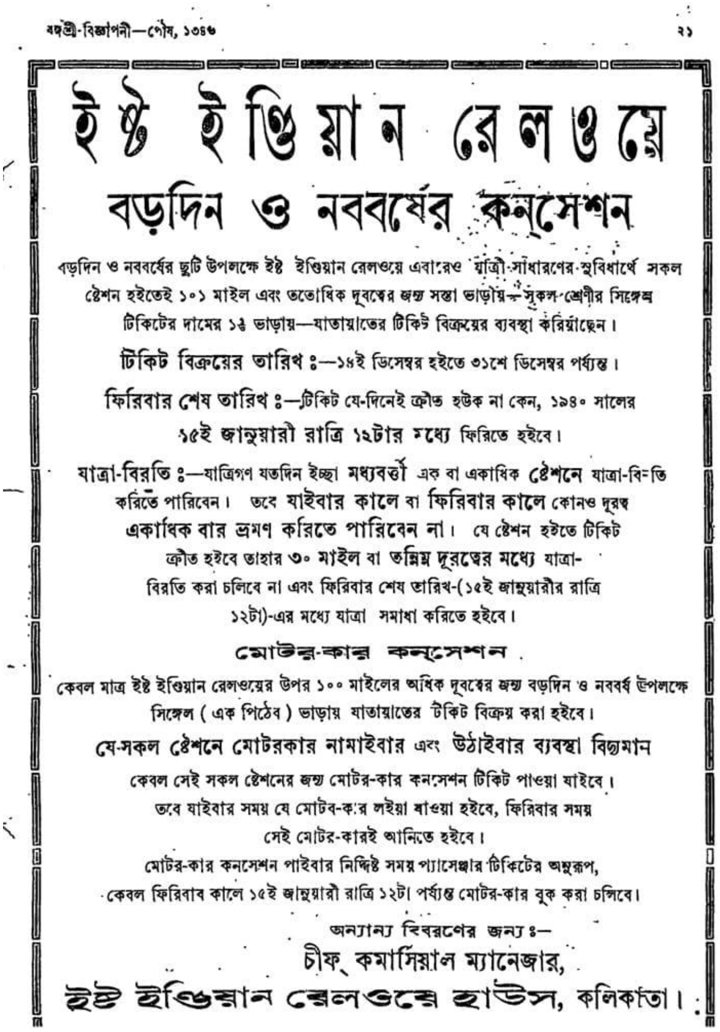

চিত্র ২.৫ বঙ্গশ্রী, বিজ্ঞাপনী, পৌষ, ১৩৪৬

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়, বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়। স্বাধীনতার বেশ কিছু বছর আগেকার এই বিজ্ঞাপন। ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ভ্রমণ বিষয়টির চমৎকার প্রচার করেছেন।

সহজবোধ্য ভাষায় টিকিটের দাম, তার হিসাব এবং যাতায়াতের পথের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। 'কেবল মাত্র' ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ কথাটিও ব্যবহার করা হয়েছে।

স্বাধীনতার আগে থেকেই যে বাঙালির ভ্রমণ-পিপাসাকে সরকার তার রেলওয়েজ-এর ব্যবসা বৃদ্ধির অনুকূলে কাজে লাগাতে চাইছে, এই বিজ্ঞাপনটি তার উদাহরণ। বাঙালির ভ্রমণের সুবাদে এইভাবেই এসে পড়ে রেলওয়ের কথা। আর রেলওয়ের প্রসঙ্গে তার ভ্রমণকেন্দ্রিক মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপনগুলির কথাও ভুলে থাকা যায় না।

২.৩ বাঙালির দুর্গাপুজো

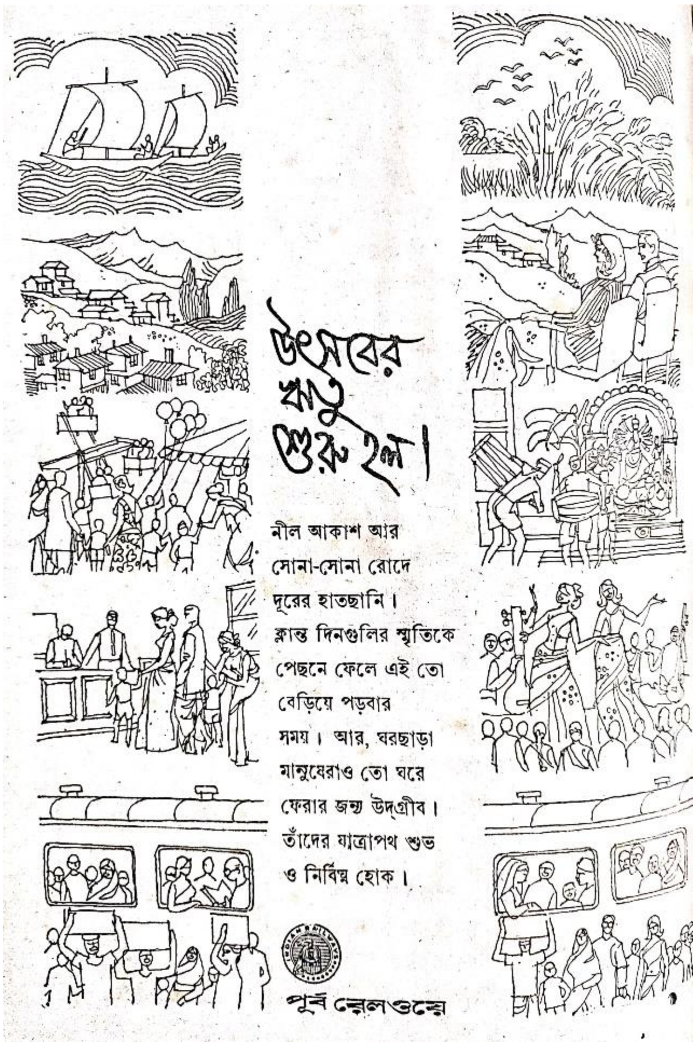

চিত্র ২.৬ সন্দেশ, শারদীয়া, ১৩৭৬

ভ্রমণের সঙ্গে পুজো এবং পুজোর ছুটির সম্বন্ধটি সেকালে-একালে সব সময়েই ঘনিষ্ঠ। উৎসবের আগমনের খবর প্রথম নিয়ে আসে প্রকৃতি। কালো মেঘ কেটে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে নীল আকাশ। সোনা রোদের দিন বহুদূরের ডাক দিয়ে যায়। কে যেন কোথায় অপেক্ষা করে আছে। পৌঁছোতে হবে তার কাছে। প্রিয়জনের কাছে, প্রিয় প্রকৃতির কাছে। কেউ কর্মমুখর দিনের পরে কিছুদিন বিশ্রাম করতে পরিবারের কাছে ফিরে আসবে। আর কারুর এই সময়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার সময়। পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপনেও ছোট ছোট করে জেগে ওঠে উৎসবের দিনরাত্রির ছবি। নৌকার পালে হাওয়া লেগেছে, কাশ ফুলে ভরে আছে মাঠ ঘাট। ওই দূরের পাহাড়ে কটাদিন নিরিবিলিতে কাটিয়ে আসার এই তো সময়। কাছাকাছি চেয়ার পেতে বসে গল্প। এদিকে আবার উৎসবের টান। বছরের এই একটি সময় প্রাণভরে কেনাকাটা, গল্প, পাড়ায় পাড়ায় কদিন পরে শুরু হবে জলসা, নাটকের রিহার্সাল চলছে রোজ, গানে নাচে মশগুল সবাই। আর চলছে ব্যাগ গুছিয়ে নেওয়ার পর্ব। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। ট্রেনে ট্রেনে সাড়া পড়েছে। সকলের মুখে উপচে পড়ছে খুশি। ট্রেন ছাড়ার বাঁশি বাজলো বলে। এই যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন আর শুভ করে তোলার ছোট্ট বার্তাটি পূর্ব রেলওয়ে জানাতে ভোলে না। যাতে যাত্রা সত্যিই হয়ে উঠতে পারে আনন্দযাত্রা।

হরপ্পা পত্রিকার অক্টোবর ২০২২ এর পুজো সংখ্যায় আত্মজিৎ মুখোপাধ্যায়ের ‘পূজাবার্ষিকীর বিজ্ঞাপন ও সামাজিক কৃত্য-র নির্মাণ’ প্রবন্ধে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছি, যেমন, ১৮৯৬ সালে *বঙ্গবাসী* পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম

সদস্য ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, তৎকালীন বঙ্গসমাজকে বেশ জোরদার আক্রমণ করে একটি বই লিখেছিলেন, নাম *শারদীয় সাহিত্য*। তারই একটি অংশের বেশ ব্যঙ্গমিশ্রিত শিরোনাম ছিল 'পূজার ফ্যাসান'। শোনা যায় সেসময়ে বিজন-বালা নামের এক আদ্যন্ত ধনী মহিলা পুজো উপলক্ষ্যে একটি 'বোধন পার্টি' আয়োজন করেছিলেন। আর সেই পার্টির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন 'মিশাশ সরসীলতা সাহা'। তাঁর বসন-ভূষণের বাহার সেই পুজোয় শহরের অন্যান্য সুন্দরীদের অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। ঠাকুরদাসের লেখাটি ছিল ইঙ্গিতবহ। উনিশ শতকের শেষ দশকে এই মহিলাদের ডাকা পুজোর 'ফ্যাশন শো' বেশ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এর কিছু বছর পরে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কিছু পত্রিকা তাদের পূজা-কেন্দ্রিকতার কথা জানান দেয়। *পার্ব্বণী, শারদীয়া আনন্দবাজার, বার্ষিক বসুমতী, আগমণী, শিশুসাথী, শারদীয়া যুগান্তর* ইত্যাদি পত্রিকায় পুজোকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হতে থাকে বিশেষ ধরনের বিজ্ঞাপন। পুজোকে কেন্দ্র করে মূলত বাঙালিদের একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিসর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল বিশ শতকে, যার চেহারা ছিল উনিশ শতকের চেয়ে আলাদা। পুজোর বিজ্ঞাপনগুলি সেই বৈশিষ্ট্য তাদের অবয়বে ধারণ করে রেখেছে।

১৯২২ সাল থেকে দৈনিক *আনন্দবাজার*-এর শারদীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলেও পুজোসংখ্যা হিসাবে একটি অতিরিক্ত সংখ্যা ছাপা হয় ১৯২৪ সালের ৫ অক্টোবর।

আত্মজিৎ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা হল, তিনি আবার কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন ইন্দমিত্র লিখিত, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ১৯৭৫ এ প্রকাশিত *ইতিহাসে আনন্দবাজার : আনন্দবাজার পত্রিকার অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস* বই থেকে।

> এই বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল ২৬ সেপ্টেম্বর, "১৯ শে আশ্বিন রবিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটী অতিরিক্ত সংখ্যা (পূজা সংখ্যা) প্রকাশিত হইবে। উহাতে নানারূপ ব্যঙ্গচিত্র, নক্সা, গল্প ইত্যাদি থাকিবে। যাঁহারা ঐ বিশেষ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ম্যানেজারের সঙ্গে ৩রা অক্টোবর শুক্রবারের মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া অথবা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিবেন।" বিজ্ঞপ্তির বাচনভঙ্গিতেই স্পষ্ট, বিশেষ সংখ্যার জন্য চাই বিশেষ বিজ্ঞাপন। সম্পাদক মশাই যেমন, বছরের বিশেষ সময়ে পাঠকের জন্য বিশেষ স্বাদবদলের সুযোগ তৈরি করছেন, তেমনভাবেই বিশেষত্ব তৈরিতে ডাক দেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞাপনদাতাকে।[২৫]

এই বিজ্ঞাপনের জবাব মিলেছিল প্রবলভাবে। শারদীয়া সংখ্যা উপলক্ষ্যে বিজ্ঞাপন নির্মাণের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে নানান পার্বণ অথবা পুজোর উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন ছাপা হত। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনগুলির সঙ্গে বছরের বাকি সময়ে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দৃশ্যত কোনও পরিবর্তন হত না। পূজাবার্ষিকীর একেবারে গোড়ার কয়েকটি

বছরেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু বিজ্ঞাপন তৈরি হয়নি। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই শারদীয় নান্দনিকতার চিহ্ন ফুটে উঠলো বিজ্ঞাপনগুলিতে। এ একেবারে নতুন ধারার বিজ্ঞাপন। একদিকে পুজোসংখ্যা এবং অন্যদিকে পুজোর বিজ্ঞাপন; দুয়ে মিলে বাংলা পত্রিকার জগতে একটা গভীর বাঁকবদল এলো। স্বভাবতই তার প্রভাব পড়লো বাণিজ্যিক দিকটিতেও, তৈরি হল পুজোর একটি একান্ত নিজস্ব অর্থনীতি।

উল্লেখ্য, বাঙালির ইতিহাসে কোনও ধর্মীয় আচার উপলক্ষ্যে এমন বিরাট অর্থনৈতিক পরিসর এর আগে কখনো তৈরি হয়নি।

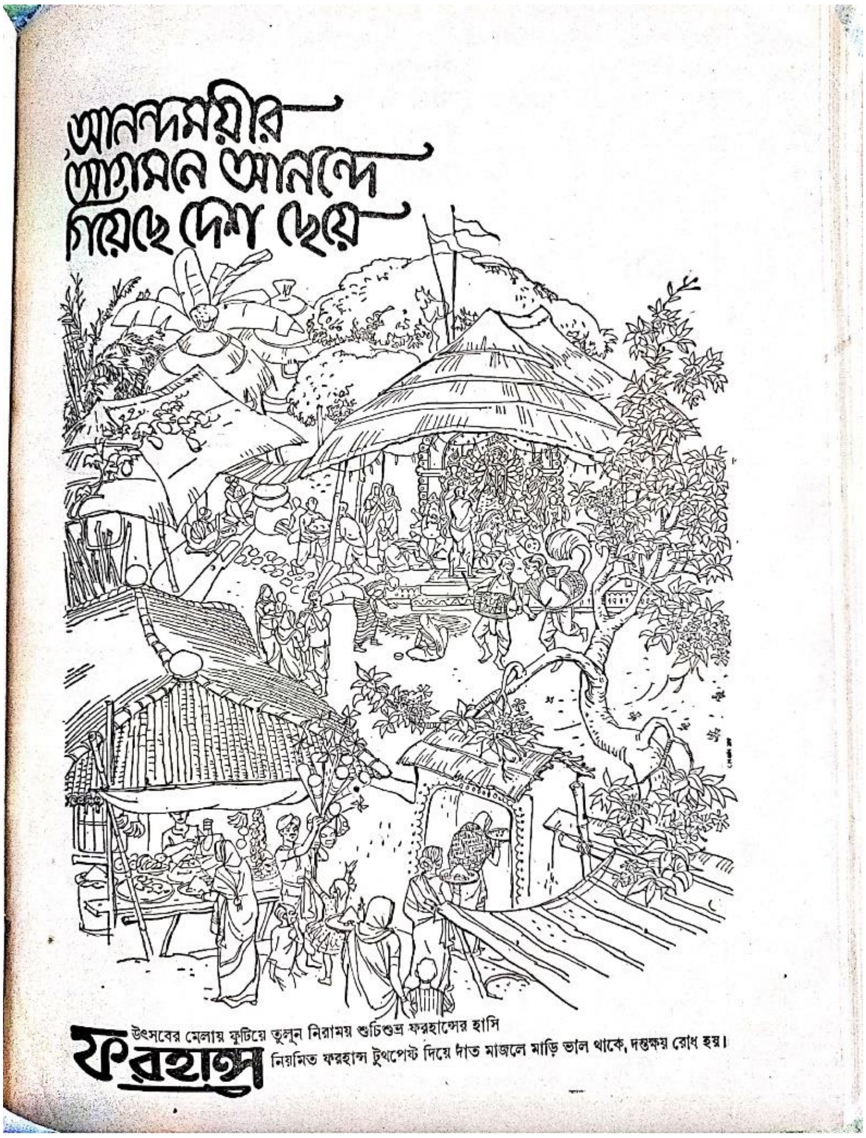

চিত্র ২.৭ সন্দেশ, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৪

এই বিজ্ঞাপনগুলির একটি নিজস্ব চরিত্র ছিল। এই উৎসব যে বিশেষভাবে বাঙালিরই উৎসব তা প্রতিটি বিজ্ঞাপনের অবয়বে ধরা পড়তো। ধর্মকে অতিক্রম করে বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি সাজিয়ে তুলতো বিজ্ঞাপনকে। "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে", রবীন্দ্রনাথের 'কাঙালিনী' কবিতার এই প্রথম পংক্তিটিকে ব্যবহার করে, শারদোৎসবের সময়ে তৈরি হয়েছে অজস্র বিজ্ঞাপন। তারই একটি এখানে ব্যবহার করা হল।

বিজ্ঞাপনটি ফরহান্স মাজনের, যেখানে বিজ্ঞাপনের নীচে খুব ছোট করে নিয়মিত ফরহান্স ব্যবহারের উপকারিতার কথা উল্লেখ করা থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার নীচে পুরো পৃষ্ঠা জুড়েই থাকে গ্রামবাংলার একান্ত উৎসবের

একটি আন্তরিক ছবি। মাটির ঘরে খড়ের চালার নীচে দেবী দুর্গার পুজো, উৎসবের মিষ্টির দোকান, বহু মানুষের মিলন এবং বাঙালির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা একাত্ম হয়ে যায় বিজ্ঞাপনে। এই ছবির সঙ্গে দাঁতের মাজনের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও উৎসবই এর বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই বিজ্ঞাপনও তারই চিহ্ন বহন করছে। পুজোর বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে বেশ অনেকগুলিতেই দুর্গার নানান পৌরাণিক আখ্যান চমৎকার সাহিত্যিক গদ্যে ধরা পড়েছে। তার কোনওটায় ধরা আছে মেনকার গর্ভে সতী-জন্মের বৃত্তান্ত, কোনওটাতে আবার অকাল বোধনের গল্প। বোরোলীন এই ধরনের বিজ্ঞাপনের সিরিজ তৈরি করেছে দির্ঘদিন ধরে। পুনর্বার উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞাপিত পণ্যগুলির সঙ্গে এই কাহিনির বিন্দুমাত্র কোনও সম্পর্ক ছিল না, সুলিখিত কপি এবং দক্ষ ছবির মাধ্যমে তৈরি হত মার্জিত, রুচিশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন। মহাদেবের পত্নী সতী পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনে অপমানে-দুঃখে প্রাণত্যাগ করে পরজন্মে হিমালয় মহিষী মেনকার গর্ভে পুনর্বার অবতীর্ণ

চিত্র ২.৮ প্রতিক্ষণ, শারদীয়া, ১৩৯৫

হয়েছিলেন। পর্বততনয়া সেই দেবীকে আজও প্রতি আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে বঙ্গভূমিতে আবাহন করা হয়।

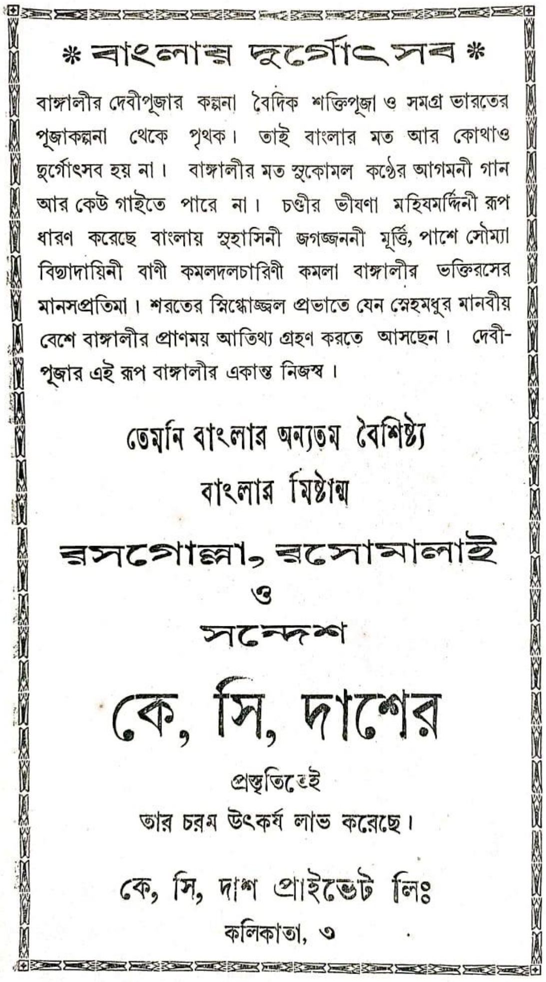

চিত্র ২.৯ সাহিত্যপত্র, নবম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৪

বঙ্গভূমির সেই পরিপূর্ণ উৎসবের আনন্দধ্বনি এই বিজ্ঞাপনে ছবিতে-কপিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

*সাহিত্যপত্র*র নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে প্রাপ্ত কে সি দাশের একটি বিজ্ঞাপনের শিরোনাম ছিল ‘বাংলায় দুর্গোৎসব’। যে কপিতে স্পষ্টতই জানানো হয় বাঙালির দেবীপূজার কল্পনা সমগ্র ভারতের ও বৈদিক শক্তিপূজার কল্পনার থেকে অনেকাংশেই পৃথক। যে উৎসবকে ঘিরে বাঙালির এহেন তীব্র আবেগ, সেই দেবী দুর্গা যেন বিশেষভাবেই মানবিক হয়ে উঠেছেন। তাঁর ভয়ানক দর্পের তুলনায় এক ধরনের কোমল, স্নেহময়ী মাধুর্য প্রস্ফুটিত। বাঙালি মায়েদের সঙ্গে দেবী দুর্গা মিশে গেছেন যেন তাঁর দেবীত্বকে পাশে সরিয়ে রেখে। ঘরের মেয়ে বছর কাটিয়ে ঘরে ফিরছেন বাঙালির আতিথ্য গ্রহণ করতে। দেবীপূজার এই রূপ যেমন বাঙালির একান্ত নিজস্ব, তেমনই কে সি দাশের মিষ্টিও বাঙালির নিজস্ব মিষ্টান্ন, সেই কথাই জানানো হয় বিজ্ঞাপনে।

‘বাঙালি’র আত্মপরিচয়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে দুর্গোৎসব। পূজার আচার-বিচারের চাইতে উৎসব আর প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আবেগ যেখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দুর্গোৎসবের চারটে দিন বাঙালির কাছে যে বিশেষ রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়, তার উপস্থিতি পরবর্তীকালের বিজ্ঞাপনেও টের পাওয়া যায়।

২০০৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর, এই চারটি দিন ছিল সপ্তমী থেকে দশমী। *আনন্দবাজার পত্রিকা* এই চার দিনকে নিয়ে একটি ছোট বিজ্ঞাপনের সিরিজ বার করে। বিজ্ঞাপনটি *আনন্দবাজার*-এর ই। বিজ্ঞাপনের

কপিটি বেশ বড় হলেও বড় স্পেস নিয়ে হরফের মাপ বাড়িয়ে কপিটি ছাপা হবার কারণে দৃশ্যত বেশ আরাম বোধ হয়।

চারদিনের চারটি গল্প।

সপ্তমীতে প্রবাসী বাঙালির বাড়ি ফেরা, অষ্টমীতে বনেদি বাড়ির আধুনিকা কন্যার সাজগোজ করে ভিন রাজ্যের প্রেমিকের সঙ্গে একত্রে অঞ্জলি দেওয়ার অপেক্ষা, নবমীতে মা, বাবা, পুত্র, কন্যার দার্জিলিং বেড়াতে যাবার প্রস্তুতি এবং দশমীতে কোনও পরিবারের গৃহকর্ত্রীর বিজয়ার জন্য আনতে বলা নানাবিধ মিষ্টির হিসাবনিকাশ-এই হল বাঙালি পরিবারের চারটি দৃশ্য। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে যে কয়েকটি চিহ্ন দশকের পর দশক বাঙালি বহন করে চলেছে, তারই চারটি ছবি যেন এই বিজ্ঞাপনে ধরা পড়েছে। কিন্তু বদল এসেছে নতুন শতাব্দীর মধ্যবিত্ত বাঙালির।

একদা যে বাঙালি দীর্ঘদিন অর্থ সঞ্চয় করে, বহু সাধ নিয়ে একখানি ভালো সাইকেল অথবা সেলাই মেশিন, রেডিও সেট কিনতেন, যত্নে ব্যবহার করতেন, যাতে মূল্যবান জিনিসটির কোনও ক্ষতি না হয়, বর্তমানে তারাই শেষমুহূর্তে অনেক মূল্য দিয়েও কেটে ফেলতে পারেন বিমানের টিকিট, ব্যবহার করেন দামি ‘লিপলাইনার’, ট্যাক্সি চড়া যার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার, দশমীতে অঢেল দামি কেনা মিষ্টি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন যেখানে সাধারণ ঘটনা; এই বিজ্ঞাপনে আছে তাঁদের কথা।

একুশ শতকের আধুনিক, স্মার্ট, ইংরেজি শব্দবহুল বাংলা বলা ঝকঝকে বাঙালির কথা, ‘ওয়েস্টার্ন আউটফিট’ থেকে শুরু করে ‘পেডিকিওর’ অথবা বাংলাদেশি ঢাকাই সবেতেই যাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত।

সপ্তমীর ভোরে বাড়ি ফিরতে গিয়ে তাঁদের কাছে শরতের আকাশ হয়ে যায় ‘ডেনিম’ রঙের। মুহূর্তে যেন ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা ধানক্ষেত, কাশবন হয়ে যায় *পথের পাঁচালী*-র সেট। মন বলে ওঠে “পথের পাঁচালির

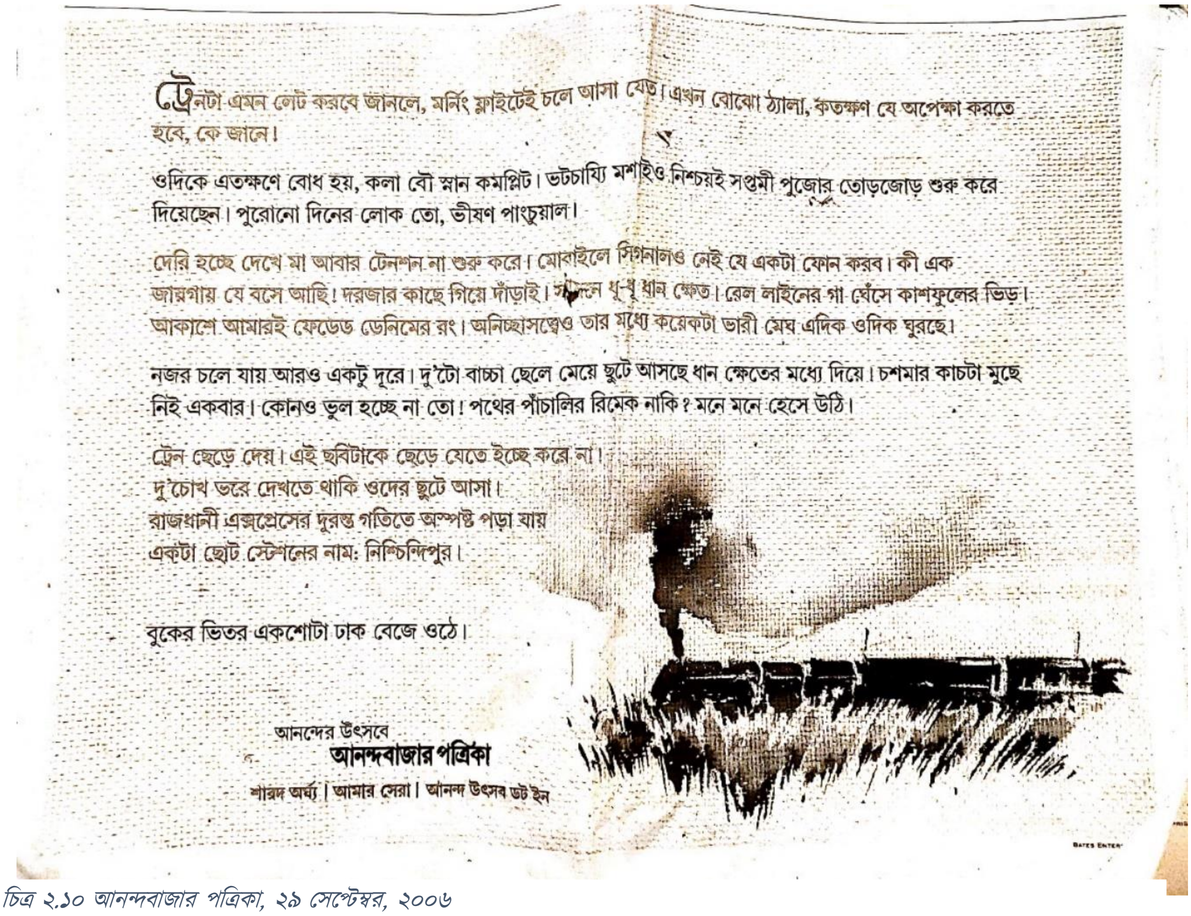

চিত্র ২.১০ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

রিমেক নাকি?” মন এখন ট্রেনের মতই দ্রুতগামী, রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়ে তীব্রভাবে এগিয়ে চলেছে নিজের ঘর, ব্যক্তিগত ‘নিশ্চিন্দিপুর’-এর দিকে।

সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়িত করার পর থেকে অপু-দুর্গার কাশবনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার দৃশ্যটি দর্শক হৃদয়ের স্থায়ী আসন জুড়ে আছে। প্রথম বিজ্ঞাপনেও তারই ছায়া।

বাণিজ্যিক কারণেই জনপ্রিয় রুচি বরাবর বিজ্ঞাপনে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এই চারটি বিজ্ঞাপনেও বাঙালির আবেগের উৎসবের সেই চিহ্নগুলি বিশেষভাবে ধরা হয়েছে, যা দিয়ে বাঙালির জনপ্রিয় 'বাঙালিত্ব' স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কে সি দাশের বিজ্ঞাপনটিতে যেমন বলা হয়েছিল নিজস্ব বাঙালি দেবীপূজার কথা, আচারবিচারের থেকে যার মধ্যে আবেগের উদযাপনই বেশি; দুর্গোৎসবের এই চারটি দিনের ধারাবাহিক বিজ্ঞাপনেও সেই নিখাদ 'বাঙালিত্বের'ই প্রকাশ। সময়ের পরিবর্তনে যাঁদের বাহ্যিক, অর্থনৈতিক, মানসিক পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু শিকড়ের টানটিকে যাঁরা এখনো উপেক্ষা করতে পারেননি, এই বিজ্ঞাপনে তাঁদেরই গল্প বলা হল।

পূর্বের আলোচনায় উঠে এসেছে, নীহাররঞ্জন বলেছিলেন, বাঙালির দেবদেবীর যে কল্পনা, তাতে তাঁরা যেন বিশেষভাবে মানবিক হয়ে উঠেছেন। বড় কোনও স্থাপত্য-ভাস্কর্যেও তেমন রুচি নেই বাঙালির। তার আন্তরিকতার, নিবেদনের প্রকাশ ধরা থাকে আলপনায়, ব্রতকথায়, পাঁচালিতে।

পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপন তাই সেজে ওঠে ভাদুলি ব্রতের আলপনায়।

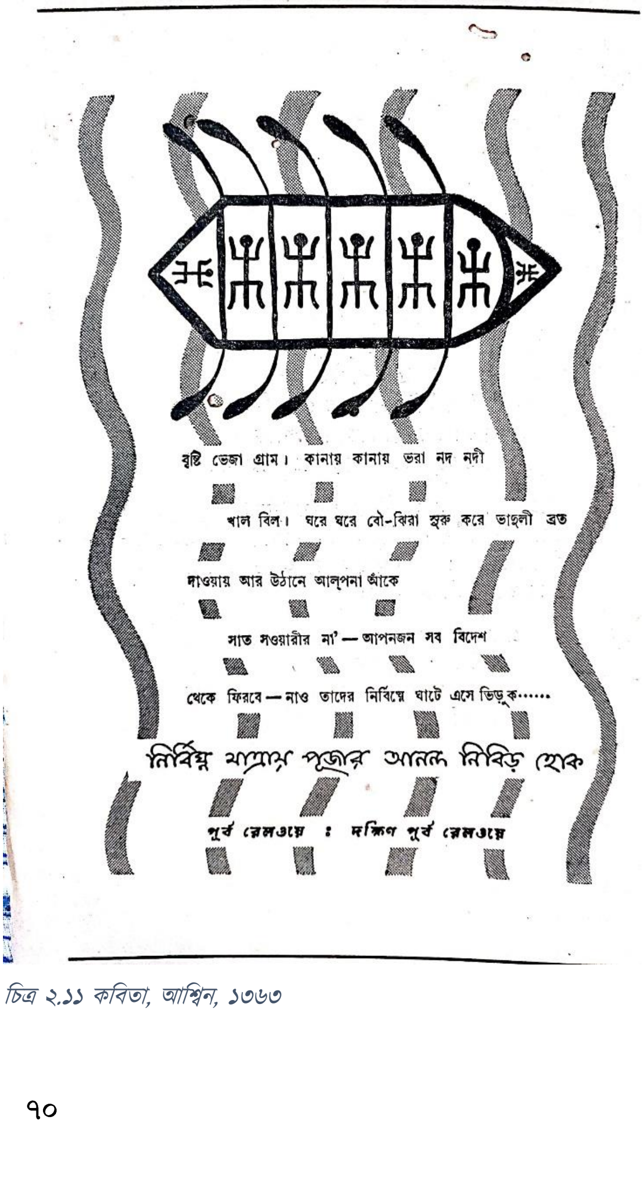

চিত্র ২.১১ কবিতা, আশ্বিন, ১৩৬৩

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বাংলার ব্রত* বইতে ভাদুলি ব্রত প্রসঙ্গে বলছেন বৈদিক সূর্য এবং শাস্ত্রীয় ব্রতের সূর্য, দুয়ের বিস্তর পার্থক্য। এই ব্রত বিশেষভাবে খাঁটি মেয়েলি ব্রত। বৃষ্টির পরে আত্মীয়স্বজন বিদেশ থেকে, সমুদ্রযাত্রা থেকে, জলপথে-স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসার কামনায় এই ব্রত পালন করা হয়। সূর্য বা ঊষার বর্ণনায় ফুটে ওঠে পরিবারের ঘনিষ্ঠতম মানুষটির নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে আসার আর্তি।

ব্রত'র ছড়াটি ছিল এইরকম-

এ নদী সে নদী একখানে মুখ,

ভাদুলি-ঠাকুরানী ঘুচাবেন দুখ।

এ নদী সে নদী একখানে মুখ,

দিবেন ভাদুলি তিনকুলে সুখ।।[২৬]

একদা বৌ-ঝিদের স্বামী, দাদা, পিতারা বাড়ি ফিরতেন নৌকায়। বর্ষার মেঘ কেটে শরতের আগমনে তাদের যাত্রাপথ বিপদমুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করে হত ভাদুলি ব্রত। বিজ্ঞাপনেও সেই দিনের ছবিই আলপনার ফাঁকে ফাঁকে ধরা পড়ে ছোট্ট কপিটিতে। আপনজনরা দেশে ফিরবে, তাদের বরণ করা হবে আদরে, আলপনায়। যেন তাদের বিপদ না হয়।

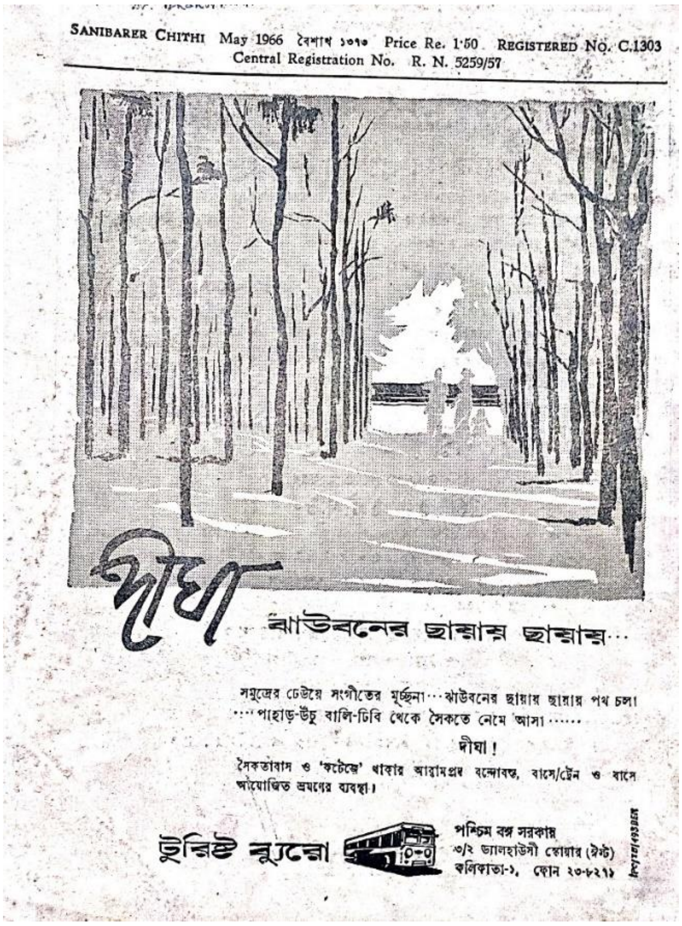

চিত্র ২.১২ শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৭৩

দিন বদলেছে, আজ সেই মানুষগুলিকেই উৎসবের দিনে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরিয়ে দেয় রেলওয়ে। বিজ্ঞাপনটি বাংলার ঋতু, বৃষ্টিভেজা গ্রাম, কানায় কানায় পূর্ণ নদী, আলপনা আঁকা ঘর-উঠোন, উৎসব, ব্রত সব মিলিয়ে আন্তরিকভাবে বাঙালি হয়ে ওঠে।

মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসার খরচ চালিয়ে, সন্তানদের পড়াশোনায় অর্থ-ব্যয় করে, অসুখ-বিসুখ সামলে অধিকাংশ সময়েই তেমন বেশি টাকা সঞ্চয় করে উঠতে পারতো না। কত সাধ না মেটা থেকে যেত, হয়তো বা সারাজীবন। কিন্তু তবু, অল্প খানিক সঞ্চয় করতে পারলেই বেরিয়ে পড়তে দ্বিধা করেনি তারা। খুব দূরে না হয় নাই বা যাওয়া হল, তবু পাহাড় সমুদ্র দেখার সাধ তার জীবনে একবারের জন্য হলেও মিটেছে। বাঙালির ভ্রমণের তিনটি চিরন্তন

ভ্রমণ-স্থান আছে। কত কাহিনিতে, ছায়াছবিতে ধরা পড়েছে সেইসব স্থান-মাহাত্ম্য। দীঘা-পুরী-দার্জিলিং। বাংলা বিজ্ঞাপনেও তাদের উল্লেখ তাই অবশ্যম্ভাবী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিষ্ট ব্যুরো দীঘার সমুদ্রসৈকত এবং বিস্তৃত ঝাউবনের ছবি দিয়ে একটি বিজ্ঞাপন করে। বিজ্ঞাপনের কপিটির শিরোনামে লেখা ছিল "ঝাউবনের ছায়ায় ছায়ায়...", তারই নীচে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছিল সমুদ্রের ঢেউয়ে সংগীতের মূর্চ্ছনার কথা। বিজ্ঞাপনের কপির শব্দচয়ন এবং ছবি, সবটা মিলে একটা রোম্যান্টিক আবেশ তৈরি হয়।

সংগীত শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্য (১৯৪০-২০১১), এরই কয়েক বছর পরে, ১৯৬৮ সালে গীতিকার বরুণ বিশ্বাসের কথায়, অশোক রায়ের সুরে একটি গান গাইলেন। গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী তিনজনেরই এটি ছিল প্রথম পুজোর গান।[২৭] "চলো না দীঘার সৈকত ছেড়ে, ঝাউবনের ছায়ায় ছায়ায়"। এই গানের ছত্রে ছত্রে ছিল গভীর রোম্যান্টিকতার ডাক, দীঘার সৈকতের প্রতি আপামর বাঙালির আকর্ষণ প্রসঙ্গে আজও সংগীতপ্রিয় বাঙালির মনে এই গান ফিরে আসতে বাধ্য। উল্লেখ্য, টুরিষ্ট ব্যুরো'র বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল গান প্রকাশের পূর্বে। এই বিজ্ঞাপন, বাঙালির চিরকালীন গানটিকে সামান্য হলেও প্রভাবিত করতে পারে, এমন সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে না। সাতের দশকেই, ১৯৭৪ সালে পীযূষ বসু পরিচালিত 'বিকেলে ভোরের ফুল' ছবিটি মুক্তি পায়।[২৮] উত্তমকুমার, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় অভিনীত সেই ছবির পটভূমিও ছিল দীঘা। বিজ্ঞাপন, গান, ছায়াছবি সব একসূত্রে গাঁথা হয়ে থাকে বাঙালির মনে।

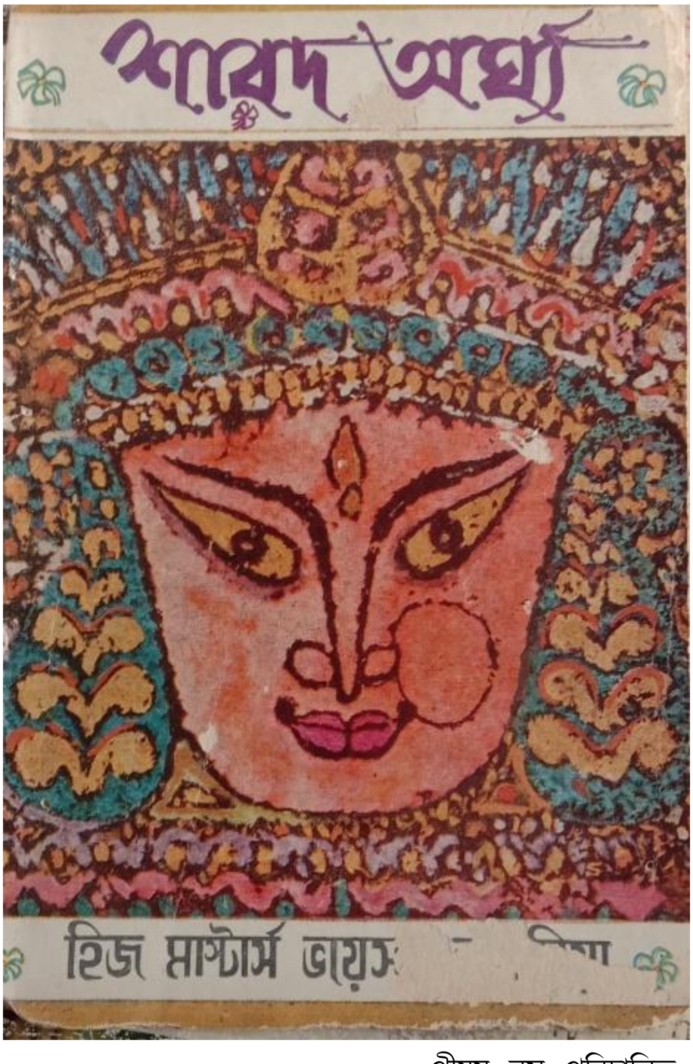

চিত্র ২.১৩ শারদ অর্ঘ্য, প্রচ্ছদ, ১৯৬৮

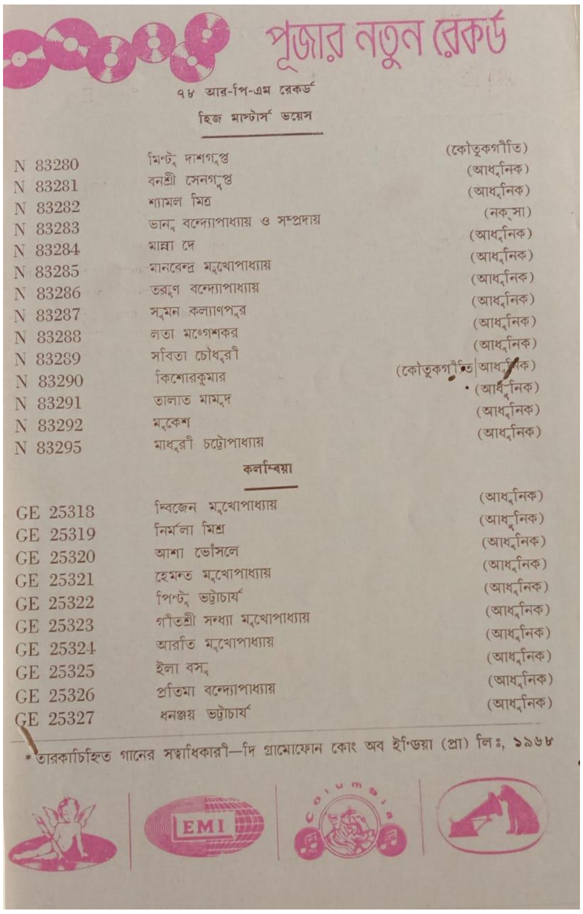
পূজার নতুন রেকর্ড

৭৮ আর-পি-এম রেকর্ড

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

N 83280	মিণ্টু দাশগুপ্ত	(কৌতুকগীতি)
N 83281	বনশ্রী সেনগুপ্ত	(আধুনিক)
N 83282	শ্যামল মিত্র	(আধুনিক)
N 83283	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়	(নক্সা)
N 83284	মান্না দে	(আধুনিক)
N 83285	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	(আধুনিক)
N 83286	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	(আধুনিক)
N 83287	সুমন কল্যাণপুর	(আধুনিক)
N 83288	লতা মঙ্গেশকর	(আধুনিক)
N 83289	সবিতা চৌধুরী	(আধুনিক)
N 83290	কিশোরকুমার	(কৌতুকগীতি|আধুনিক)
N 83291	তালাত মামুদ	• (আধুনিক)
N 83292	মুকেশ	(আধুনিক)
N 83295	মাধুরী চট্টোপাধ্যায়	(আধুনিক)

কলম্বিয়া

GE 25318	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	(আধুনিক)
GE 25319	নির্মলা মিশ্র	(আধুনিক)
GE 25320	আশা ভোঁসলে	(আধুনিক)
GE 25321	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	(আধুনিক)
GE 25322	পিন্টু ভট্টাচার্য	(আধুনিক)
GE 25323	গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	(আধুনিক)
GE 25324	আরতি মুখোপাধ্যায়	(আধুনিক)
GE 25325	ইলা বসু	(আধুনিক)
GE 25326	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	(আধুনিক)
GE 25327	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	(আধুনিক)

*তারকাচিহ্নিত গানের স্বত্বাধিকারী—দি গ্রামোফোন কোং অব ইণ্ডিয়া (প্রা) লিঃ, ১৯৬৮

চিত্র ২.১৪ শারদ অর্ঘ্য, শিল্পী তালিকা, ১৯৬৮

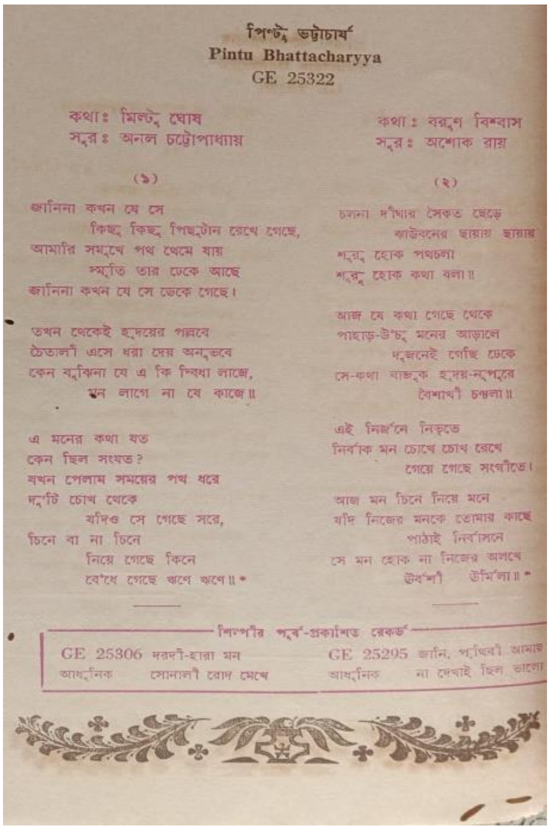
পিণ্টু ভট্টাচার্য
Pintu Bhattacharyya
GE 25322

কথাঃ মিল্টু ঘোষ
সুরঃ অনল চট্টোপাধ্যায়

(১)

জানিনা কখন যে সে
কিছু কিছু পিছুটান রেখে গেছে,
আমারি সমুখে পথ থেমে যায়
স্মৃতি তার ঢেকে আছে
জানিনা কখন যে সে ডেকে গেছে।

তখন থেকেই হৃদয়ের পল্লবে
চৈতালী এসে ধরা দেয় অনুভবে
কেন বুঝিনা যে এ কি দ্বিধা লাজে,
মন লাগে না যে কাজে॥

এ মনের কথা যত
কেন ছিল সংযত?
যখন পেলাম সময়ের পথ ধরে
দুটি চোখ থেকে
যদিও সে গেছে সরে,
চিনে বা না চিনে
নিয়ে গেছে কিনে
বেঁধে গেছে ঋণে ঋণে॥ *

কথাঃ বরুণ বিশ্বাস
সুরঃ অশোক রায়

(২)

চলনা দাঁখার সৈকত ছেড়ে
ঝাউবনের ছায়ায় ছায়ায়
শুরু হোক পথচলা
শুরু হোক কথা বলা॥

আজ যে কথা গেছে থেকে
পাহাড়-উঁচু মনের আড়ালে
দুজনেই গেছি ঢেকে
সে-কথা বাজুক হৃদয়-নূপুরে
বৈশাখী চঞ্চলা॥

এই নির্জনে নিভৃতে
নির্বাক মন চোখে চোখ রেখে
গেয়ে গেছে সংগীতে।

আজ মন চিনে নিয়ে মনে
যদি নিজের মনকে তোমার কাছে
পাঠাই নির্বাসনে
সে মন হোক না নিজের অলখে
উর্বশী উর্মিলা॥ *

শিল্পীর পূর্ব-প্রকাশিত রেকর্ড

GE 25306 দরদী-হারা মন
আধুনিক সোনালী রোদ মেখে

GE 25295 জানি, পৃথিবী আমায়
আধুনিক না দেখাই ছিল ভালো

চিত্র ২.১৫ শারদ অর্ঘ্য, গান, পিন্টু ভট্টাচার্য, ১৯৬৮

চিঠির আকারে, নানান মনোগ্রাহী উদাহরণে ভরপুর বাংলা বিজ্ঞাপন। তার কয়েকটি উদাহরণ এই অধ্যায়েই ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে।

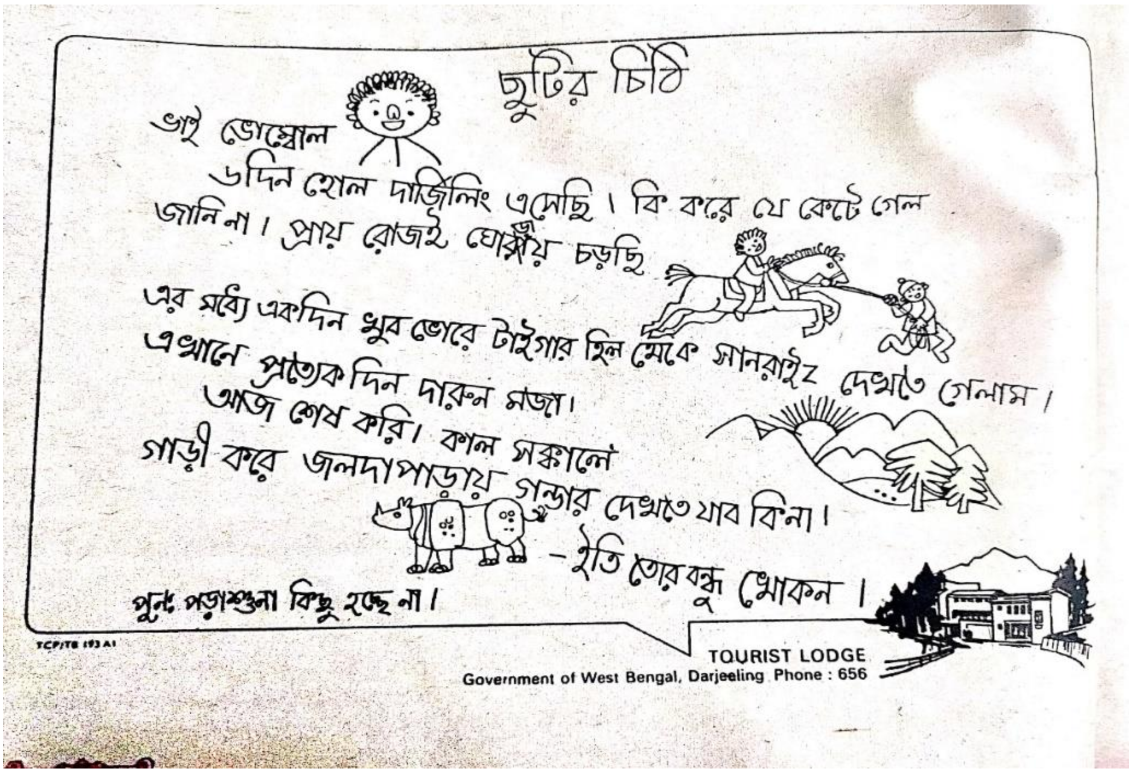

চিত্র ২.১৬ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৩৭৯

টুরিষ্ট ব্যুরো বা টুরিষ্ট লজ এর বিজ্ঞাপনে ভ্রমণ প্রসঙ্গের উল্লেখ স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু শিশু মনের প্রতিফলন এবং শিশু-ছাঁদের বাংলা হাতের লেখা পাওয়া যায় বিজ্ঞাপনটিতে। লেখার ভাষার মধ্যে বাঙালিয়ানার ছাপ স্পষ্ট। বস্তুত সমগ্র চিঠিটিতে, 'সানরাইZ' শব্দটি ছাড়া আর একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

পরস্পরকে কথায় কথায় 'ভাই' সম্বোধন করার চল ইদানীংকালে খুব বেড়েছে। হিন্দি 'ইয়ার' শব্দেরই বঙ্গীকরণ হিসাবে এটিকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এইখানে 'ভোম্বোল'কে 'ভাই' বলে যে আদরের ডাক, সে প্রয়োগ নিতান্ত বাঙালি। সঙ্গের শিশুর হাতের অনুকরণে আঁকা ছবিগুলির জন্য বিজ্ঞাপনটি আরও সুন্দর দেখায়।

রেলওয়ের বিজ্ঞাপনগুলি এতই বৈচিত্র্যময় যে সেগুলির উল্লেখ করার লোভ সামলানো যায় না।

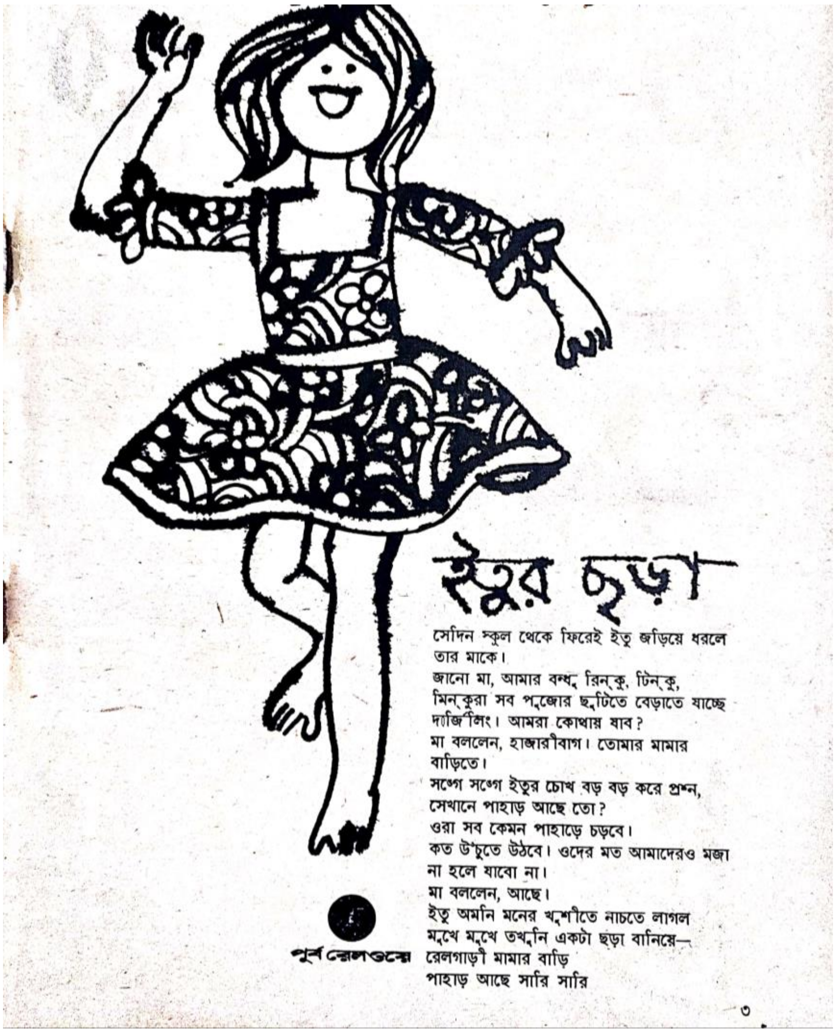

চিত্র ২.১৭ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৩৮০

বিজ্ঞাপিত পণ্যের খরিদ্দার বড়রা হলেও, ছোটদেরকে নিরাশ করেনি বাংলা বিজ্ঞাপন। চমৎকার ফ্রক পরা, হাসিখুশি ইতুর ছবিতে তাই পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রেলের বিজ্ঞাপনের শিরোনাম কেন 'ইতুর ছড়া', সেটা বুঝতে গেলে পড়তে হবে সমস্ত কপিটি। পুজোর ছুটিতে ইতুর বন্ধুরা সব পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছে, তারা কোথায় যাবে? জানতে চাইলেই মা বলেন তাঁরা যাবেন হাজারীবাগ। ইতুর সে জায়গা পছন্দ হয় না, সেখানে কি পাহাড় আছে? মা তাকে নিরাশ করেন না। ইতু তাই খুশি হয়ে বানিয়ে ফেলে ছড়া।

বাঙালির ভ্রমণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন নিছক খেয়াল খুশিতে, অপ্রয়োজনে; তেমনই কত বছর ধরে তারাই আবার, তাদের প্রিয়জনের শরীর সারিয়ে তোলার তাগিদে, সামান্য আয়কে সম্বল করেই ছুটে গেছে হাজারীবাগ, রাঁচি, সাঁওতাল পরগণা।

ঔপনিবেশিক আমলে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে গ্রামেগঞ্জে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অথবা শহরের আবহাওয়ায় প্রায়শই ঘটে থাকা পেটের অসুখে, মূলত এই দুই ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেতে অন্যত্র ঘর বাঁধতে হল তাকে। দূর বিদেশে নয়, বাংলারই পশ্চিমপ্রান্তে বন-জঙ্গল ঘেরা মালভূমি এলাকা সাঁওতাল পরগণায়। সেই পেয়ে বসলো ছুটির নেশা। *দেশ* পত্রিকার ২৪ অক্টোবর, ১৯৮৭ সালের সংখ্যাটিতে অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'ছুটির

নিমন্ত্রণে’ নামের একটি প্রবন্ধ।[২৯] সেখান থেকে জানতে পারা যায়, হুগলী জেলার বিজয়নারায়ণ কুন্ডু ১৮৭১ সালে মধুপুর-গিরিডি শাখা রেললাইন পাতার ঠিকাদারি নিয়ে সাঁওতাল পরগণায় প্রথম এলেন। তাঁর কাজের মেয়াদ ফুরোলেও বিজয়নারায়ণ আবিষ্কার করলেন তাঁর পেটের দূরারোগ্য বহু পুরোনো আমাশয় অসুখ এখানকার জল হাওয়ায় সেরে গেছে। প্রভূত শ্রমের ফলেও তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েনি। তাই তিনি পাকাপাকিভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন মধুপুরে বাসা বাঁধার। এই শুরু বাঙালির সাঁওতাল পরগণায় আসা। বাঙালি এখানে গড়ে তুলল তার মনোমত স্বাস্থ্যনিবাস। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তে, একদা বাংলাভুক্ত সাঁওতাল পরগণা বিহার রাজ্যভুক্ত হয়। হাজারীবাগ, গিরিডি, মধুপুর প্রতিটি এলাকাই ছিল বাঙালির হাওয়াবদলের জায়গা।

তারপরে বংশ পরম্পরায় কত বাঙালি পরিবার রয়ে গিয়েছেন সেইখানে। তাদের সুখস্মৃতিরেণু মিশে আছে সেই মাটিতে।

রেলওয়ে অথবা টুরিষ্ট ব্যুরো’র বিজ্ঞাপনে ভ্রমণ প্রসঙ্গ পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের। তারই কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হল। এইবারে অন্য পণ্যের বিজ্ঞাপনেও কী চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে বাঙালির ভ্রমণকথা, তারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

চিত্র ২.১৮ মৌচাক, ১৯৫৮

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর ‘মার্গো সাবান’ আর ‘নিম টুথপেষ্ট’-এর বিজ্ঞাপনে আছে দুই বন্ধুর গল্প। নাম তাদের মিনি এবং বিনী। অন্ত্যমিল দিয়ে লেখা ছোট্ট গল্পটিতে জানা যায় মিনি সদ্য

দেশভ্রমণ সেরে ফিরে এসেছে, অতএব পাহাড়, ঝরনা, ছোট নদীর বালুর চর ইত্যাদি সুন্দর জিনিসের বর্ণনা বন্ধুকে করতে না পারলে তার যেন বেড়ানোর আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। বন্ধু বিনী তাকে কয়েকদিনের ব্যবধানে দেখে বিস্মিত। এত অল্প সময়ে আরও উজ্জ্বল সে কী করে হয়ে ওঠে, এই তার জিজ্ঞাস্য। তখন আসে মার্গো সাবান আর নিম মাজনের প্রসঙ্গ। বিজ্ঞাপনে দুটি ছবি আছে। একটিতে মিনি তার বাবা মা এর সঙ্গে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকের পোশাকেই গত শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ছবিটিতে হাসি-খুশি দুই বন্ধুর আগ্রহভরা কথোপকথনে বিজ্ঞাপনটি চমৎকার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

বাঙালির ভ্রমণের, শরীর মন চনমনে হয়ে ওঠার আনন্দ-স্ফূর্তির দিকগুলি দৈনন্দিন ব্যবহৃত পণ্যের বিজ্ঞাপনেও ধরা রয়েছে।

আর একটি উদাহরণ দিয়ে বাঙালির পুজোর বেড়ানো প্রসঙ্গ শেষ করতে হবে। বিজ্ঞাপনটি দীর্ঘ এবং দুই পাতা জোড়া। দুটি পাতার ছবিই তুলে দেওয়া হল।

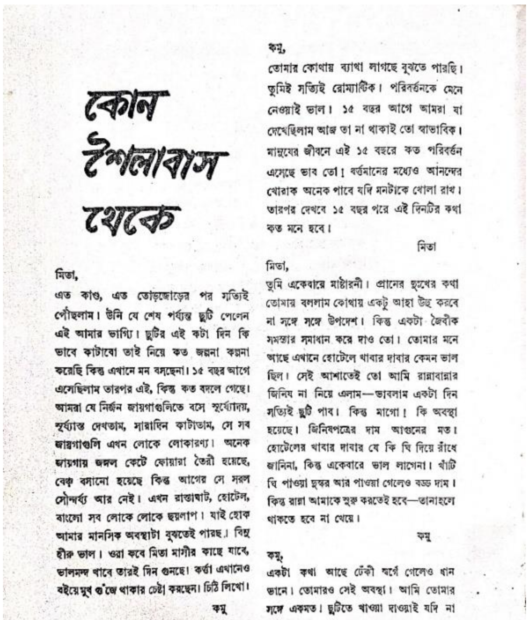

চিত্র ২.১৯ চতুরঙ্গ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৫, পৃষ্ঠা ১

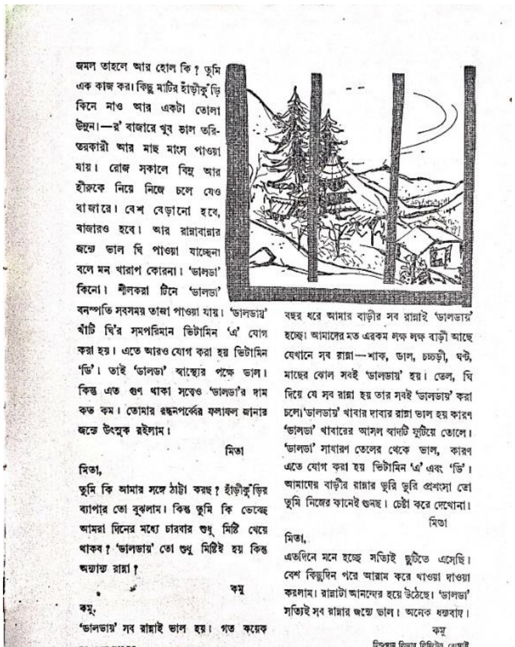

চিত্র ২.২০ চতুরঙ্গ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৫, পৃষ্ঠা ২

কোন শৈলাবাস থেকে বন্ধুকে চিঠি লিখছেন কুমু। কুমু বিবাহিতা, স্বামী এবং দুই সন্তান নিয়ে, অনেক তোড়জোড়ের পরে অবশেষে এসে পৌঁছোতে পেরেছেন পাহাড়ে। তবু মন মানছে না। পনেরো বছরের আগের দিনগুলি অনবরত স্মৃতিমেদুর করে তুলছে তাঁকে। মনটি তাঁর আজও রোম্যান্টিক।

অপরদিকে মিতা, অর্থাৎ বন্ধুটি কিন্তু বেশ বাস্তববাদী। পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত। মোট সাতখানি চিঠি মিলে দু'পাতার এই বিজ্ঞাপনটি হয়ে উঠেছে রীতিমতো সাহিত্য।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসেও যখন ঠিক মনমত শান্তিটি মিলছে না, তখন এই 'মাষ্টারনী' বন্ধুটির কাছেই সমাধান চান তিনি। ভ্রমণ-প্রেমী বাঙালির ভ্রমণের সঙ্গে আর যে বিষয়টি জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গীভাবে, তা হল মন ভরে ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া। ঘুরতে গিয়ে যাতে উদর এবং মন, দুয়েরই পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়, সেদিকেই তার লক্ষ্য। তবে 'মাছে-ভাতে' বাঙালির বাড়ি ছেড়ে 'বিদেশ' গিয়েও ঘরের আরামটি না হলে চলে না। অতএব সে ব্যবস্থা করতে হবে সর্বাগ্রে।

পাহাড়ের খাবার যখন মোটেই মুখে রোচে না, তখন মিতা কুমুকে মোক্ষম সমাধানটা দেন। আসে হিন্দুস্থান লিমিটেড এর 'ডালডা' বনস্পতির প্রসঙ্গ। 'ডালডা' দিয়ে কেবল মিষ্টান্নই তৈরি হতে পারে, এই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে জানানো হয় আমিষ, নিরামিষ সব পদই 'ডালডা'র গুণে সুস্বাদু হয়ে ওঠে, এবং তা পুষ্টিকরও বটে।

শেষ চিঠিতে কুমু জানান, তাঁদের সমস্যার সমাধান তো হয়েছেই, সুখাদ্যের দৌলতে এতদিনে ছুটির আনন্দও সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

সুখাদ্যের মাধ্যমে ভ্রমণের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির ঘটনাটি বোধহয় একান্তই বাঙালির বৈশিষ্ট্য।

বনস্পতি ডালডার বিজ্ঞাপনেও বাঙালির ভ্রমণের অন্যতম প্রধান দিকটি উঠে এসেছে চমৎকারভাবে। বিজ্ঞাপনের কপিকে সহজে সু-সাহিত্যের অংশ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই বিজ্ঞাপনটিই সূত্র রেখে যায় এই অধ্যায়ের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ে পৌঁছোবার। তারই আগে একেবারে সমসাময়িক একটি বিজ্ঞাপন এইখানে রেখে যাওয়া যাক।

বাঙালির বহু পরিবর্তন হয়েছে বিগত কয়েকটি দশকে। গড় মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সেই পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কিছু পরিবর্তন বাহ্যিক, কিছু পরিবর্তন হয়েছে নিতান্ত আন্তরিক।

খাস জনতা কেরোসিন কুকার অথবা দি ক্যালকাটা কেমিক্যালের বিজ্ঞাপনের ছবিতে যে বাঙালি পরিবারের ছবি দেখা যায়, তাদের পোশাক, দেহভঙ্গিমা সবকিছুর সঙ্গেই আজ বিস্তর তফাৎ। পাঁচের দশকের মিনি-বিনীর বাবা-মায়ের সাজপোশাকের সাধারণ ধুতি-শাড়ি আজকে বদলে গেছে ব্যবহারোপযোগী আরামদায়ক বিদেশি পোশাকে। পরিবর্তন হয়েছে শিশুদের বড় করে তোলার ধরনে। তবু তারই মধ্যে কিছু জিনিস বোধহয় পরিবর্তিত হয়নি। ঠিক যেমন ভাবে কলকাতায় মন বসছে না বলে ফেলুদারা চেপে বসেছিল জগন্নাথ এক্সপ্রেসে, সেভাবেই আজও

চিত্র ২.২১ দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২১

পরিবর্তিত হয়নি এই বাক্যটি, “বাঙালি মানেই বেরিয়ে পড়া”, ঠিক যেভাবে বসন্তের আগমনে সত্যবতী অকারণেই খুশি হয়ে উঠেছিল, আবদার করেছিল স্বামী বেড়াতে যাবে, তেমনই বেরিয়ে পড়া মানে চিরকালই বাঙালির কাছে আনন্দ। যা অধিকাংশক্ষেত্রেই অর্থহীন আনন্দ, অকারণ আনন্দ।

২.৪ বাঙালির খাওয়াদাওয়া

ভ্রমণ এবং সুখাদ্যের কথা একসঙ্গে মনে পড়লে, পুনরায় স্মরণাপন্ন হতে হয় 'কচি-সংসদ্' গল্পটির। যদিও বাংলা সাহিত্যে এই উদাহরণ বিরল নয়, তবু, এই গল্পের বাক্যগুলি কিছু অতিরিক্ত উপযুক্ত মনে হয় এই প্রসঙ্গে।

প্রকৃতি এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তনের ছবিটি এখানে মহামূল্যবান ভাষায় প্রকাশিত। অনতিদূরে সামান্য শীতের সম্ভাবনায় লেপ-কাঁথা শুকোতে দেওয়া, পটল ইত্যাদি গরমের সবজির দাম বৃদ্ধি এবিং বাজারে ফুলকপির আবির্ভাবে মিশে থাকে আসন্ন শরতের আগমনবার্তা। এবং শরৎ কেবল প্রকৃতিতেই আসে না, বিপুল উদ্যমে এসে পড়ে বাঙালির মনে। এমনকি বাড়ির কনিষ্ঠতম সদস্যের মাথায়ও এই সময়ে চেপে বসে রেলগাড়ির ভূত, কু ঝিকঝিক ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গৃহকোণ, পড়ায় মন বসা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে হাতে উঠে আসে টাইম টেবিল এবং পুজোর ছুটিতে পল্লীসংস্কার ইত্যাদি মহৎ কাজ নয়, পদব্রজ, গরুর গাড়ি, নৌকা, জাহাজ এসব কিচ্ছু না, যানের রাজা রেলগাড়িতে, আরও বিশেষ করে বলতে গেলে রেলগাড়ির রাজা ই. আই. আর (ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে)-এ চড়ে বেড়াতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এর পরের অংশটি লেখকের ভাষায় উদ্ধৃত করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

> বাংলার নদ-নদী, ঝোপ-ঝাড়, পল্লীকুটীরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানাপুকুর হইতে উত্থিত জুঁই ফুলের গন্ধ-এসব অতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পঞ্জাব মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়, নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম, পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম, পুরী-কচৌড়ি, রোটি-কাবাব, dinner sir at Shikohabad? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু-পাশে আখের খেত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুন্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকান্ড প্রান্তর অনতিদূরের শ্যামায়মান অরণ্যানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, হঠাৎ জানলা দিয়া এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তার পর সন্ধ্যা- পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কী খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী- তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহালক্কড়ে চাকার ঠোক্করে

জিঞ্জিরডান্ডার ঝঞ্চনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে-আমি চিতপাত হইয়া তান্ডব নাচিতেছি। হমীন অস্ত, ওআ হমীন অস্ত্![৩০]

সুখাদ্য এবং সু-ভ্রমণের সম্ভাবনায় চিতপাৎ হয়ে তান্ডব নাচার বিষয়টি অতীব মনোগ্রাহী।

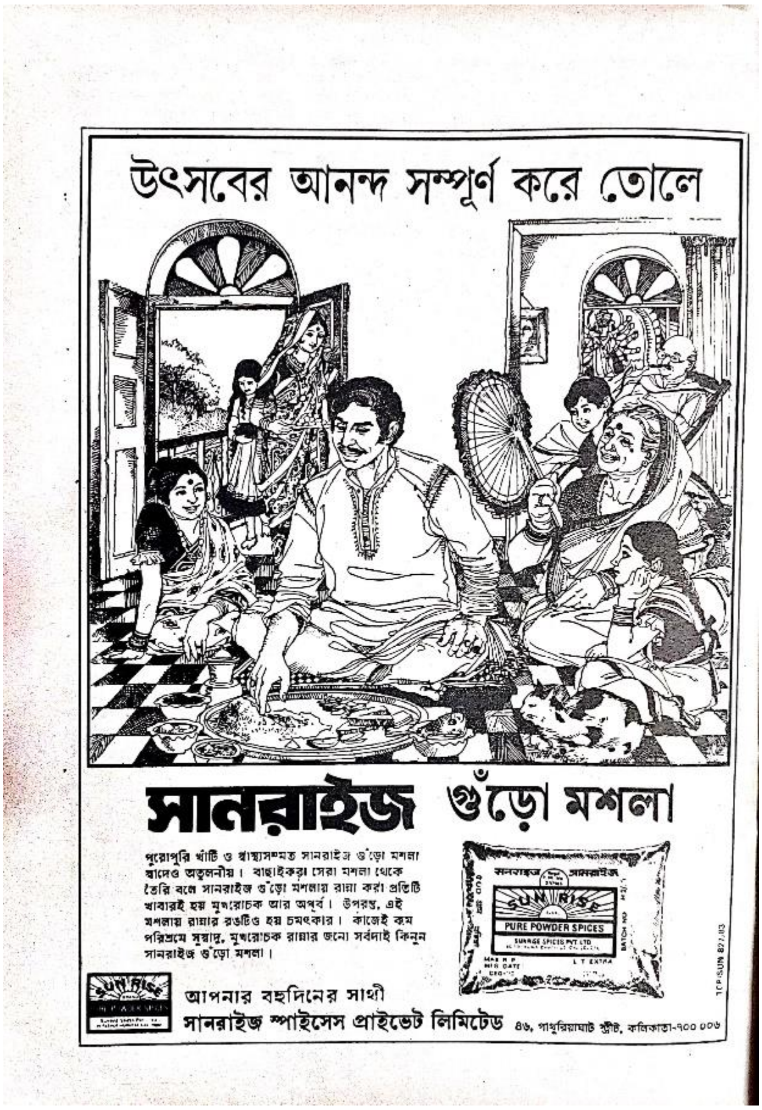

চিত্র ২.২২ শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৩৯১

বাঙালির প্রিয় খাদ্য তালিকার একেবারে শীর্ষে যদি কয়েকটি নাম রাখা যায়, সেগুলির মধ্যে অবধারিতভাবে ভাত, মাছ, মিষ্টি এই খাদ্যগুলি থাকবে। 'মাছের নামে গাছও হাঁ করে' অথবা 'মাছে-ভাতে বাঙালি' প্রবাদগুলি বহুকাল আগে যেমন সত্য ছিল, বাঙালিদের ক্ষেত্রে আজও তাই। তবে সব ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু বাঙালির পরিচিতির সঙ্গে এই খাদ্যগুলির সম্পর্ককে আজ একবিংশ শতাব্দীতে, বহুবিধ দেশি-বিদেশি আকর্ষণীয় খাদ্যের ভিড়েও অস্বীকার করা যায় না।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর *মাছ আর বাঙালি* বইতে জানাচ্ছেন ইংরেজ বা জাপানিরা একদিনে যত মাছ খান, বাঙালিরা তার অতি সামান্য অংশও খেতে পারেন না, এবং তা দারিদ্রের কারণে। এছাড়াও বাঙালিদের জনসংখ্যার অনুপাতে মাছের সরবরাহও খুব বেশি নয়। তবে এই দুর্দশা অবশ্য পূর্বকালে এমন তীব্রভাবে ছিল না। কেবলমাত্র জীবিতেরই এই একনিষ্ঠ মৎস্যপ্রীতি নয়, বাঙালি ভূত-পেত্নিরাও গভীর মৎস্যপ্রেমী।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত আরও বলছেন-

আমি অন্তত অবাক হতাম না যদি ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী (কে তিনি ছিলেন নারী না পুরুষ?) অন্নদার কাছে বর চাইতেন যে 'দুধে ভাতে' নয় 'আমার সন্তান যেঁ থাকে মাছে ভাতে'। এই কথা শুনে অনেকে হয়ত হাঁ হাঁ করে উঠে বলবেন; 'আরে এ আবার কী কথা?' ঈশ্বরী পাটনী 'দুধে ভাতে' বলেছিলেন কারণ তা প্রাচুর্য, শ্রী আর শান্তির প্রতীক। এর জবাবে আমি বলবো মাছে ভাত এ সব ছাড়াও বাঙালি জীবনেরও প্রতীক। আরও একটা কথা। সন্তান বলতে কন্যাও বোঝায়। তাই 'মাছে ভাতে' বললে মেয়ের বৈধব্য যাতে না হয় তারও কামনা থেকে যায়।[৩১]

পূর্বে ব্যবহৃত সানরাইজের বিজ্ঞাপনটিতে দেখতে পাওয়া যায় বাড়ির জামাইকে ঘিরে পরিবারের সব মহিলাদের ভীড় করে আদর-যত্নের ছবিটি। ছবির মধ্যে ফুটে ওঠে একটি কাহিনি, পাঠকের কল্পনাশক্তির উপরে ছেড়ে রাখা হয় বাকিটা। হয়তো পুজোর দিন। দূরে ঠাকুরদালানে রয়েছেন প্রতিমা। পরিবারের মাতৃস্থানীয়ারা কেউ পাশে বসে জামাতার খাওয়া-দাওয়া তদারক করছেন, অপরজন করছেন হাতপাখা। দূরে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে এ বাড়ির মেয়েটি, স্বামীর সামনে সরাসরি এসে বসতে তার লজ্জা করে এখনো। বাড়ির শিশুরাও খেলে বেড়াচ্ছে। আর পাতের পাশে বাড়ির মেনি বেড়ালটি বসে আছে ওঁত পেতে, কারণ জামাতার পাতে পড়েছে বিশাল মাছের মুড়ো। পাতেও বেশ কিছু ভাজা মাছের টুকরো দেখা যায়। বাঙালির 'উৎসবের আনন্দ সম্পূর্ণ করে তোলে' মাছ-ভাত। হাজার বছর ধরে। সব মিলিয়ে বিজ্ঞাপনের ছবিটিতে একাধিক বাঙালিয়ানার চিহ্ন স্পষ্ট।

এই তো গেল মাছের কথা। বাঙালি তাঁর নিজস্ব খাদ্যরুচিকে বেড়াতে এলেও পরিবর্তন করতে পারেন না, স্বস্তিদায়ক খাদ্যের অভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও ম্লান হয়ে আসে, সে কথা তো ডালডার বিজ্ঞাপনে আগেই দেখা গেছে।

বাঙালির কাছে মিষ্টান্ন কেবলমাত্র খাদ্য নয়, তা শিল্পবিশেষ। মিলন দত্ত তাঁর বই *বাঙালির খাদ্যকোষ* এ জানাচ্ছেন বাঙালির আরও বিবিধ বিষয়ের মত মিষ্টান্নের কোনও ইতিহাস তৈরি হয়নি। প্রাচীন কালে মিষ্টির তেমন বৈশিষ্ট্যও ছিল না, খাজা, মোয়া, নাড়ু, পিঠে কদমা, পায়েস ইত্যাদি কিছু মিষ্টি ছিল বটে, কিন্তু ক্ষীর বা ছানার মিষ্টির তেমন প্রচলন ছিল না। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ অসংখ্য খাদ্যের বর্ণনা থাকলেও মিষ্টান্নের তেমন বৈচিত্র পাওয়া যায় না। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতেও তাই। এর থেকেই অনুমাণ করা যায়, ক্ষীর, ছানা, ঘি ইত্যাদি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হলেও শিল্পীরা তার থেকে বিচিত্র স্বাদ, বর্ণ,গন্ধের মিষ্টি তৈরি করতে পারেননি।

মিলন দত্ত লিখছেন,

বাঙালি ময়রা বা মোদকরা নতুন নতুন মিষ্টি আবিষ্কারে এক আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সারা দেশে যখন ক্ষীরই মিষ্টি তৈরির একমাত্র উপাদান, বাঙালি তখন ছানাকে মিষ্টি তৈরির উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে। ছানা থেকেই সব আশ্চর্য সন্দেশ আর বাঙালির জাতি পরিচয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যাওয়া রসগোল্লা তৈরি হয়েছে।[৩২]

হুগলি, বর্ধমান, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, রাজহাটি, বিষ্ণুপুর, বহরমপুর ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মিষ্টি প্রসিদ্ধ হয়েছে। এবং প্রসিদ্ধ হয়েছে কলকাতা। কলকাতায় বিভিন্ন মিষ্টি খ্যাতি পেয়েছে মিষ্টির দোকানের নামে। ভীম নাগ, কেসি দাস, সেন মহাশয়ের নাম বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

চিত্র ২.২৩ বার্ষিক শিশুসাথী, ১৩৭০

উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যুগে কলকাতা কিছু বিখ্যাত মিষ্টির জন্মমুহূর্তের সাক্ষী থেকেছে। তৈরি হয়েছে অতিপ্রসিদ্ধ বহু মিষ্টির দোকান। ছানার থেকে সুস্বাদু মিষ্টি তৈরির জাদুকর ছিলেন তাঁরাই। হুগলির জনাই থেকে কলকাতায় আসেন পরাণ চন্দ্র নাগ, 'ভীম নাগ'-এর তৎকালীন ছোট্ট মিষ্টির দোকান তৈরি হয়, ১৮২৬ সালে বৌবাজার এলাকায়। সন্দেশ আর লেডিকেনিতে ভীম নাগের নাম হয় খুব। সে সময়ের কলকাতার বিখ্যাত মানুষরা সেই দোকানের নিয়মিত খরিদ্দার ছিলেন। বিজ্ঞাপনের ছবিটিতেও দেখা যায় ননীচোরা

কৃষ্ণ-বলরামকে। যদিও কৃষ্ণকে কিছুতেই 'বাঙালি' বলা যায় না, তবুও এই ছবিটি আঁকা হয়েছে শিল্পী যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২)-এর আঁকা ছবির আদলে। তাই ছবিটিতেও এসেছে বাঙালিয়ানার উষ্ণতা।

সন্দেশের পরে রসের মিষ্টির সেই ঊষাকাল, ১৮৬৮তে বাগবাজারের নবীন দাশ রসগোল্লা তৈরি করে ফেললেন। বয়স তখন তার বাইশ তেইশ। বাগবাজার এলাকায় ছিল তার বাড়ি। নবীন চন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র রসমালাই আবিষ্কার করে বাঙালি মহলে সাড়া ফেলে দিলেন। এই কেসি দাস ই ১৯৩০ সালে কলকাতার জোড়সাঁকোতে তাঁর নিজের নামে মিষ্টির দোকান খুললেন।

কলকাতার তিনশো বছরের জন্মদিনে *অ্যান ইকনমিক টাইমস* এর পক্ষ থেকে কলকাতা বিষয়ক বিভিন্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ লেখা মিলিয়ে যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা *Sweet Tales of Calcutta* বইটির থেকে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।[৩৩]

বিজ্ঞাপনের সুবাদে আরেকবার এই দাশ পরিবারের ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। বিজ্ঞাপনেও ধরা পড়েছে বাংলার ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রসঙ্গগুলি। যে কথা অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় বা মিলন দত্ত বলেছেন, সেই কথাই বিজ্ঞাপনের কপিতেও লেখা হচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ভারতের নবজাগরণের যুগ। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষীর আবির্ভাব এই সময়েই। তাঁরা এই দেশের ইতিহাসকে, সেখানকার মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। যে প্রভাব আজও ঘিরে আছে এ দেশের মানুষকে। বাঙালি জীবনের আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে এই শতাব্দীতেই।

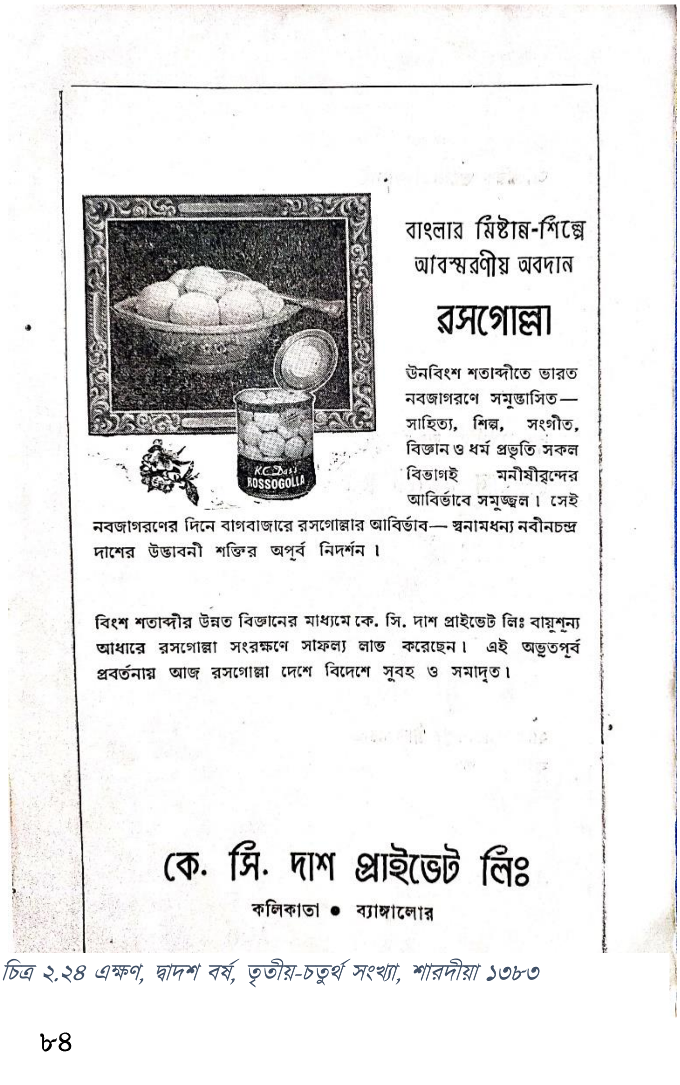

চিত্র ২.২৪ এক্ষণ, দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, শারদীয়া ১৩৮৩

নবীনচন্দ্র দাশের অপূর্ব আবিষ্কার এ দেশের মানুষের স্বাদগ্রন্থিগুলিতে নবজাগরণ ঘটালো। আবির্ভাব হল রসগোল্লার।

বাঙালি জীবনের সঙ্গে এই পরম রমণীয় খাদ্যটির সু-সম্পর্কের চিহ্ন স্বরূপ এই বিজ্ঞাপনকে ব্যবহার করা হল। নানান সামাজিক কু-সংস্কার এবং জড়তাকে ভেঙে আলোর পথে অগ্রগতিই নবজাগরণ হয়, তবে রসনাকে জাগিয়ে তোলার কাজটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

একদা, একশো বছরের বেশি আগে নবীনচন্দ্র দাশকে (১২৫২ বঙ্গাব্দ-১৩৩২ বঙ্গাব্দ) নিয়ে একটি ছড়া প্রচলিত ছিল, প্রথম দোকানটি ছিল বাগবাজারে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে। ছড়াটি ছিল এরকম- "বাগবাজারের নবীন দাশ/রসগোল্লার কলম্বাস"। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনেই এই ছড়া চোখে পড়েছে। মিষ্টান্ন-জগতের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য মিলে আছে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গেও। বিংশ শতাব্দীর আটের দশকের বিজ্ঞাপনেও এই তথ্যগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই নবীনচন্দ্র দাশের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন কৃষ্ণ চন্দ্র দাশ (১৮৬৯-১৯৩৪), আপামর বাঙালির হৃদয়ে যিনি কে. সি. দাশ হয়ে জেগে রয়েছেন। রসগোল্লার পরে তিনি মিষ্টির জগতে দ্বিতীয় বিপ্লবটি ঘটালেন রসমালাই আবিষ্কার করে, সে কথা পূর্বেই জানা হয়েছে।

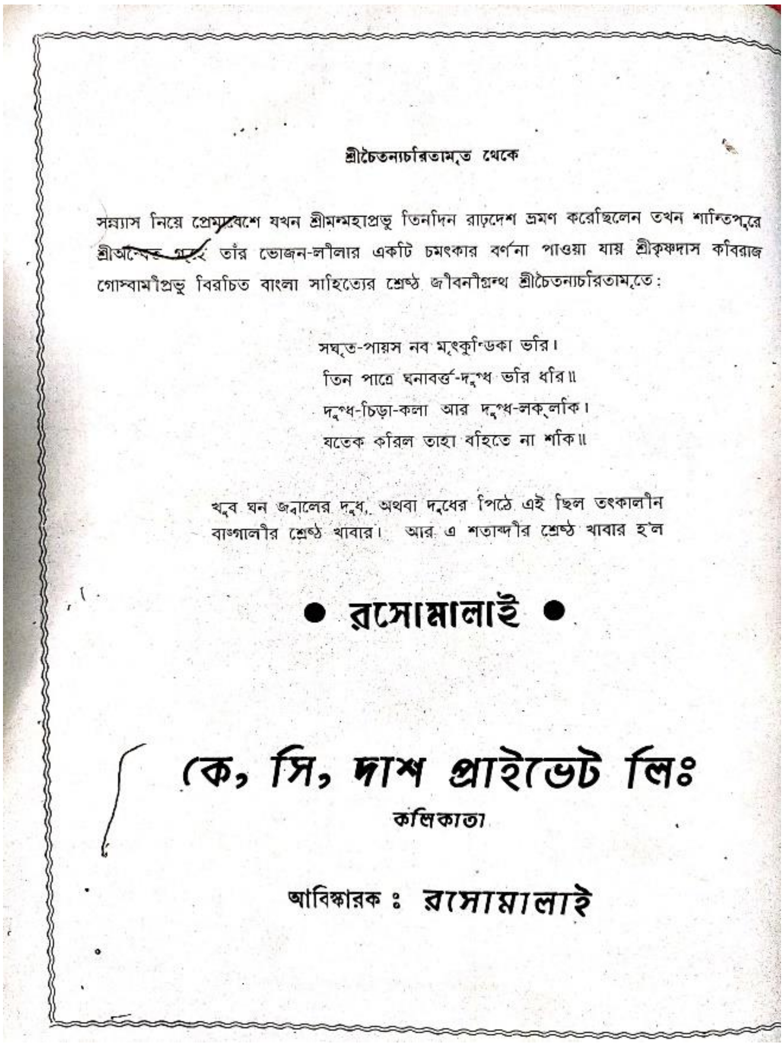

চিত্র ২.২৫ সুন্দরম্, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৬৬

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে *সুন্দরম্* পত্রিকায় প্রাপ্ত বিজ্ঞাপনটিতে দেখা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*র[৩৪] কিছু অংশ। মহাপ্রভু সেসময়ে রাঢ়দেশে ভ্রমণকালে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে গেলে তাঁকে যে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হয়, তা ছিল ঘন দুধে প্রস্তুত একপ্রকার সুখাদ্য। তবে সেসময় বাঙালির শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্নের মধ্যে পায়েস, পিঠে ইত্যাদিই ছিল সর্বোচ্চ স্থানে। সময়ের পরিবর্তনে বাঙালির স্বাদকোরকগুলিকে আরও তৃপ্তি দিতে আবিষ্কার হয়েছে ‘রসোমালাই’।

লক্ষ্যণীয়, মিষ্টির বিজ্ঞাপনে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপিত মিষ্টির বৈশিষ্ট্যই ব্যাখ্যা করা হয়নি। একালের সঙ্গে সেকালকে মিলিয়ে দেওয়ার এই পদ্ধতি অভিনব নিঃসন্দেহে। এবং সেই মেলবন্ধনের কাজটি করা হয়েছে একটি শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীগ্রন্থকে অবলম্বন করে। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালির আবেগের স্থানগুলিকে খুব নিপুণভাবে চিহ্নিত করতে পারলে তবেই এই বিজ্ঞাপন তৈরি করা সম্ভব, যাতে গ্রন্থিগুলিতে টান পড়ে সঠিকভাবে।

কে সি দাশের এমন অজস্র, বৈচিত্র্যময় চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন একদা আলো করে থাকতো তৎকালীন সংবাদ, সাময়িকপত্রের পাতা। বিজ্ঞাপনগুলি যে বিশেষভাবে বাঙালি পাঠককে উদ্দেশ্য করে তৈরি, সে কথা বলা বাহুল্য।

বাঙালির স্বাদগ্রন্থি বৈচিত্র্যময়। কখনো বহু মশলার সম্মিলনে, কখনো বা অতি সামান্য মশলায়, কখনো মাছ-মাংস ইত্যাদি নানান উপকরণ সহযোগে, কখনো নিতান্ত সহজপ্রাপ্য সবজিতে রন্ধনের পদ্ধতি বদলে বদলে বাঙালি বধূদের হাতে জন্ম হয়েছে অসামান্য সব সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের। এই দেশেরই অন্যান্য প্রদেশগুলিতে দেখা গেছে হাতে গোনা একটি বা দুটি মশলাই দখল করে রয়েছে প্রতিটি রান্নার প্রধান উপকরণ। বাংলায় কিন্তু তা হয়নি। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে খাদ্যের লোভনীয় সব বিবরণ। হয়তো কখনো সেসব খাবার অতীব সাধারণ, গরীব ঘরেও জুটে যেতো। তবু বর্ণনার গুণে তা অনন্য হয়ে উঠেছে। তেমনই কয়েকটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে কন্যা দুর্গার জন্য সর্বজয়ার নীরেনকে পাত্র হিসাবে পছন্দ হয়। নীরেন ধনী পরিবারের সন্তান, তবু তার বিনয়ী আচরণ এবং অপু-দুর্গার প্রতি স্নেহভাব সর্বজয়াকে এই ভাবনা ভাবতে খানিক সাহস সঞ্চার করে। মধুসংক্রান্তি ব্রতের দিন নীরেনের নিমন্ত্রণ হয় তাদের বাড়িতে। সামাজিক অবস্থানগতভাবে হরিহরের পরিবার শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত হলেও, অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের অতিশয় দারিদ্রের কারণে বেশি কিছু আয়োজন সম্ভব হয়নি।

> মোটা চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, ডুমুরের সুক্তনি, থোড়ের ঘন্ট, চিংড়ি মাছের ঝোল, কলার বড়া ও পায়েস।[৩৫]

যদিও এই খাদ্যতালিকায় চিংড়ি মাছ ছাড়া আর তেমন কোনও মাছ নেই এবং খাবারগুলি অতি সাধারণ, তবু এসব খাবার যে একান্তভাবেই বাঙালি এবং রান্নার গুণে সুস্বাদু হয়ে উঠতে পারে, তা বুঝতে বাকি থাকে না। রান্নায় আজকের দিনের মতন সাদা তেলে বা 'রিফাইন্ড অয়েল' এর পরিবর্তে ঘি অথবা ঝাঁঝালো ঘানি-নির্গত সর্ষের তেলই ব্যবহৃত হত। শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি বাঙালির ঔদাসীন্য একদা ছিল চোখে পড়ার মতন। যতদিন প্রাণ আছে ততদিন ভালো খেয়ে-পরে বাঁচার পক্ষপাতী ছিলেন তারা। অতঃপর নিরামিষ পোলাও থেকে আমিষ নানান লোভনীয় পদ, সাধারণ সবজির তরকারি থেকে শুক্তো; সবকিছুতে ঘি ছিল অন্যতম প্রধান উপাদান। যদিও এই ঘি কেবলমাত্র বাঙালিদেরই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। সারা মহাদেশ জুড়েই বাড়িতে ঘি তৈরি করা হয়ে থাকে। আহারের প্রথম পাতে সাদা ভাতে ঘি, এবং সঙ্গে যদি শাকভাজা বা একটু আলুভাজা জুটে যায়, তাহলে সে খাবার কিছু বেশিই লোভনীয় হয়ে ওঠে বাঙালির কাছে। বাংলা সাহিত্য জুড়ে এই ঘি এর গুণকীর্তনও ছড়িয়ে রয়েছে।

রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের *কুলীনকুলসর্বস্ব*, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর *শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত* অথবা বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাসের *মনসামঙ্গল*-এ ছড়িয়ে আছে ঘৃতপক্ক নানান খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা।[৩৬] সেই ঘি'এর একটি বিজ্ঞাপন এইখানে দেওয়া হল।

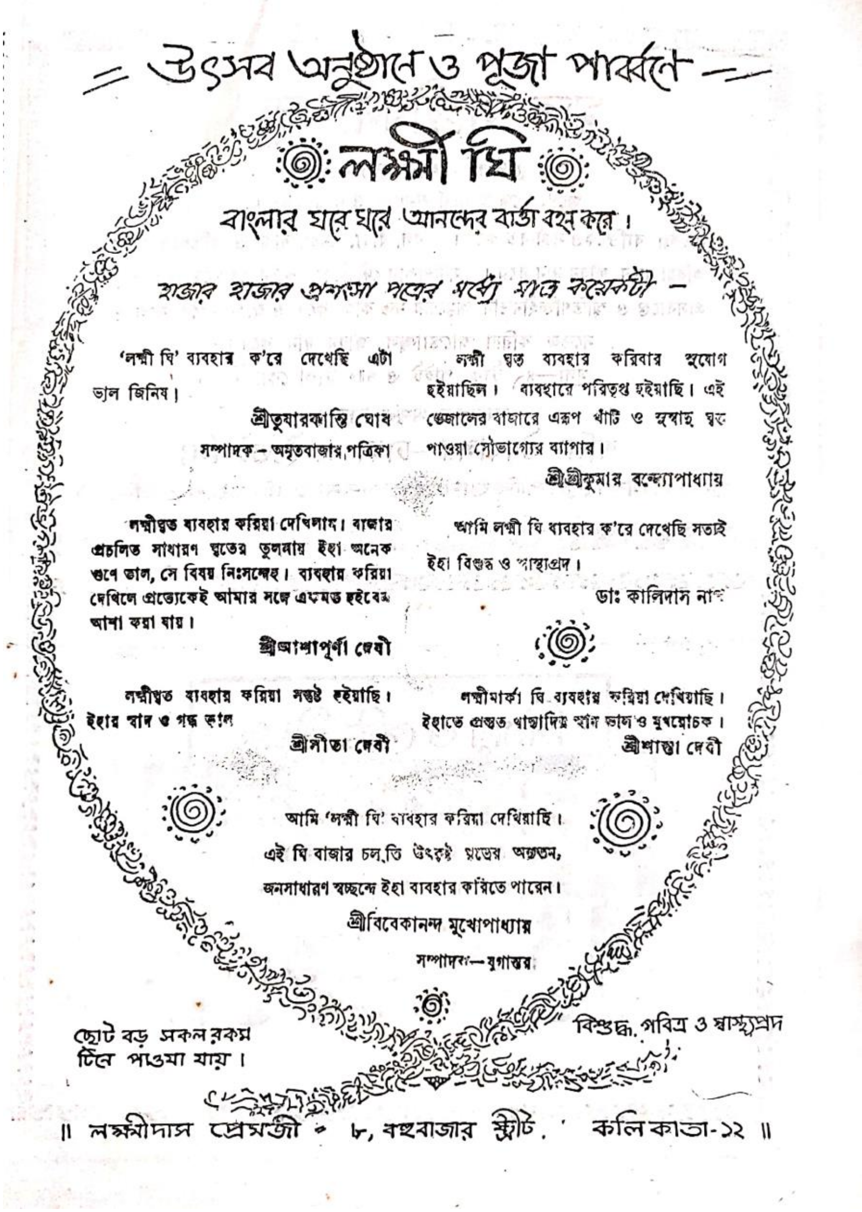

চিত্র ২.২৬ কবিতা, অষ্টাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ ১৩৬০

বাঙালির সুখাদ্যের সঙ্গে উৎসবের নিবিড় যোগের চিহ্ন রয়েছে বহু বিজ্ঞাপনে। এটিও তারই মধ্যে একটি। "বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বার্ত্তা বহন করে" যে 'লক্ষ্মী ঘি', তার বিজ্ঞাপনটিও হয় আলপনা দেওয়া। বাংলার ঘরে ঘরে মহিলারা পরিবারের সুখ, সমৃদ্ধি, মঙ্গলকামনায় যে লক্ষ্মীর পুজো করে এসেছেন, সেই পুজোতে যেমন আলপনা দিতেন তাঁরা নিকোনো উঠোন অথবা ঘরের চৌকাঠ, দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে; তেমনি আলপনা দেওয়া থাকে বিজ্ঞাপনের পাতা জুড়ে। খুব নিপুণ হস্তের নয় হয়তো, তবে তার মধ্যে মিশে থাকে আন্তরিকতার ছাপ। আর ভিতরে থাকে এই ঘি'এর কয়েকটি প্রশংসা পত্র। "হাজার হাজার প্রশংসা পত্রের মধ্যে" যে কয়খানি বেছে নেন তাঁরা, সেগুলি হল *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, *যুগান্তর*-এর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী প্রমুখের উচ্চ প্রশংসা-বার্তা। *কবিতা* পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞাপনটি গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি দেখে বোঝা যায় একধরনের বিশেষ বাঙালিকে উদ্দেশ্য করেই বিজ্ঞাপনটি তৈরি হয়েছে, যে বাঙালি একটু মনোযোগী পাঠক। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতামত বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়েছে অজস্র সময়ে। তবে এই বিজ্ঞাপনে যে সাহিত্যিক, সমালোচকদের মতামত প্রকাশ করা হয়েছে, তাঁরা জনপ্রিয়তার নিরিখে ঠিক পূর্বোক্তদের মতন নন। এর থেকে ধারণা করা যায় সাহিত্যের বেশ গভীরে ঢুকে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, সেই বাঙালির সংখ্যাও সে সময়ে নিতান্ত কম ছিল না। এবং 'লক্ষ্মী ঘি'-এর তাঁদের প্রতি আস্থা আছে বলেই তৈরি হয়েছে এই বিজ্ঞাপন।

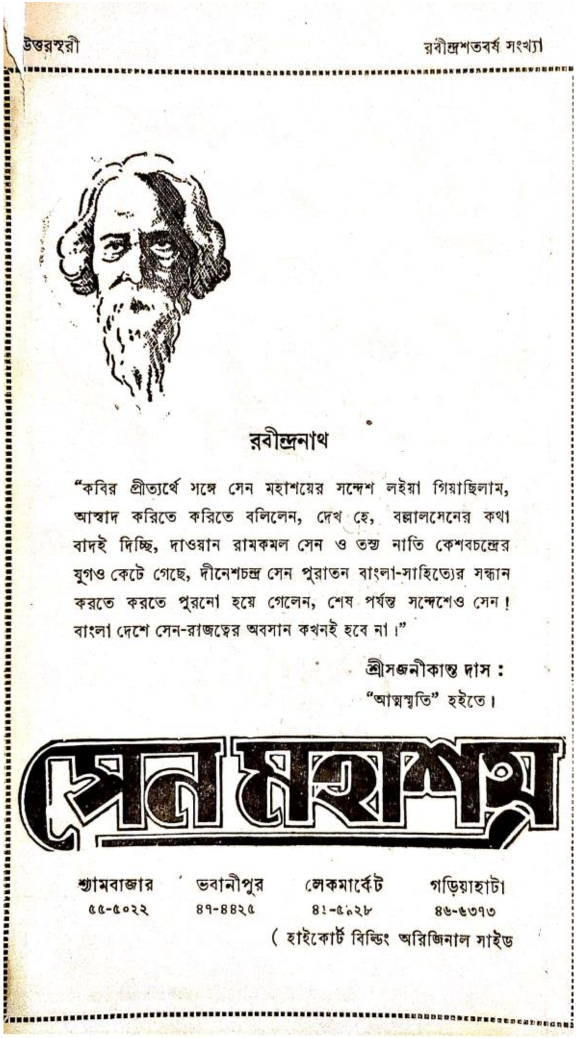

চিত্র ২.২৭ উত্তরসূরী, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬৭-৬৮

যদিও মিষ্টির বিজ্ঞাপন নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে, তবু আরেকটি বিজ্ঞাপন এখানে দিতেই হচ্ছে। বিজ্ঞাপনটি 'সেন মহাশয়'-এর মিষ্টির দোকানের। সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি'র একটি অংশ ব্যবহার

করা হয়েছে বিজ্ঞাপনে। সেন মহাশয়ের মিষ্টি খেয়ে কবির মনে পড়ে যায় বল্লাল সেন থেকে দীনেশচন্দ্র সেন পর্যন্ত বাংলার সুদীর্ঘ 'সেন' ঐতিহ্যের কথা। রাজত্ব থেকে সাহিত্য সর্বত্র একদা 'সেন'রা বিচরণ করেছেন, বর্তমানে এসেছে সন্দেশেও 'সেন' যুগ, যাতে বাংলার 'সেন' রাজত্বের কখনো অবসান না হয়।

২.৫ বিজ্ঞাপনে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাব

বিজ্ঞাপনের মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে সজনীকান্ত দাসের আত্মজীবনীর অংশ। আজকের পাঠক হিসাবে এই দৃশ্য সবচাইতে বিস্ময়ের।

বিজ্ঞাপনে শাহ্‌রুখ খান, ক্যাটরিনা কাইফ ইত্যাদির ছবি ব্যবহার করা হয়, তার কারণ এই সব চলচ্চিত্রাভিনেতা, মডেলরা দৃশ্যত অতীব গ্রহণযোগ্য প্রায় সারা দেশের লোকের কাছে। সর্বসাধারণের কাছে এই সব 'সেলিব্রিটি'দের গ্রহণযোগ্যতা আছে নিঃসন্দেহে। ফলে এইটুকু পুনরায় ধারণা করা যেতে পারে যে একটা সময় এমন ছিল, যেখানে রবীন্দ্রনাথ থেকে সীতা দেবী অথবা সজনীকান্ত অথবা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বাঙালি মধ্যবিত্ত ক্রেতার কাছে এঁদেরও একপ্রকার সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

এই গ্রহণযোগ্যতা বিংশ শতাব্দীর আটের দশক পর্যন্ত বজায় ছিল খেয়াল করা যায়। বহু উদাহরণের মধ্যে থেকে সেরকম একটি-দুটি উদাহরণ দেওয়া ব্যবহার করা যাক।

চিত্র ২.২৮ দেশ, শারদীয়া, ১৩৯০

একটি হল ১৩৯০ বঙ্গাব্দের শারদীয়া *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত ক্যাপস্টান সিগারেটের বিজ্ঞাপন। সিগারেট কোম্পানিগুলির প্রধান লক্ষ্য চিরকালই মূলত দেশের যুবকদের আকৃষ্ট করা। সেই সব কোম্পানিও মধ্যবয়সী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ও তাঁর মতামত ব্যবহার করেছে তাদের বিজ্ঞাপনে। আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত, সংস্কৃতিবান বাঙালিরই নয়, সমগ্র বাঙালির একজন প্রতিনিধিস্থানীয় মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

ব্রিটানিয়া কোম্পানির ‘থিন অ্যারারুট’ বিস্কুট কেবলমাত্র সংস্কৃতিবান, শহুরে বাঙালিদের কফির সঙ্গে নিরালায় সাহিত্যচর্চা করতে করতে খাবার বিস্কুট নয়। এই বিস্কুটের বিশেষ করে কোনও নাগরিক টার্গেট ক্রেতা নেই। সেই বিস্কুট কোম্পানি যখন তার বিজ্ঞাপনে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীতানুষ্ঠান-দৃশ্যের ছবি ব্যবহার করে, তার থেকে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না সাহিত্য-সংস্কৃতিকে এড়িয়ে সমগ্র বাঙালির রূপরেখাটা হয়তো নির্মাণ করা যেত না।

চিত্র ২.২৯ দেশ, ৪ নভেম্বর, ১৯৮৯

এই ধরনের বিজ্ঞাপন নয়ের দশক থেকে কমতে কমতে সাহিত্যিকদের বিজ্ঞাপনের মুখ হওয়া প্রায় শূন্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে। যদিও কোনও কোনও সমসাময়িক কবি বা গায়ক, বিশেষত যাঁরা বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমগুলিতে তঁদের জনপ্রিয়তা তৈরি করতে পেরেছেন, পেয়েছেন প্রচুর অনুসরণকারী; তাঁদেরকে কালেভদ্রে বিজ্ঞাপনে আজও দেখা যায়।

সেসময়কার বাঙালি মধ্যবিত্তের রুচিকে বুঝতে সাহায্য করে এই বিজ্ঞাপনগুলি। সেই পরিস্থিতি এখন পরিবর্তিত। সাহিত্য এখন সমগ্র বাঙালি সমাজের খুবই সংকীর্ণ এক কোণঠাসা অংশ। সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশের চর্চা, বোধ বা ভাবনাচিন্তার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। যে সমস্ত বইয়ের চলচ্চিত্রায়ণ হয়, সেই সব বইয়ের কখনো সাময়িক বা খুব অল্প ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী জনপ্রিয়তা থাকে। ফেলুদা, ব্যোমকেশের সমাদর আজও বাঙালি সমাজে কমেনি, কারণ ওইসব উপন্যাস নিয়ে সিনেমা হয়েছে। তা না হলে বাংলা সাহিত্য যে শেষপর্যন্ত বাঙালির রুচি-নির্মাণের জায়গা থেকে অনেকদিন তার পূর্বপদ হারিয়েছে, সেকথা আজকের বিজ্ঞাপন দেখলেই বোঝা যায়। এক সময় পর্যন্ত বিজ্ঞাপন দেখলেই আঁচ করতে অসুবিধা হত না, বাঙালি রুচির কোন জায়গায় ছিল সাহিত্যের স্থান।

বিজ্ঞাপনে সাহিত্য বিষয়টির সঙ্গে কলকাতা শহর, দুর্গোৎসব ইত্যাদি আরও কয়েকটি সুতীব্র বাঙালি বিষয় যুক্ত হয়ে আছে। যেমন খাদ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সাহিত্য, সাহিত্যের সঙ্গে ভ্রমণ।

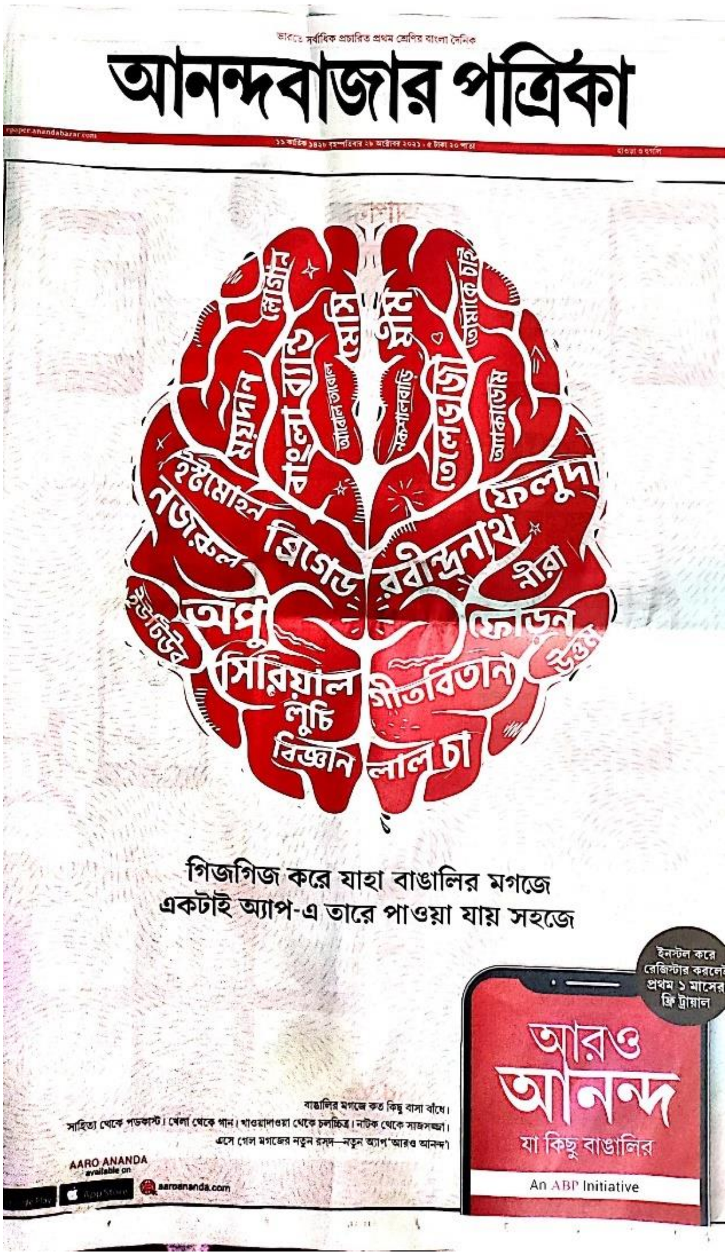

চিত্র ২.৩০ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ অক্টোবর, ২০২১

আনন্দবাজার পত্রিকায় সদ্য প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটিতে "যা কিছু বাঙালির" দাবি করে দেওয়া হয়েছে বাঙালির মগজের ছবিখানি। বিজ্ঞাপনটি আনন্দ গ্রুপের একটি 'অ্যাপ'-এর। সেই মগজে খোপে খোপে ভাগ করা আছে সেইসব বস্তু যা নাকি বাঙালির মগজে গিজগিজ করে। 'ইউটিউব', 'লুচি' অথবা 'সিরিয়াল'-এর সঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ', 'অপু', 'নজরুল', 'ফেলুদা', 'গীতবিতান', 'নীরা', 'উত্তম' ইত্যাদিরা একবিংশ শতকে 'ব্র্যান্ড'-এ পরিণত হওয়ায়; টেলিভিশনের পর্দা এবং গণমাধ্যমগুলিতে যথেষ্ট জনপ্রিয় হওয়ায়, এমনকি বহুক্ষেত্রে তাঁদের লেখা গান, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য 'সিরিয়াল'-এ যথেষ্ট আলোড়ন তুলে দেওয়ায় আজও "বাঙালির মগজে" জায়গা মিলে যায় ওঁদের।

কিন্তু এ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত, গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়ে যায় "বাঙালির মগজ" থেকে।

এই চিত্রটি সবসময় এমন ছিল না।

লেখক অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬)-এর জন্ম হয় পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) বরিশালের অন্তর্গত ভোলায়। তাঁর *জীবন মৃত্যু* বই-তে লেখক জানান তাঁর সমস্ত উপন্যাসই আত্মজীবনীমূলক। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস *একদা ট্রেনে*। লেখকের ১৯৬০ সালের ২৬ ডিসেম্বরের ডায়েরি থেকে জানা যায় কলকাতার খুব কাছে, তাঁর বড়দির শ্বশুরবাড়ির ভিটে ধপধপিতে পরিবারে সকলে মিলে একবার পিকনিক করতে যান। সেই পিকনিক খুব জমকালো হয়েছিল। সকালের ট্রেনে গিয়ে, ফেরা হয় ট্রেনে। সেই স্মৃতিই বর্ণিত হয় উপন্যাসে।[৩৭]

অকস্মাৎ অসীম রায় এবং তাঁর একটি বিশেষ উপন্যাসের প্রসঙ্গ উল্লেখের কারণ এবার ব্যাখ্যা করা যাক। ১৯৭৮ সালে *এক্ষণ* পত্রিকা থেকে এই বিজ্ঞাপনটি প্রাপ্ত। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার দু'বছরের মধ্যে পূর্ব রেলওয়ে অসীম রায়ের *একদা ট্রেনে* উপন্যাসের অংশবিশেষ ব্যবহার করছে বিজ্ঞাপনে। সঙ্গে থাকছে রেলস্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রীদের ছবি। উপন্যাসের কাহিনি শেষ হলে কাহিনির চরিত্রদের পথচলাও শেষ হয়। কিন্তু সেই সব অমিয়, সুবোধ, বুড়ো, বাবুনদের পথচলার আনন্দের উৎস

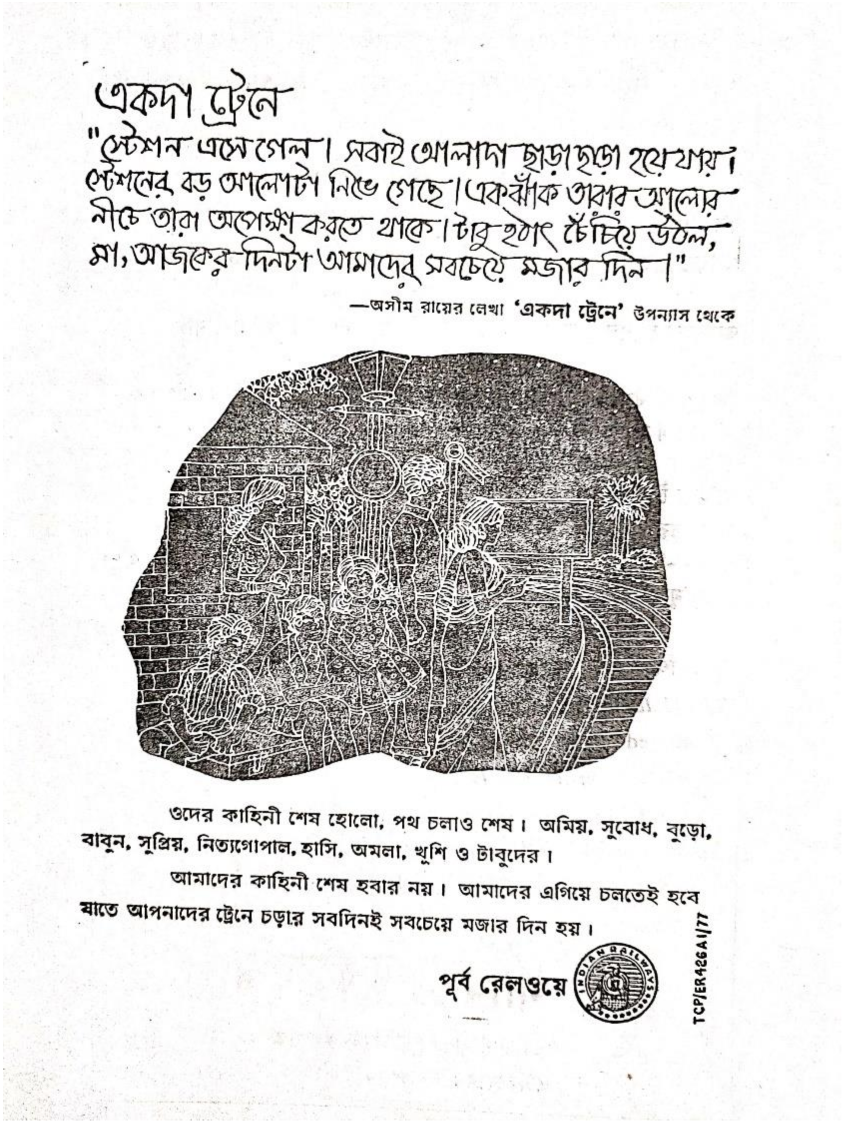

চিত্র ২.৩১ এক্ষণ, ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, জুন, ১৯৭৮

পূর্বরেলওয়ের চলা কখনো থামে না। জনসাধারণের সুবিধার্থে এগিয়ে চলাই তার লক্ষ্য, তাই জানানো হয় বিজ্ঞাপনটিতে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভাবতে বেশ অসুবিধা হয় তেমন 'জনপ্রিয়' যে লেখকরা ছিলেন না,

তাঁদের রচনাংশও কেমন অক্লেশে ব্যবহৃত হয়েছে বিজ্ঞাপনের পাতায়। তাও তা মোটেই সেই উপন্যাসের বিজ্ঞাপন নয়। রেলযাত্রা এবং তার আনন্দকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে। পাঠকদের কাছে এই কপি গ্রহণযোগ্যতা পাবে, এমন বিশ্বাস না থাকলে এমন বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হত না।

এরকম অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। রেলওয়ে সবসময়ই বিজ্ঞাপনের দিক থেকে অভিনবত্বের ছাপ রেখেছে। কিন্তু সাধারণ তেল, সাবান, লেখার কালি, চা, আইসক্রিমের বিজ্ঞাপনেও সাহিত্যের নিদর্শন রয়েছে যত্রতত্র। কফি বোর্ডের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)'র 'ফেরারী ফৌজ' কাব্যের অংশ।

একে একে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা সমীচীন।

চিত্র ২.৩২ আনন্দমেলা, ১৯ মে, ১৯৮২

বিজ্ঞাপন 'জ্যাবোরান্ডি কেশ তৈল'র। কিন্তু তারই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে দিব্যি মজার ছড়া, সঙ্গে ততোধিক মজার ছবি। সুনির্মল বসুর ছড়া "দাদুর মাথায় টাক্ ছিল/ সেই টাকে তেল মাখ্ছিল"র[৩৮] সঙ্গে মিলিয়েই যেন লেখা হয়েছে এই কবিতাখানি।

জ্যাবোরান্ডি মেখে রাবণ রাজার দশটি মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত পুনরায় মেঘের মতন ঘন কেশে ঢেকে গেলে তাঁর মুখে হাসি ফোটা স্বাভাবিক; তারই সঙ্গে যে কোনও বয়সী পাঠকের মুখে যে কোনও সময়ে হাসি ফোটানোর ক্ষমতা রাখে এই ছোট্ট চার লাইনের ছড়াটি।

এইরকম ছড়ার ব্যবহার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনেই পাওয়া যায়। কে সি দাশের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে "এলাটিং বেলাটিং সই লো/ কে সি দাশের দই লো"। বাংলার পুরোনো ছড়াকে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া হয় মিষ্টির বিজ্ঞাপনে। একদা বাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার অঙ্গ

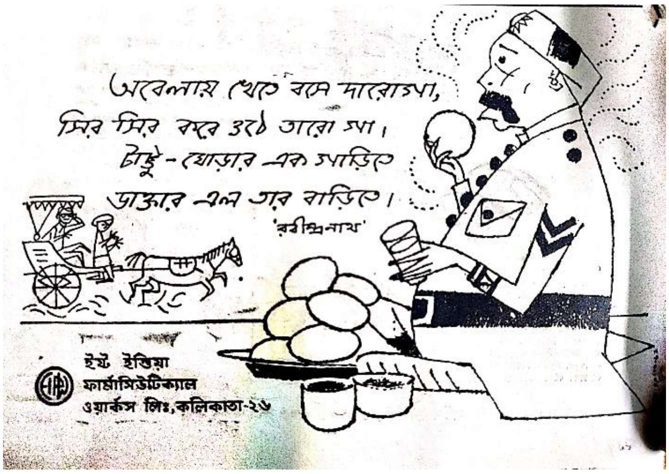

চিত্র ২.৩৩ সন্দেশ, আশ্বিন, ১৩৭০

ছিল এই ছড়াগুলি। বিজ্ঞাপন সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে যায়। এটিও ছিল গত শতাব্দীর আটের দশকের বিজ্ঞাপন।

ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল রবীন্দ্রনাথের "ছড়া"[৩৯] বইয়ের ছড়ার বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে তাদের ওষুধ কোম্পানির বিজ্ঞাপনে। "অবেলায় খেতে বসে দারোগা" অথবা "তাল ঠোকে রামধন মুনশি" ইত্যাদি নিয়ে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপন তৈরি হয়েছিল এই সিরিজে। সবকটির সঙ্গেই ছিল কার্টুনের ঢঙে আঁকা অতীব ডিটেইলযুক্ত ছবি। বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশিত হয় ছয়ের দশকের *সন্দেশ*-এ।

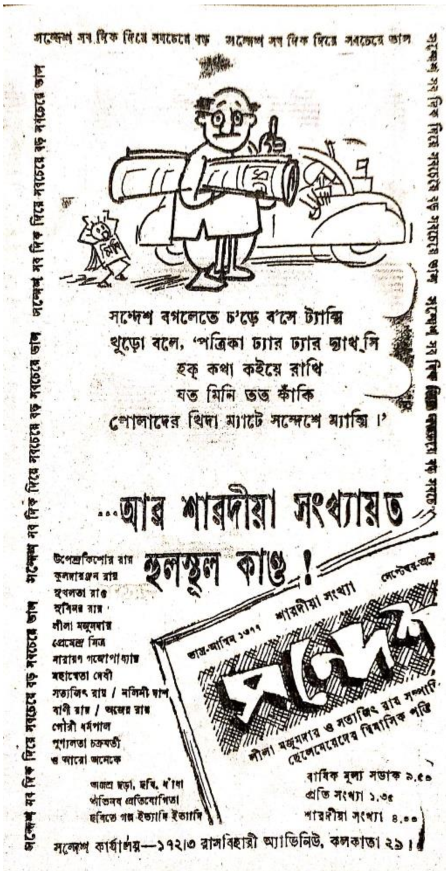

চিত্র ২.৩৪ দেশ, ৩৭ বর্ষ, ২ আশ্বিন, ১৩৭৭

আজ থেকে পাঁচ দশক আগে ১৯৭০ সালে চিরপরিচিত *সন্দেশ* তার রূপ পরিবর্তন করেছিল অদ্ভুত ভাবে। *সন্দেশ* পত্রিকার ১৪২৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় দেবাশিস গুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন-

> চিরকাল মাসে মাসে প্রকশিত হওয়া 'সন্দেশ' ১৯৭০-এর মে-জুন মাস থেকে হয়ে গেল দ্বি-মাসিক (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭)। বছরে ছ-টি সংখ্যা- এক এক ঋতুতে একটা করে। বাংলা ১৩৭৭ সনের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ১৩৭৯র ফাল্গুন চৈত্র পর্যন্ত তিন বছরে মোট আঠারোটি সংখ্যা। পত্রিকার মাপ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ১২*৯ ইঞ্চি।

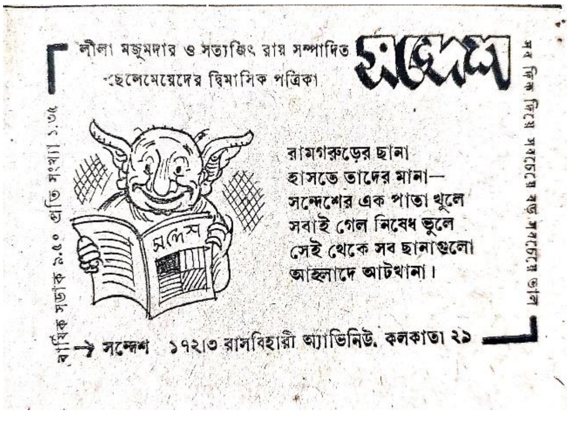

চিত্র ২.৩৫ দেশ, ৩৭ বর্ষ, ১৬ মাঘ, ১৩৭৭

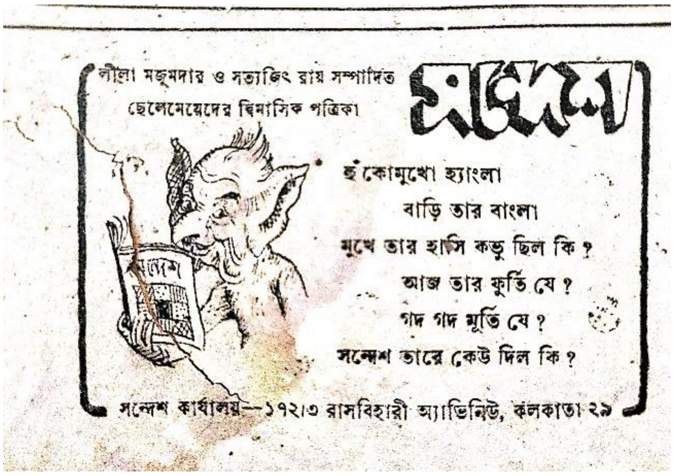

চিত্র ২.৩৬ দেশ, ৩৭ বর্ষ, ১০ পৌষ, ১৩৭৭

'সন্দেশ'-এর এখন থেকে বছরে বারোটার বদলে ছ-টা সংখ্যায় দাঁড়াল বটে, কিন্তু সেই বৃহদায়তন 'সন্দেশ' যেমন চোখ ঝলসানো দৃষ্টিনন্দন হয়েছিল, বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যে তা একেবারেই অতুলনীয়।[৪০]

এই যে *সন্দেশ*-এর পরিবর্তন হল, তারই বিজ্ঞাপন পরপর ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে বেরিয়েছে *দেশ* পত্রিকায়। ছবি এবং ছবির সঙ্গে টাটকা সব মজাদার লিমেরিকের স্রষ্টা ছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই সময়ে *সন্দেশ*-এর সম্পাদকও ছিলেন সত্যজিৎ রায় এবং লীলা মজুমদার।

এই 'সন্দেশ' মাপে এমনই বড়সড়, যে হাতে ধরা মুশকিল, তাই খুড়োকে সেই 'সন্দেশ' বগলে গুঁজে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। এবং 'ট্যাক্সি'র সঙ্গে মিল হয় 'দ্যাখ্‌সি'র। এক সময়ে যে সব বাঙালি 'পোলাদের খিদা' 'ম্যাক্সি' 'সন্দেশ'-এই মিটতো, সে সব বাঙালি পোলাদের আর তেমন 'খিদা' পায় না, এ কথা বললে খুব সরলীকরণ করা হবে না। এমন বিজ্ঞাপন ছিল প্রায় পাঁচ খানা। প্রতিটিতে ছিল মজার ছড়া। রামগরুড়ের ছানাগুলো অথবা হুঁকোমুখো হ্যাংলা, সে তারা যতই গোমড়ামুখো হোক, হয়ে পড়ে আহ্লাদে আটখানা। বাঙালি সাহিত্যিকের চিরকালীন চরিত্রগুলিকে নিজের মতন করে হাসিখুশি করে তুলেছিলেন সুকুমারপুত্র সত্যজিৎ।

চিত্র ২.৩৭ চিত্রবাণী, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৫৮

'এলাটিং বেলাটিং' এর মতই একেবারে বাংলার ছড়াকে ভেঙে গড়ে বিজ্ঞাপিত পণ্যের উপযোগী করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আরও কিছু বিজ্ঞাপনে। এই ছড়াগুলির সঙ্গে বাংলার ঘর, ঘরের আলপনা, লেপ-কাঁথা, খেলার সাথী, মেয়েমহলের আড্ডা, তার সদস্যদের সম্পর্ক ছিল গভীর। 'সেন্ট্রাল টি বোর্ড' সেই আদলেই বানিয়ে ফেলেছিল অনেকগুলি বিজ্ঞাপনের একটি সিরিজ। প্রতিটিকেই সাজানো হয়েছিল চেনা ছড়ায় নতুন শব্দ দিয়ে। প্রতিটি বিজ্ঞাপনেরই চতুর্দিক ঘিরে ছিল নিপুণ আলপনা। ছড়ার সঙ্গে সবকটি বিজ্ঞাপনেই ছিল সুন্দর ছবি। ছড়া আর ছবিতে অবধারিত উঠে এসেছিল চা-এর অনুষঙ্গ। গত শতাব্দীর তিন-

চারের দশকে নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় বেরোতো চা-প্রস্তুত প্রণালী, বিস্তারিতভাবে লেখা থাকতো চা-এর উপকারিতা। বিশেষত অতিথি বরণে বা ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনায়, অথবা নিতান্ত আড্ডার আসরে চা-পানের কথাই ছড়াগুলিতে বলে দেওয়া হয়।

এখানে যে বিজ্ঞাপনটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার শেষ দুটি পংক্তিতে লেখা আছে- "শালিধানের চিঁড়ে নয়কো গরম লুচি ভাজা/ তার সঙ্গে ধরে দিল একটি বাটি চা"। গেলাস বা কাপে চা দেওয়ার পরিবর্তে বাটি ভরে চা দেওয়ার ব্যাপারটি বেশ মজার লাগে।

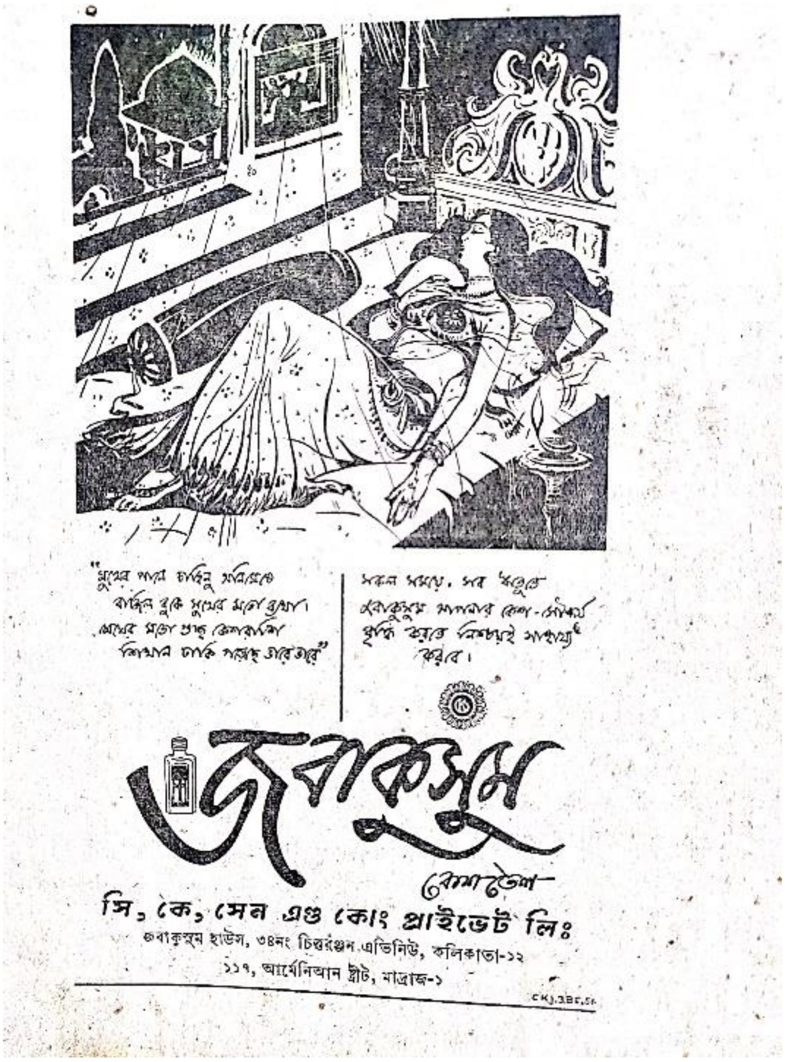

চিত্র ২.৩৮ শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৬৫

সি কে সেন-এর বিখ্যাত 'জবাকুসুম কেশ তৈল'র বিজ্ঞাপন নানা কবির কবিতায় বর্ণিল হয়ে উঠেছে বিংশ শতকের পাঁচের দশকে। রবীন্দ্রনাথের *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থের 'নিদ্রিতা' কবিতার কিছু অংশ আর ঘুমন্ত রাজকন্যার ছবিতে বিজ্ঞাপনটিই যেন হয়ে উঠেছে একখানি রূপকথা। এই সিরিজের বিজ্ঞাপনে আরও কিছু কবিতা-গান ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে আরেকটি ছিল "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি"। ছবিগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বাংলার ঋতু, বাঙালি সংস্কৃতির ভিতরের কথাটি।

এবার আবার কয়েক দশক এগিয়ে যাওয়া যাক। আটের দশকে কোয়ালিটি (Kwality) কোম্পানি তাদের আইসক্রিমের বিজ্ঞাপন করল চমৎকার সব ছড়া দিয়ে। সঙ্গে সেই বিখ্যাত বাক্যটি সব বিজ্ঞাপনের তলাতেই দেওয়া হয়েছে, “মুখে দিলে গলে যায় আহারে কি পুষ্টি!”। এই যে ছড়া-ছবি মিলে যে সব দুরন্ত বিজ্ঞাপন তৈরি হচ্ছে, তার চরিত্ররা সবাই কিন্তু কাল্পনিক ছিলেন না এবং সবাই ঠিক সেভাবে ‘বাস্তব’ চরিত্রও নন। বিখ্যাত বাঙালি হতে গেলে কেবল তাদের রক্তমাংসের মানুষ হতে হবে, তাই বা কেন; বহু কাহিনির চরিত্র তাদের স্রষ্টাকে অতিক্রম করে বাঙালির ঘরের ছেলেমেয়ে হয়ে উঠেছে।

চিত্র ২.৩৯ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৩৮৮

চিত্র ২.৪০ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৩৮৮

সকলে জানে পটলডাঙার চাটুজ্যেদের রোয়াকে আড্ডা মারা টেনির মুখে সর্বদা বড় বড় কথা লেগেই থাকে, প্যালাকে চক্ষু রাঙাতে তার জুড়ি মেলা ভার; তবু তার অথবা সেই চারজন আড্ডাবাজের প্রতি বাঙালির আদর কমেনি কখনও। বুদ্ধিদীপ্ত যুবক ফেলু মিত্তির, মধ্যবিত্ত খোশমেজাজি ডিটেকটিভ কাহিনির স্রষ্টা লালমোহনবাবু অথবা কিশোর তোপ্‌সেকে যত্ন-আত্মি করতে পারলে মন বেশ খুশি হয়ে ওঠে। সকলেই জানে ঘনাদা গুল মারেন, বড় বড় বিশাল সব গুল, তবু তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসানোই বাঙালির দস্তুর। আলিবাবা ‘আরব্য রজনী’ থেকে উঠে এসে মোহরের

পরিবর্তে আইসক্রিম খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরের মধ্যে তাঁরা সীমাবদ্ধ থাকেননি মোটেই।

ফেলুদা, ঘনাদা, টেনিদা, আলিবাবা ছাড়াও এই বিজ্ঞাপনমালায় ছিলেন চুণী গোস্বামী, ভীম ভবানী ইত্যাদি বাস্তবের 'হিরো'রা। ছড়াগুলির ভাষা ছিল যেমন ঝরঝরে, তেমনি আমোদে ভরা। ফেলুদা, তোপ্‌সে, লালমোহন বাবু যে বিজ্ঞাপনে রয়েছেন, সেটি আবার আস্ত একটি ধাঁধা। যেভাবে ফেলুদা উপন্যাসেও ধাঁধার মাধ্যমে বহু রহস্যের সমাধান করেছে, ঠিক সেভাবেই বিজ্ঞাপনেও ছড়ার মধ্যে তার বুদ্ধি খেলানোর জন্য রেখে যাওয়া হয় সূত্র। ফেলুদা অবশ্য সকলকে হতভম্ব করে জিতে নেয় 'কোয়ালিটি' আইসক্রিম।

এই বিজ্ঞাপন থেকেই আমরা জেনে নিই সহজেই, গন্ডারদের ভির্মি খাওয়ানোর জন্য ঠান্ডা মিষ্টি আইসক্রিমই যথেষ্ট।

ভীম ভবানীর আসল নাম ছিল ভবেন্দ্রমোহন সাহা (১৮৯০-১৯২২)। ভারতীয় এই কুস্তিগীর কিংবদন্তিতে পরিণত হন, যখন তিনি বুকের উপর হাতি তোলেন। তাঁর মৃত্যুর ছয় দশক পরে কোয়ালিটি কোম্পানি ছড়ায়, ছবিতে তাঁকে 'কলির ভীম' আখ্যা তো দেয়ই, সঙ্গে এও জানায়, যে নেহাৎ তিনি এখন পরলোকগমন করেছেন, বেঁচে থাকলে তিনি অবধারিতভাবে 'কোয়ালিটি'র ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি ইত্যাদির স্বাদে ভরা ঠান্ডা ক্ষীরগুলি 'সাবড়ে' দিতেন।

চিত্র ২.৪১ বার্ষিক শিশুসাথী, ১৩৭৯

ছবিতে-কথায় বিজ্ঞাপনগুলি আইসক্রিমের মতই উপাদেয় হয়ে উঠেছিল।

বাংলা সাহিত্য এই বিজ্ঞাপনের প্রাণস্পন্দন হয়ে ওঠে। তাদের উপস্থাপনের ভঙ্গিও সু-সাহিত্যের মতই বলিষ্ঠ ছিল।

আর দুটি বিজ্ঞাপনের কথা বলে কবিতা থেকে যাওয়া যাবে গল্পে। তার একটি বিজ্ঞাপন সুলেখা কালি'র। খোকনের হাতের লেখা ভালো করবার ছোট্ট কাহিনি পাওয়া যায় চারটি ছোট ছোট

স্তবকে। হাতের লেখা তার ভালো করবার উৎসাহ খুব, ভালো কলমও আছে কাছে, তবু কেন হাতের লেখা তার ভালো হয় না? কারণ লেখার প্রধান উপাদান কালিটি তার মোটেই ভালো নয়। কিন্তু বন্ধু পিন্টু খোকনের এই জটিল সমস্যার সমাধান করে দেয়। সুলেখা কালির রঙ এতই মধুর। যে সে কালিতে লেখা হয় ঠিক 'কবি দাদুর' মতন। এই ছেলেটির স্বপ্ন ছিল তার হাতের লেখা হবে 'কবি দাদু'র মতন সুন্দর। সুলেখা কালি তার সেই ইচ্ছাপূরণ করে।

বাঙালি পরিবারের শিশু-কিশোরদের হৃদয়ে আজ থেকে পাঁচ দশক আগে 'কবি দাদু' হিসাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই আদর-যত্নে-শ্রদ্ধায় বাস করতেন। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই দৃশ্য প্রায় বিরল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বাঙালি পরিবারের সন্তানরা তাদের বাংলা হাতের লেখা ভালো করার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করছে এবং তার অনুপ্রেরণা হিসাবে সে বেছে নিচ্ছে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরকে।

শেষ বিজ্ঞাপনটি 'ম্যাগি' নুডলস্ এর। আট এর দশকে মূলত শিশু-কিশোরদের লক্ষ্য করে এই খাদ্যদ্রব্য বাজারে এলো। ম্যাগির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এটি রান্না করা সম্ভব অতি দ্রুততার সঙ্গে। আক্ষরিক অর্থেই দু মিনিটে। পরিবর্তিত পারিবারিক কাঠামোয়, চাকুরীজীবী বাবা-মা দুজনের অবর্তমানে যাতে অল্পবয়স্ক সন্তানও এই খাবার যাতে সহজে বানিয়ে ফেলতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

S. Ramesh Kumar এবং Anup Krishnamurthy লিখিত *Advertising, Brands and Consumer Behaviour : The Indian Context* বইতেও 'Maggi' নামাঙ্কিত অধ্যায়ে পাই-

> Maggi devised an offering which could be readily cooked and served to children. The early 1980s was also a period when the concept of both parents going to work was slowly getting accepted even in a tradition-bound society like India. Given the historical orientation of the mother towards the children in terms of preparing food for the children and the emerging environment in the 1980s, there was a distinct need for a snack that could be prepared with convenience. Maggi's initial proposition was that it could be prepared in two minutes; and the early campaign indicated that Maggi could be prepared conveniently, and it was tasty as well (Bhattacharyya, 2015). It was

interesting to note that the company (Nestle) had actually revised its sales target upwards given the spontaneous receptivity of the consumer when Maggi was launched.[৪১]

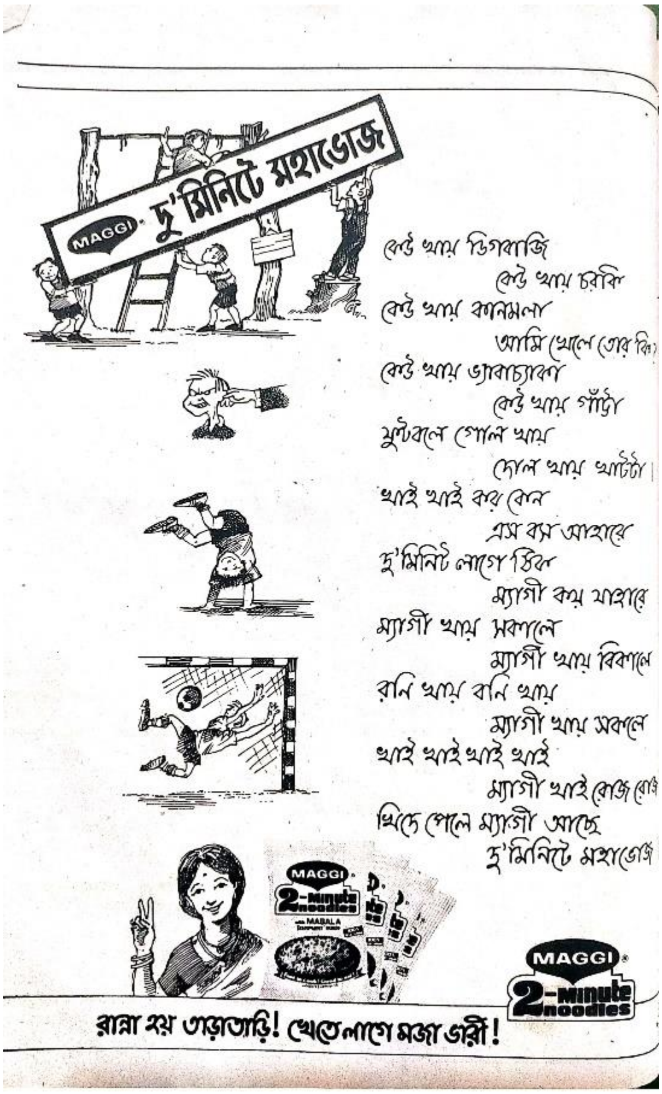

চিত্র ২.৪২ আনন্দমেলা, জুন, ১৯৮৯

'ম্যাগি'র জনপ্রিয়তা হল চমকে দেওয়ার মত। কেবল অতি দ্রুত, রান্নার ঝঞ্ঝাট ছাড়া তৈরি হয়ে যায় তাই নয়, এটি খেতেও চমৎকার, দামও মধ্যবিত্তের আয়ত্তের মধ্যে। ফলে স্কুল-ফেরত ক্ষুধার্ত শিশুদের পেট ভরানোর বিষয়টিতে তাদের মায়েরা বেশ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন।

পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন, সুকুমার রায়ের 'খাইখাই' কবিতার অবিকল প্রতিফলন রয়েছে এই কবিতাটিতে। ছবিগুলিও কিছুটা সুকুমার রায়ের অলঙ্করণের ছায়া অবলম্বনে তৈরি। "খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে-/খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে"'র[৪২] পরিবর্তে বিজ্ঞাপনে হয়ে যায়, "খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে/ দু'মিনিট লাগে ঠিক, ম্যাগী কয় যাহারে"। বিজ্ঞাপনের শিরোনামে লেখা থাকতো "দু'মিনিটে মহাভোজ", এই 'দু'মিনিট' ব্যাপারটাই ছিল 'ম্যাগি'র প্রধান আকর্ষণী শক্তি। সুকুমারের কবিতাগুলি শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য এবং আমোদের বিষয়, তা বক্তব্যের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যতই সামাজিক জটিলতা মিশে থাকুক না কেন। সেই অনন্য উপস্থাপন ভঙ্গিকে বাংলা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করলে তা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সে আশা করাই যায়।

বাংলা বিজ্ঞাপনের সাহিত্যধর্মিতা অথবা বিজ্ঞাপনে সাহিত্যের প্রভাব বিষয়ে আলোচনার সুবাদে প্রথমে এলো বিজ্ঞাপনের ছড়া, কবিতাগুলির কথা। এরপরে বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ছোট ছোট গল্প, গদ্য, ছবিতে গল্পের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণনা, ইত্যাদি অভিনব উপস্থাপনগুলি দেখা যাক।

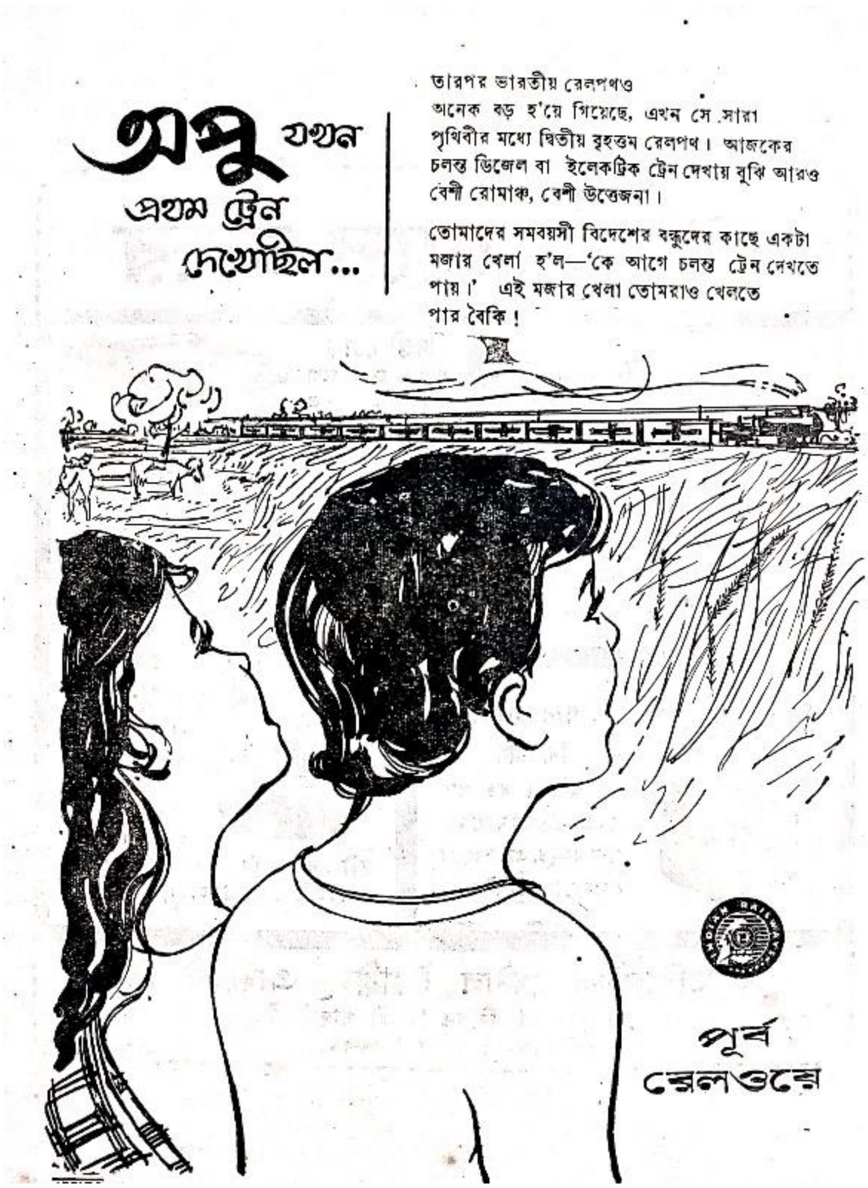

চিত্র ২.৪৩ সন্দেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

১৯২৯ সালে *পথের পাঁচালী* উপন্যাসটি লিখলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫৫ সালে সেই উপন্যাস থেকেই তৈরি হল সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত ছবি। এই ছবির জনপ্রিয়তা নিয়ে এখানে কথা বলা অবান্তর। ছবিটির বিভিন্ন দৃশ্যই পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তার মধ্যে একটি হল অপু-দুর্গার রেলগাড়ি দেখার দৃশ্যটি। যে রেলগাড়ি দেখার, চড়ার স্বপ্ন দুর্গার মৃত্যুর আগের মুহূর্ত অব্দি বুকের মধ্যে আগলে রেখেছিল। স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অপু-দুর্গার এই রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার অথবা ভাই-বোনের খেলে বেড়ানোর ইমেজগুলিকে পূর্ব রেলওয়ে বহুবার ব্যবহার করেছে তাদের বিজ্ঞাপনে। কখনো শরতের শুভেচ্ছাবার্তার সঙ্গে, নীল আকাশ, কাশফুল, সাদা মেঘ, শিউলি আর সোনারঙের দিনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে

নিশ্চিন্দিপুরের দুই ভাইবোনের হাসিখুশি আহ্লাদের ছবি। কখনো আবার ভারতীয় রেলপথের ব্যাপ্তির কথা বলতে গিয়ে দেওয়া হয়েছে অপু-দুর্গার ছবি।

ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনের ছবিটিতে শিরোনামে লেখা থাকে, "অপু যখন প্রথম ট্রেন দেখেছিল..."; কিন্তু ছবিটিতে দেখতে পাওয়া যায় দুজন মিলেই তারা ট্রেন দেখছে; যদিও দুর্গার ট্রেন দেখা শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

CESC (Calcutta Electric Supply Corporation) ঘরে ঘরে যখন পৌঁছে দিয়েছে বিদ্যুতের আলো, পাখা, টেলিভিশন, তাদের বিজ্ঞাপনে জানানো হচ্ছে সি. ই. এস. সি'র জন্মলগ্নের ইতিহাস, তারপরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আয়তন বৃদ্ধির, বিদ্যুতের বিপুল উৎপাদনের গল্প। কিন্তু এসবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে 'অপরাজিত'[৪৩] উপন্যাসে অপুর প্রথম কলকাতায় এসে ইলেকট্রিক ট্রাম, ইলেকট্রিক পাখাবাতি দেখে বিস্মিত হওয়ার অংশগুলি। 'অপরাজিত' উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। কিন্তু উপন্যাস এবং পরবর্তীকালে তৈরি

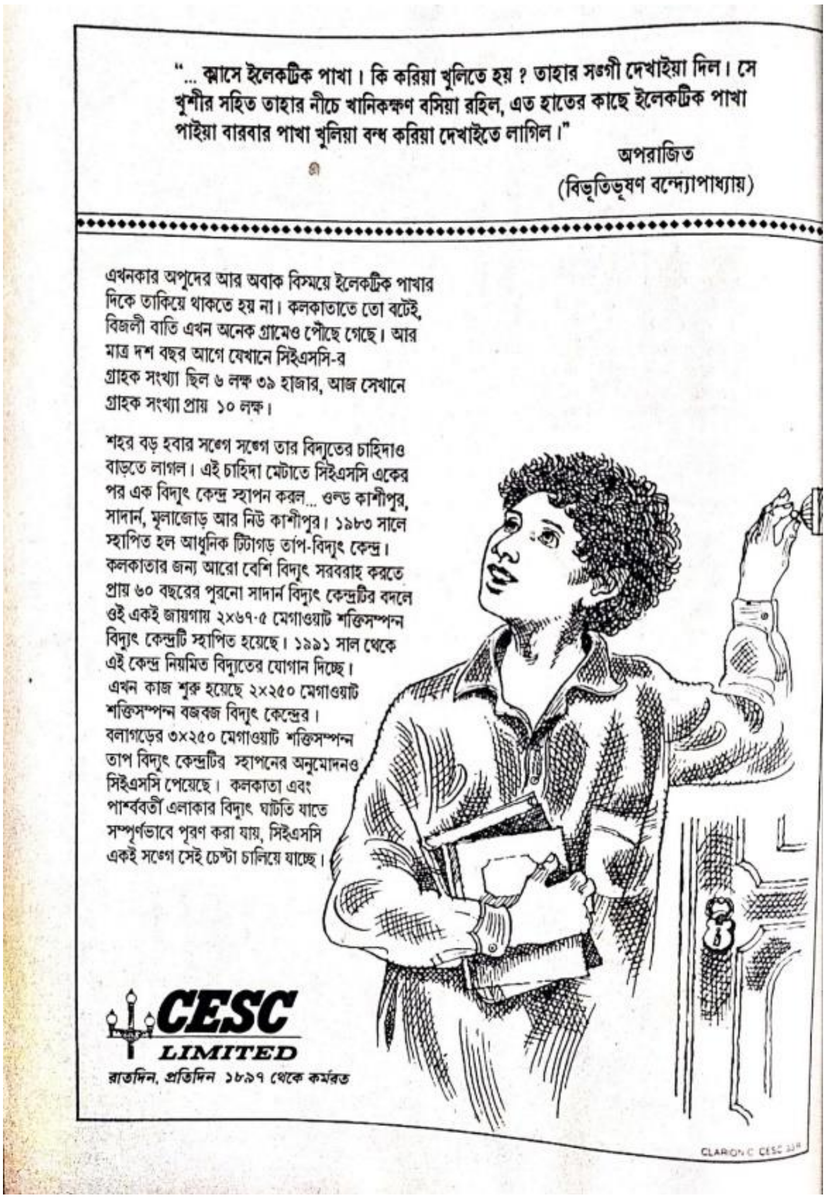

চিত্র ২.৪৪ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৩৯৯

হওয়া ছায়াছবির নিরিখে, সর্বোপরি মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে অপু নামের সুন্দর ছেলেটি পরম আদরের হয়ে ওঠার কারণেই, অপুকে বিজ্ঞাপনের চরিত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে নানাভাবে। মনসাপোতা থেকে

নিশ্চিন্দিপুরের অবোধ বালক অপু যখন জীবনে প্রথমবারের জন্য তার পরম নির্ভরতার আশ্রয়, মা কে ছেড়ে কলকাতায় পড়তে আসে, সেই ছিল অপুর জীবনের অবিস্মরণীয় সন্ধিক্ষণ; যখন অভাবনীয় দারিদ্র, প্রায় অনাহার, বাসস্থানের অভাব সহ্য করেও, পড়ার নেশায়, বস্তুত কলকাতার নেশায়, একা জীবন কাটানোর আনন্দে সে মা-এর কাছে পর্যন্ত যেতে চাইতো না সেভাবে। রিপন কলেজে ভর্তি হয়ে ক্লাসে ইলেকট্রিক পাখা এবং তা খোলা-বন্ধের সহজ কৌশল আবিষ্কার করে তার মন খুশি হয়ে ওঠে।

অপুর মনের খুশিটুকু, বহু দশক পরের কিশোরদের জন্য বিজ্ঞাপনে তুলে ধরে সি. ই. এস. সি।

বিজ্ঞাপনে গল্প-কাহিনির, পুরনো ইতিহাস, অথবা সাহিত্যের কথা উঠলে অবধারিভাবে চলে আসে কলকাতা শহরের কথা। আসে বাঙালির উৎসবের কথা। আড্ডা, ভ্রমণ, খাওয়াদাওয়া, সাহিত্যপ্রীতি, আনন্দের শহর কলকাতা, উৎসব; সব মিলে যে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন ভরে আছে দশকের পর দশক ধরে, বিজ্ঞাপনে তাকেই খোঁজার চেষ্টা চলে।

পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর *কী করে কলকাতা* হলো বইতে লিখছেন,

> রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক ঘেসাড়া। নবাগত সাহেব তাকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, ওহে, এ জায়গাটার নাম কি? চাষাভুষো মানুষ। ইংরেজিতে মা-গঙ্গা। সে ভাবলে সাহেব বুঝি তাকে প্রশ্ন করছে ওই ঘাস কবে কাটলে? সে তাই সাহেবকে জবাব দিলে, আজ্ঞে কালই কাটা। সাহেব অমনি পকেট থেকে ডাইরী খুলে গোটা গোটা করে লিখে নিলেন জায়গাটার নাম, কাল কাট্টা অর্থাৎ Calcutta।[৪৪]

কলকাতা শহরের নাম ঠিক কী কারণে কলকাতা হল, সে নিয়ে গবেষকদের মধ্যে নানান মতান্তর আছে। উপরের কাহিনিটির বাস্তব ভিত্তি কতখানি, তা নিয়ে এই বইয়ের লেখকও এমনকি সন্দিগ্ধ। তবুও, এমন মজা লুকিয়ে আছে যে শহরের নামেই, সে শহরের বৈচিত্র্য বিজ্ঞাপনের বর্ণে-গন্ধে ধরা দেবে না তা হতে পারে না।

“জীবনের ওঠাপড়া” যাতে আমাদের গায়ে না লাগে, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙালির ঘরে ঘরে পরম যত্নে সে খেয়াল রেখে চলেছে যে অতি সাদামাটা সবুজ লেবেল লাগানো বস্তুটি, তার নাম ‘বোরোলীন’। বোরোলীন প্রস্তুতকারক সংস্থা জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস একের পর এক মনোগ্রাহী বিজ্ঞাপন তৈরি করেছে বহু দশক ধরে। কখনো বিজ্ঞাপনের কপি হয়েছে চমৎকার আধুনিক, কখনো তার মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছে অতীত দিনের ছবি।

কলকাতার অতীত দিন বস্তুত বাঙালিরই অতীত দিন, সেই কথা বিজ্ঞাপনই বুঝিয়ে দিয়েছে।

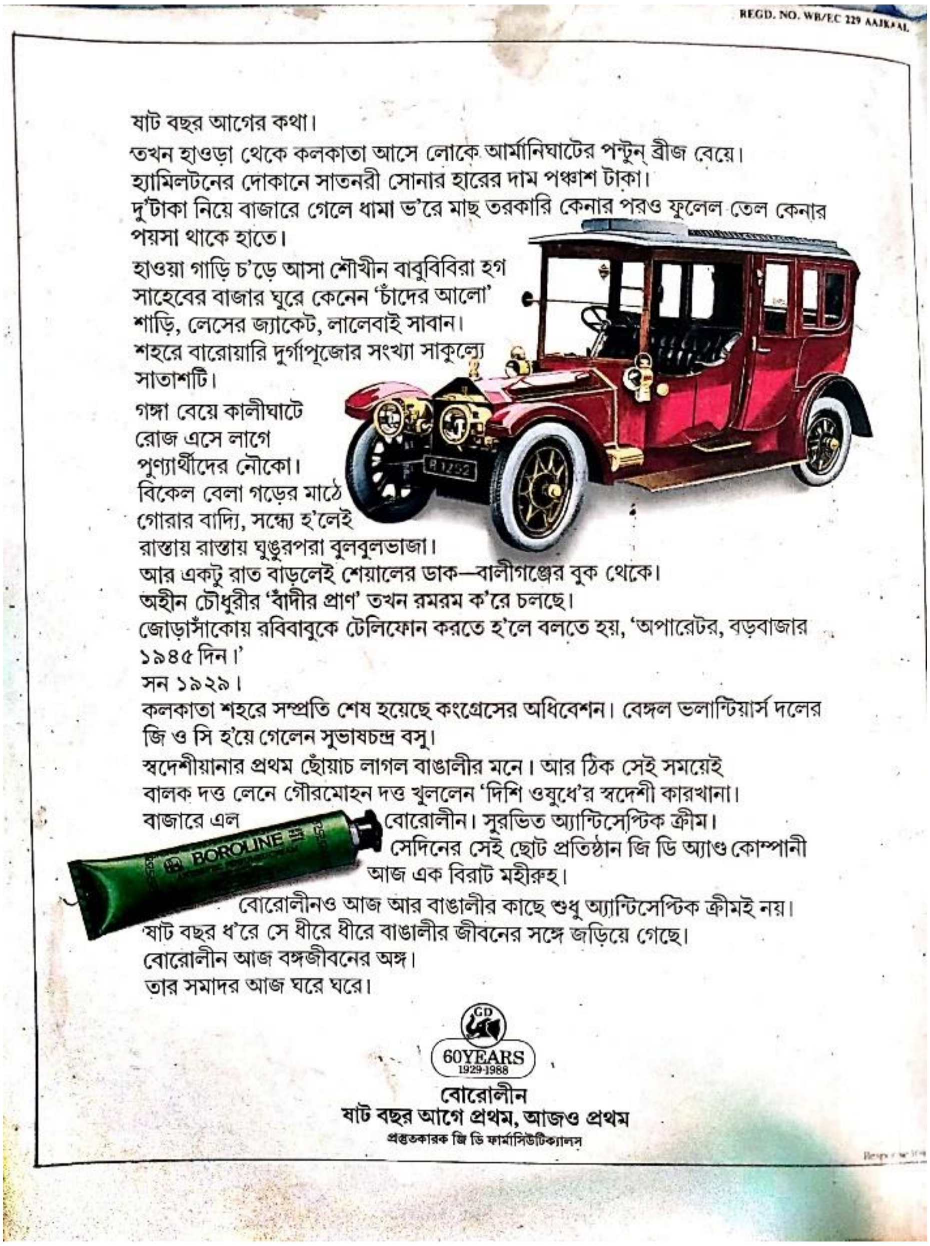

চিত্র ২.৪৫ আজকাল, কলকাতা সংখ্যা, ১৩৯৬

বর্তমান রবীন্দ্রসেতু বা হাওড়া ব্রীজের একসময়ে নাম ছিল পন্টুন ব্রীজ, হাওড়া থেকে কলকাতা শহরে প্রবেশ করতে হত এই পন্টুন ব্রীজ দিয়েই। দুইটি টাকা খরচ করলে মিলে যেত ধামা ভরা মাছ-তরকারি। বারোয়ারী দুর্গাপুজো, কালীঘাটের পুণ্যার্থীদের ভীড়, বালিগঞ্জের বুকে শিয়ালের ডাক, অহীন্দ্র চৌধুরীর বিখ্যাত নাটক 'বাঁদীর প্রাণ', কংগ্রেসের অধিবেশন, সুভাষচন্দ্র বসু, বাঙালির মনে স্বদেশিয়ানার ছোঁয়া, বালক দত্ত লেনে গৌরমোহন দত্তের 'দিশি ওষুধ'-এর স্বদেশী কারখানা, বোরোলিনের আবির্ভাব এবং সর্বোপরি জোড়াসাঁকোয় রবিবাবুর উপস্থিতি- বিজ্ঞাপনের এক পাতার কপিতে। কয়েকটি শব্দের মধ্যে জমকালো ফ্ল্যাশব্যাকে ঘুরে আসা যায় গত শতাব্দীর দুই-তিনের দশকের বাঙালি কলকাতায়, যে সময়ে টেলিফোন অপারেটরের কাছে ১৯৪৫ নম্বরে ফোন চাইলে শোনা যেত তাঁর গলা।

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ) মেট্রো রেলের বিজ্ঞাপনে "রামতনু লাহিড়ীর কলকাতা", "কালীপ্রসন্নর কলকাতা" ইত্যাদি শিরোনামে *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, হুতোম প্যাঁচার নক্শা*

ইত্যাদি বিখ্যাত বাঙালির মহামূল্যবান রচনাংশ ব্যবহার করেছে তাদের বিজ্ঞাপনে। উনিশ শতকের কলকাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আজকের কলকাতার। সেকালের ‘বাবু’দের বিলাসিতা, ছেলেপুলের মস্করা, ধনীদের বিলাসী জীবন, পরিবহনের জন্য ঘোড়ায় টানা গাড়ির পাশে রাখা হয়েছে আজকের দ্রুতগতির ভূগর্ভ রেলের বিবরণ।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর উৎসাহী পাঠক কলকাতা শহর এবং বাঙালির বিবর্তন লক্ষ করতে পারেন।

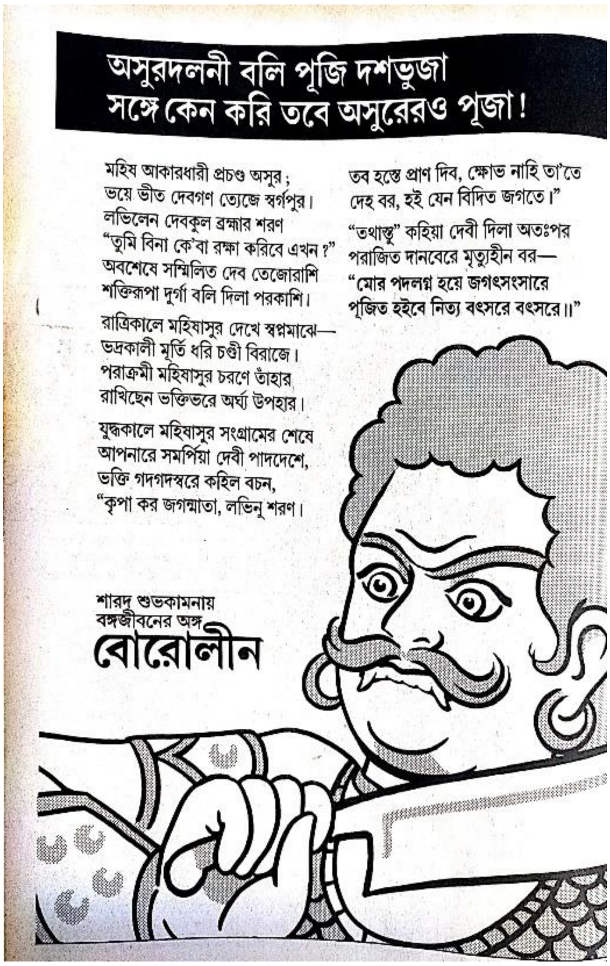

চিত্র ২.৪৬ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৩৯৯

এই বোরোলীনের বিজ্ঞাপনে “বঙ্গজীবনের অঙ্গ” শব্দে দুটির উপস্থিতি লক্ষ করার মত। শারদ শুভেচ্ছার সঙ্গে একের পর এক শারদীয় বিজ্ঞাপনে বোরোলিন শুনিয়েছে মহালয়ার পুণ্যতিথিতে পিতৃতর্পণের কথা, মেনকার গর্ভে সতী জন্মের কথা, প্রতিমার চালচিত্রের কথা, অসুর পূজার কথা, বড়িশার আটচালা দুর্গামন্ডপে জোড়া মোষ বলি, যাত্রাগান কথকতার কথা। পড়লে বোঝা যায় বিজ্ঞাপনগুলির বাচনভঙ্গি ছোটদেরকেও টেনে রাখার ক্ষমতা রাখে।

দুর্গাপূজার এই প্রথাগুলি শত শত বৎসর ধরে বঙ্গজীবনের অঙ্গ, বোরোলীনও কাহিনিগুলির সঙ্গে মিলেমিশে যেন একধরনের প্রাচীনত্ব অর্জন করে, বাঙালির ঘরে ঘরে তার গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়ে ওঠে বঙ্গজীবনের অঙ্গ। এরকম অজস্র বিজ্ঞাপন বোরোলীন তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে সেকালের দুর্গাপুজোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যেমন নবপত্রিকার স্নান, কিছু বিশেষ লোকাচার, বারোয়ারী পুজোর ধুমধাম, পুরনো বনেদী বাড়ির পুজোর গল্প সহজ, সাবলীল ভাষায়

লেখা হয়েছে। কপির সঙ্গে ছিল ছবি। যদিও এই বিজ্ঞাপনগুলি খুব পুরনো নয়, গত শতাব্দীর আট-নয়ের দশকের।

দশকে পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এগুলি। সদ্য, ২০১৬ সালে, ইউ-টিউবে Sawan Dutta নামের এক মহিলার গান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর গানগুলি ইংরেজি ভাষায় লেখা হলেও বিষয়গুলি ছিল আশ্চর্যরকম বাঙালি। মাছের ঝোল থেকে কষা মাংস, কড়াপাকের সন্দেশ থেকে শুক্তো, পুজোর ভোগের খিচুড়ি সব কিছু নিয়ে আলাদা আলাদা করে গান বেঁধেছিলেন শাওন। এরই মধ্যে একটি গান ছিল 'বোরোলীন' নিয়েও। গানটির নাম ছিল "Ode to Boroline"[৪৫]। বাঙালি হিসাবে 'বোরোলীন'এর প্রতি এমন মাধুর্য্যময় নিবেদন উল্লেখের দাবি রাখে।

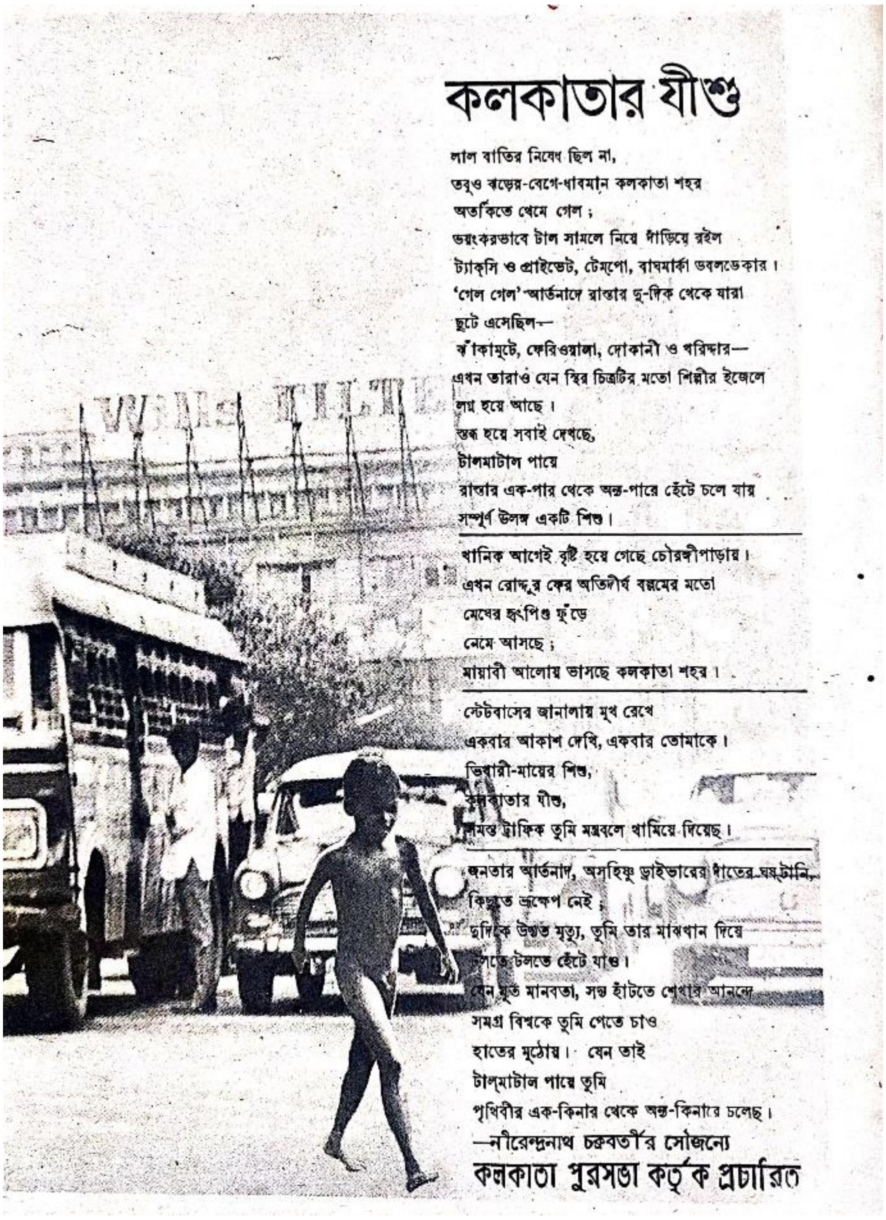

চিত্র ২.৪৭ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৩৮৫

বিজ্ঞাপনে ছড়া, লিমেরিক অথবা কবিতার আংশিক ব্যবহার ইতিমধ্যে দেখা গেছে। বিস্ময়ের বিষয় হল, কলকাতা পুরসভা, একটি পূর্ণাঙ্গ পৃষ্ঠা জুড়ে ব্যবহার করে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কলকাতার যীশু' নামের বিখ্যাত কবিতাটি, "স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,/ টালমাটাল পায়ে/ রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়/ সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু..."

কবিতার সঙ্গে মানানসই ফটোগ্রাফ দেওয়া হয় বিজ্ঞাপনে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ পথশিশুর পৃথিবীকে অথবা

উদ্যত মৃত্যুকে ভ্রূক্ষেপ না করে টালমাটাল পায়ে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি কলকাতা শহরের পথচলতি মানুষের কাছে পরিচিত। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে, অর্থাৎ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে। স্মরণে রাখার বিষয় হল, ১৯৭৭ সালে বাংলায় বামফ্রন্ট প্রথমবারের জন্য সরকার গঠন করে। কলকাতা পুরসভা এই কবিতা এবং ছবি ব্যবহার করলে, সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শ বিজ্ঞাপনে ধরা পড়ে, যেখানে সর্বহারার অগ্রাধিকারের সামনে স্তব্ধ হতে বাধ্য হয় বড় বড় ক্ষমতাবান যন্ত্রগুলি। বামফ্রন্ট সরকার তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকার কারণে, অন্তত দুটি প্রজন্ম এই সরকারের সঙ্গে কৈশোর, যৌবন অথবা বার্ধক্য কাটানোর ফলে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের সম্পর্কের সুতোটি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েক দশকের জন্য।

চিত্র ২.৪৮ দৈনিক আজকাল, ৫ মে, ১৯৯৩

এই অধ্যায়ে অন্যতম বাঙালি হিসাবে ফেলুদার নামটি উঠে এসেছে বারেবারে। কখনও ভ্রমণের প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়েছে ফেলুদাদের ভ্রমণের কথা, কখনও আবার আইসক্রিমের বিজ্ঞাপনে তাকে নিয়ে বানানো হয়েছে ছড়ার ধাঁধা, কখনো আবার ব্যবহার করা হয়েছে 'সোনার কেল্লা'র চিত্রনাট্য অংশ।

'সোনার কেল্লা'য় মন্দার বোস নিজেকে ভূ-পর্যটক বা 'গ্লোব-ট্রটার' বলে পরিচয় দিলে ফেলুদার মনে সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে। সবচেয়ে সন্দেহ হয় তখন, যখন এতো বছর বিদেশে ঘুরে-বেড়ানোর পরেও তার জুতোটা 'বাটা'র বলে মনে হয়; এমনকি তার চেহারাও বেশ পুরনো মার্কা। জুতোর কোম্পানি হিসাবে বাঙালির জীবনে আজও 'বাটা'র গুরুত্ব এবং তৎসহ ফেলুদা মিলে গিয়ে বিজ্ঞাপনটিও মন্দার বোসের জুতোর মতই বাঙালি হয়ে ওঠে।

ভীম ভবানী বা চুণী গোস্বামী বিজ্ঞাপনের চরিত্র হয়ে উঠেছেন দেখা গেছে। তেমনই American Express ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনে বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র'র ছবি ও মতামত নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতিবান বাঙালির প্রাণের নিবিড় বন্ধন যে গানের সঙ্গে, তার সঙ্গে এই শিল্পীর নামটি চিরস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

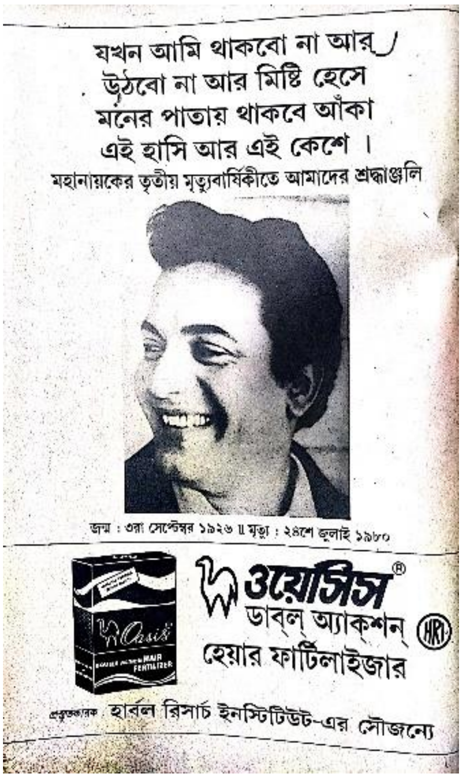

চিত্র ২.৪৯ দেশ, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৮৩

আর একজনকে বিজ্ঞাপনে পাই, পাই তাঁর মৃত্যুর পরেও। তাঁর রক্ত-মাংসের শরীরের মৃত্যু হয়েছে চার দশক আগে, এর মধ্যে এসেছেন বহু বিখ্যাত বাঙালি অভিনেতা, সময়ে সময়ে এমনকি কয়েকজন 'হিরো'র দেখাও মিলেছে। কিন্তু বাঙালির হৃদয়ে নায়কের স্থানটি যাঁর জন্য চিরকাল সংরক্ষিত ছিল, আছে এবং থাকবে, তাঁকে বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে, তা খুবই স্বাভাবিক। তিনি উত্তমকুমার। উত্তমকুমার অতীব সুদর্শন। বিজ্ঞাপনটি প্রকশিত হয় আশি সালে উত্তমকুমারের মৃত্যুর পরে। 'ওয়েসিস' নামক কেশ-বর্দ্ধকটির বিজ্ঞাপনে তাঁর অতীব সুদর্শন হাসিমুখ পাঠককে স্মৃতিমেদুর করে তুলবে, এই ছিল স্বাভাবিক।

বিজ্ঞাপনের অভিনিব উপস্থাপনের কিছু উদাহরণ ইতিমধ্যে দেখা গেছে। কথা হয়েছে বোরোলীনের বিজ্ঞাপন নিয়েও। সেই বোরোলীন বাংলা ছবিতে গল্প প্রকাশ করেছে ক্রমাগত। তার তলায় বোরলীন কর্তৃপক্ষের নাম না থাকলে তাকে বিজ্ঞাপন বলে বোধ হওয়া অসম্ভব। বিষয় নির্বাচনের দিক থেকেও ছিল অভিনবত্ব। মহাভারতের সুদীর্ঘ কাহিনিকে, আদি পর্ব থেকে

চিত্র ২.৫০ শুকতারা, ষষ্ঠবিংশ বর্ষ, ফাল্গুন-মাঘ, ১৩৭৯-৮০

স্বর্গারোহন পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত অষ্টাদশ পর্বকে চোদ্দটি কিস্তিতে প্রকাশ করে 'বোরোলীন'। বিজ্ঞাপনটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত ১৩৭৯-৮০ বঙ্গাব্দের *শুকতারা* পত্রিকায়। শিরোনামে লেখা থাকত, "অমৃত সমান মহাভারত-কথা"। কাশীরাম দাসের পর বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজশেখর বসু। শিশু-কিশোরদের উপযোগী *ছেলেদের মহাভারত* লেখেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। রামায়ণ মহাভারত নিয়ে রঙিন ছবিতে গল্পও তৈরি করেন শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। তবু "সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম"-এর বিজ্ঞাপনে, বাঙালি শিশুদের কাছে মহাকাব্যকে সাবলীল-সহজবোধ্যভাবে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছেটুকুই অনন্য করে তোলে 'বোরোলীন'কে।

চিত্র ২.৫১ প্রচ্ছদ, ভারত প্রেমকথা, সুবোধ ঘোষ, প্রচ্ছদপট অঙ্কন-আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নামলিপি অঙ্কন-শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত, একাদশ সংস্করণ : মাঘ, ১৩৬৭

পাশের ছবিতে সুবোধ ঘোষের লেখা *ভারত প্রেমকথা*-র প্রচ্ছদচিত্রটি দেওয়া হল। এটি আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত *ভারত প্রেমকথা*-র একাদশ সংস্করণ (মাঘ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)। বইটির প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেন শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নামলিপি অঙ্কনের কাজটি করেন শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

ছয়ের দশকের *ভারত প্রেমকথা* এবং সাতের দশকের 'অমৃত সমান মহাভারত-কথা'র নামাঙ্কনের মিল চোখে পড়ার মতন। মহাভারতের ছবিতে গল্পটির উপর *ভারত প্রেমকথা* বইয়ের প্রভাব থাকা খুব অসম্ভব নয়।

২.৬ বাংলা বিজ্ঞাপনের বাঙালি শিল্পীরা

দুই-তিনের দশকে যতীন্দ্র কুমার সেন, বিনয়কৃষ্ণ বসু ইত্যাদিরা এঁকেছেন বিজ্ঞাপনের উল্লেখযোগ্য ছবি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে ভারতীয় বিজ্ঞাপনের ভিসুয়াল কমিউনিকেশন বা দৃশ্যগত সৌন্দর্য্য এমন অসামান্য হয়ে ওঠে, যাকে বিজ্ঞাপনে শিল্পে নবজাগরণ বলা যেতেই পারে। চল্লিশ থেকে ষাট, মোটামুটিভাবে এই তিন দশকে অন্নদা মুন্সী, সত্যজিৎ রায়, রঘুনাথ গোস্বামী, ও সি গাঙ্গুলি, প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী বা পি সি এল (কাফী খাঁ),

সুফি (নরেন দে), মাখন দত্তগুপ্ত, রণেন আয়ন দত্ত, ইত্যাদি মহান শিল্পীরা ভিসুয়াল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে নবজাগরণ সৃষ্টি করলেন। পরবর্তীকালে নারায়ণ দেবনাথ, সুবোধ দাশগুপ্তর মত শিল্পীও বহু বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন, ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্ডী লাহিড়ী, সুধীর মৈত্র, দেবাশিস দেব প্রমুখরা।

তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হল। গুরুত্বের দিক থেকে এই সব অসামান্য শিল্পীদের তুলনা করা যায় না। তার মধ্যে কয়েকজন পথিকৃতের পরিচয় পরের অংশে দেওয়া হল।

বাংলা বিজ্ঞাপনের বুদ্ধিদীপ্ত কপির সঙ্গে, যে সব অসাধারণ শিল্পীরা বিজ্ঞাপনগুলিকে চিরকালীন করে তুলেছিলেন; তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অগ্রপথিকের কথা অতি সংক্ষেপে লিখে রাখা উচিত। The City in the Archive : Calcutta's Visual History নামের যে স্মারক গ্রন্থটি Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSSC)-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়, সেখানে কয়েকজন কমার্শিয়াল আর্টিস্টের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়। এই অংশটি লেখার জন্য সেইখান থেকে বেশ কিছু তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও পুনরায় উল্লেখ করে রাখা উচিত যে, বাংলা বিজ্ঞাপনের সুদীর্ঘ গৌরবময় যাত্রাপথের কেবলমাত্র অল্প কয়েকজন শিল্পীর উল্লেখই এখানে করা হল। আরও অজস্র মহৎ শিল্পীর কথা এই অংশে নিরুক্তই থেকে গেল।

বাংলা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত কাঠখোদাই বা লিথোছবির যুগ পেরিয়ে নতুন ধরনের রঙিন ছবি ব্যবহার হতে আরম্ভ করে। এতদিন বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ছবিগুলির থেকে এইগুলির ধরন এতটাই আলাদা ছিল যে সাধারণ দর্শকও চোখে দেখে সেই তফাৎ বুঝতে পারতেন।

এই নতুন প্রজন্মের কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অন্নদা মুন্সী (১৯০৫-১৯৮৪)-র নাম। বাংলা বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯২৫-১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি Government School of Art-এর ছাত্র ছিলেন। এই আর্ট কলেজেই একদা উপাচার্য ছিলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্ট কলেজের শিক্ষা-পরবর্তীকালে অন্নদা মুন্সী প্রাথমিকভাবে কলকাতা এবং পরে বোম্বের Army and Navy Store-এর Card Writer এবং Showcase Artist হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। বোম্বেতে থাকাকালেই *Times of India*-র বিজ্ঞাপন বিভাগে Charles Moorehouse-এর অধীনে যোগ দেন। এই কাজের ব্যাপ্তি ছিল পাঁচ বছর, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫। এই ১৯৩৫-এই কলকাতায় ফিরে অন্নদা মুন্সী ডি জে কীমার সংস্থায় যুক্ত হন। এই ছিল তাঁর শিল্পী-জীবনের বাঁক বদলের সূত্রপাত। ক্রমে তিনি এই সংস্থার শ্রেষ্ঠ শিল্পীতে পরিণত হন।

১৯৫০ সালে তিনি সংস্থার প্রচার বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। কলকাতার বিজ্ঞাপনে জগতের প্রখ্যাততম শিল্পী ছিলেন অন্নদা মুন্সী।

অন্নদা মুন্সীর সূত্র ধরেই চলে আসা যাক ও সি গাঙ্গুলির কথায়। Orun Coomar Gangoly (১৯১৯-১৯৯৬) ওরফে OC আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ করে বিজ্ঞাপনী সংস্থা Stornach and Co. তে অন্নদা মুন্সীর তত্ত্বাবধানে শিল্পী হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে ডি জে কীমারে সত্যজিৎ রায় ছিলেন তাঁর সহকর্মী। Press Syndicate Ltd. এর আর্ট ডিরেক্টর হবার কিছুদিন পরে তিনি তাঁর নিজের স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬২ সালে, তার নাম হয় Unit 62। Indian Airlines, Tea Board of India, Dunlop Tyres অথবা Burmah Shell এর অবিস্মরনীয় বিজ্ঞাপনগুলি তাঁরই হাতের দক্ষতায় জীবন্ত ও চিরকালীন হয়ে উঠেছে। বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত হন তিনি। কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনীচিত্রই নয়, গ্রন্থ-অলংকরণ থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট লেখা থেকে পোশাক, সেট তৈরি, ইত্যাদি বহুবিধ কাজ করে গেছেন আমৃত্যু।

বিজ্ঞাপনের জগতের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র রণেন আয়ন দত্ত Tata Steel, ICI, Phillips, Chloride, GKW ইত্যাদি সংস্থার বিজ্ঞাপনী-প্রচারকে অসাধারণ সব অলংকরণে ভরিয়ে তুলেছিলেন ছয়-সাতের দশকে। জবাকুসুম আর শালিমার নারকেল তেলের বিজ্ঞাপনকে তিনি ভরিয়ে তুলেছিলেন পৌরাণিক চরিত্রের অলংকরণে। সরকারী আর্ট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হবার পরে ‘প্রচারিকা’ নামের বিজ্ঞাপন সংস্থায়, অন্নদা মুন্সীর দ্বারা নির্বাচিত হয়ে শিল্পী হিসাবে যোগদান করেন। এরপর তিনি Stornach & Co, Walter Thompson (পরবর্তীকালে যে সংস্থার নাম হয় Hindustan Thompson) ইত্যাদি প্রখ্যাত সংস্থায় দীর্ঘদিন শিল্পী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি RAD Associates নামে একটি ব্যক্তিগত সংস্থা তৈরি করেন। পাঁচের দশক থেকে আরম্ভ করে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে গেছেন।

রণেন আয়ন দত্ত’র ই সমসাময়িক ছিলেন রঘুনাথ গোস্বামী (১৯৩১-১৯৯৫)। ১৯৫২ সালে J Walter Thompson-এর আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে যুক্ত হন তিনি, এছাড়াও আরও নানান সংস্থার সৃজনশীল দিকটির দেখভাল করতেন রঘুনাথ গোস্বামী। ১৯৬১ তে তিনি তাঁর নিজের সংস্থা তৈরি করেন। Tata Steel, Titagarh Paper, জবাকুসুম তেল, Burmah Shell, Indian Airlines-এর অসামান্য সব বিজ্ঞাপনী চিত্রের স্রষ্ঠা তিনি।

সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)-এর সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রায় সবকটি ক্ষেত্রে বিপুল প্রতিভা সমগ্র পৃথিবী জুড়েই বহুল চর্চিত। এই আলোচনায় তাঁর বিজ্ঞাপনে জগতের সঙ্গে সম্পর্কের কথাটুকুই অল্প কথায় জানানো হবে। ১৯৪০-৪৩, এই চার বছর তিনি শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁদের সাহচর্য, শিক্ষা, সান্নিধ্য তাঁর নান্দনিক বোধকে সজীবতর করে তোলে। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে ১৯৪৩ থেকে ৫৬ সাল পর্যন্ত, এক দশকেরও বেশি সময়ে ডি জে কীমারের শিল্পী হিসাবে কাজ করেন। সিগনেট প্রেস-এর জন্মলগ্ন (১৯৪৩) থেকেই তিনি গ্রন্থসজ্জা থেকে আরম্ভ করে টাইপ সেটিং, অলংকরণ সবকিছুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকেছেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)-এর *রূপসী বাংলা* অথবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর *আম আঁটির ভেঁপু*-র সত্যজিৎ-কৃত প্রচ্ছদ বাঙালির আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। *পথের পাঁচালী*-র চলচ্চিত্রায়ণ এবং সেই ছবির বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক সাফল্যের পরে বিজ্ঞাপন জগত ছেড়ে সর্বাঙ্গীনভাবে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনার পথটিই বেছে নেন। যদিও তাঁর অন্যান্য প্রতিভাগুলি এতে অবহেলিত হয়নি।

আনন্দবাজার পত্রিকা-র ৭৫ বছরে, ৩০ জুন, ১৯৯৭ সংখ্যায়, অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বিজ্ঞাপনে যাঁরা এনেছিলেন বাঙালিয়ানা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। প্রাবন্ধিক লিখছেন-

> চল্লিশ থেকে ষাট এই তিন দশকে অন্নদা মুন্সী, সত্যজিৎ রায়, ও সি গাঙ্গুলি, মাখন দত্তগুপ্ত, রণেন আয়ন দত্ত ও রঘুনাথ গোস্বামীর মতো গ্রাফিক শিল্পীরা নবজাগরণ সৃষ্টি করলেন ভিসুয়াল কম্যুনিকেশনের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞাপন পরিকল্পনায়, নির্দেশনায়, অঙ্গসজ্জায়, ইলাস্ট্রেশনে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিজ্ঞাপন গড়তে গড়তে বিজ্ঞাপন শিল্পে একটি অনবদ্য বাঙালি ঘরানার সৃষ্টি করেন।[৪৬]

আপাতত এইখানে বিজ্ঞাপনের শিল্পীদের কথা শেষ অন্য প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যাক।

২.৭ বাংলা বিজ্ঞাপনের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ভাষা-ভঙ্গিমায়, উপস্থাপনের ধরনে পরিবর্তন এসেছে।

বাঙালির যে নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য; যা একান্তভাবে তারই পরিচিতির প্রধান অংশ; বাংলা পত্রপত্রিকার ধারা সেই পরিচিতিরই অন্যতম চিহ্ন। আমরা এখানে বাংলা ভাষার জনপ্রিয়তম পত্রিকাটিকে নিয়ে খানিক আলোচনা করতে চাই। সেই পত্রিকাটি হল আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠীর সাহিত্যপত্র : *দেশ* ।

দেশ পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৯০ বঙ্গাব্দে। এই সংখ্যায় বেশ কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে সুবীর মিত্র'র 'দেশ : পঞ্চাশ বছরে প্রচার ও প্রসার' প্রবন্ধটি *দেশ* পত্রিকার ধারাবাহিক ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখান থেকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে দেওয়া হল।

১৯৩৩ সালের ২৪ নভেম্বর (৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০), শুক্রবার দিনটি বাংলা সাহিত্যের নবযুগের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এই সময়টি ছিল গভীরভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রতিরোধ, আন্দোলনের কাল। তারপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে *দেশ* ছড়িয়ে পড়েছে দেশের কত মানুষের ঘরে ঘরে, দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে পাড়ি দিয়েছে বিদেশেও। বাংলাদেশের ক্ষণস্থায়ী সাপ্তাহিকীর জগতে *দেশ* এনেছে স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি।

আনন্দবাজার পত্রিকা-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লকুমার সরকারের উদ্যোগ ছিল এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেই সময়ে সাহিত্যধর্মী কোনও সাময়িক পত্রিকা ছিল না। সেই অভাববোধ থেকেই *দেশ* এর জন্ম। প্রফুল্লকুমার চেয়েছিলেন দেশের উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিকায় জাতীয়তাবাদ এবং সাহিত্য সংস্কৃতির সমন্বয়।

এই পত্রিকার সূচনাকাল থেকেই পত্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

প্রথম বিজ্ঞাপনটিতে লেখা হয়, "বাঙ্গালাভাষায় একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সাপ্তাহিক পত্রিকার অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। এই অভাব দূরীকরণার্থ আনন্দবাজার পত্রিকার কার্য্যালয় হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদকতায় প্রথম সংখ্যা অদ্য ৮ই অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইবে..."[৪৭]

এর সঙ্গে সবিস্তারে বলা ছিল গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী, যাতে উৎসাহী পাঠকের কাছে *দেশ* সঠিক সময়ে পৌঁছে যেতে পারে।

প্রফুল্লকুমার সরকার এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদারের বিচক্ষণতায় জন্মমুহূর্ত থেকেই পাঠকের কাছে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায়, *দেশ* পত্রিকা এতদিন প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকাগুলির চাইতে অন্যরকম। স্বভাবতই *দেশ* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজে সাড়া পড়ে যায়। নতুন স্বাদের সাপ্তাহিক পৌঁছে যেতে থাকে উৎসাহী বাঙালির ঘরে

ঘরে। জাতীয়তাবোধ, স্বাদেশিকতা এবং নির্ভীক মানসিকতার জন্য *দেশ* পত্রিকা সর্বত্র সমাদৃত হতে থাকে। *দেশ*-এর আবির্ভাব এজেন্টদের মধ্যে সাড়া ফেলে দেয়। সকলেই এই পত্রিকার এজেন্সী নেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

শিক্ষিত বাঙালি সমাজের এই সমাদর লক্ষ্য করে, *দেশ*-এর প্রথম বর্ষপূর্তিতে যে বিজ্ঞাপন[৪৮] দেওয়া হয় তা হল-

> "...দেশ একাধারে, দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক। 'দেশের' প্রতিসংখ্যা বহুচিত্র সম্ভারে সজ্জিত, 'দেশে'র দ্বারা দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিকের অভাব পূরণ হয়। কিন্তু পৃথকভাবে দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিকপত্রে 'দেশের' অভাব পূরণ হয় না। 'দেশ' দেশবাসীর কিরূপ সমর্থন লাভ করিয়াছে প্রথম ক্রমবর্দ্ধমান প্রচারেই তাহার পরিচয়, বর্ষারম্ভে 'দেশের' গ্রাহক হউন, আপনিও দেশের সেবাকার্য্যে পরিতুষ্ট হইবেন। যাঁহারা লইতে চাহেন, তাঁহারা অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখুন।
>
> দেশের বার্ষিক মূল্য-৫ টাকা ষাণ্মাসিক মূল্য ২।। টাকা
>
> প্রতিখানা নগদ মূল্য-ছয় পয়সা
>
> ম্যানেজার 'দেশ' ১ নং বর্ম্মন স্ট্রীট"

উক্ত বিজ্ঞাপনটিতে দেখা যায় 'দেশ' শব্দটিকে নিয়ে খেলা হয় নানাভাবে। পত্রিকার নামের সঙ্গে দেশের ওতোপ্রত সম্পর্ক বুঝতে পাঠকের দেরি হয় না।

মাত্র ছয়-সাত বছরের মধ্যেই *দেশ* পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ২০০০ কপি থেকে ৯৫০০ কপি স্পর্শ করে। কেবলমাত্র নিজেদের বিজ্ঞাপনই নয়। অন্যান্য পত্রিকার বিজ্ঞাপনও *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রথম বছর থেকেই আয়োজন করা হয় শারদীয়া সংখ্যার। নিয়মিত সংখ্যাকে বিশেষভাবে সজ্জিত করে, অল্প মূল্য বাড়িয়ে 'শারদীয়া দেশ' দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তার জন্য যথোপযুক্ত বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়।

দেশ প্রকাশের পর থেকেই প্রচারবিভাগ থেকে প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে চেষ্টা করা হয় যাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এজেন্সী গঠনের। যাতে *দেশ* এর অভাব কোনও উৎসাহী পাঠককে ভোগ করতে না হয়। অন্যান্য পত্রিকাগুলি এইভাবে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেনি ইতিপূর্বে। *দেশ* পত্রিকার বিজ্ঞাপন-কৌশলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই পত্রিকাগুলিও বিজ্ঞাপনে নানান চমক আনে। পত্রিকার গ্রাহক হলে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের গ্রন্থে বিশেষ ছাড় মিলবে, এমন সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি ও পাঠকদের অবগতির জন্য মাঝমধ্যে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-তেও *দেশ*-এর বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন এবং নিয়মিত পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল এই বিজ্ঞাপনগুলির মূল উদ্দেশ্য। কখনও কখনও বিশেষ রচনা এবং লেখকসূচি তুলে ধরা হত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এই ধারাবাহিক বিজ্ঞাপনের ফলেই বহু পাঠকের *দেশ*-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে, আগ্রহ জন্মায়।

এইরকমই একটি বিজ্ঞাপন ১৯৩৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী *আনন্দবাজার পত্রিকা*-তে লক্ষ করা যায়[৪৯] -

"যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

শতবার্ষিকী স্মৃতি উপলক্ষ্যে

১৪শ সংখ্যা

'দেশ'

> সেই মহামানবের সম্পর্কে পুণ্যকথা, প্রবন্ধ, কবিতা ও বহুচিত্র সম্বলিত অর্ঘ্য লইয়া বাহির হইবে। ইহা ছাড়া যথারীতি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, সম্পাদকীয় মন্তব্যাদিও থাকিবে। মোটকথা এই সংখ্যাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার সকল প্রকার আয়োজন করা হইতেছে।"

লক্ষ্যণীয়, বিজ্ঞাপনের কপিটি ছিল নির্মেদ এবং ঝরঝরে গদ্যে লিখিত। তৎকালীন অধিকাংশ বিজ্ঞাপনে দীর্ঘ কপি লেখার প্রবণতা দেখা যায়। সেই তুলনায় *দেশ*-এর বিজ্ঞাপন ছিল খুবই অন্যরকম।

ক্রমে দেশের প্রচার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রবাসী বাঙালিরাও বঞ্চিত হননি *দেশ*-এর সাহচর্য থেকে। প্রচার বিভাগ অবিভক্ত বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে নতুন এজেন্সী গঠনে উদ্যোগী হল। বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রবাসী বাঙালিদের যোগসূত্রের সেতু হয়ে দাঁড়ালো *দেশ*। বিজ্ঞাপনদাতারা *দেশ*-এর ব্যাপক প্রচার লক্ষ্য করে এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

উল্লেখ্য, এই সময়ে সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলিও প্রচার বৃদ্ধির জন্য *দেশ*-এ বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করে। *শনিবারের চিঠি*, *বঙ্গলক্ষ্মী*, *হিতবাদী*, *জয়শ্রী*, *বঙ্গবাসী*, *ভাবীকাল*, *বসুমতী* ও নানান পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করা যায় *দেশ*-এ।

দেশ-এর জন্মলগ্ন থেকেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তাল। রাজনৈতিক আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এই সময়ে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুস্থ ধারাটিকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছে *দেশ*। সে কারণেই এই পত্রিকার প্রতি পাঠকদের আস্থা, বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। কাগজের দুর্মূল্যতা এবিং আনুষঙ্গিক ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় *দেশ*-এর মূল্যবৃদ্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে দেশের সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আদেশের ফলে *দেশ*-এর প্রচার সংখ্যা ৯৫০০ কপিতে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, বাধ্যত কমিয়ে আনতে হয় পৃষ্ঠা সংখ্যাও। এই সময়েই *দেশ*-এ 'সমরবার্তা' নাম দিয়ে নতুন একটি কলাম প্রকাশিত হতে থাকে। জাতীয়তাবাদের রাজরোষ থেকে মুক্তি পায়নি *দেশ*। সরকার বিরোধী জাতীয়তাবাদী লেখা প্রকাশ হওয়ার অপরাধে জরিমানা হয় *দেশ* পত্রিকার। কিন্তু ইত্যাদি বহুবিধ বিধিনিষেধ সত্ত্বেও *দেশ*-এর অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে *দেশ*-এর 'প্রচার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আদেশ' স্বাভাবিকভাবেই উঠে যায়।

প্রচার সংখ্যা ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়ায় ৯৫০০ থেকে ১১৫০০ কপি। প্রকাশিত হতে থাকে পরপর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি।

ছয়ের দশক থেকে *দেশ* -এর প্রচারসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। সাতের দশক থেকে নিয়মিত সংখ্যার বাইরেও আলাদা করে প্রকাশিত হতে থাকে 'সাহিত্য সংখ্যা'। নিয়মিত নতুন নতুন বিভাগের সংযোজন জারি রেখেছিল *দেশ*।

এই ছয়ের দশক থেকেই একটি যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত করল *দেশ*। ১৯৬২ সালের ১ ডিসেম্বর-পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির প্রচ্ছদে মূলত থাকতো পণ্যের বিজ্ঞাপন।

এই সংখ্যাটি থেকে শুরু হল প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদ পরিবর্তন। সেকাল-একালের পরিচিত-অপরিচিত শিল্পীদের চিত্রব্যবহার প্রথম দেখা গেল *দেশ*-এর পাতাতেই। উপেক্ষিত অথচ প্রতিভাবান শিল্পীদের যথযোগ্য শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেয় *দেশ*। এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা এবং প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধিতে এই প্রচ্ছদশিল্পের অবদান অনস্বীকার্য।

পরবর্তীকালে *দেশ*-এর বিজ্ঞাপনে কপি'র সঙ্গে ছবি এসে যুক্ত হয়। সেরকম দুইটি বিজ্ঞাপন এইখানে তুলে দেওয়া হল। দুটি বিজ্ঞাপনই আটের দশকের।

দেশ পত্রিকার **১৯৮২**’র বিশে মার্চ সংখ্যাতে ছিল ‘বিশ্বভারতী ক্রোড়পত্র’। সংক্ষিপ্ত কপিতে অল্প কয়েকটি শব্দে বিশ্বভারতী’র প্রাথমিক ইতিহাসটুকু ধরা আছে এই বিজ্ঞাপনে। সঙ্গে রয়েছে ছবি।

দেশ পত্রিকা বিজ্ঞাপনটিতে সবিনয়ে জানায় **১৯৮২** সালে বিশ্বভারতী’র ষাট বছর পূর্তি হচ্ছে, তা দেশবাসীর কাছে গৌরবের বিষয়। এই বিশ্বভারতীতেই ভারত সমগ্র বিশ্বকে উদার আহ্বান জানিয়েছে। সেই গভীর ঐতিহ্যবাহী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বভারতীর স্মৃতিচারণ এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এই দেশের সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গীভূত। তার গুরুত্ব স্মরণে রেখেই “বাংলা ভাষার একতম সাহিত্যপত্র” *দেশ*-এর কর্তৃপক্ষ এই বিশেষ ক্রোড়পত্র’র উদ্যোগ নিয়েছেন।

চিত্র ২.৫২ বিজ্ঞাপনটি দেশ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৮৩ থেকে প্রাপ্ত

বিজ্ঞাপনটি ভাষার প্রসাদগুণে এবং ছবির নিপুণতায় এমনই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে যে চার দশক পরেও মুগ্ধতার সুগভীর রেশ রেখে যায়।

পরবর্তী বিজ্ঞাপনটি *দেশ,* ২৪ জুলাই, **১৯৮২** সংখ্যার। বিজ্ঞাপনটি সহজ, স্পষ্ট এবং ছিমছাম। ভাষা বা ছবির উল্লেখযোগ্য কারুকাজ এই বিজ্ঞাপনে নেই। তবু এই বিজ্ঞাপনটির সহজতাই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই *দেশ*-কর্তৃপক্ষ 'দেশ' শব্দটিকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন সময়ে। একটি বাক্যে একাধিকবার একই শব্দের পুনরাবৃত্তি অর্থে এনেছে নানান পরিবর্তন। দেশ ও দেশের রাজনীতির সঙ্গে *দেশ* পত্রিকার সম্পর্ক যে গভীর। রাজনীতি, সমাজ নিরপেক্ষভাবে যে এই পত্রিকা বেড়ে ওঠেনি, সাহিত্যপত্রিকাটি যে রাজনৈতিকভাবেও সবল হয়ে উঠেছে, তার নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত তৈরি হয়েছে, তাও যেন স্পষ্ট হয়েছে 'দেশ' শব্দ নানাভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে।

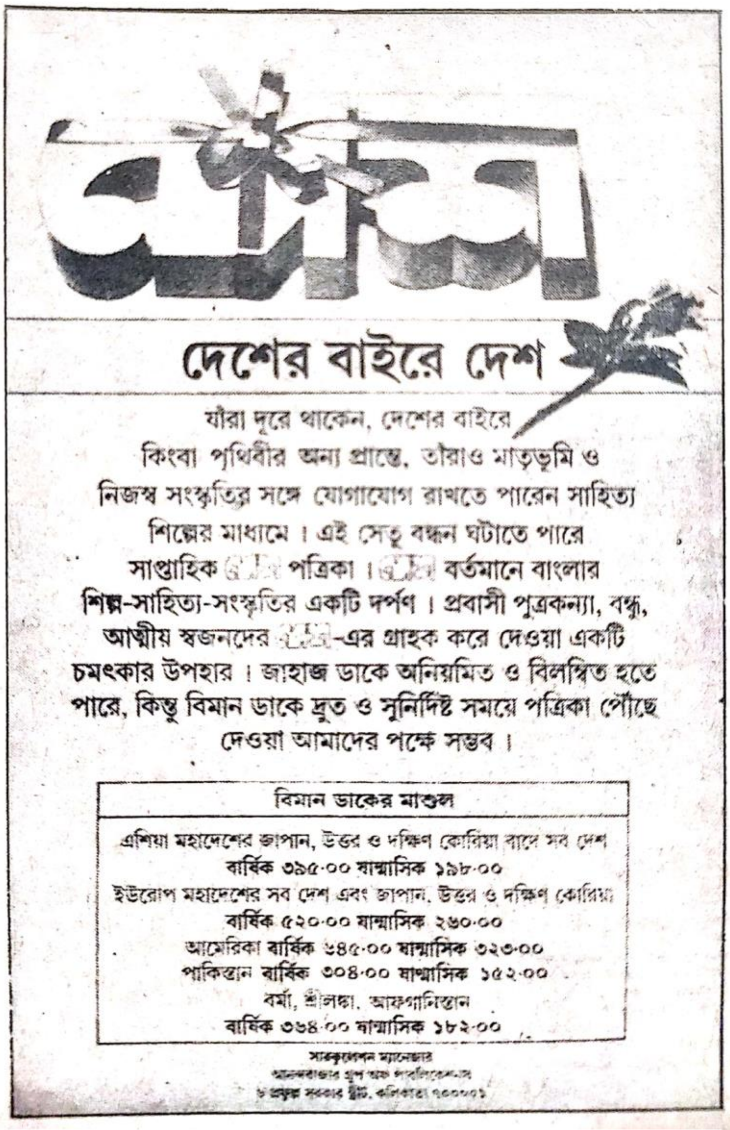

চিত্র ২.৫৩ বিজ্ঞাপনটি দেশ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৮৩ থেকে প্রাপ্ত

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কিছু মানুষের কাছে দেশের সংজ্ঞা রাতারাতি পাল্টে যায়। আজন্ম তাঁরা যাকে নিজের 'দেশ' বলে জেনে এসেছেন, হঠাৎ একদিন জানতে পারেন তাঁরা সেই দেশে বিদেশি, যেতে হবে অন্য দেশে। ঘরবাড়ি, জমি, বাগান, পুকুর কিংবা প্রিয় পোষ্যটিকে সঙ্গে করে আনা হয়নি নতুন দেশে। বুকের মধ্যে গভীর ক্ষত বহন করে বহু মানুষ এক দেশ থেকে পাড়ি দিয়েছেন অন্য দেশে। প্রিয়জন, চেনা পরিবেশ হারিয়ে, নতুন দেশে এসে পেয়েছেন 'উদ্বাস্তু'র তকমা। দেশভাগের সঙ্গে মিশে আছে গভীর লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, রক্তক্ষরণ, প্রিয়জন হারানোর বেদনার ইতিহাস। সেসময় থেকে বাংলার মানুষ বুঝেছেন 'দেশ' বিষয়টিকে কোনওভাবেই ভৌগোলিক সংজ্ঞায় খাপ খাওয়ানো যায় না। আসল 'দেশ' থাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, যা তাঁরা বয়ে বেড়াবেন আমৃত্যু।

দেশ পত্রিকা 'দেশ' বিষয়ে বাঙালির আবেগকে চিহ্নিত করতে ভুল করেনি। তাই যেসব বাঙালি কর্মসূত্রে, বাধ্যত অথবা হয়তো নিতান্ত স্বেচ্ছায়ই দেশের বাইরে রয়েছেন; তাঁদের সঙ্গে যেন মাতৃভূমি এবং নিজস্ব সংস্কৃতির সেতুটি

ছিন্ন না হয়ে যায়, সেই চেষ্টা চালিয়েছে। বিজ্ঞাপনেও জানানো হয়েছে সেই কথাই। কপিতে লেখা হয়েছে, "প্রবাসী পুত্রকন্যা, বন্ধু, আত্মীয়স্বজনদের 'দেশ'-এর গ্রাহক করে দেওয়া একটি চমৎকার উপহার..." কারণ বর্তমানে *দেশ* হল বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি দর্পণ।

প্রবাসী গ্রাহকদের আশ্বাস দেওয়া হয়, তাঁদের কপি পৌঁছোতে বিলম্ব হবে না, কারণ এটি অনিয়মিত। বিলম্বিত ডাকযোগে না পৌঁছে পাঠানো হবে বিমানে। সঙ্গে সুস্পষ্ট তালিকা করে জানানো হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিমান ডাকের বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক মাশুলের হিসাব। এশিয়া মহাদেশের জাপান, উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়া বাদে বাকি সব দেশের বাঙালির হাতে নিজের *দেশ*-টি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেয় এই বিজ্ঞাপন।

দেশ-এর ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা-প্রদত্ত আধুনিক অথচ সুন্দর বাঙালি বিজ্ঞাপনগুলি বিস্মিত এবং মুগ্ধ করে। বিজ্ঞাপনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যটি স্বভাবতই আত্মপ্রচার। কিন্তু প্রকাশের ধরনে, ভাষা-ছবি-কপিতে বিনীত, একান্ত বাঙালি ভাবটি *দেশ* পত্রিকার ইতিহাস বিষয়ে এতগুলি কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। *দেশ* পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যাটির কাছে এই ইতিহাস জানতে পারার জন্য পুনরায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেই হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গবেষণাপত্রে যে যে বিজ্ঞাপন ব্যবহৃত হয়েছে, তার একটি বড় অংশই গৃহীত হয়েছে *দেশ* পত্রিকার বিভিন্ন দশকের নানান সংখ্যা থেকে। অজস্র পণ্যের অজস্রতর বিজ্ঞাপন এই পত্রিকায় পাওয়া গেছে। কিন্তু *দেশ*-এর জন্মলগ্নের চিত্রটি এরকম ছিল না।

দেশ পত্রিকার এই সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যাতে একদিকে যেমন সুবীর মিত্র'র 'দেশ : পঞ্চাশ বছরে প্রচার ও প্রসার' শীর্ষক প্রবন্ধটি বেরোয়, যেখানে *দেশ*-এর ধারাবাহিক ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কাহিনি জানতে পারি, জানতে পারি প্রচারের মাধ্যমে দেশের গন্ডী পার করে বিদেশের বিদেশের মাটিতে প্রসারের কথা; ঠিক তেমনই এই বিশেষ সংখ্যাটির পরবর্তী প্রবন্ধ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য লিখিত 'প্রচার সাহিত্যের পঞ্চাশ বছর' থেকে কেবলমাত্র *দেশ*-এর বিজ্ঞাপনই নয়, এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে।

একদা পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরিবর্তে মূলত দেওয়ালে কাঠের ব্লকে ছাপা পোস্টার সেঁটে, হ্যান্ডবিল বিলি করে প্রচারের কাজ সারা হত। সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারের বস্তু বলতে ছিল বিদেশী শৌখিন জিনিসপত্র,

যার অধিকাংশই প্রকাশিত হত ইংরেজি কাগজে। ফলে *আনন্দবাজার পত্রিকা* গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক পত্রিকা যখন ১৯৩৩ সালে ভূমিষ্ঠ হল, তখন সেই পত্রিকায় তেমন বিজ্ঞাপন যে থাকবে না, তা ছিল জানা কথা।

এইসময়ে *দেশ* পত্রিকা সাহিত্যকে তাদের প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতেন, রাজনৈতিক সুর ঝংকৃত হত কমবেশি সব রচনাতেই। তাই বিজ্ঞাপন পাওয়ার কথা, এমনকি কর্তৃপক্ষরও ধ্যান-ধারণা বাইরে ছিল। কদাচিৎ খাঁটি ঘি, ইটালিয়ান কেক ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের ছোট বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত। সঙ্গে প্রকাশিত হত এমন কিছু বিজ্ঞাপন, যা ছিল সৌজন্যমূলক, দেশ ও দশের সেবার্থে। যক্ষ্মা রোগমুক্তির চিকিৎসার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন কখনও রবীন্দ্রনাথ, কখনও আবার *প্রবাসী* সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পুষ্টি এবং রোগমুক্তির বিজ্ঞাপনের পরেই আসে প্রসাধনদ্রব্যের বিজ্ঞাপন। তাও তা সংখ্যায় ছিল নগণ্য। *দেশ* পত্রিকার শৈশবকালে, প্রথম কয়েকটি বছরে বিজ্ঞাপনের মাপ অনুযায়ী অত্যন্ত কম চার্জ ধার্য করা থাকলেও তেমন বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে কিছু কিছু সরকারী বিজ্ঞাপন আসতে শুরু করে। এই ধরনের সরকারী বিজ্ঞাপন সাহিত্য পত্রিকায় ছাপাবার ইচ্ছে কতৃপক্ষের না থাকলেও তাঁরা কিছুটা নিরুপায় ই ছিলেন। মিলিটারি বিজ্ঞাপন না ছেপে সাময়িক পত্রিকা চালানো সে সময়ে অসম্ভব ছিল।

এর পরে ক্রমে ক্রমে কিছু অন্যান্য বিজ্ঞাপনও আসতে শুরু করে। *দেশ* তখনও আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হতে পারেনি। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে কাগজেরও আকাল দেখা দেয়। *ভারতবর্ষ, প্রবাসী, শনিবারের চিঠি* তে সেসময়েও বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য্য থাকলেও *দেশ* তখনও পর্যন্ত তেমন বিজ্ঞাপন পেতো না। অবশেষে কতৃপক্ষ খুঁজে বের করতে পারেন বিজ্ঞাপন পাওয়ার সাফল্যের চাবিকাঠিটি। *দেশ* প্রতিনিধি প্রকাশকদের ২০-২৫ শতাংশ ছাড় দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হবার প্রস্তাব দিয়ে হাতে হাতে ফল পেয়েছিলেন।

এই সময়ে 'সিগনেট প্রেস' সবদিক থেকেই প্রকাশনায় নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করে। তাদের প্রতিটি বিজ্ঞাপন ছিল মার্জিত, সহজবোধ্য; অথচ নান্দনিক এবং রুচিসম্পন্ন। এই সিগনেট-এর বইয়ের বিজ্ঞাপন *দেশ*-এর পাতায় স্থান পায়। পূর্ব রেলওয়ে থেকে বনস্পতি ঘি, লক্ষ্মীবিলাস তৈল অথবা জীবনবীমা থেকে আনন্দ পাবলিশার্স; বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ থেকে সাধারণ বিজ্ঞাপন, সবই স্থান করে নেয় *দেশ* পত্রিকার পাতায়। প্রাথমিক কয়েকটি বছরের বিজ্ঞাপনের ঘাটতি পূরণ হয় অল্প সময়েই।

আটের দশকে *দেশ* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপাবার খরচ বেশ উল্লেখযোগ্য রকম বৃদ্ধি পায়, তথাপি বিজ্ঞাপন পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল-

> ১৯৮২ সালে দেশের প্রচ্ছদ নয়নাভিরাম বহুবর্ণে রূপায়িত হয়েছে, চতুর্থ কভারের চার্জ হয়েছে ১১,৫০০ টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কভারের জন্য (এ দুটি শাদা কালোয় ছাপা) যথাক্রমে দক্ষিণা ৫৭৫০ টাকা ও ৫৫০০ টাকা। আর সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠার জন্য : ৫৩০০ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠার জন্য ২৮০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠার জন্য ১৫০০ টাকা চার্জ। অঙ্ক দেখে আঁতকে ওঠার আগে মনে রাখতে হবে, এই চড়া হারের কড়ি গুণে দেবার মত মক্কেলের অভাব নেই : বড় বড় টেক্সটাইল মিল, সিগারেট কোম্পানী, প্রসাধনী, টি ভি, ইলেকট্রনিক কেমিক্যাল, গৃহ সজ্জা, পটারি, ফুড, ভিটামিনযুক্ত বিবিধ ওষুধ এমনি বহু ও বিচিত্র বিজ্ঞাপনের বহর পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে। বাংলা বই-এর অসুবিধা, প্রকশনা এখনো শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। সংখ্যাতে প্রকাশক অনেক বাড়লেও প্রচারে আঞ্চলিক ভাষার বাংলা ভাষার বই বেশ পিছিয়ে আছে। একথা যেমন ঠিক তেমন এও ঠিক যে, মানুষ বুদ্ধির বলে বলীয়ান। বুদ্ধিমান প্রকাশকেরা তাই ঘন ঘন বিজ্ঞাপন না দিয়ে একসঙ্গে বিলম্বিত অন্তরে একটা বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। যাঁরা প্রতিষ্ঠানের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা জানেন লেখক ও বই-এর নামাবলী পাঠক মহলে পৌঁছে দিতে পারলেই সিদ্ধিলাভ হবে। একেবারে স্বল্পসামর্থ্যের বিজ্ঞাপনদাতার জন্য রয়েছে প্যানেল আর বক্স-দেশ কর্তৃপক্ষ এঁদের স্বার্থের মুখ চেয়ে সুলভ টেনেমেন্টের বন্দোবস্ত করেছেন।[৫০]

দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র বড় বড় সংস্থার জন্যই না, স্বল্পসামর্থ্যের বিজ্ঞাপন দাতাদেরকেও নিরাশ করেননি *দেশ* কর্তৃপক্ষ। এই পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ভান্ডারটি তাই পরিপূর্ণই থেকেছে।

গল্প, উপন্যাস, নাটক-সিনেমা ইত্যাদির পাঠক যেমন আছেন, তেমনই বিজ্ঞাপনের একনিষ্ঠ পাঠকও অজস্র। প্রচারসাহিত্যকে আপাত দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ লঘু অথবা চটুল, কেবলমাত্র পণ্য বিক্রয়ের হাতিয়ার মনে হলেও, বিজ্ঞাপন জগতের দক্ষ কপি রাইটার এবং শিল্পীদের পাকা হাতের কাজে তা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। রেখে যেতে পারে সুদূরপ্রসারী, গভীর ছাপ। *দেশ* পত্রিকার দীর্ঘ যাত্রাপথে তা যেমন একদিকে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় দৃষ্টান্ত রেখেছে। তেমনই প্রচারসাহিত্যেও দেশের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে *দেশ*-এর পাতায়।

গত শতাব্দীর সাত, আটের দশকের বিজ্ঞাপন নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পরে এবার নয়ের দশক থেকে ক্রম-পরিবর্তমান বিজ্ঞাপনের ভাষা নিয়ে একটু কথা বলা দরকার। আনন্দবাজার পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যাটিতেই সুভাষ

ঘোষাল 'বিজ্ঞাপনে বাংলা ভাষা নিয়ে ছেলেখেলা চলবে না' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উল্লেখ্য, সুভাষ ঘোষাল (১৯২৫-১৯৯৮) ছিলেন Hindustan Thompson Association (HTA) অথবা JWT (James Walter Thompson)'র চেয়ারম্যান। বহু বছর ধরে বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

তিনি সেই প্রবন্ধে লিখছেন, বর্তমানের বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং কথ্য ভাষায় তফাৎ আকাশ-পাতাল। তিনি এই পার্থক্যের কিছু কারণ নির্ণয় করেন। তাঁর ধারণা শতকরা নব্বই ভাগ বিজ্ঞাপন চিন্তা-চর্চা করা হয় ইংরেজি ভাষায়, এবং সেখান থেকে তা বাংলা ভাষায় বাঙালি পাঠকের জন্য অনুবাদ করা হয়। দুর্বল অনুবাদের কারণে বিজ্ঞাপন হয়ে পড়ে নিতান্ত শ্রীহীন। এবং সেই অনুবাদের দারিদ্র্যই সব সমস্যার মূল। বিজ্ঞাপন জগতের পিছনে বহু অর্থ ব্যয় হলেও বাংলা বিজ্ঞাপনের এই নাজেহাল অবস্থা কেন হচ্ছে, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপন তৈরির পূর্বপটটি। তাঁর লেখা উদ্ধৃত করা হল-

> একটু খতিয়ে দেখা যাক বাংলা অনুবাদ কী করে ঘটে (ইচ্ছা করেই 'ঘটে' শব্দটি ব্যবহার করছি)। যে সব অনুবাদক বিজ্ঞাপন জগতের মুশকিল আসান করে থাকেন তাঁরা প্রায় সকলেই তর্জমার কাজ করেন বাড়তি উপার্জনের জন্য। তাঁদের প্রধান রোজগার স্থায়ী চাকুরির মাইনে থেকে বা নিজ ব্যবসার লাভ থেকে। দু-পাঁচটা বিজ্ঞাপনের অনুবাদ করে পয়সা না কামালে তাঁদের উনুনে হাঁড়ি চড়বে না এমন নয়। একেই তো যে মজুরি তাঁদের দেওয়া হয়-অন্তত আগেকার দিনে হত-তাতে দিন গেলে পানদোক্তার খরচ ওঠানোও ভার।[৫১]

ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার বাক্যগঠন প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন হবার কারণে এমন আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে পড়ে দুর্বোধ্য। ইংরেজি 'বিউটি সোপ' এর বাংলা করলে বাংলায় তা হয়ে দাঁড়ায় 'সৌন্দর্য্য সাবান'।

মনে পড়ে সুবিমল মিশ্রের লেখা একটি ছোট গল্পের কথা, গল্পটির নাম 'আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর কোল্ড ক্রিম তখন আপনার ত্বকের গভীরে কাজ করে'[৫২]

এই বিজ্ঞাপনের প্রায় প্রতিটি শব্দই কোনও না কোনও জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছে। যতিচিহ্নহীন ভাবে লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ একটি বাক্য। বিজ্ঞাপন কীভাবে মানুষের জীবনকে গ্রাস করে, তাকে বিজ্ঞাপনের তালে নাচতে শেখায়, তারই প্রতিরূপ হয়ে ওঠে গল্পটি। সুভাষ ঘোষাল আশঙ্কা করেছিলেন, বিজ্ঞাপনে যেমন 'চামড়া' বদলে হয়ে যায় 'ত্বক'-এ, 'খুশকি' পরিণত হয় 'ড্যানড্রাফ'-এ, সেভাবেই বোধহয় কোনও না কোনওদিন বাঙালির মুখের ভাষাতেও ঢুকে যাবে এই শব্দগুলি। বাঙালি কথা বলবে এই বিজ্ঞাপনের ভাষায়।

সুভাষ ঘোষাল প্রবন্ধটি লেখার পরে ইতিমধ্যে আরও প্রায় পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ২০২১ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পদার্পণ করেছে তার শতবর্ষে। একশো বছরের উদযাপনে আনন্দবাজার একের পর এক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে চলেছে সমকালীন বাঙালির বিবর্তন নিয়ে। তাতে লিখছেন সমসাময়িক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাবন্ধিকরা।

২০২১ এর ২৯ নভেম্বরে 'বাঙালি মন বাঙালির প্রাণ' নামের ক্রোড়পত্রে শৌভিক মিশ্র 'বাঙালির মন ও বিজ্ঞাপন' নামের একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনিও জানাচ্ছেন সেই কথা যে এক সময় এই দেশের বিজ্ঞাপন শিল্পের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। বঙালির মননের সুগভীর ছাপ ছিল বিজ্ঞাপন গুলিতে। বহু বিজ্ঞাপনই একদা হয়ে উঠেছিল বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ। আজকের দিনেও যে বিজ্ঞাপনগুলি আলোচিত হয়। নানা পুরনো বিজ্ঞাপনের বিবরণ দিয়ে শেষে তিনি জানান বিজ্ঞাপন শৈলী যেমন বাঙালির মননের পরিচায়ক, তেমনই বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একটি সমাজের প্রতিফলক হয়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তিত হয়েছে বিজ্ঞাপিত পণ্যের চেহারা। বাঙালি জীবনে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়েছে। বাঙালির নতুন 'আধুনিকতা'র সঙ্গে তাল রেখে পরিবারে আবির্ভাব হয়েছে নতুন অতিথিদের। গ্রামোফোন বদলে সাউন্ড সিস্টেম হয়ে স্মার্ট ফোন-টিভির যাত্রাপথ কারুর অজানা নয়।

প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান তিনি একধরনের ইতিবাচকতায়,

> একশো বছর আগের বিজ্ঞাপন আর আজকের বিজ্ঞাপনে অনেক তফাত। কিন্তু একটি বিষয় বদলায়নি। শিল্পনৈপুণ্যে, সৃষ্টিশীলতায়, ভাষার ব্যবহারে, অভিনবত্বে বাংলা বিজ্ঞাপনের স্বকীয়তা। বাংলার স্বকীয়তা।[৫৩]

সেই 'আজকের' বাংলা বিজ্ঞাপনের 'স্বকীয়তা' একবার যাচাই করা যাক।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৯১০-১৯৯০)-এর *দিনগুলি মোর* গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৮২'র সেপ্টেম্বর থেকে ৮৩'র জানুয়ারির মধ্যে। বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এর বছর দুই পরে ১৩৯২ বঙ্গাব্দে। তাও আজ থেকে প্রায় চার দশক আগের কথা। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে লিখছেন-

> লিখতে গিয়ে অমৃতলাল বসুর 'যাজ্ঞসেনী' নাটকের কথা মনে পড়ল। খুব ঘটা করে আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু অল্পদিনেই বন্ধ হয়ে গেল। নীল রঙের জমিতে সুদৃশ্য অক্ষরে ছাপা দেওয়ালে মারা পোস্টারের কথা মনে আছে।
>
> অগ্রবিজ্ঞাপনী/ নাট্যমঞ্চে যাজ্ঞসেনী/ অমৃতভাষিণী মিনার্ভার/

বিজ্ঞাপনের ভাষা এখন একটু খটমট মনে হলেও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মনে হত না। খুব প্রচারও হয়েছিল।... [৫৪]

আজ এই বক্তব্যের পরে আরও চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত। ‘খটমট’ ভাষা থেকে অতিসরলীকরণের বিধ্বংসী যাত্রায় বিজ্ঞাপনের কী হাল দাঁড়িয়েছে দেখলে কিঞ্চিৎ হতাশা জাগে।

ভারতের অর্থনীতির ইতিহাসে, উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে নয়ের দশকের মুক্ত বাজার অর্থনীতি যে গভীর পরিবর্তন আনে, সে কথা এই অধ্যায়ের আলোচ্য নয়। কিন্তু ৯২-এর একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিবর্তনশীল বাঙালির পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হবার ছবি দেখা শুরু করা যাক।

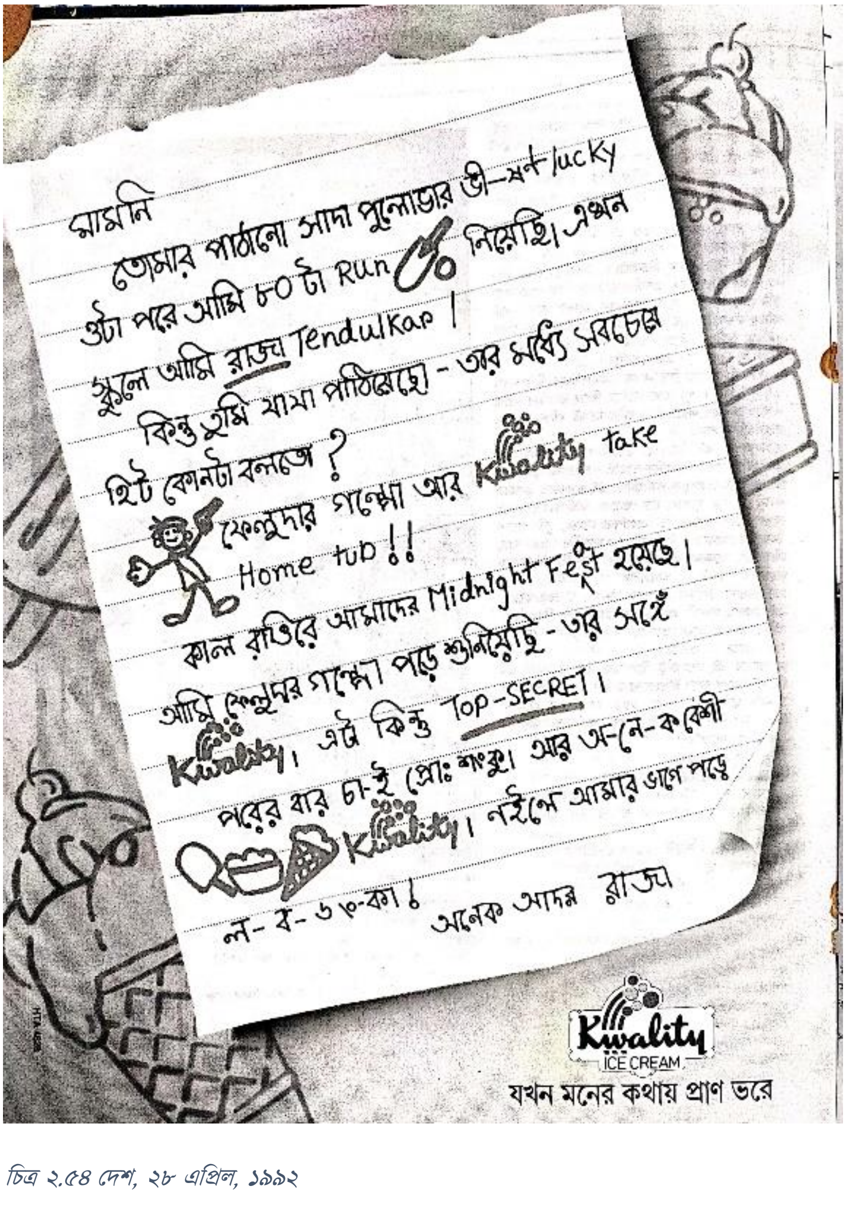

চিত্র ২.৫৪ দেশ, ২৮ এপ্রিল, ১৯৯২

‘কোয়ালিটি’ আইসক্রিমের আটের দশকের বিজ্ঞাপনগুলির কথা একটু আগে বলা হল। তারই এক দশক পরের একটি ‘কোয়ালিটি’র বিজ্ঞাপন পাশে রাখা যাক। বিজ্ঞাপনে চিঠির বয়ান, বিশেষত ছোটদের লেখা চিঠি আগেও ব্যবহৃত হয়েছে নানা ক্ষেত্রে। এখানেই রয়েছে ‘আদরের রাজা’র তার ‘মামণি’কে লেখা চিঠি। মা কে ‘মামণি’ বলার অভ্যাস আগের দশকগুলিতে বাঙালি সন্তানদের খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। ছেলেটি তার দূরে থাকা মা কে, যিনি সম্ভবত অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর এবং পুত্রকে নানান উপহার পাঠিয়ে থাকেন সময়ে সময়ে, চিঠি লিখে তার জীবনের সদ্য ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি জানায়। চিঠিটি মূলত

বাংলায় লেখা হলেও ইংরেজি শব্দে পরিপূর্ণ। এই হল সেই সময় যখন থেকে বাঙালি তাঁদের সন্তানদের ক্রমে ক্রমে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করা শুরু করলেন। কথ্য ভাষায় বেড়ে গেল ইংরেজির ব্যবহার, সময় বিশেষে বাংলার তুলনায় ইংরেজির কিঞ্চিৎ প্রদর্শন ফ্যাশন স্টেটমেন্টে পরিণত হল।

প্রায় সমসময়ের আরেকটি বিজ্ঞাপন পাশে রাখা যাক। বিজ্ঞাপনটি 'লিমকা'র। বিজ্ঞাপনের হাতে আঁকা রঙিন ছবি ছোটদের পছন্দ হবার কথা, বিশেষত যখন চরিত্রদের মুখে-চোখে এক ধরনের কার্টুনধর্মিতা এবং মজা আছে।

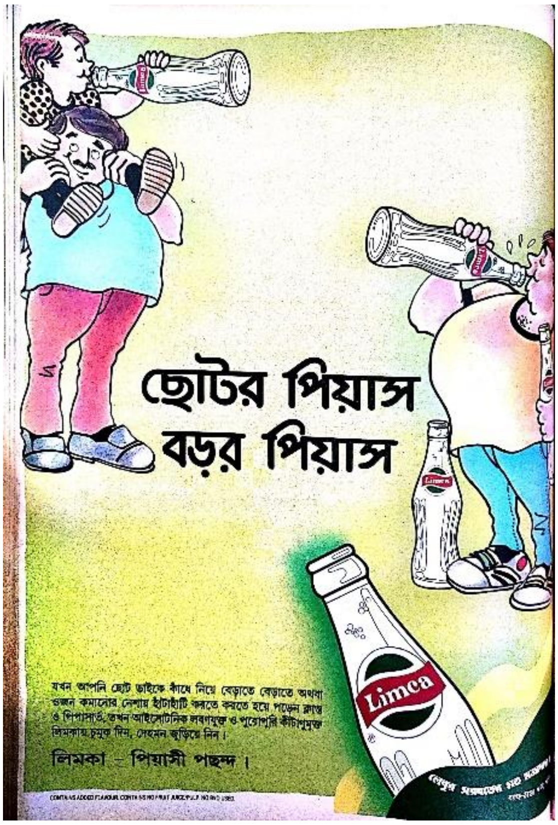

চিত্র ২.৫৫ শারদীয়া আনন্দমেলা, ১৪০০

আসা যাক কপিতে, বড় বড় করে কপিটিতে লেখা থাকে "ছোটর পিয়াস বড়র পিয়াস"। বাংলা ভাষায় 'পিয়াস' শব্দের ব্যবহার সাধারণত দেখা যায় না। হিন্দি শব্দ 'Pyaas' বা তৃষ্ণা থেকেই সরাসরি বাংলা করে ওই শব্দটি হয়ে দাঁড়ায় 'পিয়াস'।

এবং কপিতে ছোট ছোট করে লেখা থাকে ভাইকে কাঁধে নিয়ে বেড়ানোর সময়ে অথবা ওজন কমানোর নেশায় হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন লিমকা আপনাকে স্বস্তি দান করতে পারে। এই ওজন কমানোর নেশা'র বিষয়টি নিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়া, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি আগে খুব একটা মাথা ঘামাতো না। পেট ভরে ভাত খেয়ে কোনও গ্লানিবোধ সে অনুভব করেনি নিজের শরীর বিষয়ে। বাঙালির শরীরচর্চা বিষয়টি বহুকালের হলেও, খাদ্য তালিকা বা 'ডায়েট চার্ট'-এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, 'জিম' ইত্যাদির রমরমা বেড়ে যাওয়ায় ওজন কমানোর 'নেশা' তাকে পেয়ে বসে। এই বিজ্ঞাপনটি ছিল তারই প্রথম যুগের।

চিত্র ২.৫৬ উনিশ কুড়ি, পুজো সংখ্যা, ১৪২২

১৪২২ সালের ‘উনিশ কুড়ি’ পুজো সংখ্যার একটি বিজ্ঞাপন তার ভাষার অভিনবত্বের কারণে স্মৃতিতে থেকে যায়। প্রসিদ্ধ ‘ম্যাট্রিক্স’ কোম্পানির বিজ্ঞাপন, বাংলা পত্রিকায়, বাঙালিদের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞাপনের কাছে ন্যূনতম এইটুকু আশা রাখা যায় যে, বিজ্ঞাপনটির মধ্যে স্বকিয়তা না থাক, নাই বা থাক ভাষার প্রসাদগুণ, বিজ্ঞাপনটি অন্তত পড়ে বোঝা যাবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, এই বিজ্ঞাপনটির অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। অথচ বিজ্ঞাপনটি বাংলা ভাষাতে, বা বলা ভালো বাংলা বর্ণে লেখা। “বায়োম্যাচ ইনোভেশনের অভিজ্ঞতা লাভ করুন”, কাকে বলে ‘বায়োম্যাচ ইনোভেশন’ তা সাধারণ পাঠকের জানা না থাকলেও, লোভনীয় শ্যাম্পুর কৌটোর ছবি দেখে খুবই মোহময় কিছু হবে আন্দাজ করে নেওয়া যায়। নানান বড় বড় ‘টার্ম’ ব্যবহার করে ক্রেতাকে বেশ একচোট ঘাবড়ে দেওয়াও যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্য, অর্থাৎ, “চুল সংক্রান্ত সবকিছুর সমাধান করতে প্রকৃতির গোপনতা বায়োলাজ ডিকোডস্”-এর যে কী অর্থ তা কিছুতেই বোঝা যায় না। কয়েকটি ইংরেজি শব্দ এলোপাথাড়ি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মনে হয়। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর ক্রেতা সম্ভবত সেই ভাষার সঙ্গে আপোস করে নেন, বরঞ্চ ‘বায়োম্যাচ’, ‘বায়োলাজ’ ইত্যাদি বেশ দুর্বোধ্য, চমৎকার, রূপকথার বস্তু বলে বোধ হয়।

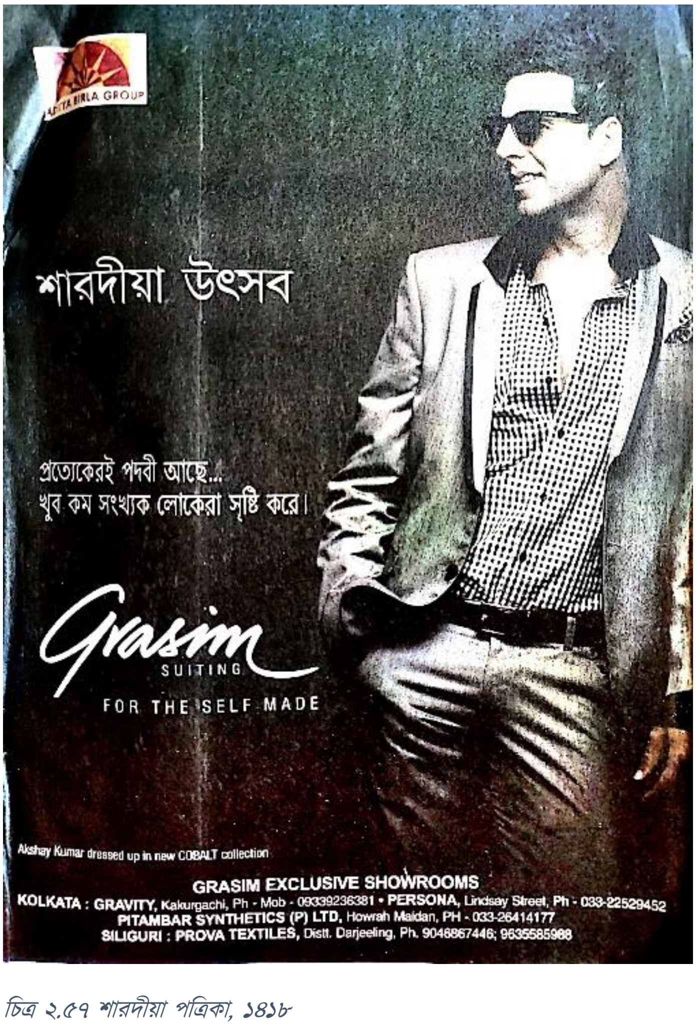

চিত্র ২.৫৭ শারদীয়া পত্রিকা, ১৪১৮

পুরুষ অভিনেতা বা মডেলরা বিভিন্ন সময়েই পোশাকের বিজ্ঞাপন করে থাকেন। ‘গ্রাসিম শ্যুটিং’ এর বিজ্ঞাপন করেন অক্ষয় কুমার। বিজ্ঞাপন জুড়ে শোভা পায় অক্ষয় কুমারের দামি পোশাক-পরিহিত ঝকঝকে একটি ছবি। বিজ্ঞাপনে কপি বলতেও তেমন কিছু নেই, আছে কেবল দুটি বাক্য। দুটি আপাতভাবে অর্থযুক্ত, এবং সর্বাঙ্গীনভাবে অর্থহীন বাক্য। সম্ভবত মূল ইংরেজি বা হিন্দি ভাষার কপিতে থেকে অনুবাদের ফলে বাংলা ভাষার এহেন পরিণতি হয়। পাঠকদের আন্দাজ করে নিতে হয় অক্ষয় কুমারের ছবির পাশে কিছু যখন বলা হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই ভালো কথাই হবে।

এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলির স্বকীয়তার অনুসন্ধান করতে গেলে খানিক বিপাকে পড়তে হয়।

প্রায় কাছাকাছি সময়ে অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা বিজ্ঞাপন করেন 'লোরিয়াল' কোম্পানির চুলে রঙ করার ক্রিমের। বিজ্ঞাপনের শিরোনামটি বাংলা হরফে লেখা, "গার্লস্, লেট'স্ ফেস ইট। নো কালার মানে নো ফ্যাশন"। এখানেও দুটির বাক্যের মধ্যে 'মানে' শব্দটি ছাড়া আর একটি বাংলা শব্দ পাওয়া যায় না। ভাষায়, বৈচিত্র্যে, উপস্থাপনায়, বিষয় নির্বাচনে সব দিক থেকেই বিজ্ঞাপনটি উৎসাহী বাঙালি পাঠককে নিরুৎসাহিত করার পক্ষে যথেষ্ট। তবে প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞাপনের কাজ যেহেতু সাহিত্য সৃষ্টি করা অথবা সুললিত গদ্য লেখা নয়, ফলত ভাষা যতই দুর্বোধ্য বা অপ্রাসঙ্গিক হোক না কেন, পণ্যের বিক্রয়ে তার প্রভাব পড়ে না বলেই মনে হয়।

কোনও বিজ্ঞাপনে আবার বাংলা কথা লেখা হয় রোমান হরফে, যেমন 'টাটা টি গোল্ড'-এর বিজ্ঞাপনে দেখা যায় লেখা আছে, "Khutkhutey Bangali'r Monmoto cha!"। বিজ্ঞাপনে বাংলা হরফ ব্যবহার করা কোনও কঠিন কাজ নয়, তবু কেন রোমান হরফে লেখা হল বোঝা যায় না। যদি বা লেখা হয়, তাও নজর দেওয়া হয় না প্রকৃত বাংলা উচ্চারণের দিকে। 'খুঁতখুঁতে' শব্দটিতে যে দুটি চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়, রোমান হরফে লেখার সময়ে সেই চন্দ্রবিন্দুকেন্দ্রিক আনুনাসিক ধ্বনি দুটি বাদ পড়ে যায়। ফলে কোনও স্বল্প বাংলা জানা এবং ইংরেজি পড়তে পারা বাঙালি যদি বিজ্ঞাপনটি দেখেন, তাঁরা অবশ্যম্ভাবীভাবে শব্দটির ভুল উচ্চারণ জানবেন।

শৌভিক মিশ্র *আনন্দবাজার পত্রিকা*-এর যে ক্রোড়পত্রে (২৯ নভেম্বর, ২০২১) তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি লেখেন, সেই ক্রোড়পত্রে সেইদিনেই প্রকাশিত কয়েকটি 'বাংলা' বিজ্ঞাপন এখানে তুলে ধরা হবে। মনে রাখতে হবে এই ক্রোড়পত্রের বিষয় ছিল "বাঙালির মন বাঙালির প্রাণ"। তারই তৃতীয় পৃষ্ঠায় একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনটি 'রিলায়েন্স' কোম্পানির

চিত্র ২.৫৮ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ নভেম্বর, ২০২১

গহনার। বিজ্ঞাপনে বিয়ের মরশুমে ‘মাধুর্যের সাথে’ বোধকরি ‘উজ্জ্বল’ হয়ে উঠতেই বলা হয়। কিন্তু সঠিক বানানের পরিবর্তে শব্দটি বিকৃতভাবে ছাপা হয়। ফলে ‘উজ্জ্বল’ বানান হয়ে দাঁড়ায় ‘উজ্বল’, যাতে পুনরায় শব্দটি ভুলভাবে উচ্চারিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এটি প্রকৃতই কপি লেখকের অজ্ঞতা, নাকি ছাপার ভুল তা বোঝার কোনও উপায় নেই। কেবলমাত্র এইটুকু বোঝা যায় যে বিজ্ঞাপনদাতা অথবা বিজ্ঞাপন যেখানে ছাপা হচ্ছে সেই সংবাদপত্র, কেউই বিজ্ঞাপনের মান নিয়ে তো বটেই, এমনকি বানানের বিষয়েও আদৌ ভাবিত নয়। মনে রাখতে হবে, এই ক্রোড়পত্রটির বিষয় হল বাঙালির সংস্কৃতি, যেখানে বলা হয় অপুর কথা, বলা হয় ঘটি বাঙালের যুদ্ধের কথা, বাউল-চৈতন্যের কথা, সেখানে একটিও এমন বিজ্ঞাপন নেই যাকে নির্দ্বিধায় ‘বাংলা’ বিজ্ঞাপন বলা যেতে পারে। পাঠক এই নিয়ে সর্বসমক্ষে সরব হলে তাঁরা এই গাফিলতি দেখাতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে। সম্ভবত ধরেই নেওয়া হয় দামি গহনা কেনার মত পারিবারিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যাঁদের আছে, তাঁরা এই নিয়ে চিন্তা করার থেকে সোনা কেনায় বেশি গুরুত্ব দেবেন। বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে মাথায় পাগড়ি, গলায় সোনার চেন পরা পুরুষদের। মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরুষদের মধ্যে সোনার হার, চুড়ি পরার চল কখনও ছিল না। কেবলমাত্র একটি বিজ্ঞাপন নয়, একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান বছরগুলিতে একের পর এমন বিজ্ঞাপন প্রকশিত হয়ে চলেছে, যাতে রয়েছে উল্লেখযোগ্য বানান ভুল। বহুক্ষেত্রে বাক্য সম্পূর্ণ হয়নি অথবা হয়ে দাঁড়িয়েছে হাস্যকর রকম অবোধ্য। এর মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য, সৃষ্টিশীলতা, সুন্দর ভাষার ব্যবহার খুঁজতে গেলে একাধারে ক্লান্তি এবং বিরক্তি আসে।

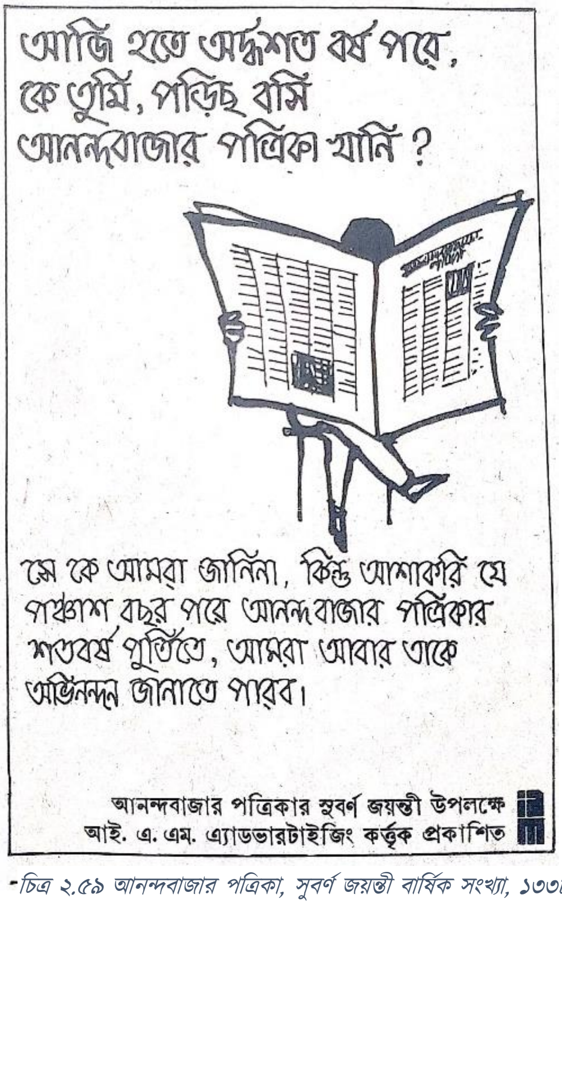

-*চিত্র ২.৫৯ আনন্দবাজার পত্রিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৩৮*

এই *আনন্দবাজার*-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে যায়। আই. এ. এম এ্যাডভারটাইজিং সংস্থা *আনন্দবাজার* কে অভিনন্দন জানিয়ে দিয়েছিল বিজ্ঞাপনখানি। বিজ্ঞাপনটির মধ্যে ছিল এক দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর। যা আজ অর্ধশত বর্ষ পরে স্মৃতিমেদুর করে তোলে। এই বিজ্ঞাপন সংস্থা এখন আদৌ আর সক্রিয় আছে কিনা, তাও জানা যায় না।

কপিতে পঞ্চাশ বছর পরের *আনন্দবাজার*-এর কোনও একনিষ্ঠ পাঠককে উদ্দেশ্য করে একটি বাক্য লেখা থাকে। আর আজ ঠিক সেই শতবর্ষ পূর্তিতে বিজ্ঞাপনটি দেখে 'টাইম ট্র্যাভেল'-এর অনুভূতি হয় যেন।

বিজ্ঞাপন সংস্থাটি একটি আন্দাজে ভুল করেনি। *আনন্দবাজার পত্রিকা* স্বমহিমায় একশো বছরে এসে পড়েছে। শুধু হারিয়ে গেছে সংস্থাটি এবং ভালো বাংলা বিজ্ঞাপন।

Response ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপন সংস্থা। বহু স্মরণযোগ্য বাংলা বিজ্ঞাপন তাঁরা তৈরি করেছেন। সেই বিজ্ঞাপন সংস্থা ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে, 'এক্ষণ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় বাংলা ভাষা এবং সেই ভাষার সঙ্গে বাংলা বিজ্ঞাপনের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একটি বিজ্ঞাপন দেন। এতে কোনও পণ্যের প্রচার নেই, যা আছে, তা হল বাংলা ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা।

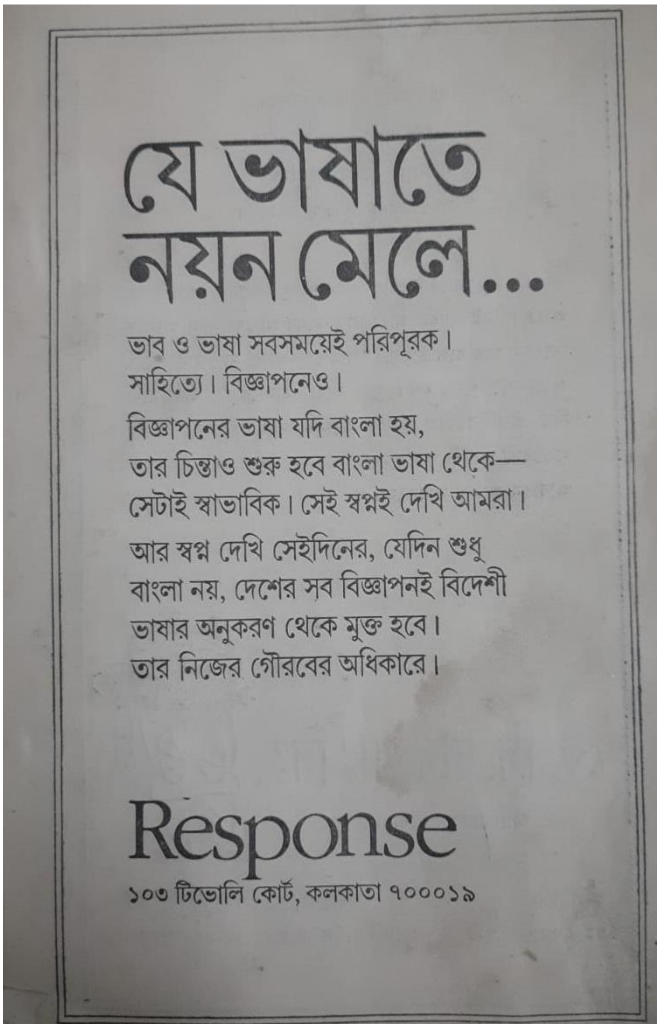

চিত্র ২.৬০ শারদীয় এক্ষণ, ১৩৯৪

ভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় ভাষায়, তাদের সম্পর্ক পারস্পরিক; তা সাহিত্যে হোক বা বিজ্ঞাপনে। বাংলা ভাষা, বিশেষত বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষার প্রতি আন্তরিকতা এই বক্তব্যের পাঠককে আজও আবেগপ্রবণ করে তোলে। সুভাষ ঘোষাল বলেছিলেন দুর্বল অনুবাদই বিজ্ঞাপনের খারাপ কপির জন্য দায়ী। 'রেসপন্স' ও আঘাত করে সেই মূল সমস্যাটিতে। বলা হয়, বিজ্ঞাপনের ভাষা বাংলা হলে, বিজ্ঞাপনকেন্দ্রিক সমস্ত চিন্তাভাবনাও বাংলা ভাষাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশ বহু দশক পূর্বে স্বাধীন হলেও ভাষার দাসত্ব থেকে, অনুকরণ থেকে মুক্ত হতে না পারায় বহু সৃষ্টি পূর্ণতা পায় না; সে সমস্যারও একদিন সমাধান হওয়ার স্বপ্নে শেষ হয় এই বিজ্ঞাপন।

পরিশেষে :

কিন্তু তার পরবর্তী দশকগুলিতে অনুকরণের দাসত্ব থেকে মুক্তির পরিবর্তে বাংলা বিজ্ঞাপন ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে; সমসাময়িক বিজ্ঞাপনগুলি তারই প্রমাণ দেয়।

একদা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালির যে রুচিবোধের ছাপ পড়তো বিজ্ঞাপনগুলিতে, শেষপর্যন্ত তা হারিয়ে গেছে। যাঁরা এই বিজ্ঞাপনের কপি লেখেন তাঁদের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান নিয়ে সন্দিহান হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ইংরেজি বা হিন্দি থেকে বাংলায় অনুদিত কপিগুলি হয়ে দাঁড়ায় যারপরনাই কিম্ভূত প্রকৃতির। বাঙালির যে মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতা, তার সাংস্কৃতিক সত্তা- এগুলির পরিচয় আর বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায় না। একবিংশ শতাব্দীতেও প্রতিনিয়ত বাঙালি সংস্কৃতি কী, তা নিয়ে বিতর্ক চলেছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে তা আজও চর্চার বিষয়। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি ‘কী নয়’, তা এই বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি এত চোখে আঙুল দিয়ে, নির্মম এবং নির্লজ্জভাবে বুঝিয়ে দিতে থাকে, তা যন্ত্রণার বিষয় হয়ে ওঠে। বুঝিয়ে দিতে থাকে বাঙালির সংস্কৃতি অধিকার করে নেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন। প্রতিদিন বাংলা বিজ্ঞাপন, বাংলা হরফের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছে গর্বিত ভঙ্গিতে, ভুল বানানে, ভুল ভাষায়, ভুল ছবিতে; তারা এই সংস্কৃতির পরোয়া করে না। তারা বাংলা কাগজেই বিজ্ঞাপন দিয়ে যাবে দিনের পর দিন, এবং বাঙালি বাধ্য থাকবে তা কিনতে, কারণ তার কাছে আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। এক ধরনের অন্য ভাষা সংস্কৃতি লুঠ করে নিয়ে গেছে আমাদের সংস্কৃতি। বাঙালির বিজ্ঞাপনের ধারাবাহিক ইতিহাসের দিকে নজর করলে সে কথা টের পেতে অসুবিধা হয় না। রসগোল্লা, দুর্গাপুজো, মৎস্য-প্রীতি, আড্ডা, চিরাচরিত শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি কয়েকটি চিহ্নই নয় কেবলমাত্র, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাঙালির রুচি এবং ভাষা বিজ্ঞাপনগুলিকে মাধুর্য্যময় করে রেখেছিল বহু দশক ধরে; বর্তমানে তারই দীর্ঘকালীন মৃত্যুদৃশ্যের সাক্ষী থাকতে হচ্ছে।

এই অধ্যায়ে যা বলার ছিল, তা মোটামুটিভাবে বলা হল। বাঙালি মধ্যবিত্তের চেতনা, বোধ, নির্বাচন সব মিলে যে সর্বাঙ্গীন যাপন; তার অন্তর, বাহির সবকিছুতেই গভীর পরিবর্তন এসেছে। বাঙালির পরিবারের ছবি বদলে গেছে। সেই পথেই বদল এসেছে বিজ্ঞাপনে। সেকাল-একাল মিলিয়ে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা হল। আজকে পরিবর্তিত বাঙালির ছবিটিই আমাদের মাথায় ঘোরাফেরা করে। নতুন সাজ-পোশাক, নতুন খাদ্যাভ্যাস, নতুন জীবনযাত্রা, নতুন ভাষায় অভ্যস্ত তারা। পুরনো বাঙালির ছবি হয়তো বাড়ির আলমারি মধ্যে, জামাকাপড়ের পাশে এক কোণে মলিন অ্যালবামে পড়ে থাকে। কখনো বহু বছরের ব্যবধানে হাতে ওঠে একবার, আবার বিস্মৃতির

অতলে তলিয়ে যায়। তবু ভুলতে ভুলতেও কিছু স্মৃতি, কিছু মায়া রয়ে যায়। কোনও কোনও বাঙালি তার সর্বস্বটুকু দিয়ে নতুন হয়ে উঠতে পারে না। আগলে রাখে কিছু পুরনোকে।

ছয় দশক আগে মার্গো সাবান, সেকালের একটি বাঙালি পরিবারের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন করে। সে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়। ঠাকুরদাদা, ঠাকুমা, পুত্র, পুত্রবধূ এবং আদরের পৌত্র, পৌত্রী এই ক'জনের ছোট্ট পরিবারের ছবিটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দর্শককে উপহার দেয় 'মার্গো' সাবান। প্রত্যেকের হাসিখুশি, পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবি আজ এতো বছর পরেও, মনের উপর সৃষ্টি হওয়া ক্ষতে আলতো প্রলেপ দিয়ে যায়।

চিত্র ২.৬১ চতুরঙ্গ, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮

তথ্যসূত্র :

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭১৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১৯-৭২০।

৩. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন,* কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৫৬।

৪. আহমদ শরীফ, *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব,* ঢাকা : অনন্যা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ২২২।

৫. শংকর, "বাঙালির ব্যালান্সশিট : কে বাঙালি? কেন বাঙালি?", *দেশ,* বার্ষিক সংখ্যা, অভীক সরকার (সম্পাদিত), কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০২, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১।

৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "বাঙালি কে বাঙালি কোথায়?", *সানন্দা,* ৫ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, অপর্ণা সেন (সম্পাদিত), কলকাতা, ৪ এপ্রিল, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ২২-২৪।

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩।

৯. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, "অমর বাঙালি", *সানন্দা,* ৫ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, অপর্ণা সেন (সম্পাদিত), কলকাতা, ৪ এপ্রিল, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ২৫-২৬।

১০. বুদ্ধদেব বসু, "আড্ডা", *কলকাতার আড্ডা,* সমরেন্দ্র দাস (সম্পাদিত), কলকাতা : মহাজাতি প্রকাশন, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৩।

১১. Bhadra, Gautam. *From An Imperial Product To A National Drink : The Culture of Tea Consumption in Modern India.* Kolkata : Centre for Social Sciences, Calcutta in association with Tea Board India. 2005. Page 2.

১২. সৈয়দ মুজতবা আলী, *চাচা কাহিনী,* কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩।

১৩. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, "আড্ডা", *আলেখ্য দর্শন,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৮৬।

১৪. সৈয়দ মুজতবা আলী, "আড্ডা", *হৃদয়,* বাঙালির আড্ডা সংখ্যা, বার্ষিক সংখ্যা, লীনা চাকী (সম্পাদক), কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৪৭।

১৫. রাজশেখর বসু, “কচি-সংসদ্”, *পরশুরাম গ্রন্থাবলী,* কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭৬।

১৬. সুকুমার সেন, *রেলের পা-চালি,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯০।

১৭. অমিয় বসু (সম্পাদিত), *বাংলায় ভ্রমণ,* প্রথম খন্ড, কলকাতা : পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ প্রচারবিভাগ, ১৯৪০।

১৮. Eastern Bengal State Railway (Edited). *From The Hooghly to the Himalaya.* Bombay : Times Press. 1913. Preface Page.

১৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইছামতী,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৫।

২০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, “রাতের অতিথি”, *শরদিন্দু অম্‌নিবাস,* চতুর্থ খন্ড, কিশোর গল্প-সমগ্র, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদিত), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৫৯।

২১. বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৬৮-১৬৯।

২২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, “রক্তের দাগ”, *শরদিন্দু অম্‌নিবাস,* দ্বিতীয় খন্ড, ব্যোমকেশ, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদিত), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪০-১৪১।

২৩. সত্যজিৎ রায়, “হত্যাপুরী”, *সন্দেশ,* লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ এবং সত্যজিৎ রায় (সম্পাদিত), শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬।

২৫. আত্মজিৎ মুখোপাধ্যায়, “পূজাবার্ষিকীর বিজ্ঞাপন ও সামাজিক কৃত্য-র নির্মাণ”, *হরপ্পা : লিখন চিত্রণ,* পুজোর বই, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, অক্টোবর, ২০২২।

২৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত,* বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৪১।

২৭. হিজ মাস্টার্স ভয়েস (নিবেদিত), *শারদ অর্ঘ্য,* ৭৮ আর-পি-এম রেকর্ড, কলকাতা : দি গ্রামোফোন কোং অব ইন্ডিয়া (প্রা) লিঃ, ১৯৬৮।

২৮. Ghosh, Neepabithi. *Uttam Kumar : The Ultimate Hero.* New Delhi : Rupa & Co. 2002. Page 86.

২৯. অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, "ছুটির নিমন্ত্রণে", *দেশ,* সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩৯-৪৮।

৩০. রাজশেখর বসু, "কচি-সংসদ্", *পরশুরাম গ্রন্থাবলী,* কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০।

৩১. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, *মাছ আর বাঙালি,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১১-১২।

৩২. মিলন দত্ত, *বাঙালির খাদ্যকোষ,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩২৭।

৩৩. Mukhopadhyay, Ashoke Kumar. "Sweet Tales of Calcutta". *Calcutta 300 : An Economic Times Special Feature.* Ghosh, Nityapriya (Edited). Calcutta : Economic Times. 1990. Page 123-131.

৩৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত,* সুকুমার সেন এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা : আনন্দ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৬২।

৩৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯৫।

৩৬. মিলন দত্ত, *বাঙালির খাদ্যকোষ,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪।

৩৭. স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদক), "অসীম রায় : প্রাসঙ্গিক তথ্য", *জলার্ক,* দ্বাবিংশ সংকলন, কলকাতা, মাঘ ১৪০১- পৌষ ১৪০২, পৃষ্ঠা ২৮৭-৩০২।

৩৮. সুনির্মল বসু, *ছড়ার ছবি ৩,* কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৭।

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খন্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৮।

৪০. দেবাশিস গুপ্ত, "জানি শুধু এইটুকু-বড়ো ভালো খেতে", *সন্দেশ,* সন্দীপ রায় (সম্পাদক), কলকাতা, শারদীয়া ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩৫।

৪১. S. Ramesh Kumar and Krishnamurthy, Arun. "Maggi". *Advertising, Brands and Consumer Behaviour.* New Delhi : Sage. 2020. Page 145-146.

৪২. সুকুমার রায়, *সুকুমার সমগ্র,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০০, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।

৪৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অপরাজিত,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪।

৪৪. পূর্ণেন্দু পত্রী, *কী করে কলকাতা হলো,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৯।

৪৫. https://youtu.be/5OygkS28TAg. Accessed on 10.01.2022.

৪৬. অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিজ্ঞাপনে যাঁরা এনেছিলেন বাঙালিয়ানা", *আনন্দবাজার পত্রিকা,* কলকাতা, ৩০ জুন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬।

৪৭. সুবীর মিত্র, "দেশ : পঞ্চাশ বছরে প্রচার ও প্রসার", *দেশ,* সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা (১৩৪০-১৩৯০), সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ১৮৩।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৪।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৮।

৫০. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, "প্রচার সাহিত্যের পঞ্চাশ বছর", *দেশ,* সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা (১৩৪০-১৩৯০), সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ২০৯।

৫১. সুভাষ ঘোষাল, "বিজ্ঞাপনে বাংলা ভাষা নিয়ে ছেলেখেলা চলবে না", *আনন্দবাজার পত্রিকা,* কলকাতা, ৩০ জুন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩।

৫২. সুবিমল মিশ্র, "আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর কোল্ড ক্রিম তখন আপনার ত্বকের গভীরে কাজ করে", *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫।

৫৩. শৌভিক মিশ্র, "বাঙালির মন ও বিজ্ঞাপন", *আনন্দবাজার পত্রিকা,* কলকাতা, ২৯ নভেম্বর, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৫।

৫৪. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, *দিনগুলি মোর,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১২৭।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনীতি ও বাংলা বিজ্ঞাপন

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই ভারতীয় অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ রাষ্ট্র -নিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্র পরিচালকদের সমাজতান্ত্রিক ঝোঁকই তার প্রধান কারণ। 'ব্রিটিশ রাজ' শব্দবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি (১৮৭৮ -১৯৭২) একে বলতেন 'লাইসেন্স রাজ'। এতখানি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জন্ম হতে পারে প্রবল দুর্নীতি, অর্থনীতির প্রকৃত অগ্রগতির জন্য সরকারি 'লাল ফিতে'র বাঁধন থেকে মুক্তির কিছু প্রয়োজন আছে, এই ছিল তাঁর মত।

এ আসলে অর্থনীতির পাঠে দুই স্বতন্ত্র মতবাদের দ্বন্দ্ব। এর ভালো-মন্দ বিচারের তর্ক আজও শেষ হয়নি।

সেই তর্কে না ঢুকেও বলা যায়, স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম যুগে দেশনেতাদের উদার বিশ্বদৃষ্টি, নৈতিক ও আদর্শবাদী চরিত্র অর্থনীতির আঙিনাকেও মোটের উপর কালিমালিপ্ত করেনি। কিন্তু ১৯৮০-র দশক পৌঁছতে পৌঁছতে এই চেহারা বদলে যায়। বলা হয়, কোনো নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য অন্তত আশিটি সরকারি দপ্তরের ছাড়পত্র নিতে হত তখন। বলা বাহুল্য, সহজ ও সৎ উপায়ে এইসব ছাড়পত্র পাওয়া যেত এমনটি নয়।

চিত্র ৩.১ ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে রাজীব গান্ধী সরকারের পতনের ভবিষ্যৎবাণী করে আর কে লক্ষ্মণের বিখ্যাত কার্টুন

১৯৮৪ সালের শেষ থেকে রাজীব গান্ধী (১৯৪৪-১৯৯১) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনে মনোযোগ দেন। সোভিয়েত নির্ভরতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার অবস্থা থেকেও বেরোবার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে থাকে। কিন্তু এর অব্যবহিত পরবর্তী বেশ কিছু ঘটনা

ভারতীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বস্ত করে দেয়।

এক. রাজীব গান্ধী-সরকারের পক্ষ থেকে ‘বোফোর্স’ নামের এক সুইডিশ অস্ত্রনির্মাতা কোম্পানির কাছে ৪১০টি ‘ফিল্ড হাউইৎজার’ কামান মোট ১৪০ কোটি মার্কিন ডলারে কেনবার জন্য চুক্তি করা হয়। কিন্তু এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নানা মহল থেকে এই চুক্তির ভিতরে বড়ো মাপের দুর্নীতির অভিযোগ তোলা শুরু হয়। ‘গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়’ এই স্লোগানে ভরে ওঠে শহর-জনপদ-গ্রামের দেওয়াল। রাজীব গান্ধীর অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়। এবং এরই পরিণামে ১৮৮৯-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজীব গান্ধী সরকারের পতন ঘটে।

দুই. রাজীব গান্ধী সরকারের পতনের পর ভারতীয় রাজনীতিতে দেখা দেয় গভীর অস্থিরতা। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (১৯৩১-২০০৮)-এর নেতৃত্বাধীন জনতা দল-সরকার টিকে থাকে ৩৪৩ দিন। তারপর সমাজবাদী জনতা পার্টির নেতা চন্দ্রশেখরের (১৯২৭-২০০৭) নেতৃত্বে সরকার চলতে পারে মাত্র ২২৩ দিন। রাজনৈতিক এই অস্থিরতা ভারতীয় অর্থনীতিকেও বিপর্যস্ত করে দিতে থাকে।

তিন. বিশ শতকের আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে বোঝা যাচ্ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপ জুড়ে বামপন্থী রাষ্ট্রগুলির পতন আসন্ন হয়ে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর রাষ্ট্রপ্রধান মিখাইল গোর্ভাচেভ (১৯৩১-) ‘পেরিস্ত্রোয়িকা’ এবং গ্লাসনস্ত’ নামের দুই বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করতে শুরু করেন ১৮৮৫ সাল থেকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত নানা ঘটনা পরম্পরায় ১৮৮৯ সালে ‘বার্লিন ওয়াল’-এর পতনের মধ্যে দিয়ে পূর্ব ইউরোপ থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলি অবসৃত হয়। ১৯৯১ সালে পতন হয় সোভিয়েত ইউনিয়নেরও। ‘দ্বিমেরু বিশ্বে’ সোভিয়েত ব্লকের অন্তর্গত ভারতবর্ষে এর প্রভাব হয় গুরুতর। তার অর্থনীতির কাঠামো অনেকটাই ছিল সোভিয়েত-নির্ভর। সেই ধাক্কা যেমন প্রবল হয়ে ওঠে এই সময়ে, তেমনি নীতিগতভাবে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ধারণা থেকে সরে আসার পথও সুগম হয়ে যায়।

চার. কুয়েতের তেল-খনিগুলির দখল নিয়ে আমেরিকা এবং ইরাকের মধ্যে শুরু হয় ‘উপসাগরীয় যুদ্ধ’ (১৭ জানুয়ারি – ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১)। এর ফলে বিশ্বজুড়ে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম-জাত পণ্যের দাম অভাবনীয় বৃদ্ধি পায়। ততদিনে এমনিতে-বিপর্যস্ত ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে এই যুদ্ধের ফলে।

INDIAN EXPRESS

Secret sale of gold by RBI again

21,000 kg of metal airlifted to coded destination

Ramdoss arrested, hospitalised

LTTE massacres civilians

Last-chance bid for Yugoslavia

Kashmir militants extend deadline

Narasimha Rao confident of winning trust vote

চিত্র ৩.২ ৮ জুলাইয়ের 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'। স্বর্ণসঞ্চয় বন্ধকের স্তম্ভিত-করা খবর।

মূলত উপরিলিখিত চারটি কারণে **১৯৯১**-এর গোড়ায় ভারত অর্থনৈতিক অব্যবস্থার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়। বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় নেমে আসে তলানিতে। একটা সময়ে মাত্র তিন সপ্তাহের আমদানির যোগ্য মুদ্রাসঞ্চয় পড়ে থাকে মাত্র। 'দি ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক' এবং ইন্টারন্যাশানাল মানিটরি ফান্ড' (IMF) ভারতকে কোনোরকম ঋণ দিতে অস্বীকার করে। ভারতবর্ষ রাষ্ট্র হিসেবেই 'দেউলিয়া' ঘোষিত হবার মুখে এসে দাঁড়ায়। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার দেশের স্বর্ণসঞ্চয় (Gold reserve) বন্ধক রাখতে বাধ্য হয় প্রথমে তৎকালীন চন্দ্রশেখর-সরকার এবং পরে সদ্য-গঠিত নরসিং রাও (১৯২১-২০০৪)- সরকার। 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ডের' কাছে ৪৭ টন এবং 'ব্যাঙ্ক অফ সুইৎজারল্যান্ডের' কাছে ২০ টন সোনা বন্ধক রেখে ৬০০ মিলিয়ন ডলার ধার করে ভারত সরকার। সর্বনাশের কিনারে এসে দাঁড়ায় ভারতের অর্থনীতি।

এই চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েই **১৯৯১** সালের ২৪ জুলাই নরসিংহ রাও সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম বাজেট পেশ করতে আসেন ড. মনমোহন সিং (১৯৩২-)। দিনটি ঐতিহাসিক। ভারতের অর্থনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস এই একটি দিনে সম্পূর্ণ বদলে যায়। এর ভালো-মন্দ নিয়ে তর্ক ও চুলচেরা বিশ্লেষণ আমাদের প্রকল্প নয়, সে

INDIAN EXPRESS

7,719-CR DEFICIT IN UNION BUDGET

Taxation effort to net 2,005 cr.

Foreign investment liberalised

Petrol, LPG, aviation fuel to cost 20% more

10% cut in kerosene for non-industrial use

20% disinvestment in select PSUs

Sugar subsidies abolished, food subsidies stepped up

AIADMK frowns on Chavan visit

Industrial policy highlights

Centre to fix responsibility

চিত্র ৩.৩ ১৯৯১- এর ২৫ জুলাইয়ের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা

কাজ অর্থনীতিবিদের। কিন্তু এই দিনটির পর থেকে আজ-পর্যন্ত বদলে-যাওয়া ভারতবর্ষের চেহারাটাকে কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। থমাস কুন (১৯২২-১৯৯৬) একদা যাকে বলেছিলেন 'প্যারাডাইম শিফট', স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন মৌলিক 'প্যারাডাইম শিফট'-এর আর কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া শক্ত বলেই আমরা মনে করি। 'লাইসেন্স রাজ'-এর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, নানা ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫১ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া-সহ একগুচ্ছ অভাবিতপূর্ব পদক্ষেপ সেদিন কাঁপিয়ে দিয়েছিল ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজবোধকেও। তার ফলাফল কী হতে চলেছে সে কথা ঠিক সেইদিনই খুব বেশি কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তী তিন দশক ধরে ভারতবর্ষের বদলে যাওয়া চেহারা ও মন সেই যুগান্তকারী বাজেট ভাষণেরই একান্ত প্রতিক্রিয়া মাত্র।

প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী অর্থমন্ত্রী সেদিন তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছিলেন, 'Victor Hugo once said, "no power on earth can stop an idea whose time has come". I suggest to this august House that the emergence of India as a major economic power in the world happens to be one such idea. Let the whole world hear it loud and clear. India is now wide awake. We shall prevail. We shall overcome.'

এই বাজেটের ভালো-মন্দের বিচার অনেকাংশে আমাদের অধিকার ও সাধ্যের বাইরে বলে সে প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রেখে আমরা এইটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, মনমোহন সিং-কথিত এই 'আইডিয়া'র উপর নির্ভর করেই আজও পর্যন্ত এগিয়ে চলেছে ভারতবর্ষ, তার সমাজ ও অর্থনীতি। অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক অশোক মিত্র (১৯২৮-২০১৮) তাঁর প্রবন্ধে জানাচ্ছেন-

> এই সব তথ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হতে দেবেন না, কিন্তু নানা সূত্র মিলিয়ে পাটীগণিত কষলে বোঝা যায়, তথাকথিত অনাবাসী ভারতীয়দের প্রাপ্য যোগ দিলে আমাদের আর্থিক ঋণের পরিমাণ ১২,৫০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মেক্সিকোকে পিছনে ফেলে আসতে সফল হয়েছি আমরা; উন্নয়নশীল অথবা উন্নত দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ ঋণগ্রহীতার তালিকায় ব্রাজিলের পরেই এখন আমাদের স্থান। বারো হাজার পাঁচশো কোটি ডলার, হালের বিনিময়মূল্য প্রয়োগ করলে, তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ, যা কিনা আমাদের সার্বিক

জাতীয় আয়ের অন্তত দুই তৃতীয়াংশ। গড় হিশেবে একটি ভারতীয় নাগরিকের উপর বৈদেশিক ঋণের বোঝা চার হাজার টাকারও বেশি।[১]

১৯৯২ সালে দেশ জুড়ে বিপুল সোরগোল পড়ে যায়। চারিদিকে একটা আশঙ্কা, আপত্তির থমথমে ভাব। বিষয়টা হল তিন অক্ষরের একটি শব্দ, আই. এম. এফ (International Monetary Fund)। যারা দেশে দেশে ঋণ দেন, তাদের কাছ থেকে ভারত একটি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ নিয়েছে। আই. এম. এফ- এর দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়া শর্তসাপেক্ষ। এবং সেই শর্ত ঠিক করতেই বেশ কিছু মাস সময় লাগে। আই. এম. এফ-এর মনোমত পরিস্থিতি তৈরি না হলে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয় না। এই শর্তগুলির মধ্যেই থাকে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে আই. এম. এফ সুযোগ পেতে পারে দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর। অর্থনৈতিক যোগ্যতার বিচারে পরিকল্পনাহীন ব্যয় বা অপব্যয় হিসাবে এই সংস্থা, দেশের ক্ষেত্রে নানান অতি প্রয়োজনীয় ব্যয়কে সংকুচিত করতে বলতে পারে। যেমন খাদ্য বন্টন ব্যবস্থার ভরতুকি কমাতে বা জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমাতে বলা হল। এতে দেশের মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল হতে সময় লাগবে না। খাদ্যের দাম বাড়বে, ঘটবে ক্রমান্বয়ে মূল্যবৃদ্ধি। দেশে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলিই যদি বিদেশ থেকে আমদানী করতে বলা হয়, তাহলে দেশীয় শিল্প অচিরেই এই অসম প্রতিযোগিতায় পড়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। সারা দেশের যে আপাত ভারসাম্য, তা ব্যহত হবে এই ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে।

অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক অশোক মিত্র তাঁর প্রবন্ধে সেই বিপুল ঋণের চিত্রই কিঞ্চিত স্পষ্ট করেছেন পাঠকের কাছে। স্বভাবতই তিনিও দেশের সংবেদনশীল নাগরিক হিসাবে এ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

১৯৯১ সালে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ এবং বিশ্বপুঁজির দরজা হাট করে খুলে দেবার পরে এই ছিল সামগ্রিক ভারতবর্ষের চিত্র।

এই অর্থনৈতিক বিতর্কে এ সময়ে সরকার পক্ষ কিছুটা অসুবিধায় থাকেন। এই যে বিপুল ঋণের বোঝা এবং তারই সূত্র ধরে বিশ্বপুঁজির দরজা খুলে দেওয়া, এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা অহরহ বলেছেন উদারনীতি দেশের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক, অপরদিকে এই নীতি রূপায়ণ করছেন যে সরকার, তাঁরাও সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে পারেননি কেন এই নীতি প্রয়োজনীয়। ১৯৯৩ সালে *দেশ* পত্রিকায় অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৯-) এ বিষয়ে লিখছেন,

চিত্র ৩.৪ সানন্দা, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৮

বেতার এবং দুরদর্শনের মতো দুটি গণমাধ্যম সরকারের হাতে, রাজনীতির লড়াইয়ে সে দুটিকে ব্যবহার এবং অপব্যবহার করার অভ্যাস ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের বিলক্ষণ আছে, কিন্তু অর্থনীতির মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁদের একেবারেই ব্যবহার করতে পারেননি সরকার। হয়তো করতে চাননি, পাছে বিরোধীরা তা নিয়ে আরও শোরগোল করেন। কিংবা হয়তো সরকার ভাবছেন, আলাদা করে অর্থনৈতিক সংস্কারের গুণগানের প্রয়োজন নেই, দুরদর্শনের পর্দায় বিজ্ঞাপনের কড়া আলোয় আর চড়া রঙে দেশি-বিদেশি ভোগ্যপণ্যের যে অনন্ত মহাবিশ্ব মুগ্ধ দর্শকদের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছে, সেটাই উদারনীতির মোক্ষম সার্টিফিকেট। হয়তো খুব ভুল ভাবনা নয় সেটা। দৈনন্দিন জীবনের সহস্র যন্ত্রণা আর অনিশ্চয়তার শিকার যে-গড়পড়তা দূরদর্শক, তাঁর কাছে বিজ্ঞাপনের এই জগৎ একটা মরীচিকার মতো। সেই জগতে পাহাড় থেকে নেমে আসে ঘন দুধের উত্তাল ঝরনা, সমস্ত নারীর ত্বক মসৃণ, সেখানে মোটরগাড়িরা বাজনার তালে তালে যুগলে নাচে। তৃষ্ণার্ত দর্শকের ঘোর লাগতেই পারে। এমন কি, যে দর্শক সচেতন যুক্তিবাদী, তিনিও ভাবতে পারেন-কোথাও একটা মরূদ্যান নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে মরীচিকা দেখা যেত না, মরীচিকা তো মরুদ্যানেরই প্রতিরূপ।[২]

এই ঋণ গ্রহণ উচিত কাজ হল না তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠলো, সে তর্ক আপাতত প্রাসঙ্গিক নয়। ভারতবর্ষে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, বৃহত্তর বিদ্যুৎ উৎপাদন, বড় বড় বাঁধ ইত্যাদি দীর্ঘদিন বন্ধ হয়েছিল। ১৯৮৫ সালের রাজীব গান্ধীর সরকারের নয়া অর্থনীতির প্রভাবে যে সব নতুন শিল্পোদ্যোগ শুরু হয়, তার জন্য

বিদেশী প্রযুক্তি ও মূলধন বেশি আমদানি হয়। কম্পিউটার, মোটর কার, স্কুটার, রেফ্রিজারেটার, ইলেকট্রনিক শিল্পের উৎপাদন যে হারে বেড়েছে, বড় উৎপাদন সেই হারে হয়নি।

ভারতবর্ষের অর্থনীতির ধারাবাহিক যে পরিবর্তন, তা সুস্পষ্ট ভাবে ধরা আছে বিজ্ঞাপনের মধ্যে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে বুঝতে সুবিধা হয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিশ্বযুদ্ধাকালীন টালমাটাল অর্থনীতির দিন পেরিয়ে দেশভাগ, স্বাধীনতা লাভ, নতুন দেশ গঠন ও তার অর্থনীতিকে নির্মাণের সুদীর্ঘ প্রয়াসের পথ পেরিয়ে নয়ের দশকের বিপুল অর্থনৈতিক পরিবর্তন, বিশ্বপুঁজির উদার প্রবেশ- এই ছয় দশকের যে যাত্রাপথ, তাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চিনে নিতে চাওয়াই হবে এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। দেশের বৃহৎ অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি দেশের মানুষের একেবারে সংসারের মধ্যে কীভাবে গভীরতর ছাপ রেখে যায়, তাও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উঠে আসবে বিজ্ঞাপনগুলিতে।

নয়ের দশকের এই আকস্মিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ঋণ গ্রহণ, তা নিয়ে বিপুল তর্ক-বিতর্ক এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে কিছু চিরস্থায়ী অত্যন্ত প্রভাবশালী পরিবর্তনের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করার উদ্দেশ্য হল এই যে, আজকে এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় অবস্থান করছি, তার সূত্রপাত হয় নয়ের দশকে গোড়ায়, সেই কথা সামান্য উল্লেখের পরে ফিরে যাওয়া যাক গত শতাব্দীর তিনের দশকের শেষ ভাগে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকে দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে ছিল কুটীর ও গ্রামীণ শিল্পের উপরে নির্ভর করে। *দেশ* পত্রিকায় ভবতোষ দত্ত (১৯১১-১৯৯৭) লিখেছেন-

> যে গান্ধীবাদ কংগ্রেসের আর্থিক নীতির রূপ পরিগ্রহণ করল তার মূলনীতি ছিল ছয়টি- এক, যন্ত্রচালিত উৎপাদনের বদলে কুটীর শিল্পের প্রসার; দুই, ছোট ক্ষেতের চাষের উন্নতি; তিন, গ্রামীণ সমাজকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর করে তোলা; চার, প্রশাসনিক কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ; পাঁচ, অর্থিক অসাম্য কমানো- বিশেষত ধ্বনীদের মনোভাবে পরিবর্তন এনে; এবং ছয়, সমস্ত দেশের সমস্ত সম্পদের 'ট্রাস্টী' বা ন্যাস-রক্ষক হতে ধনীদের উদ্বুদ্ধ করা। গান্ধীবাদের পিছনে ছিল ব্যক্তিগত অভাববোধ কমানো, কারণ একটি অভাবের তৃপ্তি থেকেই নতুন অভাববোধ জাগ্রত হয়। মহাত্মা গান্ধী অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ইত্যাদি মৌলিক অভাব নিরসনের পরে আর্থিক সমৃদ্ধির দিকে অবাধ অগ্রগতির বিরোধী ছিলেন।[৩]

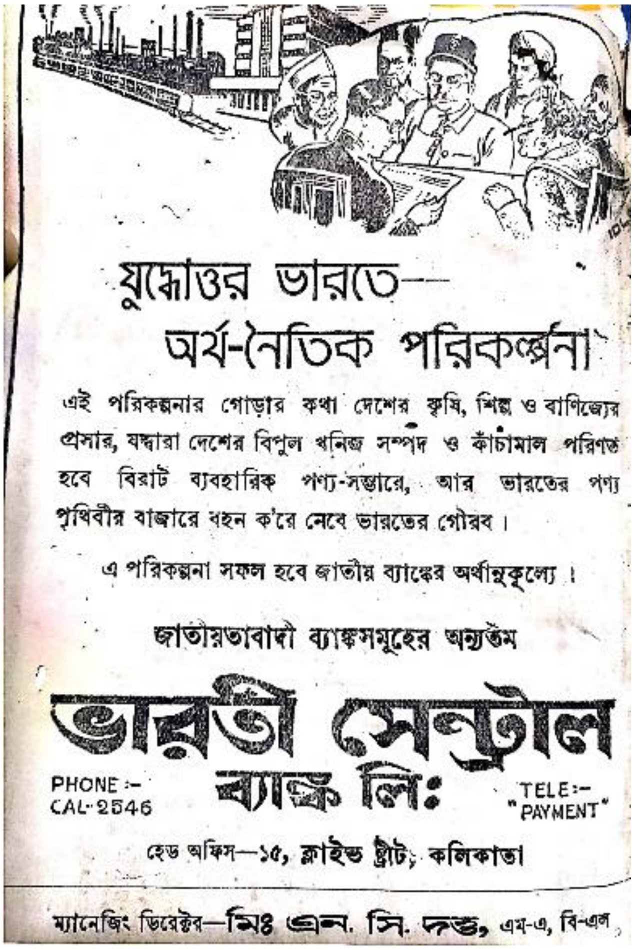

চিত্র ৩.৫ শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

১৯৩০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার দ্বারা আক্রান্ত হয়েও সোভিয়েত রাশিয়া পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ যে রকম দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল, জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪)-র কাছে তা বিস্ময় এবং আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রগত পরিকল্পনা রচিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে না, এই মতবাদকে তিনি পোষণ করে গেছেন এবং এই ধরনের পরিকল্পনা রচনার কৌশল আয়ত্ত করার জন্য স্বদেশ ও বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে তাঁকে দেখা গেছে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে। সন্দেহাতীত ভাবেই সমাজবাদের প্রতি আনুগত্যই তাঁকে পরিকল্পনার পথে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেয়। জাতীয় সম্পদ যাতে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য অপব্যবহৃত না হয়ে শুধু জাতীয় স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়, জওহরলালের পরিকল্পিত অর্থনীতির মূলে ছিল সেই উদ্দেশ্য।[৪] এই পথ ধরেই ক্রমে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভার বহন করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে বেশ কষ্টকর বিষয় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ভারত সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সংখ্যালঘু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে উদ্যোগী হয়। ১৯৫০ সালের ৮ ই এপ্রিল সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে 'ভারত-পাকিস্তান চুক্তি' নামে একটি চুক্তি হয়। তাতে উভয় সরকারই ঘোষণা করে, সংখ্যালঘুরা ধর্মনির্বিশেষে নাগরিক হিসাবে সমান অধিকার ভোগ করবেন। তাঁদের জীবন, সংস্কৃতি ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিত করা হয়, আর মতপ্রকাশের এবং ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

বাস্তুহারা মানুষের আগমনে পশ্চিমবঙ্গে এবং সমগ্র দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটে। পাঁচের দশকে উদ্বাস্তু সমস্যা খুবই গুরুতর হয়ে ওঠে।

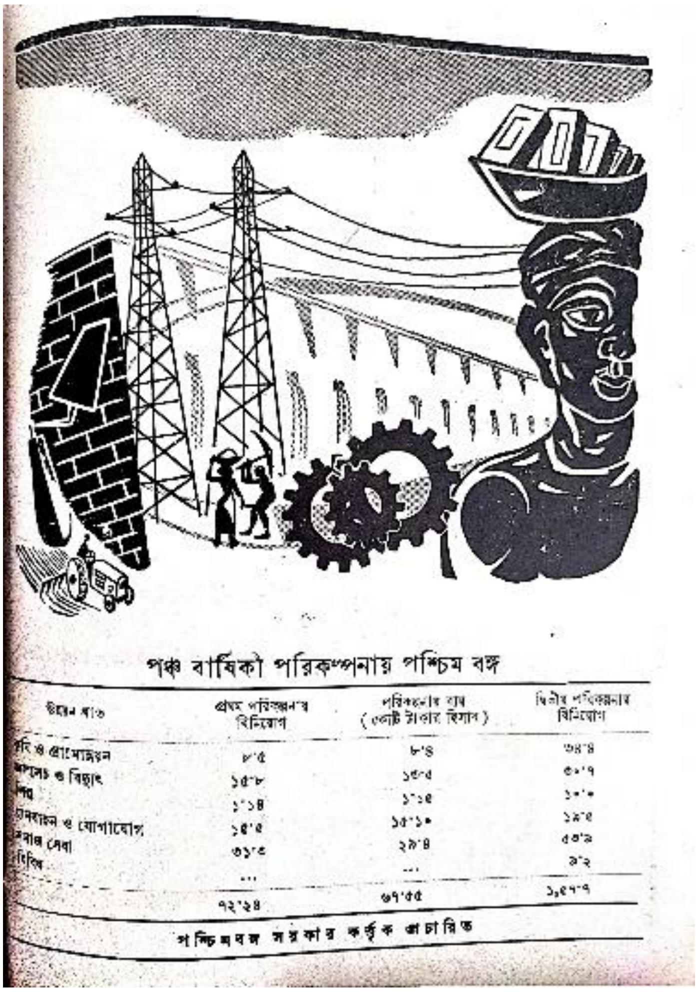

চিত্র ৩.৬ সুন্দরম্, চতুর্থ বর্ষ, ৩-১২ সংখ্যা, ১৩৬৭

স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সাল থেকে 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র সাহায্যে ধাপে ধাপে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবেন জওহরলাল নেহরু। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫১-১৯৫৬) জোর দেওয়া হয়েছিল সেচ ও শক্তি উৎপাদন (মোট বাজেটের ২২.৭%), কৃষি (১৭.৪%) এবং রাস্তা ও অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে (২৪%)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১) মূলত প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশের (১৮৯৩-১৯৭২) তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে। বিখ্যাত 'মহালনবিশ মডেল' ছিল এর কেন্দ্রীয় ভিত্তি। এতে জোর দেওয়া হয় বড়ো ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি এবং বড়ো বাঁধ নির্মাণের উপর।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর বাঁধ (১৯৫৫), পাঞ্চেত বাঁধ (১৯৫৯), মাইথন বাঁধ (১৯৫৭) গড়ে ওঠে এরই আশেপাশের সময়ে। ফারাক্কা বাঁধের কাজ শুরু হয় ১৯৬২ তে। অন্যদিকে শুধু ১৯৫৯ সালেই একসঙ্গে ভিলাই, দুর্গাপুর, রৌরকেলায় মোট পাঁচটি লৌহ-ইস্পাত কারখানা তৈরি হয় মূলত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিম জার্মানির সহায়তায়। এছাড়া পরিকাঠামো নির্মাণের গতি বাড়ানোর জন্য রেল ও অন্যান্য সরকারি সেক্টরে বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থান তৈরি হয়। ফলে শহর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তশ্রেণির ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে চোখে পড়ার মতো।

বিংশ শতাব্দীর এই প্রথম দশকগুলিতে কোন কোন বিজ্ঞাপন সংস্থা প্রভাবিত করেছিল ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রটিকে, একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। আনন্দ্ হাল্ভে এবং অনিতা সরকারের 'Adkatha' বই থেকে জানা যায়-

চিত্র ৩.৭ সন্দেশ, মাঘ, ১৩৭৩

We can perhaps consider one of two dates: the first is 1780, when James Augustus Hicky started the Bengal Gazette. India's first newspaper- and therefore, the first organized advertising medium. But the second, and more likely, date is 1905, when B. Dattaram set up a small advertising agency in Girgaum, the oldest agency still in existence. Having said that, there is, of course, a much richer, more ancient stream of advertising, rooted in the bazaar cries of India's vendors and peddlers; a tradition that goes back to the times and places of our earliest civilizations, and still lives on today. While B. Dattaram & Co had been formed much earlier, it was only in 1920s that the Indian advertising industry really began to takeshape, with the setting up of agencies like Stornach and DJ Keymar. The first agency to bring in International standards of professionalism to India, however, was J. Walter Thompson, with the opening of its office in Mumbai in 1929.

The Tata group was one of those at the forefront of India's industrial effort, involved in everything from steel to soaps...[৫]

জানা যায়, বি.দত্তরাম ছিল বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির পথপ্রদর্শক। তারপর ক্রমশ, স্টরনাক, ডি. জে. কীমার, জে. ওয়াল্টার থম্পসন অথবা টাটা স্টীল আস্তে আস্তে জায়গা করে নিতে থাকে ভারতের বিজ্ঞাপনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে।

সরাসরি কয়েকটি বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গে চলে আসা যাক।

ভারতবর্ষের অর্থনীতির প্রসঙ্গকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হতে পারে।

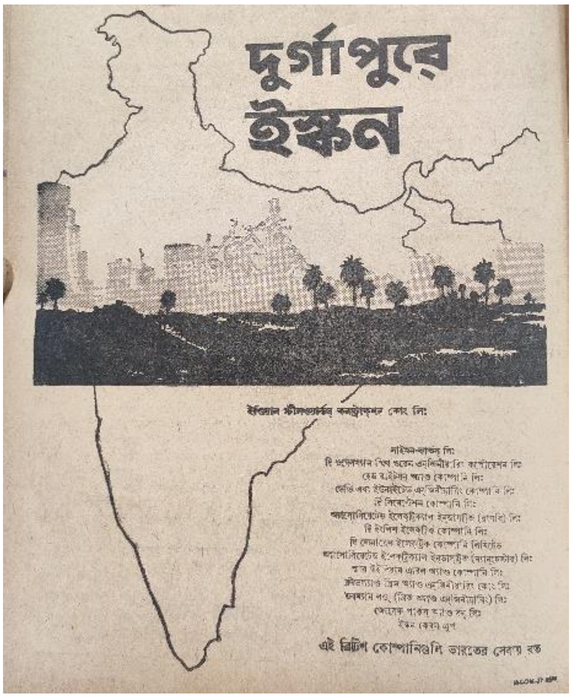

চিত্র ৩.৮ দেশ, ১৬ আষাঢ়, ১৩৬৮

একটি হল, ভারতের বৃহত্তর যে অর্থনীতি, নানান রাজনৈতিক-সামাজিক প্রসঙ্গের সঙ্গে যা ওতোপ্রতভাবে জড়িত, অর্থনীতির সেই বড় দিকটি কী ভাবে প্রভাবিত করেছে সমসাময়িক বাংলা বিজ্ঞাপনকে। আর দ্বিতীয় দিকটি একটি বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলেও, তা একেবারে ঘরের কথা, কেমন করে দেশের অর্থনীতি প্রভাবিত করে মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন গৃহস্থালীকে, এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কেমন করে বিজ্ঞাপনেও তার স্পষ্ট ছায়া পড়ে, তাই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

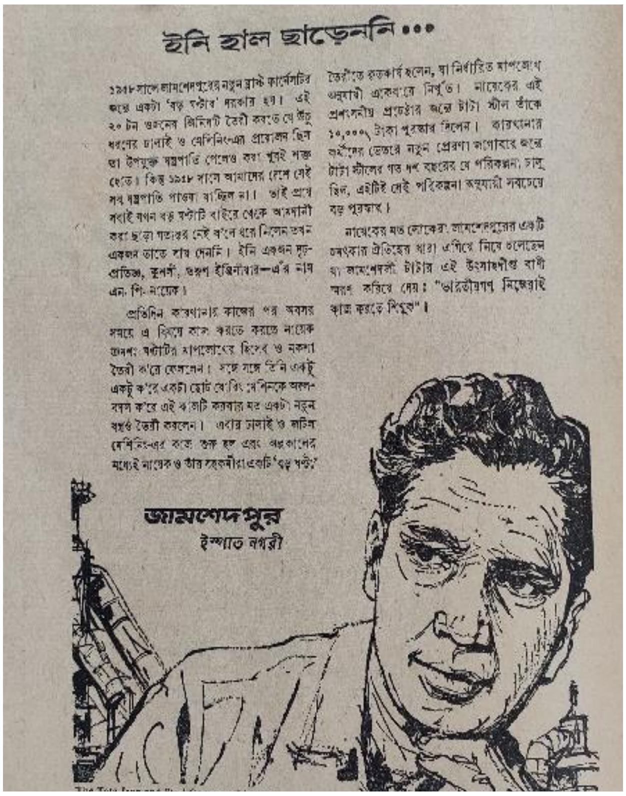

চিত্র ৩.৯ দেশ, ৩০ ভাদ্র, ১৩৬৮

দুর্গাপুর ইস্কনের বিজ্ঞাপনের মধ্যে স্পষ্টভাবে রয়েছে সে সময়ের বড় ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের গড়ে ওঠার

চিহ্ন। বিশেষত ইস্পাত শিল্প। ‘ইনি হাল ছাড়েননি’ শিরোনামের বিজ্ঞাপনের ‘কপি’ থেকে অতিরিক্ত আর একটি জিনিস বোঝা যায়। সেই গড়ে ওঠবার দিনগুলোতে ‘টেকনোলজি’ ও যন্ত্রপাতির জন্য যে আমাদের পদে পদে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হচ্ছিলো,তার অসহায়তা এবং সেই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার সংকল্পের কথাটা ওই বিশেষ বিজ্ঞাপনটি বুঝিয়ে দেয়।

চিত্র ৩.১০ দেশ, ২৭ শ্রাবণ, ১৩৬৮

বাঁ পাশের ছবিটি ফের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া একটি বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কথাটি যেন বিজ্ঞাপনের লেখায় আর ছবিতে ধরা আছে। একদিকে বড়ো বাঁধ, হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট, অন্যদিকে বড় ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির গড়ে ওঠাই এই বয়ানের মূল ভর।

স্বাধীনতার পর থেকে, পাঁচের দশকের সূত্রপাতের সময় পর্যন্ত, দেশে খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে, ১৯৫৬ সালে খাদ্য সংকট উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আগের বছরের তুলনায় মন প্রতি ৪ টাকা করে চালের দাম বাড়ে। পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময়ে ‘পারিবারিক কার্ডের’ ভিত্তিতে গ্রামে ও শহরে ব্যাপকভাবে ‘সংশোধিত রেশন’ চালু করতে হল। ১৯৫৭ সালে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে ‘ফাটকাবাজি মুনাফাখোরি’ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কর্তৃক ‘আংশিক নিয়ন্ত্রণ’ চালু করা হয়। অত্যাবশ্যক পণ্য আইন অনুযায়ী ‘খাদ্য আইন’ জারি করা হয়।[৬]

চিত্র ৩.১১ ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৬২

পুনরায় ১৯৫৮ সালে এই খাদ্যসঙ্কট তীব্র হয়। পাশের ছবিটি ঠিক এই পাঁচের দশকের মধ্যভাগের। প্রায় খাদ্য সঙ্কটের সমসময়ের। সে সময় পর্যন্তও বাংলার মানুষের মনে জেগে ছিল সেই মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের বীভৎস ছবিটি। সেই দুর্ভিক্ষেই মানুষ একই আস্তাকুঁড় থেকে কুকুরের সঙ্গে খাবার কাড়াকাড়ি করেছে। ছেলের মুখের থেকে সামান্য খাদ্য হয়তো কেড়ে নিয়েছে মা। এখানে খাদ্যের এই হাহাকারের ছবিটির সঙ্গে শালিমারের নারিকেল তেলকে মিলিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিটি কিছু বিসদৃশ মনে হলেও, পাঠকের চোখ এই ছবিতে সে সময়ে আটকে যাওয়াও অবশ্যম্ভাবী ছিল বলেই আন্দাজ হয়। তবে নানান উদাহরণ থেকে এও মনে হয় যে, মধ্যবিত্ত, যাঁদের অন্তত খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যায় পড়তে হয়নি এই মন্বন্তরকালে, অন্নের প্রাথমিক জোগান টুকু যাঁদের বন্ধ হয়ে যায়নি, তাঁদের মধ্যে একধরনের উদাসীনতাও চোখে পড়ে।

প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' গল্প থেকে একটি অংশ তুলে দেওয়া হল।

"অপমানিত মুখে পলকের জন্য বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নি বৃষ্টি ক'রে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের কদর্য কলুষ রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালুম রাজপথের ওপর দিগন্ত জোড়া

মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভালো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসীন্যে এদের এড়ানো চলে।"[৭]

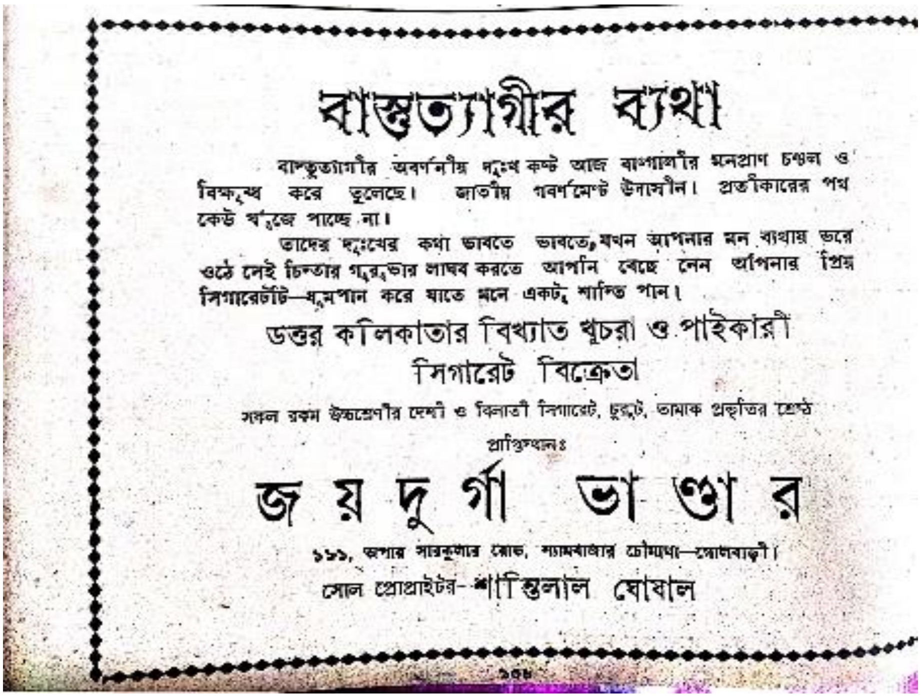

চিত্র ৩.১২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৭

সেই ঔদাসীন্য, এমনকি বেশ স্বার্থপর নৃশংসতার ছাপ আমরা বিজ্ঞাপনেও দেখি। দেশ থেকে উৎক্ষিপ্ত, গৃহহীন মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার কথা ভাবতে ভাবতে, এবং সেই 'গুরুভার লাঘব করতে' ধূমপানের উপদেশ দেওয়ার মতন বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় ১৯৫০ সালে।

খাদ্যের অপচয় নিয়ন্ত্রণ করতে অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয়। সরকারি বিজ্ঞাপনে সেই কথা প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠান বাড়িতে যাতে অতিরিক্ত খাদ্যের অপচয় বন্ধ হয়, সেইদিকে সরকার পক্ষ থেকে লক্ষ্য রাখা হয়। একদিকে তীব্র খাদ্য সঙ্কট, এবং অন্যদিকে বিলাসবহুল খাদ্যের আতিশয্য, এই দুইয়ের সহাবস্থান বন্ধ করতেই ছিল এই সরকারী অবস্থান। বলা হয়, অতিথিকে এই নিয়ন্ত্রণ বিধি লঙ্ঘন করে আপ্যায়ণ করলে তা হয়তো গৃহকর্তার অহমিকা চরিতার্থ করবে, কিন্তু তার মর্মান্তিক প্রভাব এসে পড়বে হাজার হাজার

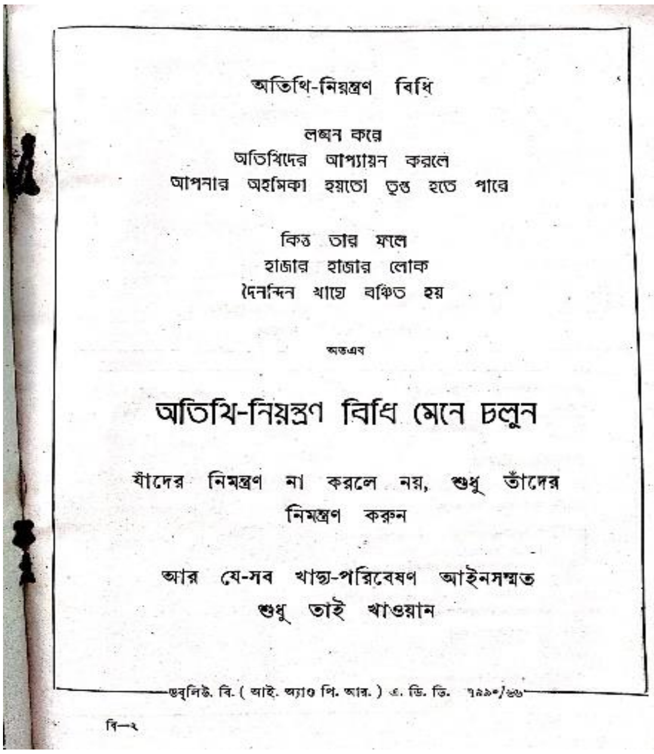

চিত্র ৩.১৩ শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৭৩

ক্ষুধার্থ মানুষের উপর। ধনীর অহমিকা চরিতার্থতা, অন্নহীনকে আরও তীব্র অন্নহীনতার দিকে এগিয়ে দেয়। গত শতাব্দীর আটের দশক পর্যন্ত এমনকি এই অতিথি নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু ছিল।

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন জওহরলাল নেহরু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন বিধানচন্দ্র রায়(১৮৮২-১৯৬২)। বঙ্গ বিভাগ, বিপুল উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্যাভাব, ইত্যাদি বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যাকেন্দ্রিক প্রতিকূল পরিবেশেই ডাঃ রায়কে দায়িত্ব পালন করতে হয়। দামোদর নদের উপরে গড়ে ওঠে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সূত্রপাত হয়। ভারি শিল্প গুলি গড়ে ওঠার তথ্য পূর্বে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বিধানচন্দ্র রায় নানারকম উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পন্ন করেন। তার মধ্যে রয়েছে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভস, রাষ্ট্রীয় পরিবহন, কল্যাণী উপনগরী, দুগ্ধ প্রকল্প (হরিণঘাটা), ও আই আই টি (খড়্গপুর)।

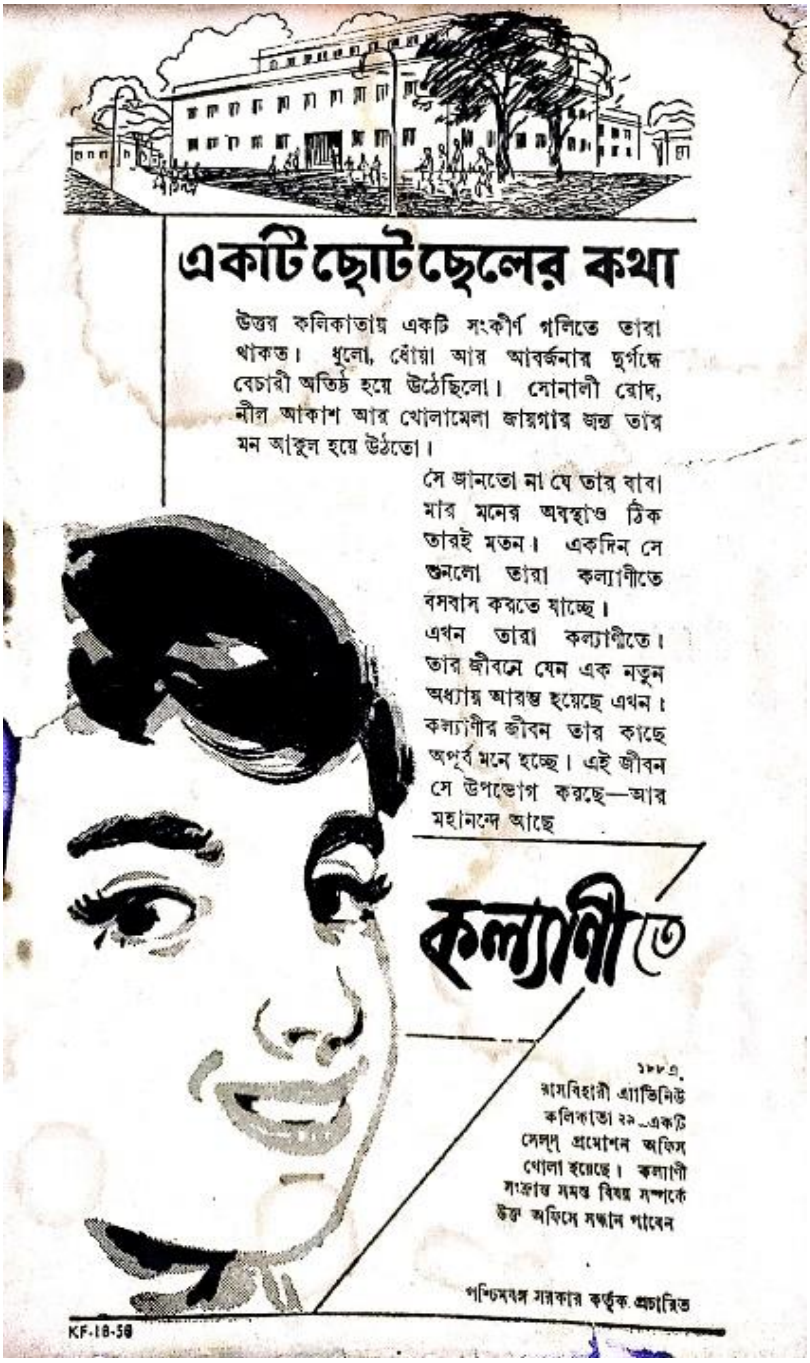

চিত্র ৩.১৪ কবিতা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭

গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে গড়ে ওঠা এই কল্যাণী উপনগরীর কিছু বিজ্ঞাপন সমসময়ের পত্র-পত্রিকায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই বিজ্ঞাপনের একটি

সিরিজ সেই সময়ে প্রস্তুত হয়। নবগঠিত একটি শহরে, কলকাতা থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে, কলকাতার সমস্ত সুবিধা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সঙ্গে বাড়তি পাওনা হল, প্রচুর সবুজে ঘেরা থাকবে এই অঞ্চল। ১৯৫৪ সালে বিধানচন্দ্র রায় কল্যাণীতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আহ্বান করা হয় অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, তরুণ যুবকদের। গাছপালা ভরা এই নতুন শহরে বসবাসের জন্য সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্ভাবনাময় শ্রেণীকেই সর্বাপেক্ষা উপযোগী মনে করা হয়।

একটি ছোট ছেলে, যে উত্তর কলকাতার ধুলো ধোঁওয়া আবর্জনায় থেকে, প্রকৃতির সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল, সেই ছেলেটির জীবনে সুন্দর পরিবর্তন এনেছে কল্যাণী শহর। এই হল বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু এই বিজ্ঞাপন পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই দেওয়া।

চিত্র ৩.১৫ চতুরঙ্গ, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৬

এই বিজ্ঞাপনমালায় ‘ইঞ্জিনিয়ার-এর চোখে’, ‘অধ্যাপকের পছন্দ’ শিরোনামেও চিত্তাকর্ষক সব বিজ্ঞাপন তৈরি হয়। সেই ছবিগুলির চরিত্রদের পোশাকের মধ্যে একধরনের রুচিসম্মত মধ্যবিত্ততার ছাপ স্পষ্ট। অর্থনৈতিকভাবে যাঁরা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থানে আছেন, অথবা অর্থের আতিশয্যে যাঁরা রয়েছেন ঠিক তার বিপরীত অবস্থানটিতে, উভয়কেই কিছুটা দূরে রেখে, সদ্যোজাত শহরটির স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডাক দিয়েছিলেন তাঁদের, যাঁরা শিক্ষালগ্ন। বর্তমানে বহুব্যবহৃত শব্দে বলতে গেলে

‘বুদ্ধিজীবী’দের। কারণ এই শহরটির কেন্দ্রে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। কল্যাণী উপনগরী এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় যাতে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে, তার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কল্যাণীতে স্কুল, হাসপাতাল, বাজার ও ডাকঘরের সুবিধার কথা সবিনয়ে ঘোষণা করে শেষপর্যন্ত জানানো হয়, “কল্যাণীতে স্কুল, হাসপাতাল, বাজার ও ডাকঘরের সুযোগ-সুবিধা দেখে ভদ্রলোকটি খুব খুশী।”

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কাদের জন্য সেজে উঠেছে কল্যাণী। তার সঙ্গে আর একটি জিনিসও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষিত, বাঙালী ‘ভদ্রলোক’দের প্রধান চাহিদাগুলি ঠিক কী কী ছিল।

ছয়ের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে ভারতীয় রেলওয়েজ জানাচ্ছে তাঁদের কর্মীসংখ্যা ‘দশ লক্ষাধিক’। এই সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। ১৯৬১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি (১৯৬১-এর সেন্সাস অনুযায়ী ৪৩৮,৯৩৬,৯১৮)। আর আজ ২০২১ সালে অন্তত ১৩৯ কোটি। অন্যদিকে ভারতীয় রেলের পরিসরও ১৯৬১-র পর অনেক বেড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু এই ২০২১ সালে ভারতীয় রেলের সর্বমোট কর্মীসংখ্যা ১৫ লক্ষের কাছাকাছি। ১৯৬১ সালের বিজ্ঞাপনে ‘দশ লক্ষাধিক’ কর্মীর তথ্য প্রমাণ করে ‘রেলওয়েজ’-এর মতো সরকারি ‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ সেক্টরে সেদিন কী বিপুল নিয়োগ সম্ভব হয়েছিল।

চিত্র ৩.১৬ দেশ, ১ বৈশাখ, ১৩৬৯

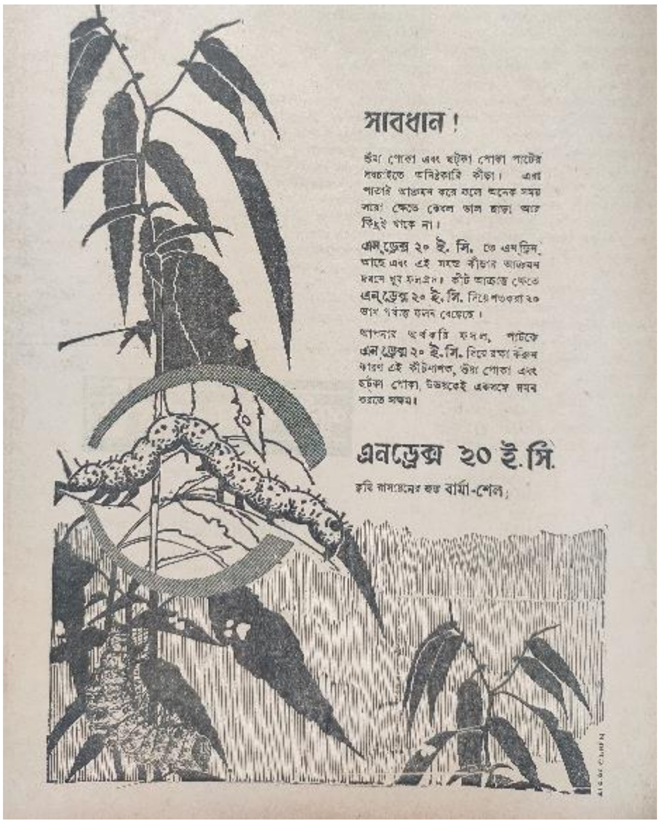

চিত্র ৩.১৭ দেশ, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন দেশটিকে কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে স্বাবলম্বী করে তোলবার ক্রমাগত প্রয়াস চলেছে স্বাধীনতা পরবর্তী অন্তত প্রথম তিনটি দশক ধরে। বিজ্ঞাপনে ধরা আছে সেই দেশের অর্থনীতি নির্মাণের ছবিটি। পাট-জাত শিল্প তখনও বাংলার শিল্পজগতের একটা মূল নির্ভর। অবশ্য ততদিনে পলিএস্টার (১৯৫০), পলিকার্বনেট (১৯৫৩), এবং পলিপ্রোপাইলিন (১৯৫৪)- এর মতো যৌগগুলি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, ফলে পাট-শিল্পের মৃত্যুঘন্টা বেজে গেছে ততদিনে। কিন্তু বাংলার পাটশিল্প সেই শব্দ শুনতে পায়নি তখনও। বার্মা শেল তাই বিজ্ঞাপন করছে নির্ভরযোগ্য কীটনাশকের, যা রক্ষা করতে পারে পাটের পাতাকে।

বার্মা শেল-এর আরেকটি বিজ্ঞাপন এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম, কপি এবং ছবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। বোম্বাইয়ের ট্রম্বেতে বার্মা শেলের যে তৈল শোধনাগার, সেটি ভারতের মধ্যে বৃহত্তম, সেই তৈল শোধনাগার জানাচ্ছে সেখান থেকে উৎপাদিত কেরোসিন তেল

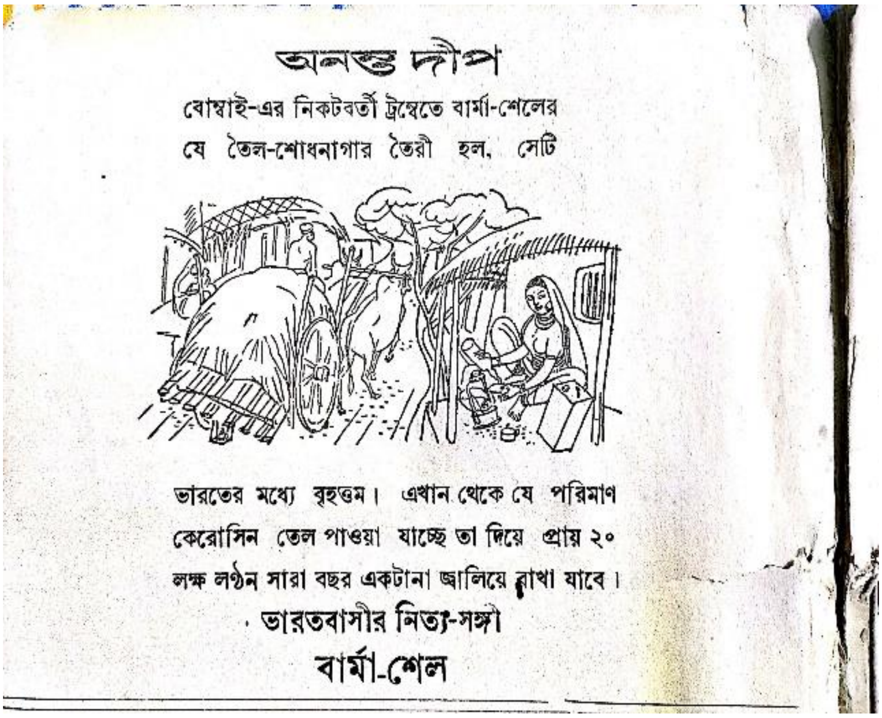

চিত্র ৩.১৮ উত্তরসূরী, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৩৬৩

দিয়ে প্রায় বিশ লক্ষ লণ্ঠন সারা বছর ধরে ক্রমান্বয়ে জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব। কপির সঙ্গে যে ছবিটি দেখা যায়, তা গ্রামীণ ভারতের চিত্র। তারই প্রতীক হয়ে এসেছে চালাঘর, গরুর গাড়ি অথবা লণ্ঠনের ছবি। এই বিজ্ঞাপনে ধরা রয়েছে একটি বিশেষ সময়ের চিহ্ন। এ হল সেই সময়ের কথা, যখন তৈলচালিত দুই বা চার চাকা, বিজ্ঞাপনের পাঠক-দর্শকদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের আওতায় সেভাবে আসেনি। সেই সময়ে আপামর ভারতবাসীর কাছে পেট্রল-ডিজেল অত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যেমনটা আজকের দিনে আছে। ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সেই যুগে গ্রামজীবনের যে ওতোপ্রত যোগ ছিল, তারই চিহ্ন ধরা আছে এই বিজ্ঞাপনে, যেখানে একটি তৈল শোধনাগার ঘোষণা করে উৎপাদিত কেরোসিন তেলের কথা। যাতে গ্রামের ঘরে ঘরে জ্বলে থাকতে পারে 'অনন্ত দীপ'।

অপরাজিত উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, দুর্গাপূজার আগে পথে স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানার বিজ্ঞাপনের উল্লেখ, "একটা নতুন দেশলাইয়ের কারখানা পথে পথে জাঁকাল বিজ্ঞাপন মারিয়াছে।"[৮] ১৩৬২ সালে বেরোচ্ছে এই খাদি প্রতিষ্ঠান নির্মিত দেশলাইয়ের বিজ্ঞাপনটি।

চিত্র ৩.১৯ দেশ, কার্তিক, ১৩৬২

'দেশলাই' এবং 'খাদি প্রতিষ্ঠান' কথাটিকে বড় অক্ষরে লিখে, তলায় ক্ষুদ্র হরফে জানানো হচ্ছে দেশলাই উৎপাদন ট্রেনিং এবং রিসার্চশালায় সোদপুরে শিক্ষার্থী নেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতের ব্যাপক বেকারত্ব দূর করতে দেওয়া হচ্ছে কুটীর শিল্পের প্রশিক্ষণ। নেহেরু'র কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে এই উদ্যোগগুলিকে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

জীবন বীমার গুরুত্ব মানুষকে উপলব্ধি করানো হয়েছে বছরের পর বছর অজস্র বিজ্ঞাপনে। এই বিজ্ঞাপন স্বাধীনতা পরবর্তী কোনও বিশেষ ঘটনা নয়। ১৯৪৭-এর পূর্বে ভারতে এই বীমার বিজ্ঞাপনে ধরা পড়েছে স্বদেশপ্রেম, সৌভ্রাতৃত্বের ছাপ। নির্দিষ্ট সময়ে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে বিস্তারিতভাবে। বর্তমানে স্বাধীনতা উত্তর একটি জীবন বীমার বিজ্ঞাপন দেখা যাক। স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকগুলিতে দেশের অর্থনীতিকে যখন গড়ে তোলবার প্রয়াস চলছে, সেই সময়ে এই বিজ্ঞাপনে জানানো হচ্ছে, দিনকাল খারাপ হওয়ায় আয় থেকে কিছু বাঁচিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। তবুও নতুন প্রজন্মের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার জন্য, "ওদের চোখের আলো" অম্লান রাখতে প্রয়োজন জীবন বীমা। নতুন দেশের নাগরিককে সঞ্চয়ী হতে শেখাচ্ছে এই ধরনের বিজ্ঞাপন। ছবিতেও দেখা যায় শিশুকে নিয়ে বাবা মা এর নিরাপদ জীবনের একটি মুহূর্ত। সেই শিশু এই দেশের ভবিষ্যৎ, অতএব তার অভিভাবকদের তার বিষয়ে যত্নবান হওয়া কাম্য।

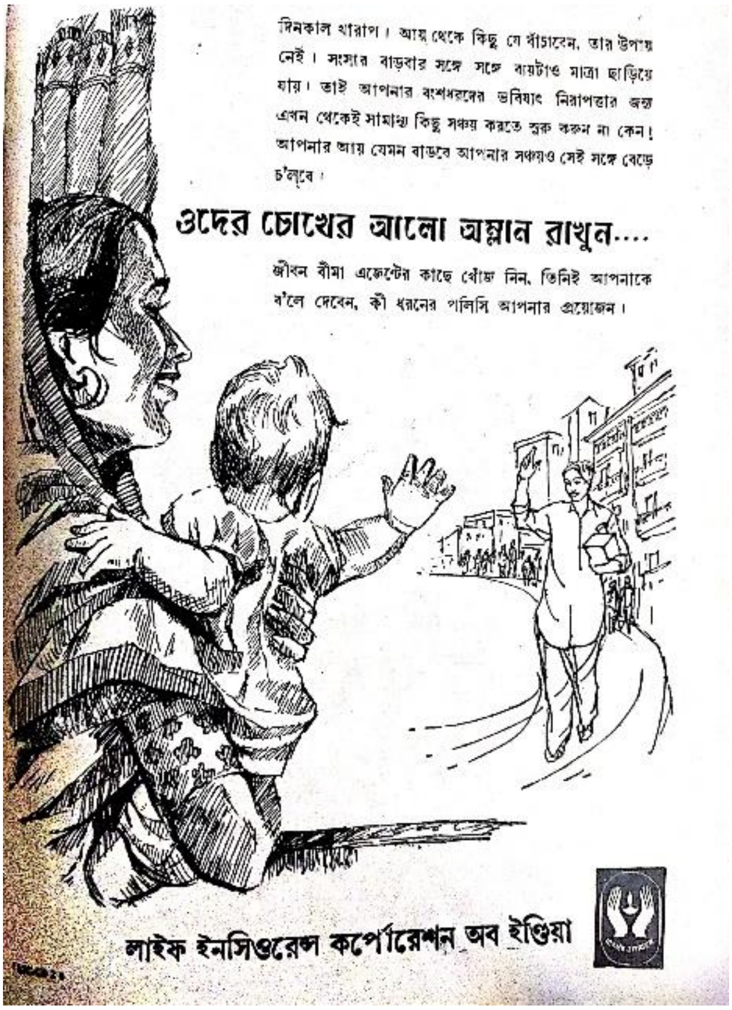

চিত্র ৩.২০ সুন্দরম্‌, চতুর্থ বর্ষ, ৩-১২ সংখ্যা, ১৩৬৭

বাংলা সাহিত্যের একটি বহু চর্চিত ভয়াবহ গল্পের কয়েকটি বাক্য প্রয়োজন অনুসারে উদ্ধৃত করা হবে এইবারে। গল্পের নাম 'দুঃশাসন', লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে অন্ন-বস্ত্রের বিপুল অভাব ঘটে, এবং সেই অভাব ছিল মনুষ্যসৃষ্ট। অর্থলোভী আড়তদার ব্যবসায়ীরা মানুষের প্রাণের বিনিময়ে প্রচুর লাভবান হয়েছিল এই সময়কালে। সে সময়ে তারাই দুঃশাসন। অনবরত অন্ন, বস্ত্রহরণ করে চলেছে অজস্র দ্রৌপদীর।

ঘাটের দিকে থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর একসঙ্গেই চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌর দাসের দৃষ্টি, ছলছল করে উঠল রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই-কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্য্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।[৯]

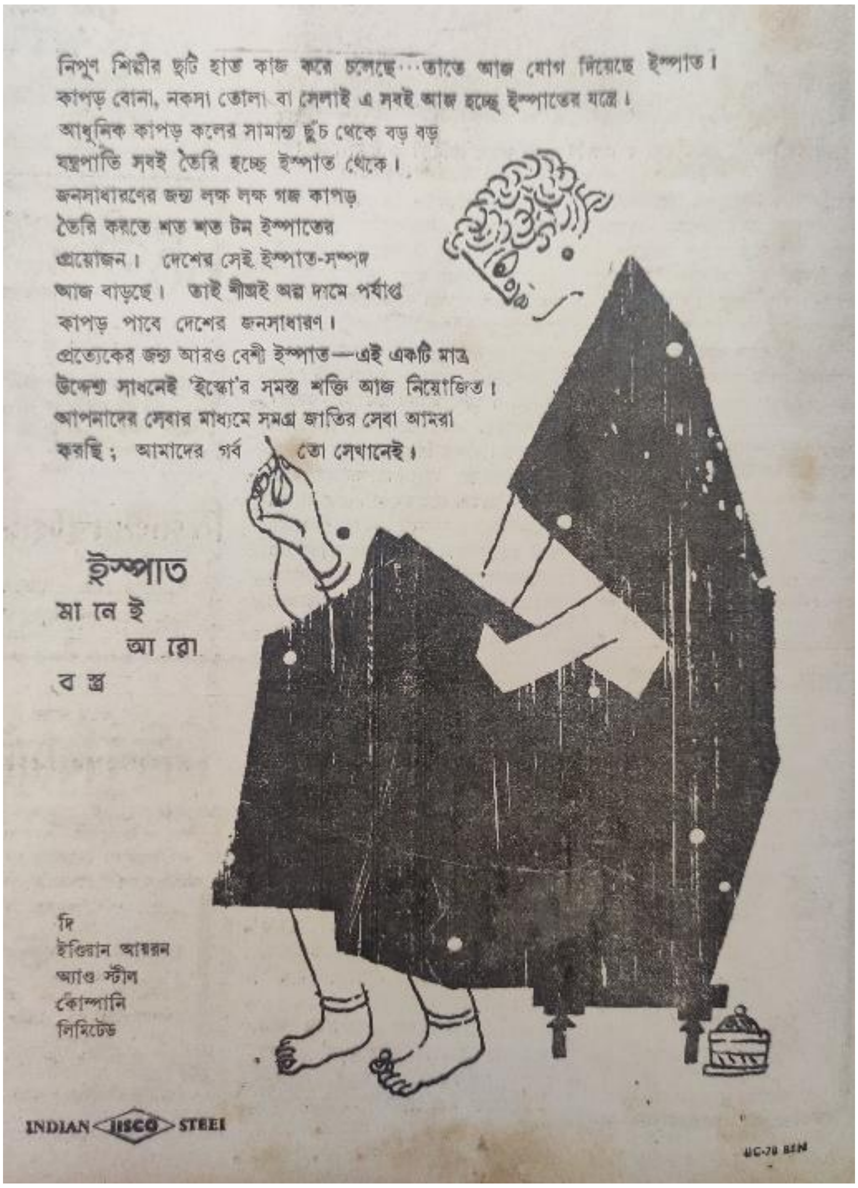

চিত্র ৩.২১ দেশ, ১৯ কার্তিক, ১৩৬৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি দশক ধরে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশকে সম্মুখীন হতে হয়েছে খাদ্য-বস্ত্র সংকটের। খাদ্য সমস্যার কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। বস্ত্র সংকট প্রসঙ্গে কিছু অভিনব বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। দি ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির মতন ইস্পাত কারখানা তাদের বিজ্ঞাপনের শিরোনামে জানায়, "ইস্পাত মানেই আরো বস্ত্র"। দেশের ইস্পাত সম্পদ বাড়ছে, ইস্পাত কারখানা গুলি নানান যন্ত্র এবং কাপড় বোনার উপযোগী ছুঁচ নির্মাণ করছে, ফলে অতি অল্পদিনেই কম দামে প্রয়োজনীয় কাপড় জনসাধারণ পেতে পারবেন। দেশ গড়ে ওঠার এই শুরুর দিনগুলিতে ভারি শিল্পের দিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে জোর দেওয়া হয়, তারই ফল স্বরূপ মানুষের অতি প্রাথমিক চাহিদা গুলি আস্তে আস্তে পূর্ণতা পাবার দিকে অগ্রসর হয়। অর্থিক সামাজিক প্রেক্ষিতই বড়ো কোম্পানিগুলোরও বিজ্ঞাপনের অভিমুখকে নিয়ন্ত্রণ করতো। আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি যখন

আর-সব প্রোডাক্ট ছেড়ে ছুঁচের কথা বিজ্ঞাপনে জানান দেয়, এবং বিশেষভাবে জানায় যে 'শীঘ্রই অল্প দামে পর্যাপ্ত কাপড় পাবে দেশের জনসাধারণ' তখন বোঝা যায় দেশের গরিব নিম্নবিত্ত মানুষের যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্য তখনও বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়নি।

সেকালের টাকার মূল্য বোঝার জন্য একটি বিজ্ঞাপনের কথা এখানে বলা প্রয়োজন। ১৯৬১ সালে ১০ টি সিগারেটের দাম ছিল ৫০ নয়া-পয়সা। অর্থাৎ একটির দাম ৫ পয়সা।

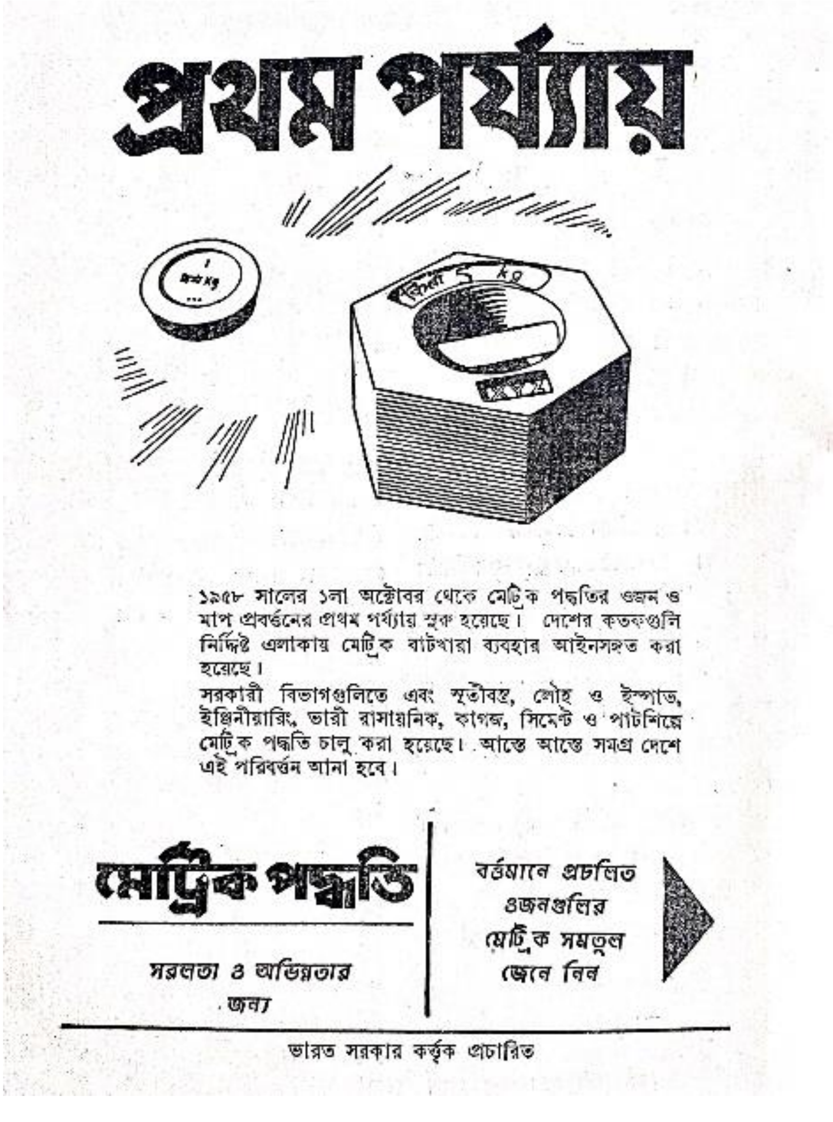

চিত্র ৩.২২ চতুরঙ্গ, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫

প্রসঙ্গত, ১৯৫৫ সালে 'ইন্ডিয়ান কয়েনেজ অ্যাক্ট' সংশোধন করে 'মেট্রিক সিস্টেম'-এ টাকা পয়সার হিসাব রাখার প্রথা চালু হয়। ১৯৫৭ সালের পয়লা এপ্রিল প্রথম '১ নয়া-পয়সা' বাজারে আসে। ১৯৬৪ সালের ১ জুন এই 'নয়া' বিশেষণটি অফিসিয়ালি ভারত সরকার বাতিল করে। কিন্তু এই 'নয়া' শব্দটি যেন স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টারই এক বিশেষণ-চিহ্ন হিসেবে জেগে থাকে। 'মেট্রিক সিস্টেম' চালু হবার পরে ভারত সরকার মানুষকে সচেতন করবার জন্য বহু বিজ্ঞাপন দেয়। সেখানে পুরোনো পরিমাপক এককগুলি বাতিল করে নতুন এককের ব্যবহারের কথা বলা হয়। সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে সেই বিজ্ঞাপনে হিসাব করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় পূর্বে প্রচলিত এবং নতুন পদ্ধতির পার্থক্য।

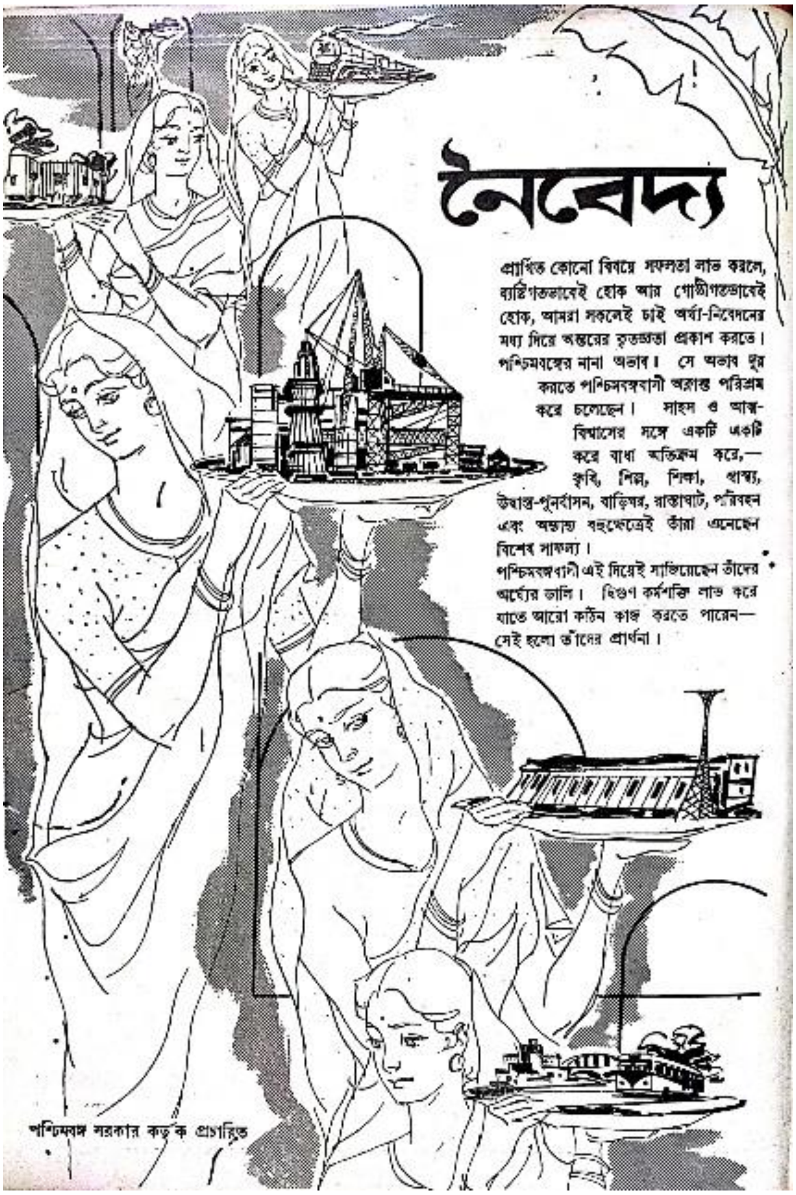

চিত্র ৩.২৩ সুন্দরম্, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৬৬

১৩৬৬ সালের *সুন্দরম্* পত্রিকায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে বোঝা যায়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির তখনও কৈশোর কাল চলছে। সেই সম্ভাবনাময় ভারতের ছবি এই বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনদাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেসময়ে বহু বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়েছে 'পুণ্যব্রত', 'নৈবেদ্য', 'সাধনা'র মতন শব্দ, যা দেশ-সম্বন্ধে যে পুরোনো রোম্যান্টিক ধারণা গুলির সঙ্গে মিলে যায়। স্বাধীনতার পরে পরিবারে নতুন শিশুর আগমনে তাদের 'স্বাধীন', 'সুভাষ' ইত্যাদি নাম রাখার চল ছিল বাঙালি পরিবারে। এই বিজ্ঞাপনেও সেই স্বাধীনতার বোধ, নতুন দেশ গঠন এবং বাঙালিত্বের অনুষঙ্গ মিলেমিশে গেছে। ছবিতে বাঙালী গৃহবধূদের হাতে ধরা রয়েছে পূজার অর্ঘ্যের থালা, কিন্তু সে থালায় পূজার সরঞ্জামের পরিবর্তে কোনটি রেলগাড়ি, কোনটি বড় কলকারখানার দ্বারা পূর্ণ। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, উদ্বাস্তু পুনর্গঠনের মতন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে নতুন দেশ এবং সেই দেশের নতুন একটি রাজ্য কী ভাবে গড়ে তুলতে চলেছে, এ যেন তারই আনন্দবার্তা।

জামশেদপুরের ইস্পাত নগরী জানায়, তারা ১৮০ দিনের কাজ করেছে ৮৪ দিনে। যদিও প্রথমে তারাই সিদ্ধান্ত নেন, এই কাজ শেষ করবেন ৯০ দিনে, তবু তাঁদের উৎসাহী ইঞ্জিনিয়ার আর কর্মীরা কাজটি শেষ করেন নির্ধারিত সময়েরও ছয় দিন পূর্বে। জামশেদপুরে তৈরি হয় নতুন ব্লাস্ট ফার্নেস। ৪৫ বছর আগে এই দেশে আমেরিকা থেকে একটি 'সেকেন্ড হ্যান্ড' 'ই' ব্লাস্ট ফার্নেস কেনা হয়। নতুন ভারতবর্ষের যোগ্য মানুষেরা তাঁদের শিক্ষা আর আত্মপ্রত্যয়ে দেশের জন্য নির্মাণ করেছেন নতুন ব্লাস্ট ফার্নেস।

চিত্র ৩.২৪ সন্দেশ, জৈষ্ঠ্য, ১৩৭০

কৌশিক বসু (১৯৫২-) *অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প* প্রবন্ধ গ্রন্থের একটি প্রবন্ধাংশে লেখেন-

> সন্ধ্যা নামে। ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বসে, দোকানদাররা সন্ধ্যায় ভিড় সামলানোর জন্য তৈরি হয়। ঠিক তক্ষুনি নিভে যায় আলো। লোডশেডিং শুরু হল, ম্লান ভোল্টেজের বিদ্যুৎ ফিরতে চার থেকে আট ঘন্টা। CESC-র নতুন টিটাগড় ইউনিটেও কোনো বিশেষ হেরফের হল না। কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো দিন লোডশেডিং-এর মেয়াদ গিয়ে ঠেকে বারো ঘন্টায়। কেউ নালিশ করে না; জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে এসব। বস্তিতে মোম জ্বলে ওঠে, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে হ্যারিকেন, ফ্যাশনদুরস্ত দক্ষিণ কলকাতায় গুঞ্জনরত জেনারেটর আর ইনভার্টার ধনীদের জুগিয়ে চলে বিদ্যুৎ।
>
> এমন উষ্ণ ও প্রাণবন্ত একটা শহরের বিদ্যুৎ সংকটে এমন মুহ্যমান অবস্থা বড় মর্মান্তিক।[10]

প্রবন্ধের এই অংশটি পড়ে যে জিনিসটা বুঝতে আর সংশয় থাকে না, সেটি হল, সাত-আটের দশকে কলকাতা আর লোডশেডিং প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

১৩৮২ বঙ্গাব্দের একটি বিজ্ঞাপনের কথা এখানে অবশ্য উল্লেখ্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ 'আলো তৈরির গল্প' শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন বানায়। বিজ্ঞাপনের কপিটি ছিল দীর্ঘ। বোঝা যায় এ বিজ্ঞাপন কিশোরদের কথা ভেবেই মূলত প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে বড়দের কাছেও কিছু তথ্য এর মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়। 'বিদ্যুৎ তৈরি হয় কি ভাবে?', 'পারমানবিক শক্তি', 'সৌর শক্তি', 'বিদ্যুৎ পরিবহন ও বিতরণ' ইত্যাদি নানান শিরোনামে ভাগ করে লেখা হয়েছে বিজ্ঞাপনের কপিটি। যেখানে শেষে জানানো হয় পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদই সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ তৈরি করে। ১৯৫৫ সালে যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হত ৪ মেগাওয়াট, এখন সেখানে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাপ ৬৬২ মেগাওয়াটেরও বেশি। এ ছাড়া রাজ্যের প্রায় দশ হাজার গ্রামে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে।

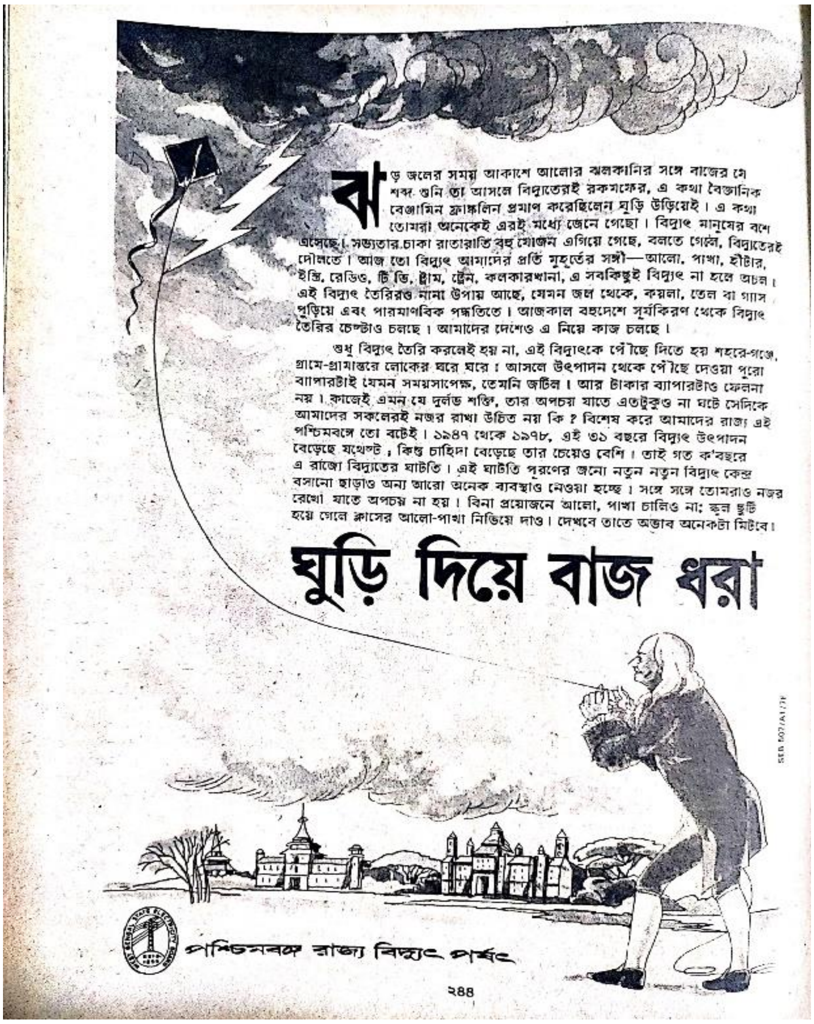

চিত্র ৩.২৫ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৩৮৫

কিন্তু মনে রাখার বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গে যেখানে গ্রামের সংখ্যা প্রায় আটত্রিশ হাজার, সেখানে দশ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছোবার অর্থ হল বাকি আঠাশ হাজার গ্রাম গত শতাব্দীর সাতের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিদ্যুৎহীন অবস্থাতেই ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একটি বিজ্ঞাপন এবার দেখা যাক। *আনন্দমেলা*-র পূজাবার্ষিকী থেকে এই বিজ্ঞাপনটি প্রাপ্ত। শিশু-কিশোরদের পত্রিকায় তাদের বোধগম্য ভাষায় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের কাহিনির মাধ্যমে জানানো হয় বিদ্যুৎ আমাদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। আমাদের দেশেও বিদ্যুৎ

উৎপাদন যাতে বাড়ে তার কাজ চলছে। স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলিতে বিদ্যুতের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। তৈরি হয়েছে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র। তবু শিশুদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াবার জন্য দেওয়া হয়েছে এই বিজ্ঞাপন, যাতে তারা সময়মতো আলো-পাখা নিভিয়ে বিদ্যুতের অপচয় রোধ করে।

এই বিজ্ঞাপনটি প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলের বিজ্ঞাপন। স্বাধীনতার পরে বেশ কয়েকটি দশক অতিক্রান্ত হলেও রাজ্যে এই বিদ্যুতের অভাব বেশ গুরুতর আকারে ছিল তা কৌশিক বসুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধাংশ থেকেই বোঝা যায়। শোনা যায় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীও লোডশেডিং-এ অন্ধকার ঘরে বসে হাতপাখা নাড়তেন। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনেই নয়, গোলমাল হয়েছিল বৃহত্তর ক্ষেত্রেও। দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০)-এর *নিজস্ব সংবাদ* বইয়ের একটি ফিচারধর্মী লেখার অংশ উদ্ধৃত তুলে দেওয়া হল-

> ১৪ এপ্রিল ৮৩ বিধানসভা ভবনে এমন এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যাকে খবরের কাগজে ‘অভূতপূর্ব’ বলা হয়েছে। ‘অভূতপূর্ব’ কথাটির আবার একটু ব্যাখ্যা আছে- ‘বিধানসভার ইতিহাসে’।
>
> ‘ইতিহাস’-টি সত্যি করেই কার সেটা একটু পরে দেখা যাবে, কিন্তু ঘটনাটি কী?
>
> বৃহস্পতিবারে বিধানসভায় বিকেলবেলায় সমবায় বিভাগ নিয়ে আলোচনা চলছিল। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং। বিধানসভায় লোডশেডিং হয় না। কোনো কারণে হয়ে গেলে দু-পাঁচ মিনিট পরই বিদ্যুৎ চলে আসে। সুতরাং সদস্যরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই বোঝা গেল, ব্যাপারটা ‘অভূতপূর্ব’ হতে চলেছে। চল্লিশ মিনিটে বিদ্যুৎ ফিরে না আসায় ‘ইতিহাস’ তৈরি হল। বিধানসভা মুলতুবি রাখা হল। সেদিনই শ্রম বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি এখন বিদ্যুৎ বিভাগেরও তদারক মন্ত্রী, ঘোষণা করলেন, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সঙ্গে শেষ মোকাবিলার সময় এসেছে।[১১]

বিজ্ঞাপনগুলি থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসে যে সেই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ ইত্যাদি নানান বিপুল রাজনৈতিক আলোড়নের পরে স্বাধীন ভারতবর্ষের অর্থনীতি নির্মিত হচ্ছিল প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে। সমসাময়িক বিজ্ঞাপনগুলি নিজেদের দেহে যত্নে ধরে রেখেছে সেই অর্থনৈতিক ভাষ্য। এই নানান উত্থান-পতন, প্রচেষ্টা, সাফল্য, বিফলতার পথ ধরে গত শতাব্দীর নয়ের দশকের গোড়ায় ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে এলো সেই আলোড়নকারী পরিবর্তন, যে প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত।

দেশের বৃহৎ অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন। একটি পরিবর্তন অপরটিকে প্রভাবিত করে স্বভাবতই। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কাঠামোর ইতিহাস এবং মানুষের প্রাত্যহিক

অর্থনীতির ইতিহাস, সেই সঙ্গে জড়িত তার তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, দুটির রূপ ভিন্ন, কিন্তু দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বিজ্ঞাপনের মধ্যে সেই দুটি রূপকেই খুঁজে পাওয়া যায়। বৃহৎ অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার পথ পেরিয়ে এইবার আমরা এসে দাঁড়াই মধ্যবিত্তের গৃহকোণটিতে।

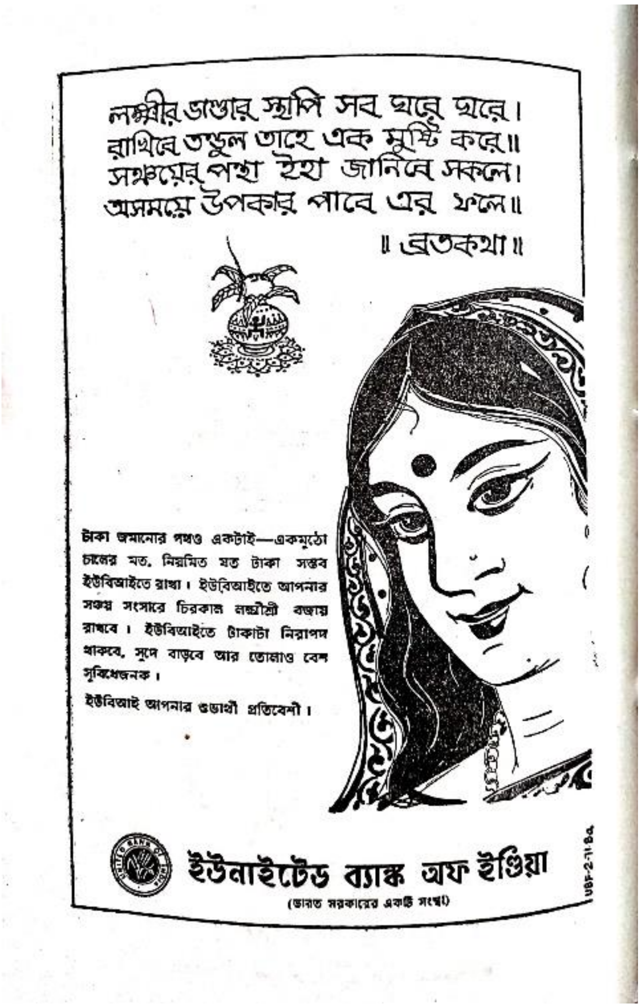

চিত্র ৩.২৬ এক্ষণ, শারদীয়া ১৩৭৮

দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কতটা বিদেশী মুদ্রার ভান্ডার আছে অথবা কতটা সোনা সঞ্চিত হয়ে আছে, তার সঙ্গে আমাদের পরিবারের গৃহকর্ত্রীদের কুলুঙ্গিতে যে মাটির লক্ষ্মীর ভাঁড় আছে, তাতে কতগুলি খুচরো পয়সা আছে- দুটি যে একেবারে পরস্পর সম্পর্কহীন, তা নয়। কিন্তু তাদের রূপ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধরন আলাদা। পাশের বিজ্ঞাপনটিতে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াও টাকা জমানোর পন্থা হিসাবে সেই পরিবারের বধূটির একমুঠো চাল সঞ্চয়ের চিরকালীন ঘরোয়া পথটিকেই দেখায়। মানুষের প্রাত্যহিক অর্থনীতির ইতিহাসের রূপ আলাদা। বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে এই দুটি রূপকেই খোঁজা সম্ভব। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ে গুরুতর টান পড়ে গেলে আমাদের পরিবারের লক্ষ্মীর ভাঁড়েও খানিকটা টান পড়ে। মুদ্রাস্ফীতি হয়, জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে, হয়তো ভাঙতে হয় যত্নে সঞ্চিত ভাঁড়টিকেও, ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীর ভাঁড়ের প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় আসে বড় রকমের পরিবর্তন। মধ্যবিত্তের বাড়ি থেকে উধাও হয় কুলুঙ্গি। বহুতল শপিংমলের সঙ্গে যুক্ত হয় ক্রেডিট কার্ড। আমরা যে পরিমাণ খরচের হিসাব মাথায় নিয়ে বাজার করতে ঢুকি, ফিরি অবধারিতভাবে তার চাইতে বেশি খরচ করে। মধ্যবিত্তকে যাতে তার চাহিদার সঙ্গে, স্বপ্নের সঙ্গে কোনও আপোষ করতে না হয়, তার ব্যবস্থা করে এই ক্রেডিট কার্ড। এদিকে সুকৌশলে কমতে থাকে অর্থ।

তবে তা বোঝার আগেই ঘরে চলে আসে সেই 'মহার্ঘ্য' বস্তু যা না থাকলে সমাজ সংসার মিথ্যে বলে মনে হতে শুরু করেছিল অকস্মাৎ আমাদের।

এই ধরনের বহুতল বাজারগুলি আমাদের সামনে অজস্র দ্রব্য ছড়িয়ে রাখে, আমরা হয়তো ভাবি এই তো প্রকৃত নির্বাচনের সুযোগ। নির্বাচন বাড়িয়ে দেয় অযাচিত চাহিদা।

নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এভাবেই পরিবর্তন করে মধ্যবিত্তের ক্রয়ের ধরন, পাল্লা দিয়ে পরিবর্তিত হয় তার মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মূল্যবোধের পরিবর্তিত চিত্রও ধরা পড়ে যায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

> কাপড়চোপড় নিয়ে কোনো মহলই তেমন মাথা ঘামাত না। আমাদের জন্যে পূজোর সময় রাশি রাশি বঙ্গলক্ষ্মী কিংবা মোহিনী মিলের নেহাত সাদামাটা ধুতিশাড়ি আসত। তাঁতের দামী ধুতিশাড়ি 'এক চড়নের' অর্থাৎ একসঙ্গে চারখানা বোনা এলেও বাড়ির ছেলেমেয়েরা তা পেত না, কুটুম বাড়িতে পাঠানো হত সে সব। তাঁতের শাড়ির তখন এমন বাহার ছিল না- লালকালো পাড় এদিক ওদিক করে হয় 'গঙ্গাযমুনা' নয় 'সিঁথির সিঁদুর'। বাড়ির ছোটদের জন্যে জামা আসত একধরনের- কর্তার তরফের ছেলেমেয়েরা বা পিতৃহীন অন্যতর ছেলেমেয়েরা একই জামা পুজোর সময় পরত। তা নিয়ে কখনও কারুর মনে ক্ষোভ ছিল না।[১২]

মধ্যবিত্তের চাহিদার ছবিটি সহজ কথায় ধরা আছে কল্যাণী দত্ত (১৯৩০-)-র প্রবন্ধাংশটিতে।

১৩৫০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল বাংলার ইতিহাসের সেই নিষ্ঠুর, দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তরে মানুষের অবস্থা হয়েছিল বিপর্যস্ত। গ্রাম থেকে আগত মানুষের পথে পড়ে দীন মৃত্যু হয়েছিল। প্রথমে অন্নের প্রার্থনা, তারপরে সামান্য ফ্যান, শেষে রাস্তার পশুদের সঙ্গে একই আস্তাকুঁড়, নর্দমা থেকে উচ্ছিষ্টের জন্য কাড়াকাড়ি; এই ছিল দৈনন্দিন চিত্র।

কিন্তু শুধু তাদেরই না, টান পড়েছিল শহরের মধ্যবিত্তের ভাঁড়ারেও। একেবারে মৃত্য না হলেও মৃত্যুর অতি কাছেই ছিল সেই অবস্থান, মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে। অন্নের সঙ্গে বস্ত্রের আকালও জর্জরিত করে তুলেছিল।

বর্তমানে ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনটি মহালক্ষ্মী কটন মিলের। এই সংস্থাও এ সময়ে বিজ্ঞাপনের সিরিজ করে কখনও পরিবারের কর্তা, কখনও কর্ত্রী, কখনও বা ছোট খোকা বা খুকুকে সম্বোধন করে। সকলকেই বলা হয় তাদের

চিত্র ৩.২৭ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৫০

পোশাক সামলে চলার কথা। যেখানে শিশুদের সম্বোধন করা হচ্ছে সেই কপি তাদের বোধগম্য করে লেখা হচ্ছে। আর বড়দের জন্য তৈরি কপিতে কথা বলার ধরনটি বদলাচ্ছে স্বভাবতই। সব ক্ষেত্রেই যদিও জানানো হচ্ছে একই কথা, যুদ্ধের কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় ইচ্ছামতন জামা-কাপড় কেনা অসম্ভব, তবে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো এমন পরিস্থিতি দাঁড়াবে যখন সাধ্য থাকলেও আর সাধপূরণ হবে না, বাজারে কাপড় পাওয়া যাবে না। সেই সময়ের কথা ভেবেই সকলকে সচেতন করতে চাইছে ‘মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিমিটেড’। বলা হচ্ছে সাবধানে পোশাক ব্যবহার করার কথা, যাতে তা দ্রুত ছিঁড়ে না যায়। তবে শেষে তারা সবিনয়ে এও জানাচ্ছে যে, যুদ্ধ থেমে গেলে তারাই পরিবারের সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন তাদের পছন্দসই শাড়ি, ধুতি। তা কেবল সময়ের অপেক্ষা। এই বয়ানকে একটি বিজ্ঞাপনী কৌশল হিসাবে মাথায় রেখেও একটি জিনিস লক্ষ্যণীয় যে, আজ থেকে প্রায় সাত দশক আগের বিজ্ঞাপনমালায় একটি বাণিজ্যিক সংস্থাই মানুষকে বুঝেশুনে, সময়ের কথা মাথায় রেখে খরচ করতে বলছে।

আজকের দিনে এই ধরনের বিজ্ঞাপনকে কিছুটা অবিশ্বাস্য মনে হয়, যখন বৈভবের প্রদর্শন সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রধান বা একমাত্র হাতিয়ার। এই বিজ্ঞাপনগুলি তাদের অবয়বে ধারণ করে রেখেছে জ্বলন্ত সময়ের চিহ্ন। কেবলমাত্র ক্রয়ে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে তারা শিক্ষা দিয়েছে সাময়িকভাবে সংযমী হওয়ার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শুরুর একটি দুটি বছর বাংলার মধ্যবিত্তদের সংসারে তেমন টানাটানি পড়েনি। পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬)-র একটি গল্পে স্পষ্ট দেওয়া আছে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের, ১৯৩৯-১৯৪৩ এই পাঁচটি বছরের মাসিক খরচের হিসাব। গল্পের নাম ‘শেষের হিসাব’। আসলে সমস্ত গল্পটিই একটি হিসাবের খাতার কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র। তার মধ্যে থেকে কাহিনির কথক তুলে দিয়েছেন ছ’টি মাসের ছবি।

হিসাবের খাতায় লেখা সামগ্রীর নাম ও পরিমাপ দেখলে ভদ্রলোক যে শহরের বাসিন্দা তা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না। বাড়িভাড়া, চাল, কাপড়, কয়লা ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সঙ্গে খাতাটি ধরে রেখেছে তৎকালীন মধ্যবিত্তের সহজ বিলাসিতার চিহ্নগুলিকে। যুদ্ধ শুরুর একেবারে প্রথম বছরটিতে, মাসে এক-আধ দিন সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাওয়ার সাধ্য ছিল। দ্বিতীয় বছরের হিসাব খেয়াল করলে দেখা যায় মণ প্রতি চালের দাম বেড়েছে একটি গোটা টাকা। সে সময়ে একটি গোটা টাকার মূল্য মধ্যবিত্তের সংসারে যথেষ্ট ছিল। চালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে অন্যান্য সংসার-খরচ এবং হিসাবের নিয়ম মেনে সহজেই অন্তর্হিত হয় সিনেমা-থিয়েটারের মতো বাড়তি খরচগুলি। ৪১ সাল থেকে হিসাবটা গুরুতরভাবে বদলে যেতে থাকে। চালের দাম বাড়ে দ্বিগুণ, কেনার পরিমাণ হয় অর্ধেক। টান পড়ে কয়লাতেও। ৪২-এ চালের পরিমাণ গত বছরেরও অর্ধেক হয়, দাম বাড়ে প্রথম বছরের প্রায় চারগুণ। জ্বালানি ছাড়িয়ে সরাসরি টান পড়ে পেটে। এ পরিবারটির তখনও কিছু ভরসা ছিল জীবনের প্রতি। সম্ভবত ভাগ্য ফেরাবার স্বপ্নে সংসার খরচে যতই টানাটানি হোক, কেনা হতে থাকে লটারির টিকিট। যদি একদিন সব ঠিক হয়ে যায়, হাজার দুঃসময়েও মানুষ এই আশা ছাড়তে পারে না। শেষ বছরের দুটি মাসের হিসাব থেকে চাল বাদ যায়। অর্থাৎ নিরন্ন উপবাস। ৪৩ সালের জুলাইয়ে শেষ চেষ্টা, শেষ সম্বল ভাঙিয়ে, হৃতসর্বস্ব একটি একদা সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার কবচ, মাদুলি, লটারির টিকিট কেনে। অন্তিম হিসাবটি মর্মান্তিক। স্ত্রী সন্তানকে দেশের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করে কথকের সেই অদেখা ভদ্রলোক বেছে নেন আত্মহত্যার পথ। এক কালের সম্পন্ন অবস্থার কথা ভেবে, ঠিক পথে বসে অন্নভিক্ষা করতে পারেননি এরা। তার থেকে মৃত্যুকে সহজতর মনে হয়েছিল। তারপর তিনি সে পথেই চলেছিলেন না কোনও অবস্থান্তর ঘটেছিল, তা অবশ্য জানা যায় না। শুধু বোঝা যায়, মধ্যবিত্তের শান্তিপূর্ণ দিনযাপন থেকে আত্মবিশ্বাস, যুদ্ধ-মন্বন্তরের বাজার

সবকিছুকে ধ্বংস করেছিল। শেষ পর্বে তাই কেনবার জন্য পড়েছিল দড়ি আর কলসি। তবু সেও যে সস্তায় মেলেনি সে কথাও লেখা আছে রক্তের অক্ষরে। দুর্ভিক্ষের দিনে একদিকে মৃত্যু ছড়াছড়ি যাচ্ছিলো, অন্যদিকে প্রতীক্ষার ধৈর্য না থাকলে তাও সহজে পাওয়া যেত না।[১৩]

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকগুলির যে স্মৃতিচিহ্ন সাহিত্য, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথায় ছড়িয়ে আছে; অথবা বয়স্ক মানুষের ব্যক্তিগত মৌখিক স্মৃতিচারণের প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায় মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন যাপন, সন্তানদের বড় করবার পদ্ধতি, আহার-বিহার সবকিছুর মধ্যেই একধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। অর্থের দিক থেকে তেমন শক্তিশালী না হতে পারলেও, এই বৈশিষ্ট্যটুকুই ছিল তার একান্ত অর্জন। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধও সেই দিন যাপনেরই অংশীদার। খেয়ে-পরে সংসার চলে যায়, অর্থনৈতিকভাবে প্রায় সম মানের পরিবারগুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে একই মূল্যবোধ কাজ করতো। স্বদেশী আন্দোলন যে সময়ে তুঙ্গে, সে সময়ে সরাসরিভাবে সংগ্রামে যোগ না দেওয়া পরিবারগুলিও কিছু আদর্শ মেনে চলত, সংযমের শিক্ষা দেওয়া হত শৈশব থেকেই। অর্থ রোজগারই যে জীবনের মূল মন্ত্র নয়, আর অর্থ থাকলেও যে সর্বদা বিলাসী জীবন যাপনীয় নয়, সে শিক্ষাও তাঁরা দিয়েছেন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে। এইভাবেই কেটেছিল পরপর বেশ কয়েকটি প্রজন্ম। নয়ের দশকের সূচনালগ্নের অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তাঁদের জীবনে গভীর ছাপ ফেলে গেছে। প্রায় এক শতাব্দী লালিত মূল্যবোধের সংজ্ঞা বদলে গেছে অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

অশোক মিত্র তাঁর *আপিলা চাপিলা* বইতে লিখছেন-

> আদর্শবাদী বাবা বাড়িতে বিলিতি কাপড় ঢুকতে দিতেন না, অন্য যে কোনও বিলাসিতার উপকরণও। ছেলেবেলায় মাখন বলতে গয়লাদের দেওয়া কলাপাতায় কলাপাতায় জমানো ননী আমাদের ভোজ্য ছিল। গৃহস্বামীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আমার মা কয়েকবছর বাদে পলসনের মাখনের টিন কিনে সেঁকা পাঁউরুটির টুকরোর উপর ছড়িয়ে দিতেন। তা-ও পরম সতর্কতার সঙ্গে, সীমিত বিন্যাসে, যাতে টিনের মাখন বহুদিন ধরে চলে। আমার কাছে এটা সাংসারিক মিতব্যয়িতার প্রতীক হয়ে ছিল।[১৪]

বিজ্ঞাপনের উদাহরণে আসা যাক।

বিজ্ঞাপনটি হারকিউলিস সাইকেলের। ধোপদুরস্ত ধুতি,শার্ট অথবা পাঞ্জাবি কিংবা ফতুয়া, চোখে চশমা, হালকা ঠান্ডায় গায়ে একটা জহর কোট; পোশাকের এই ভঙ্গি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না বিজ্ঞপনের ছবির চরিত্ররা

চিত্র ৩.২৮ দেশ, ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

মধ্যবিত্ত। এমনকি উচ্চ মধ্যবিত্ত বললেও ভুল বলা হয় না। কিন্তু তাঁদের স্বপ্নের উচ্চসীমা সাইকেল কেনা পর্যন্তই যেত অধিকাংশ ক্ষেত্রে। সেই সাইকেলও ক্ষণিকের সিদ্ধান্তে ক্রয় করা সম্ভব ছিল না। রীতিমতো বাসভাড়া, খাওয়ার খরচ, শাড়ি গয়না থেকে টাকা বাঁচিয়ে সেই সাইকেল কেনা সম্ভব হত। মধ্যবিত্তের হাতে কাঁচা টাকা মাত্র ছয় দশক আগে কত কম ছিল, তা এই বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়। আজকের গাড়ির মতন সে সময়কার সাইকেল ছিল মধ্যবিত্তের কাছে একটা বিনিয়োগ। তাই তার প্রতি আদর যত্নেরও খামতি ছিল না। চা, সিগারেট সহযোগে তাসের আড্ডা চলাকালেও তাই বারবার মনে পড়ে যেত 'সারা জীবনের সাথী'-র কথা, চুরি হওয়ার আশঙ্কায় বারে বারে গিয়ে দেখে আসতে হত তালা ঠিকমতো দেওয়া আছে তো! একই সঙ্গে, মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরোয়া আড্ডার যে চিত্র বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়েছে বারেবারে, এই বিজ্ঞাপনেও রয়েছে সেই আড্ডাপ্রিয় বাঙালি জীবনের একটি মনোরম দৃশ্য।

সাইকেল ছাড়াও আরও নানান বিজ্ঞাপনের মূল ভাবটি যেন একইরকম। 'রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্'-এর বিজ্ঞাপনেও একটি নতুন কেনা রেডিও সেটকে কেন্দ্র করে একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মুগ্ধতার ছবি ধরা আছে।

একদিনে যা কেনা যায় না, ধৈর্য ধয়ে অর্থ জমিয়ে উৎকৃষ্ট বস্তুটি নির্বাচন করে মমতাভরে যাকে ঘরে আনাই দস্তুর। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় একসঙ্গে বসে গান, বক্তৃতা, বাজনা, নানা দেশের সংবাদ, গল্প শোনা যেমন আনন্দ ও শিক্ষার বিষয়, তেমনই রেডিও সেটটিও যে বড়ই সাধের সে কথা বিশেষ জোর দিয়ে জানানো হয় বিজ্ঞাপনে। যদিও এই বিজ্ঞাপনটি হারকিউলিস সাইকেলের বিজ্ঞাপনের চাইতে বেশ কিছু আগেকার। *চিত্রপঞ্জী* পত্রিকার প্রথম বর্ষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় এটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

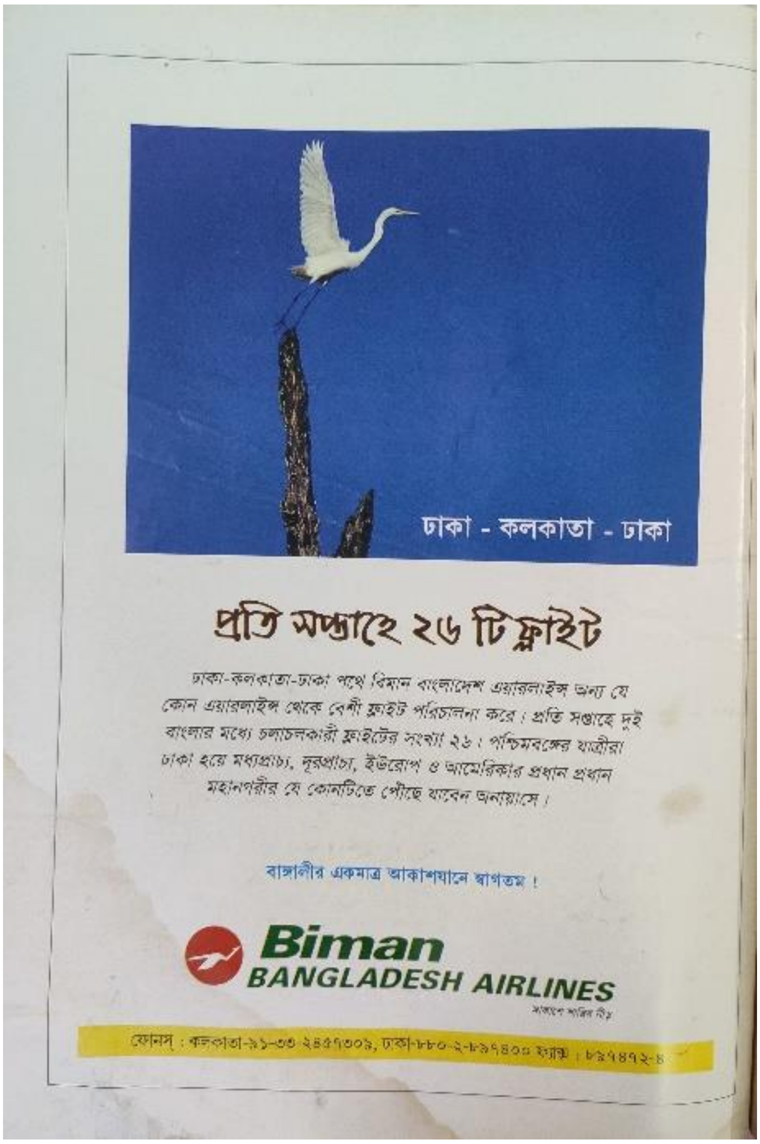

চিত্র ৩.২৯ দেশ, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯

স্বাধীনতার পর যে মধ্যশ্রেণী একটা সাইকেলের স্বপ্ন দেখা দিয়ে জীবন শুরু করেছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষ বছরটিতে দাঁড়িয়ে তারই জন্যে এলো বিমানে চড়ার হাতছানি। কপির মধ্যে যে বাক্যটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল, ‘বাঙ্গালীর একমাত্র আকাশযানে স্বাগতম’। একদিন সাইকেল কেনার জন্য সাংসারিক খরচ থেকে যাকে অর্থ বাঁচাতে হত, সেই মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে এসে পড়লো বিমান। এই যাত্রা চমকপ্রদ সন্দেহ নেই, এর পিছনে রয়েছে দেশের অর্থনীতি।

আবার গত শতাব্দীর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পিছিয়ে গেলে দেখা যায় মধ্যবিত্ত গৃহিনীর পোশাকের সাধ। কিন্তু সাধ্য নেই। কেননা হাতে কাঁচা টাকা নেই, ক্রেডিট-ডেবিট কার্ডের প্রশ্নই ওঠে না। ‘টাকায় কুলোয়নি বলে পরবার সাধ থাকতেও’ যে পোশাক পরতে পারেননি, এবার সেই পোশাক নিজেই বানিয়ে নেবেন। এখন তাঁর কাছে আছে ঊষা সেলাই কল। নিজের সাধ মেটানোর পাশাপাশি হাতেও বেশ দু পয়সা আসতে পারে। এইখানে বিজ্ঞাপনের কপিটিতেই শেষে দেওয়া হয়

একটি চমৎকার প্রস্তাব, যাঁরা এখনো কলে সেলাই করতে পারেন না, তাঁদের জন্য ঊষা কোম্পানি ব্যবস্থা করেছে সেলাই আর এমব্রয়ডারি স্কুলের। ছবিতে সুসজ্জিতা এক যুবতীকে দেখতে পাওয়া। তাকে আধুনিকা এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত মনে করায় বাধা থাকে না, বাঁ হাতের মণিবন্ধে স্পষ্ট দেখা যায় ঘড়ি। তবুও হাতে কাঁচা টাকা বা বর্তমানের পরিভাষায় 'লিকুইড মানি'র অভাবে ইচ্ছা হলেই পছন্দসই পোশাক কেনা হয়ে উঠতো না। এ ছবি তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের একটি অতি পরিচিত ছবি বলেই মনে হয়। নতুন সেলাইয়ের কল কিনে সেই কলে সেলাই শিখে নেওয়ার বিষয়টি সম্ভবত বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাঙালী বাড়ির মেয়েরা ছুঁচ-সুতোয় সেলাই জানবে এই ঘটনা সেসময় খুবই স্বাভাবিক ছিল। বহুদিন পর্যন্ত বাঙালী পাত্রী পছন্দ করার অন্যতম শর্ত ছিল মেয়েটির সূচিশিল্পের পারদর্শিতা।

চিত্র ৩.৩০ দেশ, ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫)-এর 'অবতরণিকা' ছোটগল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) 'মহানগর' (১৯৬৩) ছবিটি তৈরি করেন। সেই ছবির প্রধান চরিত্র, ছয়ের দশকের কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের সন্তান আরতি মজুমদার পরিবারের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপে যখন কাজে বেরোতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁর কাজটি হয় 'সেলস্-গার্ল'-এর। ঘরে ঘরে সেলাইয়ের মেশিন বিক্রি করতে হত তাকে। এই ব্যবসা সে সময়ে যথেষ্ট লাভজনক ছিল।

মনে পড়ে আশালতা সিংহ (১৯১১-১৯৮৩)-র 'সেলায়ের কল' গল্পটির কথা, যেখানে সুরবালার ডেপুটি স্বামী বাঁকুড়ায় বদলী হলে স্ত্রী এর একাকীত্ব ঘোচাতে কিনে দেন একখানা সেলাইয়ের কল, আর সেই কলের কোম্পানির

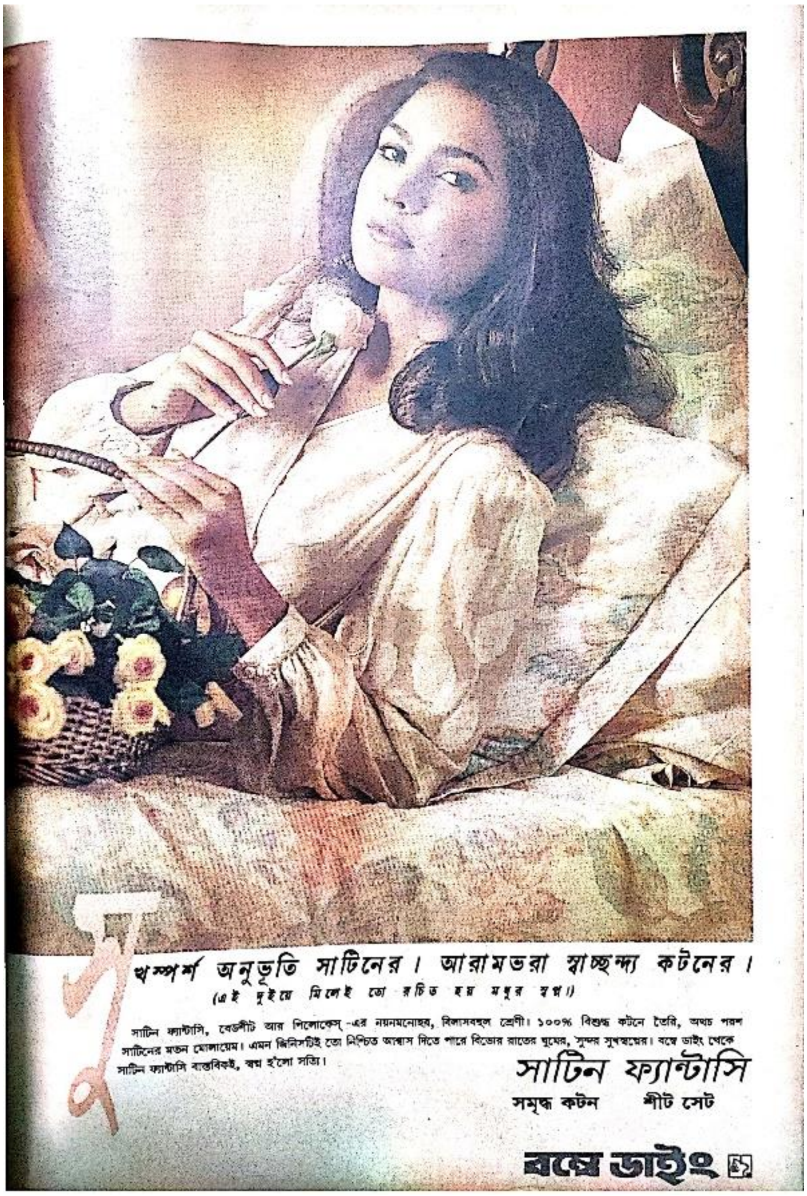

চিত্র ৩.৩১ দেশ, ২৯ আষাঢ়, ১৪০৩

কর্মচারী এক মহিলা সুরবালাকে নিয়মিত এসে শিখিয়ে যেতে থাকেন সেলাই। সে সময়ে অবস্থাপন্ন পরিবারের স্টেটাস সিম্বলের সঙ্গেও কোথাও যুক্ত ছিল একটি সুন্দর সেলাইয়ের কল। গত শতাব্দীর আটের দশক থেকে রেডিমেড পোশাকের ব্যবহার বাড়তে শুরু করে, নয়ের দশকে তা বেড়ে যায় বহুগুণ। নানান দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডে ছেয়ে যায় বাজার। বাড়িতে হাতে তৈরি পোশাকের থেকে মেশিন নির্মিত পোশাকগুলির মাপ অনেক সঠিক হতে আরম্ভ করে, ফলে আকর্ষণের পাল্লা সেদিকেই ভারি হয়ে পড়ে। এছাড়া পাড়ার ছিট কাপড়ের দোকানগুলিকে সহজেই পিছনে ফেলে দেয় বিনী, বিমল, বম্বে ডাইং এর মতন নামকরা কোম্পানি। কপির সঙ্গে হাতে আঁকা ছবির যুগ শেষ হয়ে দামি পোশাক বা ড্রেস মেটিরিয়ালের বিজ্ঞাপনে আসেন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট, বলিউড অথবা মডেলিং-এর চমকপ্রদ সব মুখ। কখনো নবাব মনসুর আলি খান পতৌদি (১৯৪১-২০১১), স্ত্রী শর্মিলা ঠাকুর (১৯৪৪-) ও পুত্র সইফ আলি খান(১৯৭০-) এর ছবি, কখনও বা দেখা যায় অভিনেতা কবীর বেদি (১৯৪৬-)-কে। কোনও সময়ে পাতা জুড়ে থাকেন একদা মিস ইউনিভার্স লারা দত্ত (১৯৭৫-)।

সেই যে গৃহিনী একদা সাধ্যে কুলোয়নি বলে পছন্দসই পোশাকের সাধ মেটাতে পারছিলেন না, তারপর একটি ঊষা সেলাইয়ের কল আসে সে সমস্যার মুশকিল আসান হয়ে। তার পরে অনেক বছর পেরিয়ে যায়, সেলাইয়ের

কল ব্যবহারের অভাবে নষ্ট হতে বসে। নয়ের দশকের মধ্যভাগে বম্বে ডাইং এর বিজ্ঞাপনটিতে মধ্যবিত্তের সেই বহু পরিচিত সাধ আর সাধ্যের টানাপোড়েন যেন নেই। এক অভাবহীন, নির্ভার, বিলাসবহুল জীবনের ছবি। রাতপোশাকের স্নিগ্ধতা যেখানে গোলাপের মতই কোমল, এবং এই রাত পোশাক এমনই বাহারি, যে তাকে ছবিতে দেখে অনায়াসে অনুষ্ঠানযোগ্য পোশাক বলে চালানো যায়।

সে সময়ে শহরের গৃহবধূর স্বপ্ন যদি সেলাইকল পর্যন্ত যায়, গ্রামের গৃহবধূর আকাঙ্ক্ষা তবে কী হবে? একটা ভালো লন্ঠন। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ১৯ কার্তিকের *দেশ* পত্রিকায় 'কিষাণ' লন্ঠনের লন্ঠনের বিজ্ঞাপনের কপিটি অতি সংক্ষিপ্ত, বিজ্ঞাপনটি মূলত একটি হাতে আঁকা ছবি। একধারে লন্ঠনটির ছবি, অন্যদিকে সেই ব্যস্ত গৃহস্থ বধূরা, রাতের অন্ধকারে যারা ভরসা করে এই লন্ঠনের উপরেই। স্বাধীনতার পরে সেসময় যদিও প্রায় ১৩-১৪ বছর কেটে গেছে, কিন্তু বিদ্যুৎ তখনও গ্রামে গ্রামে পৌঁছোয়নি। 'কর্মব্যস্ত' বধূর কাছে জোরালো লন্ঠন তখন ভারি আহ্লাদের বস্তু।

স্বাধীনতার পরে প্রায় পাঁচ দশক ধরে বিদ্যুতের অভাব পশ্চিমবঙ্গে একটি স্থায়ী সমস্যা হিসাবেই থেকে গিয়েছিল। 'নেহাত ব্যক্তিগত' গদ্যে দেবেশ রায় লিখছেন,

> কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন লোড শেডিং বীভৎস। অফিসে-দোকানে বারোয়ারি বা নিজস্ব জেনারেটর শুরু হয় নি। ইনভার্টারের বাজারও জমিয়ে বসে নি। রাত দুটো-আড়াইটেয় হঠাৎ গলগল গরমে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয় একটু বাতাসের খোঁজে। আমাদের এক বন্ধু আর্থিক ক্ষমতা সত্ত্বেও জেনারেটার বা ইনভার্টার কিনতে পারছিলেন না লজ্জায়। পাড়ার আর-সব বাড়ি অন্ধকার আর তাঁর ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে- লোকের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে?[১৫]

মধ্যবিত্তের এই 'লজ্জা' টা ১৯৯১- এর পর থেকে ঘুচে যায়। যদিও সেই মানসিকতার বীজ লুকিয়ে ছিল তার কিছু অতীতে। সে ইতিহাসে পৌঁছোবার আগে আর কয়েকটি বিজ্ঞাপন ঘুরে যাওয়া যাক।

টাটা কোম্পানি পাঁচ-ছয়-সাতের দশকে শুধু ইস্পাতই নয়, কেশতৈলও বানাত। তাদের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, সেই কেশতেল যাঁরা মাখেন, তাঁরা স্পষ্টতই মধ্য বা উচ্চমধ্যবিত্ত। বিজ্ঞাপনে সুশ্রী নরনারীর মুখে সে ছাপ স্পষ্ট। একটু আগেই জানা গেছে, তাঁরা সাইকেলেও চড়েন। বিজ্ঞাপনের প্রধান পাত্রপাত্রীর পিছনে লাইন ড্রয়িং-এ পাওয়া

যায় গাড়ি চড়া নর-নারীর মুখ। গাড়ি যাঁরা চড়েন, সেই গুটিকয় মুখহীন উচ্চবিত্ত এই কেশতেল মাখা মধ্যবিত্তকে চুলের সৌন্দর্যের কারণে বেশ সমীহের চোখেই দেখেন।

চকোলেটের প্রতি শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেরই মোহ। শিশুরা তা প্রকাশ করে, বয়স্করা তা কিছুটা সংযত রাখতে পারেন, এই মাত্র ফারাক। উপহার সামগ্রী হিসাবে চকোলেটের জুড়ি মেলা ভার। আর তা যদি হয় ক্যাডবেরী কোম্পানির, তবে তা সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে তা এমন সহজলোভ্য হয়ে ওঠেনি। বাজারে মিলতো ঠিকই, কিন্তু যে কারণে সাইকেল কেনার জন্য করতে হত ব্যয়-সংকোচন, পোশাকের সাধ মেটাতে বাড়িতে আসতো সেলাইয়ের কল, নয়তো প্রিয় পোশাকের স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত; সেই একই কারণে ইচ্ছে হলেই একটি-দুটি চকোলেট বার কিনে ফেলা সম্ভব ছিল না মধ্যবিত্তের পক্ষে। প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটানোর পরে অতিরিক্ত খরচ বিষয়ে ভাবতে হত। তার উপরে ছিল আদর্শের প্রশ্ন। বাড়ির শিশু-কিশোররা বিলাসিতার জীবনে অভ্যস্ত হোক, তা অধিকাংশ মধ্যবিত্ত অভিভাবকই চাইতেন না। অশোক মিত্রের আত্মজীবনীতেও সেই কথাই জানা গেছে।

দেশ পত্রিকার ওই ১৯ কার্তিক, ১৩৬৭ তেই যে ক্যাডবেরী কোম্পানি'র 'মিল্ক চকোলেট' এর বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে, সেখানে কেবল রসনাতৃপ্তি ও মানসিক সন্তোষের জন্যই চকোলেট কিনতে বলা হচ্ছে না। ঠিক যেমন 'কিষাণ' লন্ঠনের বিজ্ঞাপনের এক ধারে ছিল লন্ঠনটির ছবি, তেমনই এখানেও আঁকা থাকে বৃহৎ একটি কোকো বীন এর ছবি। আর কপিতে ব্যাখ্যা করা হয় ক্যাডবেরী চকোলেটের গুণাবলী। কেন এমন হচ্ছে? নানান উদাহরণ থেকে আর অর্থনৈতিক চিত্রটি চোখের সামনে ধরা পড়লে বোঝা যায় সবকিছু তখন আজকের মত সুলভ হয়ে যায়নি। টাকা না, দ্রব্য না, উচ্চাকাঙ্ক্ষা না। একটা চকোলেট বারের জন্য তাই বিস্তারিত করে বলতে হয় কেন তা 'উপকারী'। আজ ক্যাডবেরী কোম্পানির এমনি বিশেষ চকোলেটের নাম হয়েছে 'সিল্ক'। টেলিভিশন থেকে সোশ্যাল মিডিয়া, সর্বত্র সেই বিজ্ঞাপন চোখে পড়লে, কোথাও তার মধ্যে আর 'উপকার' অথবা 'পুষ্টি'র উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরিবর্তে 'সিল্ক' শব্দটির মতন মোলায়েম আবেদনময়ী নাম এবং গলন্ত চকোলেটের অনুষঙ্গে সেই বিজ্ঞাপন অন্য ব্যাঞ্জনা পেয়েছে। নব্বই পরবর্তী অর্থনীতি ও সমাজমনের সঙ্গে কোকো বীনের গুণাবলী সমৃদ্ধ বিজ্ঞাপনের তফাৎ বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পুরুষদের প্রসাধনীদ্রব্যের বিজ্ঞাপন নারীদের ব্যবহার্য প্রসাধনের বিজ্ঞাপনের তুলনায় অনেক কম। জবাকুসুম কোম্পানি অবশ্য পুরুষ-নারী নির্বিশেষে তাদের কেশতৈলের বিজ্ঞাপন করেছে। তবু নারীদের তুলনায় সে

উল্লেখযোগ্যরকম কম। শুধু ভোগ্যপণ্য নয়, মধ্য ও নিম্নশ্রেণি দৈনন্দিন প্রয়োজনের দ্রব্য হিসাবে কী ব্যবহার করে

চিত্র ৩.৩২ দেশ, ১১ শ্রাবণ, ১৪০৩

সেটা তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। যথার্থ নাগরিক মধ্যশ্রেণি তৈরি হয়ে ওঠার সেই প্রথমযুগে যেখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তির উপর তার কর্তৃত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা হয়নি, বরং নিম্নমধ্য শ্রেণির সংখ্যাধিক্যই বাজারের নিয়ন্ত্রক, সেখানে হ্যারিকেন বা 'শস্তা' ব্লেডের বিজ্ঞাপন সুলভ। ব্লেডের বিজ্ঞাপনের শিরোনাম 'সকাল বেলা থেকেই পয়সা বাঁচান'। ক্রেতাদের জানানো হচ্ছে ক্যারাট কোম্পানির এই ব্লেডে অল্প খরচে সাশ্রয় বেশি। তারই পাশে ১৪০৩ বঙ্গাব্দের 'ব্লু স্ট্র্যাটজ' এর বিজ্ঞাপনে রয়েছে এক মোহময় আবেশ। কপিতে অতি অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে 'সম্মোহন' শব্দটা। পুরুষদের প্রসাধনীর পথ হয়েছে উন্মুক্ত। কেবল সস্তা ব্লেডে দাড়ি কামিয়ে থেমে না থেকে, এখন কিছু বিলাসী, আকর্ষক উপাদান ব্যবহার করা যাক। সামান্য ব্লেডের পিছনে অর্থ সাশ্রয়ের দিন চলে গিয়ে নিজেকে শৌখিনভাবে মেলে ধরার হাতছানি রয়েছে বিজ্ঞাপনটিতে। মধ্যবিত্তশ্রেণির এ সময়ে নিজের জন্য এই বিলাসিতাটুকু নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। যেমন এসেছিল সাধারণ ছিট কাপড় আর ঘরে তৈরি পোশাকের পরিবর্তে 'বম্বে ডাইং' বা 'রেমন্ডস' ব্যবহার করার ক্ষমতা।

নব্বই পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমিকা সম্পর্কে আগে আলোচনা হয়েছে। মধ্যবিত্তশ্রেণির মন কীভাবে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে, অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন (১৯৩৯-)-এর লেখার একটি অংশ থেকে সে বিষয়ে আরেকটু পরিষ্কার ধারণা করা যাক-

> দিল্লিতে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে অর্থনীতিবিদদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। সদ্য স্বাধীন দেশে নেহরু-মহালনবিশের নেতৃত্বে মহাসমারোহে জাতীয় পরিকল্পনা চলছিল, তাতে দেশের ও বিদেশের অনেক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। আর্থিক নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে চারদিকে পত্রপত্রিকায় ও আলোচনাসভায় অর্থনৈতিক প্রবক্তাদের তখন রমরমা। সত্তরের দশকের প্রথমে আমি যখন দিল্লিতে বসবাস করতে শুরু করলাম, ততদিনে ওখানে অর্থনীতিবিদদের জৌলুস খানিকটা ক্ষীয়মাণ। সেই দশক থেকে শুরু করে গত কয়েক দশকে জনপরিসরে বাকবিতন্ডায়, বিদগ্ধ আলোচনায়, টিভির পর্দায়- অর্থনীতিবিদদের তুলনায় বরং অন্য সমাজবিজ্ঞানীদের বা ভোটের গণৎকারদের বা নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদদের বা উত্তর-আধুনিক সাংস্কৃতিক প্রবক্তাদের প্রতিপত্তি অনেক বেশি। এই পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন। এ ব্যাপারে আমার কয়েকটি কারণের কথা মনে হয়। এক, জাতীয় পরিকল্পনায় মানুষের বিশ্বাস স্তিমিত হয়ে গেছে। আরও বড় করে বলতে গেলে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের অর্থনীতিবদরা রাষ্ট্রকে দেশের দশের উন্নতির জন্য অনেক মহৎ সব কাজ করিয়ে নেবেন ভেবেছিলেন, সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে এখন অনেকেরই মোহভঙ্গ হয়ে গেছে...[১৬]

নব গঠিত রাষ্ট্রের উপরে মোহভঙ্গ হতে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষের। তৈরি হয় নানানরকম ক্ষোভ।

কর্মসংস্থানের অভাবও ধীরে ধীরে বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। পড়াশোনা করে, বহু চেষ্টা করেও চাকরি মেলে না। অর্থনীতিবিদ এবং সমাজ-রাজনীতির বিশ্লেষক অশোক রুদ্র (১৯৩০-) প্রায় চার দশক পূর্বে বিপন্ন অর্থনীতি এবং উত্তাল রাজনীতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আর্থ-সামাজিক সঙ্কট, বিশেষত বিপুল বেকারত্বের অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নাম 'আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক'। কালের গতি আজও এই শিরোনামকে অতিক্রম করতে পারেনি। একটি ছেলের সঙ্গে বোলপুরে তার দেখা হয়ে যায়। সেই তরুণের মুখে স্পষ্ট ছিল নিরাপত্তাহীনতার চিহ্ন। অথচ সে বয়সে মুখের ভাব হওয়া উচিত বিশ্বজয়ীর মতন। পরিবর্তে তার মুখ যেন ভীরু, চোরের মতো। ছেলেটি তাঁর কাছে একটি কাজ জুটিয়ে দেওয়ার আর্জি নিয়ে আসে। জানায় সে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু কাজ মেলেনি। সেই প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক-

সরকারী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সেই প্রথম পরিকল্পনা থেকে সর্বশেষ পঞ্চম পরিকল্পনা, আমি যাচাই করেছি এই ছেলেটির কষ্ঠিপাথরে, ইন্দিরা গান্ধীর উত্থান পতন, বামপন্থী দলগুলির যুক্তফ্রন্ট আমলের রাজনীতি, আবার তাদের এখানকার রাজনীতি, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, সরকারী বেতন কমিশনের সুপারিশ- সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাই ঘটেছে অথবা যে যাই ঘটাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের সবকিছুকেই আমি যাচাই করেছি বোলপুরের ঐ ছেলেটির কষ্ঠিপাথরে। বার বারই, প্রতিটি বিচারেই, দোষী সাব্যস্ত হয়েছে আমাদের সমাজব্যবস্থা। সেই ছেলেটি নষ্ট হয়ে গেছে।...

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, সরকারী ও বেসরকারী সব রকমের উদ্যম ও নীতিকে একটি যুক্তির ও অঙ্কের কাঠামোতে ধারণ করা হয়। সেই কাঠামোটা হল আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ১৯৫১ সালে পত্তন করা হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এখন চলছে পঞ্চম পরিকল্পনার অন্তিম বর্ষ। এই প্রত্যেকটা পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এবং এখন যেমন মোরারজী দেশাই ঘোষণা করেছেন, দশ বৎসরে বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে তেমনি জওহরলাল নেহরুও সেই ১৯৫৬ সালে ঘোষণা করেছিলেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বেকার সমস্যার মোকাবিলা করা হবে। আবার 'গরিবী হটাও' ধ্বনি দেওয়ার একই কালে ইন্দিরা গান্ধীও বেকার সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতারা এরকম ঘোষণা করেই থাকেন, সেটা নূতন কিছু নয়। কিন্তু লক্ষণীয় যা তা এই যে, রাষ্ট্রের নেতাদের এই সব ঘোষণাকে ঐ একই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঠামো যে পরিকল্পনা তার অংশীভূত করা হয়নি।[১৭]

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে কিছু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়েছে, কিছু প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্ভব হয়েছে। কিছু আবার অমীমাংসিত থেকে গেছে।

এবার একটু প্রসঙ্গান্তর জরুরি।

এক সবুজ রঙের ছোপ লাগা 'মানুষ', চোখের উপর তার মোটা আদিম ভুরু, মাথায় দুটো সিং, হাতে সবুজ রঙেরই বড় বড় নখ। এক বিশেষ সময় ও সমাজের আশ্চর্য আখ্যানকে ধারণ করে আছে এই ছবি।

১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন বোম্বের এক কোম্পানি 'Mirc Electronics' ১৯৮২ সালে বাজারে আনল তাদের টিভি সেট 'ওনিডা'।[১৮] ভারতের বাজারে তখন Nelco, Crown, BPL, Videocon-এর মতো কোম্পানির টেলিভিশন সেট সহজলভ্য, তার মধ্যে 'ওনিডা'-র একটা চোখে-পড়ার-মতো জায়গা করে নেওয়া সহজ ছিল না। সেই কঠিন কাজটা অনায়াসে করে দিলেন যিনি তিনি এক বাঙালি যুবক, নাম গৌতম রক্ষিত।

গৌতম রক্ষিত চাকরি করতেন 'ক্যাডবেরি' কোম্পানিতে। ১৯৭০-এর শেষভাগে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্থিতিশীল জীবনের চেনা স্বপ্ন দেখা ছেড়ে এই শিল্পী মানুষটি যোগ দিলেন 'ক্ল্যারিয়ন' নামের এক বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে, আর তার কয়েক বছর পরে নিজেই খুলে ফেললেন নিজের এক বিজ্ঞাপনী সংস্থা, 'অ্যাডভার্টাসিং এভিনিউজ'।[১৯] ঘটনাচক্রে এই নতুন-জন্ম-নেওয়া সংস্থারই দ্বারস্থ হল 'ওনিডা' কর্তৃপক্ষ। গৌতম রক্ষিত এই কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

১৯৮২ সালে (১৯ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর) দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নবম 'এশিয়ান গেমস', ১৯৮৩ সালের ২৫ জুন কপিল দেবের নেতৃত্বে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় এবং ১৯৮৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে দিয়েগো মারাদোনার 'অলৌকিক' উত্থান ভারতীয় মধ্যশ্রেণির স্বপ্নে দৃশ্যমাধ্যমের চাহিদা বাড়িয়ে তুলছিল বহুগুণ। কিন্তু তখনও ১৯৯৪ সালের বিখ্যাত 'পঞ্চম বেতন কমিশনের' ঢের দেরি আছে, সরকারি চাকুরিজীবী মধ্যশ্রেণির হাতে কাঁচা টাকার জোগান তখনও নিতান্ত অপর্যাপ্ত, তখনও মধ্যবিত্ত গৃহিণী পাড়ার মুদির দোকানে মাসকাবারির খাতায় ধার রেখে নুন-চিনি কিনে আনেন। ফলে গোটা ১৯৮০-র দশক জুড়েই টেলিভিশন সেট প্রত্যেক ঘরের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠতে পারেনি নিছক অর্থনৈতিক কারণেই। মফস্বলের পাড়ায় একটি বা দুটি বাড়িতে থাকে টেলিভিশন, পাড়ার সকলে দল বেঁধে সেখানে দেখতে যায় সেই রূপকথার বাক্সটিকে।

ভারতীয় মধ্যশ্রেণির সাধ ও সাধ্যের মধ্যেকার এই তফাৎটিকে সুস্পষ্টভাবে নজর করতে পারেন গৌতম রক্ষিত।

চিত্র ৩.৩৩ শুকতারা, আশ্বিন, ১৩৭৭

তখন ভারতীয় বিজ্ঞাপনের জগৎ, স্বাভাবিকভাবেই, উচ্ছলতায় ভরা, মানবমনের সদর্থকতার দিকটিকে নিয়ে তাদের কারবার। সুখী মানুষের ছবি না-দেখালে 'সুখ' কে আর কীভাবে বিক্রি করা সম্ভব? ফলে 'গোল্ড স্পট'-এর বিজ্ঞাপনের ক্যাচলাইন হয়ে ওঠে 'The Zing Thing', পান পরাগের বিজ্ঞাপন ভরে ওঠে চিত্রতারকা শাম্মি কাপুরের উচ্ছলতায় কিংবা কখনও প্রোডাক্ট-এর নামটাই হয়ে ওঠে নবীন কিশোরকিশোরীর বিশেষণ : কমপ্ল্যান বয়/কলপ্ল্যান গার্ল! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কোকা-কোলা' কোম্পানি গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে এদেশে তাদের ব্যবসা আরম্ভ করে। সাতের দশকের শেষ ভাগে কিছু সরকারী নীতির পরিবর্তনের ফলে 'কোকা-কোলা' কোম্পানি ভারতে তাদের বাণিজ্য এই দেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেয় (১৯৭৭)। 'জরুরী অবস্থা' পরবর্তী সময়ে মোরারজি দেশাই (১৮৯৬-১৯৯৫)-এর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ (১৯৩০-২০১৯) Foreign Exchange Regulation Act (FERA) চালু করেন। 'কোকা-কোলা' এবং 'আই বি এম' কোম্পানি এই আইন মানতে অস্বীকার করে। 'কোকো-কোলা' ইন্ডিয়ার মালিকানার একটি বড় অংশ তাদের কাছে ভারত সরকার দাবি করে। 'কোকা-কোলা' এই শর্ত প্রত্যাখ্যান করে, কারণ মালিকানা দেওয়ার অর্থ, তাদের কোকা-কোলা বানানোর গোপন ফরমুলাও দিয়ে দিতে হত। তা 'কোকা-কোলা' কর্তৃপক্ষ চায়নি। ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে কোকা-কোলা কোম্পানি ভারতের বাজারে পুনঃপ্রবেশ করে। সাতের দশকের শেষভাগ থেকে

নব্বইয়ের গোড়া পর্যন্ত বাংলা পত্র-পত্রিকায় স্বভাবতই কোকা-কোলার কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। 'কোকা-কোলা' কোম্পানির সেই অনুপস্থিতির বছরগুলিতে বাজারে নানা ঠান্ডা পানীয়ের বাড়-বাড়ন্ত হয়। 'ক্যাম্পা-কোলা' তাদের মধ্যে অন্যতম।

দেবেশ রায় লিখছেন,

> মধ্যবিত্তের পকেট সচেতনতার দায় বইতে পারছে না। কিন্তু অন্য ধরনের দেখানেপনার দায় তাকে মেটাতেই হচ্ছে। উত্তর কলকাতার অলিগলিতেও চাকা-ওয়ালা ঠেলা গাড়ির ওপর 'স্ন্যাকবার'। গলির গলি তস্য গলিতেও কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকান। আর এসব অনিবার্যভাবেই আমাদের প্রতিদিনেরই অংশ হয়ে গেছে। ফলে মধ্যবিত্তের প্রতিটি দিন তার প্রতিদিনের হিশেবের বাইরের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।[২০]

যে ভাবে ঠান্ডা পানীয়র রমরমা শুরু হল, সেভাবেই একদা সাইকেল কেনার জন্য পয়সা সঞ্চয় করা মধ্যবিত্ত দু-চাকা পার করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো চার চাকার। সেই স্বপ্ন সত্যি করল কোন কোম্পানি? অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু লিখছেন-

> সব সূচকের বিচারেই-হয়তো কেবল দুর্ঘটনায় মৃত পথচারীর সংখ্যা ছাড়া, বার্ষিক যা তিরিশ হাজারের মতো-ভারতের মোটরগাড়ি শিল্প ক্ষুদ্রায়তনই বটে। কয়েক বছর আগে তা ছিল সবচেয়ে সেকেলে শিল্পের একটি।
>
> এ অবস্থা দ্রুত বদলাচ্ছে মনে হয় এবং তার প্রধান কৃতিত্ব স্পষ্টতই মারুতি উদ্যোগের। সম্প্রতি জানা গেল ভারত নাকি হাঙ্গেরিতে মারুতি গাড়ি রপ্তানি করবে- আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, দেখাই যাচ্ছে। ভারতের পুরোনো উৎপাদকরা মডেল উন্নত করছেন, অনেকে রয়েছেন এ শিল্পে প্রবেশের অপেক্ষায়। যেমন এসকর্টস চাইছে Citroen 2CV বানাতে।
>
> গুরুতর একটা প্রশ্ন জাগে এ সময়। এ শিল্পের আধুনিকীকরণে মারুতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার খাতিরে তাকে সংরক্ষিত করা উচিত? সরকারি মহলে এমন মনোভাব একটা আছে। তারই প্রকাশ দেখা যায় মারুতি গাড়ির জন্য সুবিধাজনক অন্তঃশুল্ক ও বহিঃশুল্কে, অন্য সম্ভাব্য উৎপাদকদের অনুমতি দিতে টালবাহানায়।[২১]

মারুতি কোম্পানি, সুজুকি কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রথম বাজারে নিয়ে এলো 'মারুতি ৮০০' গাড়ি। এই গাড়ি প্রথম মধ্যবিত্তের চার চাকা চাপার যে স্বপ্ন (একদা যে মধ্যবিত্ত সাইকেলের স্বপ্ন দেখতো), সেই স্বপ্নের দরজা তার সামনে খুলে দিয়েছিল 'মারুতি ৮০০'। ক্রমশ ছোট হয়ে আসা নিউক্লিয়ার যে মধ্যবিত্ত পরিবার, সখ

থাকলেও তেমন সাধ্য নেই, এই গাড়ি ছিল তার গাড়ি। ব্যক্তিগত গাড়ি এর আগে মধ্যবিত্ত সেভাবে কখনো চড়তে পারেনি। এ্যম্বাসাডর গাড়ির চল থাকলেও তা মধ্যবিত্তের আওতায় ছিল না তখন।

‘ওনিডা’ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ভারতীয় বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে প্রথমবার, গৌতম রক্ষিত নামলেন ‘অসুখ’ কে বিক্রি করতে। অনেক ভেবেচিন্তে।

অ্যারিস্টটল (৩৮৪ খ্রী.পূ-৩২২ খ্রী.পূ) তাঁর ‘Rhetoric’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের দশম অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলেন ‘ঈর্ষা’ নামক অনুভূতিকে নিয়ে। পার্শ্ববর্তী মানুষের অন্যায্য সাফল্যে বিরক্ত হয়ে ওঠাকে অ্যারিস্টটল চিহ্নিত করেন ‘Indignation’ নামে আর সেই মানুষেরই যে-কোনো রকম সাফল্যেই বিরক্ত হয়ে ওঠার নাম দেন ‘Envy’ বা ঈর্ষা। সেই সঙ্গে তিনি এও জানিয়ে দেন যে ‘we feel it towards our equals... We shall feel it if we have, or think we have, equals.’[২২] অর্থাৎ সেই মানুষটির প্রতিই আমরা ঈর্ষান্বিত হই আমি প্রকৃতই যার ‘সমতুল্য’ কিংবা আমি ভাবি যে আমি তার ‘সমতুল্য’। এই কারণেই ঈর্ষা নামক অনুভূতির জাগরণে শ্রেণি-পরিচয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঈর্ষা দূরের মানুষকে ঘিরে গড়ে ওঠে না, প্রতিবেশীকেই মানুষ ঈর্ষা করে।

অন্যদিকে ভারতীয় পুরাণকথা ও সাহিত্যে এ হেন ‘ঋণাত্মক’ অনুভূতির বয়ান উঠে আসে অনেক জটিল ও বহুমাত্রিকতায়। *মহাভারত*-এর সভাপর্বে ধৃতরাষ্ট্র যখন দুর্যোধনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তুমি এত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লে, দুর্যোধনের সুস্পষ্ট উত্তর ছিল, ‘হে রাজন! কাপুরুষেরাই অশন-বসনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং অধম পুরুষেরাই অমর্যশূন্য হয়।’[২৩] অর্থাৎ, ভারতীয় সমাজমনে ঈর্ষার বিস্তার শুধুমাত্র একমাত্রিক ঋণাত্মকতায় এমনটি বলা মুশকিল। ঈর্ষা অনেকসময় হয়ে ওঠে আমাদের কর্মশক্তির প্রেরণা, নেতিবাচক অর্থেই বটে, তবু প্রেরণাই। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতায় দুর্যোধনের এই বাক্যটিই সেইজন্যে ভিন্ন রূপ নিয়ে এইভাবে ধরা দেয়:

‘ধৃতরাষ্ট্র

ক্ষুদ্র ঈর্ষা! বিষময়ী

ভুজঙ্গিনী!

দুর্যোধন

ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।

ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি

মধ্যে রাখে ব্যবধান লক্ষ লক্ষ তৃণ

একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।[২৪]

তাত্ত্বিকভাবে 'ঈর্ষা' নামক অনুভূতিটির ঋণাত্মকতা নিয়ে কারোরই সংশয় নেই, কিন্তু ভারতীয় সমাজজীবনে 'ঈর্ষা' এইভাবে 'বৃহতের ধর্ম' হয়েই নিজের স্থায়ী জায়গা করে রাখে। প্রতিমুহূর্তে সে আমাদের Superiority Complex- কে পরিতৃপ্ত করতে থাকে। যে ঈর্ষা করে সে নিজেকে 'সুপিরিয়র' বা যোগ্যতর বিবেচনা করেই ঈর্ষা করে, আর যে ঈর্ষার পাত্র সে-ও ভাবে: অন্যকে 'হারিয়ে' উঁচুতে উঠেছে বলেই-না সে নিম্নতর-অন্যের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে!

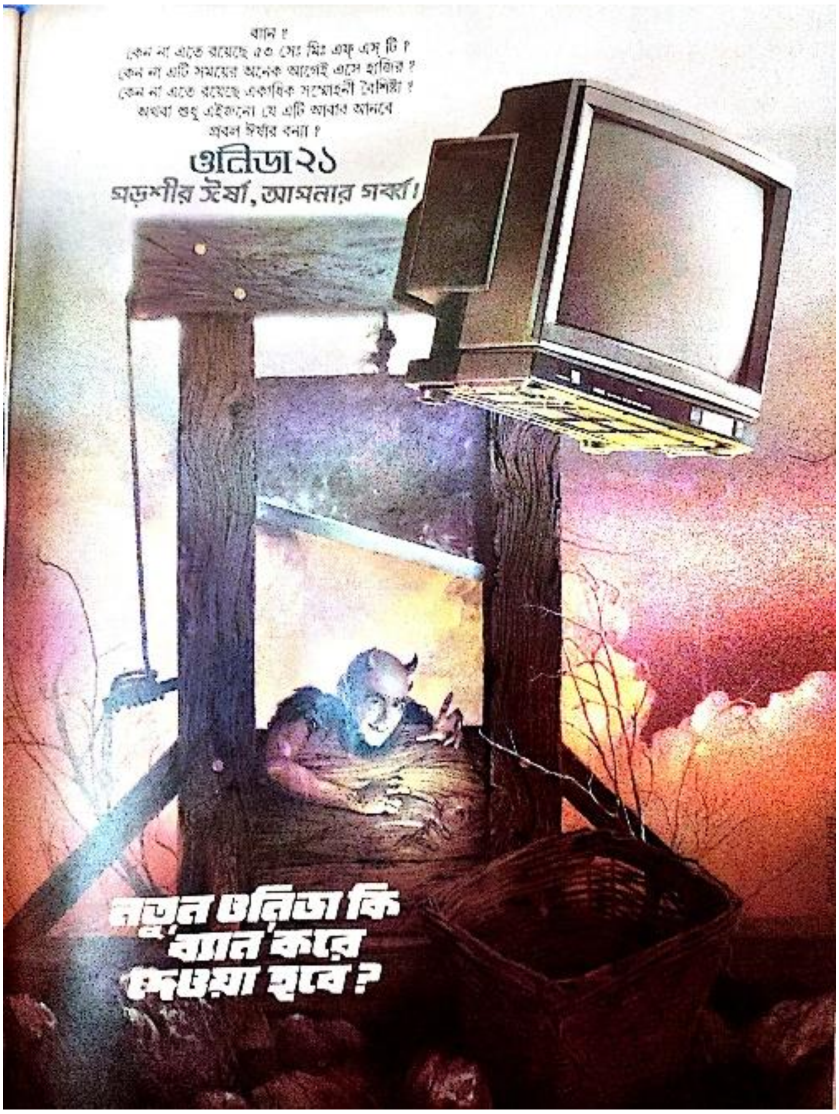

চিত্র ৩.৩৪ দেশ, ৪ নভেম্বর, ১৯৮৯

এই সমাজমনকে বুঝতে যেমন অসুবিধা হয়নি গৌতম রক্ষিতের তেমনি ১৯৮০-র দশকে মধ্যশ্রেণির সাধ ও সাধ্যের তফাৎকে চিনতেও তাঁর ভুল হয়নি একটুও। ফলে তাঁরই হাতে জন্ম হল এক ঐতিহাসিক ট্যাগলাইন 'পড়শীর ঈর্ষা, আপনার গর্ব!' সিং-ওলা সবুজ মানুষের ছবি বেয়ে সবুজ ঈর্ষা প্রবেশ করল বিজ্ঞাপনের উচ্ছলতার দুনিয়ায়।

কিন্তু বিজ্ঞাপনের এই সবুজ-দৈত্য কোথা থেকে এল? তার নখে, মুখে, পোষাকে সর্বত্র সবুজ। এর উৎসমূলে আছেন স্বয়ং শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬)। *ওথেলো*-র তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের এক বিখ্যাত লাগো বলে উঠেছিল ওথেলোর উদ্দেশে, 'O, beware, my lord, of jealousy;/ It is the green-eyed monster which doth mock/ The meet it feeds on...'[২৫] শেক্সপিয়ারের এই গ্রিন-আইড মনস্টারই এখানে সবুজ-

শয়তান হয়ে দেখা দিল, মানুষের ভিতরকার চিরকালীন ঈর্ষা আর সমসময়ের অর্থনীতির টানাপোড়েন একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারা একটা 'টেক্সট'কে পাঠকের দরবারে পেশ করলেন গৌতম রক্ষিত।

এর ফল হয়েছিল অসামান্য। ওই সবুজ শয়তান তো ভারতীয় বিজ্ঞাপনের এক শ্রেষ্ঠ 'চিহ্ন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেই, 'আমূল'-এর মেয়ে অথবা 'এয়ার ইন্ডিয়া'র 'মহারাজা'র সঙ্গেই এর জনপ্রিয়তার তুলনা চলতে পারে কেবল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সমসময়ের এই আশ্চর্য অভিজ্ঞান মাত করে দিয়েছিল বাজারকেও। বিজ্ঞাপনটির এই যুগান্তকারী ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন 'ওনিডা' কোম্পানির এক পূর্বতন কর্তা (CEO) Y V Verma-ও, জানিয়েছেন তিনি, 'These ads single-handedly pushed the company's market share from 5-6 per cent in 1981 to 19-20 percent in 1995.'[২৬] এই উদ্ধৃতিতে 'single-handedly' শব্দবন্ধটিই বুঝিয়ে দেয় একটা বিজ্ঞাপন জনমানসকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে।

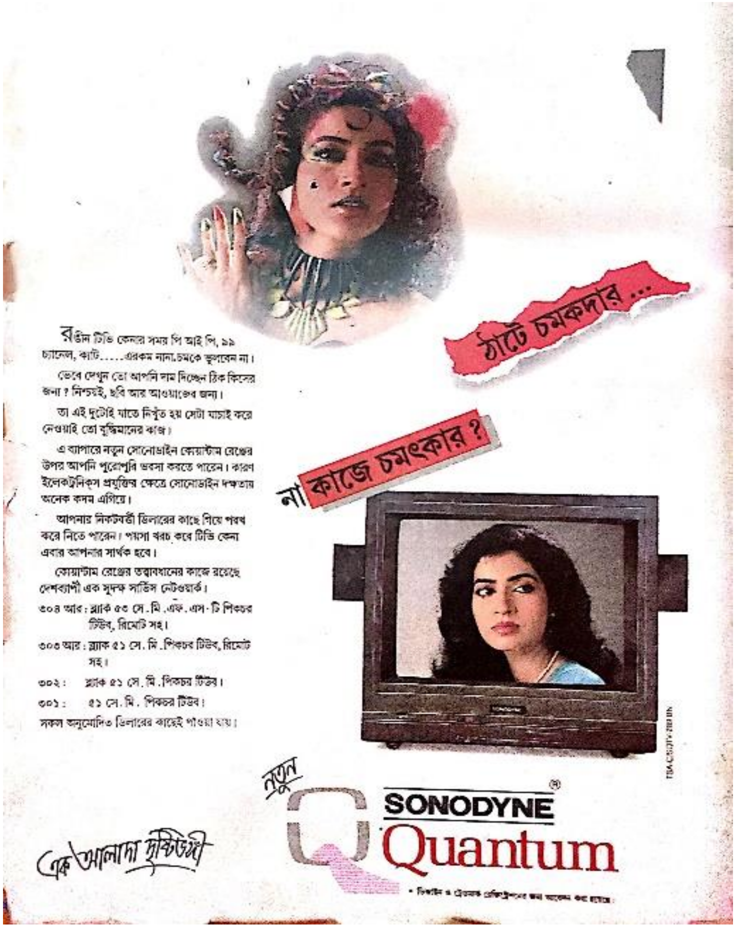

চিত্র ৩.৩৫ দেশ ১১ নভেম্বর, ১৯৮৯

এর ই প্রায় সমসময়ে অন্যান্য কিছু টেলিভিশন কোম্পানি এই শয়তানের ছবির প্রতি সম্ভবত কিছুটা তীর্যক ভঙ্গি নিক্ষেপ করে বিজ্ঞাপন বানায়। তার মধ্যে একটি হল 'সোনোডাইন'। সেখানে 'ওনিডা' কোম্পানির সবুজ শয়তানকে ইঙ্গিত করে ব্যবহার করা হয় একটি সবুজ লাল নখযুক্ত উগ্র সাজগোজের এক সুন্দরীকে এবং তারই তলায় একটি সুবেশী, সুশ্রী তন্বী'র ছবি দিয়ে করতে চাওয়া হলে ফারাক। ঠাট এবং কাজের তফাৎ বোঝাতেই ব্যবহৃত হয় উক্ত ছবিদুটি। কিন্তু বলা বাহুল্য 'ওনিডা'র চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন এবং বুদ্ধিদীপ্ত ট্যাগলাইনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে যায় বহুদূর। বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই প্রতিপক্ষ তৈরির বিষয়টি ঘটে থাকে। কিন্তু এই ঠান্ডা যুদ্ধের অন্তরালে

কোথাও গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেন অপর সংস্থাটি। নিজেদের প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনেও প্রতিপক্ষকে ডেকে আনা, কিছুটা যেন 'শত্রু রূপে ভজনা' করবার সমতূল্য হয়ে ওঠে।

মধ্যবিত্তের ঘরে তখনও টিভি বিষয়টা ঠিক কেমন ছিল, তার একটা চমৎকার ছবি নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯) এঁকেছেন তাঁর *সীতা থেকে শুরু* বইতে। এ তাঁর নিজের বাড়ির চিত্র। মধ্যবিত্ত, আর্থিকভাবে সচ্ছল অধ্যাপক পরিবারেও সে সময়ে বিলাসিতা ব্যাপারটা এইভাবে পেয়ে বসেনি।

> সন্ধেবেলায় চিত্রমালা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে হেমামালিনী নাচছেন। লতা গাইছেন। মা ইজিচেয়ারটা টেলিভিশানের উলটোদিকে (এ বাড়িতে টিভি বলা বারণ, ওটা নাকি অমার্জিত) ঘুরিয়ে বসে বই পড়ছেন। কানে তুলোর প্লাগ গোঁজা। মুগ্ধ দর্শক বাড়ির কাজের লোকেরা এবং কন্যাদ্বয়। মা খবরের সময়ে এদিকে ঘুরে বসবেন, কানের তুলো খুলবেন। মা ঘরবন্দী বলে মাকেই উপহার দেওয়া হয়েছে যন্ত্রটা। কিন্তু মা ওটাতে খবর ছাড়া প্রায় কিছুই দেখেন না। আর চেনাজানা লোকের প্রোগ্রাম। অথচ ঘর ভরতি হয়ে আছে ঠিকে-ঝিয়ের ফ্যামিলি অ্যাণ্ড ফ্রেন্ডস্-এ, রোজ সন্ধেবেলায়। কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ার প্রত্যেকটা টিভি সেটই কমিউনিটি সেট। সরকার থেকেই খরচটা দেওয়া উচিত মনে হয়।[২৭]

হাতে গোনা লোকের বাড়িতে থাকত টেলিভিশন, আর সেই টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে জনসমাগম, এই ছিল কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী মফস্বলের পরিচিত ছবি। আটের দশকের মাঝামাঝি বা শেষের দিকেও এ ছবির তেমন পরিবর্তন হয়নি। উল্লেখ্য, এ বইয়ের লেখাগুলি গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের বেশ কিছু বছর পূর্বে লিখিত, তা নবনীতা বইয়ের 'ভণিতা' অংশে লিখেছেন।

তারপর কী হল?

১৯৯১ সালে ভারতবর্ষে বিশ্বপুঁজির দরজা যখন হাট করে খুলে গেল, এবং ১৯৯৪ সালে 'পঞ্চম বেতন কমিশন'-এর পর মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর বেতন যখন এক লাফে বেড়ে গেল অনেকটাই, তখন স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্ত মনও বদলাতে শুরু করেছে। ১৯৯৪-এর পর থেকে মধ্যশ্রেণি তো বটেই, এমনকি নিম্নমধ্য শ্রেণির কাছেও টেলিভিশন সেট আর দুর্লভ বস্তু রইল না, এক বাড়িতে একাধিক টিভি-সেট ঢুকে পড়ল এমন উদাহরণও আর বিরল বলা গেল না। এই অবস্থায় টেলিভিসন সেটের মালিকানাকে 'ঈর্ষা'র বয়ান সহযোগে বাজারে চালানোর উপযোগিতা ফুরোলো।

এবার প্রয়োজন নতুন ভাবনার, নতুন দিক্‌দর্শনের। ততদিনে বাজারে চলে এসেছে LG বা Samsung-এর মতো বিশ্বব্যবসায়ীরা। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল মৌলিক এবং নতুন বয়ানের। কিন্তু ততদিনে গৌতম রক্ষিতের সংস্থা 'অ্যাডভার্টাসিং এভিনিউজ'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে 'ওনিডা' চলে গেছে অন্য বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছে, প্রথমে 'Ogilvy', তারপর 'Rediffusion', এবং শেষে 'McCann Erickson' নামের বিজ্ঞাপন-সংস্থাগুলির হাতে 'ওনিডা' নিজের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এঁরা কেউই ক্রেতার সামনে এমন কোনো নতুন বয়ান পেশ করতে পারেননি যা দিয়ে বিশ্বপুঁজির বিপুল প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করা যায়। ভারতের টেলিভিশন-বাজার থেকে বিশ শতকের শেষেই আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছে 'ওনিডা'র প্রায় একচ্ছত্র দাপট!

চিত্র ৩.৩৬ দেশ, শারদীয়া ১৩৯৫

কিন্তু টেলিভিশনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। দেখা গেছে, বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ অন্য জিনিসের, কিন্তু তার মধ্যেও চলে আসছে টিভি শো-এর প্রসঙ্গ। রোজকার ব্যবহারের জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন মধ্যবিত্তের জীবনপ্রবাহকে বুঝতে সাহায্য করে। কড়াই, খুন্তি, হ্যারিকেনের বিজ্ঞাপন পেরিয়ে আটের দশকের শেষভাগে, নব্বইয়ের গোড়ায় পেয়ে যাই খাবার গরম রাখার পাত্রের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনের কপিটি খুবই চমকপ্রদ। 'সেলো ক্যাসেরল' কোম্পানি এক আধুনিকা গৃহিনী ও তার শিশুসন্তানের ছবি দেয়, আর শিরোনামে লেখে, "খাবার চাই একেবারে গরমাগরম আর চিত্রহারই বা বাদ দিই কি করে"। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'চিত্রহার' ছিল সাত-আট-নয়ের দশকে ডি ডি ন্যাশনালে প্রচারিত জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান। তেমন পাত্র কেন দরকার যাতে অনেকক্ষণ খাবার গরম থাকতে পারে? কেননা টেলিভিশনের জনপ্রিয়

অনুষ্ঠান দেখা ছেড়ে তো আর খাওয়া যায় না! পিছনে টেলিভিশন সেট এবং তার আকৃতিটি লক্ষ্যণীয়। মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন সময়সূচি তখন সত্যিই বদলে যেতে শুরু করেছে অল্পে অল্পে।

১৯৮৮ সালে ভারতবর্ষের লিডিং এক রেফ্রিজারেটর কোম্পানি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছে এতদিনে সব মিলিয়ে তাদের মোট ২৭ লাখ ইউনিট প্রোডাক্ট তৈরি হয়েছে। ২০২০ সালে, এক বছরে ভারতে ১ কোটি ২৫ লাখের উপরে রেফ্রিজারেটর বিক্রি হয়।[২৮] প্রসঙ্গত, কেলভিনেটর ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ১৯৬০-এ। অবশ্য মধ্যশ্রেণির দামের নাগালে ডাবল-ডোর ৩০০ লিটার রেফ্রিজারেটর তারা প্রথম বাজারে আনছে ১৯৮৬ তে।

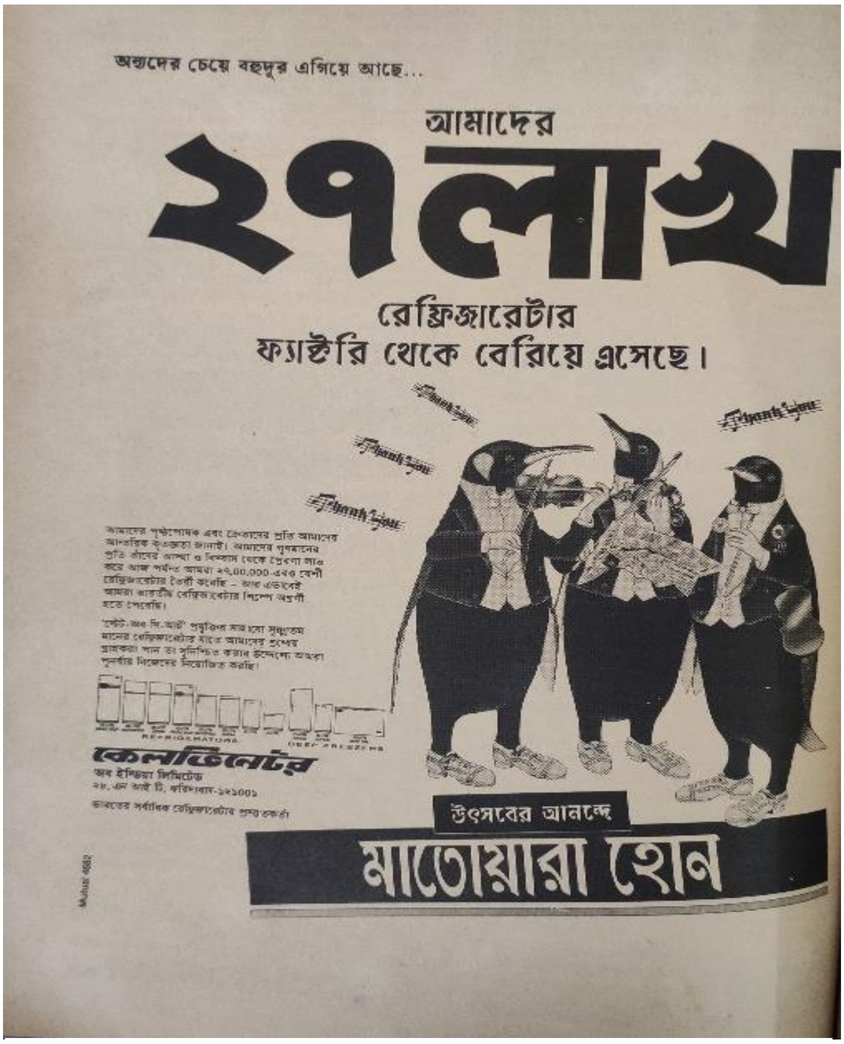

চিত্র ৩.৩৭ দেশ, শারদীয়া ১৩৯৫

রেফ্রিজারেটরের দৌলতে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনে ঢুকে পড়ছে মদ্যপান-সংস্কৃতি। আগে যে মূল্যবোধ থেকে অধিকাংশ সাধারণ মধ্যবিত্ত মদ্যপানে নিজের পরিবারকে বিরত রেখেছেন, সেই সংযম পরিবর্তিত হয়ে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হলে মদ্যপানই সামাজিক স্টেটাসের অঙ্গ হিসাবে উঠে আসছে। রেফ্রিজারেটর ‘সফট ড্রিংক’-এর সঙ্গে সঙ্গে ‘হার্ড ড্রিংক’-কেও ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করছে। অবাঙালী সংস্কৃতির অনুকরণে বাঙালীদের মধ্যে পানের বদলে ‘পান পরাগ’, ‘পান মশলা’ খাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

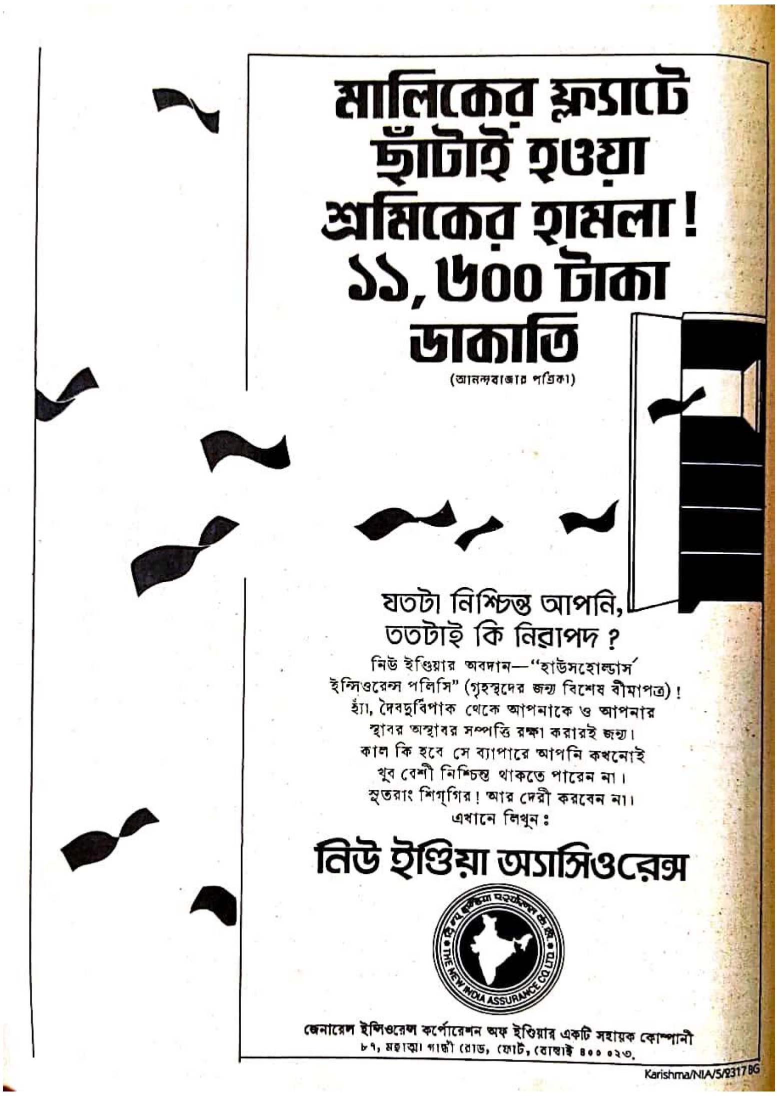

চিত্র ৩.৩৮ দেশ, ২০ অক্টোবর, ১৯৮৮

'নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স' এর এই বিজ্ঞাপনটি এরই মধ্যে বেশ হতচকিত করে দেয়। যার শিরোনামে জ্বলজ্বল করে একটি বাক্য, "মালিকের ফ্ল্যাটে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের হামলা! ১১,৬০০ টাকা ডাকাতি", শিরোনামের তলায় ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা থাকে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা', অর্থাৎ, এই বিজ্ঞাপন সম্ভবত সমসময়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংবাদকেই ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞাপনে। এই বিজ্ঞাপনের বয়ান স্পষ্টতই যায় মালিক পক্ষের দিকে। এবং 'ছাঁটাই হওয়া' শ্রমিকের হামলা, তাও তাদেরই মালিকের ফ্ল্যাটে, এই অনাহার বা বেকারত্বের যন্ত্রণাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে 'দৈবদুর্বিপাক' বলে। ধনী, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, পরিবর্তমান বাঙালী সমাজের সফল প্রতিনিধিত্ব করে এই বিজ্ঞাপনটি। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতে যেভাবে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে সমাধানের কথা ভাবা হয়েছিল একটি একটি করে, অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অভাবকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়। তারই চার দশক পরে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেশীয় সংস্থাগুলি পক্ষ বেছে নেয়। বাঙালীর মূল্যবোধের খুব নিবিড় ছবিটি এই বিজ্ঞাপন একটি ছোট কপির মাধ্যমে তুলে ধরে।

যে মধ্যবিত্ত একদা সাইকেল নিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি অথবা শার্ট পরে আড্ডা দিতে যেতেন, যে আড্ডা বসতো তেল, মুড়ি, নারকেল, কাঁচা লঙ্কা সহযোগে বাড়ির বৈঠকখানায়; অথবা সেলাই কলে নিজের হাতে সেলাই করা পোশাক

পরে সাজগোজের পরে বাড়ির মহিলারা বসতেন অন্দরমহলের আড্ডায়, মুখে হয়তো থাকতো পান, সেই ছবি পাঁচ-ছয়টি দশকের ক্রমবিবর্তনে পরিবর্তিত হয় গভীরভাবে। রেডিও, ট্রানজিস্টার, হ্যারিকেন লণ্ঠনের বদলে টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটরে সেজে ওঠে ঘর। পানের বদলে পান পরাগে অধিক স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে বাঙালী নারী-পুরুষ। ব্র্যান্ডকেন্দ্রিক সাজগোজ আচ্ছন্ন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রম করে, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ সামলে দেশের বড় অর্থনীতির গভীর দীর্ঘ ধারাবাহিক পরিবর্তনের ছাপ কীভাবে বদল করলো মধ্যবিত্ত বাঙালীর মূল্যবোধ, কাঁচা টাকার অভাব থেকে ক্যাসলেস ইকোনমি, কীরকম করে নতুন করে গড়ে তুললো বাঙালীর নতুন মূল্যবোধ, তা জীবন যাপনের পক্ষে ভালো নাকি মন্দ তা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু এই সমগ্র পরিবর্তনের ছবিটি, তা বৃহৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক, অথবা ব্যক্তিগতস্তরে, ধরা আছে সমসাময়িককালে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মধ্যে।

এই সম্পূর্ণ অধ্যায়টিতে বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞাপনের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটিকে সামনে রেখে সেই পরিবর্তনটিকে বুঝতে চাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. অশোক মিত্র, “স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে?”, *প্রশ্ন উত্তর উত্তরহীনতা,* কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ২০০১, পৃষ্ঠা ২৩।

২. অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, “অনুদার কোলাহল”, *দেশ,* সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২৩।

৩. ভবতোষ দত্ত, “কংগ্রেসের আর্থিক নীতি, ১৮৮৫-১৯৮৫”, *দেশ,* কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা, সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১০৬।

৪. ধীরেশ ভট্টাচার্য, “জাতীয় কংগ্রেস, সমাজবাদ ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা”, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১১-১২১।

৫. Halve, Anand and Sarkar, Anita, *Adkatha : The Story of Indian Advertising* , Centrum : Goa, 2011, page 32-34.

৬. এবিপি লিমিটেড (প্রকাশক), *সাত দশক : সমকাল ও আনন্দবাজার,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯।

৭. প্রবোধকুমার সান্যাল, “অঙ্গার”, *মহামন্বন্তর,* কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ৬৩।

৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অপরাজিত,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৪০।

৯ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, “দুঃশাসন”, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৩।

১০. কৌশিক বসু, “ম্লান ভোল্টেজের শহর”, *অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প,* কলকাতা : আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৮৭।

১১. দেবেশ রায়, “জীবনযাপনে গণতন্ত্র”, *নিজস্ব সংবাদ,* কলকাতা : প্রতিক্ষণ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৪।

১২. কল্যাণী দত্ত, “সেকালের ভেতরবাড়ি’, *দেশ,* সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩০।

১৩. পরিমল গোস্বামী, “শেষের হিসাব”, *মহামন্বন্তর,* কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্‌, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ৩৪।

১৪. অশোক মিত্র, *আপিলা চাপিলা,* কলকাতা : আনন্দ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৮।

১৫. দেবেশ রায়, “নেহাত ব্যক্তিগত”, *নিজস্ব সংবাদ,* কলকাতা : প্রতিক্ষণ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১২৬।

১৬. প্রণব বর্ধন, *স্মৃতিকন্ডূয়ন,* কলকাতা : আনন্দ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৬৮-১৬৯।

১৭. অশোক রুদ্র, "আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক", *আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ২৫-২৮।

১৮. https://www.onida.com/corporate-journey. Accessed on 20.07.2021.

১৯.https://www.exchange4media.com/advertising-news/lost-my-longest-lasting- professional-friend. Accessed on 20.07.2021.

২০. দেবেশ রায়, "জীবনযাত্রার সন্ধানে", *নিজস্ব সংবাদ,* কলকাতা : প্রতিক্ষণ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ২৮।

২১. কৌশিক বসু, "মোটরগাড়ি শিল্পের সংরক্ষণ চাই?" *অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প,* কলকাতা : আনন্দ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৪৩।

২২. Aristotle. *Rhetoric.* Translated by W. Rhys Roberts. Provided by The Internet Classic Archive. http://classics.mit.edu//Aristotle/rhetoric.html. Accessed on 20.07.2021.

২৩. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারত,* প্রথম খন্ড, সভাপর্ব, ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত, কলকাতা : সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৮৯।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গান্ধারীর আবেদন", *কবিতা সমগ্র,* কলকাতা : আনন্দ, ২০১০, পৃষ্ঠা ১১১।

২৫. Shakespeare, William. *Othello.* Act III, Scene III. New Delhi : Classic Paperback. 1988. P.68.

২৬. https://theprint.in/features/brandma/devils-in-the-detail-how-onida-tv-became-a-household-name-in-the-80s. Accessed on 12.08.2021.

২৭. নবনীতা দেবসেন, *সীতা থেকে শুরু,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১০৪।

২৮.https://www.astuteanalytica.com/industryreport/indiarefrigeratormarket#:~:text=As%20per%20the%20research%20study,end%20of%20the%20year%202027. Accessed on 13.08.2021.

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদ ও বাংলা বিজ্ঞাপন

১.

আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদের উত্থানের যে ইতিহাস, তা নিয়ে এই অধ্যায় আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। সেই রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উত্থানের ইতিহাস বহুআলোচিত এবং এই গবেষণাকার্যের বাইরের বিষয়। মূলত যে বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হবে, তা হল অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিষয়টি কীভাবে আস্তে আস্তে গড়ে উঠলো তা পড়তে পড়তে সেই সূত্র ধরেই বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গে এসে উপস্থিত হওয়া যাবে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪) ইত্যাদি ব্যক্তির নাম আমাদের দেশের দেশীয় শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এঁদের হাত ধরে দেশীয় শিল্পোদ্যোগ হয়েছে, কিন্তু উল্লেখ্য এই যে, এই দেশীয় শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসও এখানে জরুরি নয়। দেশীয় শিল্পোদ্যোগ মানেই যে তার একটি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এমনটা নয়। কিন্তু দেশীয় শিল্পোদ্যোগ, তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও কিছু পরের দিকে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী অবস্থান, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ তৈরি হওয়া, এই অর্থনৈতিক বিকাশকে বিদেশী শাসনের প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা, এই বিষয়গুলি মোটামুটিভাবে শুরু হচ্ছে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং তার পর থেকে। দেশীয় শিল্পোদ্যোগের ইতিহাস অনেক পুরনো, কিন্তু দেশীয় শিল্পোদ্যোগ মানেই তা জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির সঙ্গে সমার্থক হয়ে যায় না।

তবে ১৯০৫ সালের আগে এ কথা আর কেউ বলেননি এমনটা নয়। দেশ বিষয়টিকে সামনে রেখে আমাদের পুঁজির লড়াই লড়ে যেতে হবে এ কথা আগেও কিছু মানুষ বলেছেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত'র (১৮৬৯-১৯৫৬) লেখা, *শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী* গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে দেখি জাপান থেকে চিকাগো যাওয়ার পথে জাহাজে বিবেকানন্দ'র (১৮৬৩-১৯০২) সহযাত্রী ছিলেন জামসেদজী টাটা (১৮৩৯-১৯০৪)। জানা যায়,

> সুপ্রসিদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন যে তিনি টাটাকে বলিয়াছিলেন, "জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি ত সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র; এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।" কিন্তু টাটা সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া নানারূপ আপত্তি দর্শাইতে লাগিলেন। সে সময় টাটার জাপানি দেশলাই একচেটিয়া ছিল।[১]

যে পণ্য উৎপাদনের উপযোগী মূলধন দেশে রয়েছে, সেই পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করলে, তা কোনও দিক থেকেই দেশের পক্ষে যে লাভজনক নয়, সেই কথাই টাটাকে জানান স্বামীজী। তার পরিবর্তে দেশে সেই পণ্যের উৎপাদন হলে দেশের অর্থ বিদেশে যায় না তো বটেই, অপরদিকে কিছু দেশীয় মানুষের জীবিকার পথও প্রসারিত হয়। আপাতভাবে সহজ এই কথা কটি বিবেকানন্দ টাটাকে বললে, টাটা প্রাথমিকভাবে সে প্রস্তাবে সম্মত না হলেও পরবর্তীকালে তাঁর ভাবনা পরিবর্তিত হয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু'র *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ* বইয়ের 'বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইন্সটিটিউট : ভারতে যন্ত্রশিল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ' প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল-

> জামসেদজী টাটা যে স্বামীজীর সঙ্গে পাঁচ বছর আগেকার প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা স্মরণ করেছিলেন, তা ২৩ নভেম্বর, ১৮৯৮, তারিখে স্বামীজীকে লেখা তাঁর পত্র থেকে দেখা যায়। পত্রটি এই :
>
> "প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ, আমার বিশ্বাস আপনি জাপান থেকে চিকাগোর পথে জাহাজে সহযাত্রীরূপে আমাকে মনে রেখেছেন। ভারতে সন্ন্যাসীসুলভ ত্যাগের আদর্শের পুনর্জাগরণ, ঐ আদর্শকে ধ্বংস করার পরিবর্তে যথাযোগ্য পথে চালিত করার কর্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত বর্তমান মুহূর্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে।
>
> "ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনার কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন বা পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাবরাজির কথা আমি স্মরণ করছি। মনে হয়, যদি ত্যাগব্রতী মানুষেরা আশ্রমজাতীয় আবাসিক স্থানে অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রে প্রাকৃতিক ও মানবিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে- তাহলে তার অপেক্ষা ত্যাগাদর্শের শ্রেষ্ঠতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে না। আমার ধারণা, এই জাতীয় ধর্মযুদ্ধের দায়িত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ করলে তার দ্বারা ধর্মের ও বিজ্ঞানের উন্নতি হবে, এবং দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর এই অভিযানে বিবেকানন্দের তুল্য মহানায়ক কে হতে পারেন! আপনি কি এই পথে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে নবজীবন দান করবার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন? বোধহয় শুরুতে এ-ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করবার

জন্য অগ্নিময় বাণী সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রচার করলেই ভালো করবেন। প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার আমি সানন্দে বহন করব। শ্রদ্ধানত, হে প্রিয় স্বামীজী, আপনার বিশ্বস্ত, জামসেদজী এন টাটা।”[২]

এরপরে আসা যাক ১৯০৫ এর সমসাময়িক বা পরবর্তী সময়ে।

নবকুমার দত্তগুপ্ত, নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত *স্বদেশী* পত্রিকায় ‘বাঙ্গালীর ব্যবসা’ প্রবন্ধে লিখছেন :

> স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচনা ও আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। এতদিনে বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত কোন জাতিরই স্থায়ী উন্নতি লাভ সম্ভবপর নয়। তাই সহর বন্দর প্রভৃতি স্থানে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্যে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ইহাই যে সর্ব্বোত্তম ফল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দাসত্বজীবী বাঙ্গালীর স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি যে দেশের পক্ষে পরম মঙ্গলের বিষয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিদ্যা বুদ্ধিতে ভারতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত বাঙ্গালী জাতির ব্যবসা বাণিজ্যেও শ্রেষ্ঠতা লাভ করা কি বাঞ্ছনীয় নয়? কত দিনে বাঙ্গালী যে ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে পারিবে তাহা কে বলিতে পারে? তবে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে তাহাতে আশা করা যায়, অচিরেই বাঙ্গালায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।[৩]

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের যে যোগাযোগ, সে কথা সেই সময়েই দাঁড়িয়ে উল্লেখ করছেন প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধাংশে দেখতে পাওয়া যায়, স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই ব্যবসাবিমুখ বাঙালি ক্রমে ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে। এবং জাতির শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই পথটি ব্যতীত যে অন্য উপায় নেই, সে কথাও নবকুমার দত্তগুপ্ত লেখেন।

অথবা, *বিনয় সরকারের বৈঠকে (বিংশ-শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি)* বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে স্বদেশী আন্দোলন সংলগ্ন ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখ পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিনয় সরকার স্বদেশী অর্থনীতির সমর্থক ছিলেন না। অর্থনীতিকে তিনি রাজনীতির বাইরে রেখেই দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন অর্থনীতির যে নিজস্ব কিছু মানদন্ড আছে, সেই মানদন্ড থেকেই তাকে মাপা উচিত। সেই কথাই তিনি বলেন তাঁর বইতে কিন্তু তিনি সে কথা বলতে গিয়ে বলছেন-

> তা হ’লে শোনো :- “বৃটিশ-সাম্রাজ্যের আওতায় আর্থিক ভারতে যা-কিছু ঘট্‌ছে তার প্রায়-সবটাই একপ্রকার ভারতীয় নরনারীর পক্ষে অনিষ্টকারক। ভারতের শুল্ককে শুল্ক, মুদ্রাকে মুদ্রা, শিল্পকে শিল্প, কৃষিকে কৃষি, রেলকে

রেল, কর্জ্জকে কর্জ্জ,-সব-কিছুই "কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা।" এই ধুআ গেয়েই আমরা ১৯০৫ সনে বঙ্গ-বিপ্লব সুরু ক'রেছিলাম। তার বৎসর বিশেক পূর্ব্বে ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস এই ধুআই যুবক ভারতে ধরিয়েছিল। এই ধুআরই অন্যতম মূলগায়েন ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের রমেশ দত্ত। তাঁর রচনাবলী ছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার আর্থিক ভারতের বেদ-বাইবেল-কোরাণ-স্বরূপ। এই সব গিলেই আমরা মানুষ হ'য়েছি। ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের সনাতন সুরে রাষ্ট্রনীতির গৎই বাজ্‌তো। আজও সেই গৎ বাজছে।[৪]

রমেশচন্দ্র দত্ত'র (১৮৪৮-১৯০৯) *অর্থশাস্ত্র*-কে তিনি 'স্বদেশী-মার্কা ভারতীয় অর্থশাস্ত্র' বলছেন। তাঁর লেখার মধ্যে একধরনের ব্যঙ্গের সুর শোনা যায় স্পষ্ট। কিন্তু এই যে 'স্বদেশী-মার্কা' অর্থশাস্ত্র, তা যে ১৯০৫-এর সঙ্গে যুক্ত, তা বিনয় সরকারের বইয়ের মধ্যেও পাওয়া যায়।

তৃতীয় আরেকটি উদাহরণে আসা যাক। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে মডার্ণ বুক এজেন্সী থেকে *টাকার কথা* নামের একটি বই প্রকাশিত হয়। বইয়ের লেখকের নাম অনাথগোপাল সেন। এই বইয়ের ভূমিকা লেখেন প্রমথ চৌধুরী। বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে 'দেশীয় শিল্পের অন্তরায়' অধ্যায়ে পাওয়া যায়-

১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ব্রতের প্রথম সূত্রপাত এই বাংলায় সুরু হয়। পরে বাংলা হইতে ইহা ক্রমে গোটা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময় হইতেই বাংলার Industrial Renaissance বা শিল্পযুগের আরম্ভ। সেই সময়ে দেশপ্রীতির নূতন প্রেরণায়, ছোট-বড় নানাপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান চারিদিকে গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম চিরদিনের দ্বিধা ও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে তাহার মূলধন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক দিকে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্‌, বেঙ্গল নেশন্যাল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান-কো-অপারেটিভ্‌ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি প্রভৃতি বৃহৎ অনুষ্ঠান যেমন তৎকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্য দিকে তেমনি ছোট কলকারখানার তৈরি গেঞ্জি, মোজা, কালি, কলম, নিব্‌, পেন্সিল, জুতা, সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, বাক্স, সাবান, দাঁতের মাজন, ছুরি, কাঁচি, খেলনা, পুতুল, জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, প্রসাধন-দ্রব্য ইত্যাদি নানাবিধ স্বদেশী জিনিষ আমরা বাজারে প্রথম দেখিতে পাই। উৎসাহের তুলনায় বড় কারখানার উপযোগী মূলধন যে তখন খুব বেশী পাওয়া গিয়াছিল তাহা নহে; উল্লিখিত অধিকাংশ শিল্পদ্রব্যই স্বল্পপুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা প্রসূত। উৎসাহ তখন যেমন প্রবল ছিল, মূলধন তদনুপাতে তেমন প্রচুর ছিল না। স্বদেশী যুগ হইতে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীদিগকে মূলধনের জন্য যে অসুবিধা ভোগ এবং সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইতেছে, তাহার নিবৃত্তি আজও হয় নাই।[৫]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের যেমন নানান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে, তেমনই এই ১৯০৫ সাল আমাদের যে অর্থনৈতিক যাপন, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সুচনাকাল হিসাবে এই সময়টিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়।

বিপান চন্দ্র (১৯২৮-২০১৪) তাঁর *ঔপনিবেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ* বইয়ের 'ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ : ১৯৪৭ সালের আগে' অধ্যায়ে বলছেন-

> উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এবং বিশেষ করে ১৯১৪ সালের পরে ভারতবর্ষে এক স্বাধীন পুঁজিপত শ্রেণী গড়ে উঠল। শুরু থেকেই এই শ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল : মুখ্যত ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সঙ্গে এই শ্রেণী কোন সাংগঠনিক সম্পর্ক গড়ে তোলেনি, ভারতে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে তা যুক্ত ছিল না। এই ব্যাপারটাকে আরও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিশ শতকের ভারতীয় পুঁজিপতিরা ব্রিটেন বা ভারতীয় ব্রিটিশ পুঁজিপতি এবং ভারতের বাজারের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দালালের ভূমিকা পালন করেনি। এমন কি তাদের কোন কোন পূর্বপুরুষ উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি থেকেই নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতিতে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করত।...
>
> বিশ শতকের ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যে পুরোগামী কয়েকজনের পারিবারিক ইতিহাস থেকে এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। টাটা, বিড়লা, শ্রীরাম, ডালমিয়া, জৈন, বিঠলদাস ঠ্যাকারসে, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, নরোত্তম মোরারজী, সিংহানিয়া, কস্তুর ভাই লাল ভাই, অশ্বালাল সরাভাই, যমনালাল বাজাজ, লালুভাই সমলদাস, লালজি নারানজি, কিলেস্কির, মোদি, কিলাচাঁদ দেবীচাঁদ, হরকিষণ লাল ইত্যাদি পরিবারের সঙ্গে বিদেশী পুঁজির কোন বড় রকমের যোগাযোগ বিশেষ দেখা যায় না। বিদেশী পুঁজির অধীনতার কথা সেক্ষেত্রে ওঠেই না।
>
> অতএব অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্য ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভর করেনি। এবং সেভাবে "বাঁধা" পড়েনি বলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তারা মিত্র হয়েও ওঠেনি। বস্তুতঃ ঘটেছিল ঠিক উলটো ব্যাপার।[৬]

বিপান চন্দ্র এই প্রবন্ধাংশে বলেন, বাংলার ক্ষেত্রে যে কথা সত্য, সেই কথা কিন্তু ক্রমে সারা ভারতবর্ষের জন্যই সত্য হয়ে উঠেছিল। অনেক সময়ে এই দেশীয় পুঁজি ব্রিটিশ বিরোধী যে সংগ্রাম তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। তার মানে এমনটাও নয় যে এই সমস্ত দেশীয় পুঁজিপতিরা দেশে সর্বক্ষণ একটা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চাইতেন। অতিরিক্ত রাজিনৈতিক বিশৃঙ্খলা পুঁজির বিকাশের পথে অন্তরায়। তবু, এই পুঁজি ব্রিটিশ শাসনকে তো সহায়তা করেইনি, বরঞ্চ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষেই ছিল।

বাংলা বিজ্ঞাপনের জগতেও, বঙ্গভঙ্গের সমসাময়িক সময় এবং তার পরবর্তীতে, নানান স্বদেশী উদ্যোগের সঙ্গে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব বিজ্ঞাপনেও কিছুটা প্রকাশিত হচ্ছে।

পূর্বে আলোচিত *স্বদেশী* পত্রিকার ১৩১৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী'র 'স্বদেশী ভূত'[৭] নামের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সেই কবিতাটির কিছু অংশ এইখানে উদ্ধৃত করা হল-

সে ছিল বিদেশী ভক্ত, নামটী তার রঘু;
স্বদেশীর ভিটেয় সে চরিয়ে বেড়ায় ঘুঘু।
খাওয়া পরা শোওয়া বসা সবই তার বিলাতি,
যা' বিলাতী তা' মিষ্ট তার- মায় বিলাতি লাথি।
গ্রামের ভিতর ছেলেগুলা 'পিকেটিং' করে,
তাই দেখে রঘু যেন জ্বলে পুড়ে মরে।
গায় যখন তারা 'বন্দে মাতরম্' গান,
দুই হাতে রঘু নিজের ঢেকে রাখে কাণ।
ভাবে রঘু একি আপদ এল দেশের মাঝে,
ছেলে মেয়ে বুড়াবুড়ী স্বদেশী বাঁদর সাজে!
নেহাৎ যখন অসহ্য হয় ঘরে রইতে নারে,
ছুটে যায় রঘুনাথ থানা ঘরের দ্বারে।
মারপিট, নুণ ফেলা কাপড় পোড়ান আদি,
কত মামলায় সাক্ষী রঘু, কত মামলায় বাদী।
কত ছেলে জেলে গেল, কত বেত খায়;
কি আপদ্, তবু তো এ পোড়া ভূত না যায়?

কবিতার শুরু থেকে এহেন স্বদেশী-বিরোধী রঘুর শেষকালে কী ভাবে বিপুল মানসিক পরিবর্তন হয়, তা প্রমাণ করাই এই কবিতার উদ্দেশ্য। এই কবিতা থেকে বোঝা যায় বাঙালির একটি বড় অংশ 'স্বদেশী'র প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হন। ঘোর ইংরেজ-সমর্থক, পদলেহনকারী রঘুর কবিতার শেষকালে স্বদেশী আন্দোলনকারীদের সততায় কেমন করে পরিবর্তিত একটি মানুষে রূপান্তরিত হন তা জানার জন্য শেষ স্তবকের উদ্ধৃতি প্রয়োজন-

‘বন্দেমাতরম্’ গেয়ে ছেলের দল ফিরে,
এমন সময় পুলিশ সাহেব দাঁড়ায় তাদের ঘিরে।
রঘুনাথকে ডেকে সাহেব বলে চড়াসুরে,-
কোন্ কোন্ আদ্‌মী তোমায় মারপিট করে?
দশ বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলে,-
আমিই একা দোষী সাহেব, দিবে চল জেলে।
আর একটী ছেলে- বয়স হবে বছর সাত,
আগু হ’য়ে বলে সাহেব, ঝুটা ওর বাত।
আমিই বেঁধে দিছি রাখী রঘুনাথের হাতে,
জেলে যেতে হয় আমি রাজি আছি তাতে।

ব্যাপার দেখে সাহেব হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায়,
সবাই বলে ‘আমিই দোষী’ কারে ধরা যায়?
ধমক্ দিয়ে রঘুকে বলে, আসামী কোন্ হ্যায়?
রঘুর মুখে কথা নাই শুধু ফ্যাল ফ্যাল চায়।
ক্রমে তার চক্ষুদু’টা সজল হ’য়ে আসে,
চোখের জলে রঘুনাথের পাষাণ বুকটা ভাসে।
“ওগো সাহেব মিছা কথা” কেঁদে রঘু বলে,
কেউ আমায় মারেনি, এরা শান্তশিষ্ট ছেলে।
‘ড্যাম্ আদ্‌মী’ ব’লে সাহেব চেয়ে রাঙ্গা চোখে,
শীকারভ্রষ্ট বাঘের মত ফিরে মনের দুঃখে।
চারিদিকে উঠে ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি;
ডুক্‌রে কেঁদে রঘু বলে, “হায় কি পাপী আমি।”

এমনি ধারা কত রঘু ভূতের ভয়ে ছুটে,
ভূত তাড়াতে গিয়ে শেষে ভূতের পায়ে লুটে।

কেবলমাত্র রঘুর বৌদ্ধিক পরিবর্তনই নয়, শিশু থেকে শুরু করে বহু সংখ্যক বাঙালির মনে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তা কবিতায় স্পষ্ট। সেই আবেগের প্রকাশ বিজ্ঞাপনের মধ্যে পড়বে, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বাংলা বিজ্ঞাপনও বাঙালির এই ‘স্বদেশী’ যাপনের সঙ্গী হয়েছিল। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদের প্রভাব যেভাবে অর্থনীতিতে পড়ে, বিজ্ঞাপনও তার বাইরে ছিল না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ধরনটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করা হবে এই অধ্যায়ে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের পার্থক্যগুলিকে চিহ্নিত করা হবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

ভবতোষ দত্ত’র (১৯১১-১৯৯৭) আত্মজীবনী *আট দশক* এ পাই ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি ইডেন হিন্দু হস্টেলে ছিলেন। একটি জায়গায় তিনি লিখছেন-

> দেশের বড় রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রভাবও কিছুটা এসে পড়ত। যতীনদাসের মৃত্যুর প্রতিবাদে যখন সারা দেশে অনশন হল, তখন হস্টেলেও পুরোপুরি অনশন। কেউ বাইরে গিয়ে খেয়ে আসে নি। আমাদের বি এ পরীক্ষার বছরটাতেই (১৯৩০) আরম্ভ হইয় মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ- কলেজ স্ট্রিটে বে-আইনী নুন বিক্রী দেখতে আমরা সবাই গিয়েছিলাম। সে বছরই হয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন এবং ডিসেম্বরে বিনয়-বাদল-দিনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান এবং কারা-বিভাগের অধিকর্তা সিম্পসনকে হত্যা। দীনেশ স্কুলে এবং ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে আমার সহপাঠী ছিল এবং আমরা এক পাড়াতেই থাকতাম। হিন্দু হস্টেলে মাঝে মাঝে আসত- প্রথম দিকটায় মেদিনীপুরে দল তৈরি করছিল। তার পরে ছিল বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী। ১৯৩০-এর নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে (তখন আমি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র) একদিন সন্ধ্যায় এসে হাজির। সে দিন হস্টেলে ফিস্‌ট্ ছিল। খেয়ে যেতে বলায় অত্যন্ত আনন্দে রাজি হল এবং পূর্ণ তৃপ্তিতে সব খেল। রাত হয়ে গিয়েছে বলে থেকে যেতে অনুরোধ করলাম (যদিও সেটা নিয়ম-বিরুদ্ধ), এক বিছানায় দু-জনেই ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। আমার ঘুম বারবার ভেঙে গেল এবং প্রত্যেকবারই মনে হল দীনেশ ঘুমোয় নি। পরের দিন ভোরবেলা যাবার সময় বলে গেল, বহুদূর দেশে যাচ্ছি, আর হয়ত দেখা হবে না, একটু থেমে বলল, একটা স্যুট কিনেছি। আমি মনে করলাম যে হয়ত পালিয়ে জাপান, জার্মানি বা আমেরিকা যাবে- যেমন আগে অনেক বিপ্লবী গিয়েছিলেন। কোনো প্রশ্ন করি নি। কয়েকদিন পরে খবরের কাগজে দীনেশ বাদল এবং বিনয় বসুর অভিযানের কথা পড়লাম। বিনয় বসুও স্কুলে আমাদের সঙ্গেই ছিলেন- এক ক্লাস ওপরে।[৮]

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এই অংশটি সম্পর্কিত নয়, কিন্তু তবু এটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য হল এই যে, আজ বিপ্লবী বলতে ইতিহাস বইয়ের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত যুবকদের কথা পড়েন বর্তমান প্রজন্ম, একদিন তাঁরা তেমন বহু দূরের দুই মলাটের মধ্যেকার কোনও মানুষ ছিলেন না। ঘরের, পাড়ার, স্কুলের একই বেঞ্চিতে বসা বন্ধুটিই বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়তো দুঃসাহসী কাজে। জাতীয়তাবাদ বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল বাঙালিকে। বিজ্ঞাপনের জগৎ বাঙালির এই গভীর আবেগের জায়গাটিকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছিল।

স্বাধীনতা এবং তৎসংলগ্ন দেশভাগের আগে পর্যন্ত এই 'স্বদেশী' বোধ বিভিন্ন বাঙালির মধ্যে কিঞ্চিৎ তীব্রভাবেই জাগরুক ছিলো। কখনো কখনো তা এমনকি কিছু বাড়াবাড়ির পর্যায়েও পৌঁছেছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) সম্পাদিত *প্রবাসী* পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যার থেকে এমনই কিছু উদাহরণ তুলে আনা যাক। প্রথমটির শিরোনাম 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ঘরবোনা কাপড়'। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় এই পত্রটি প্রকাশিত হয়। যেখান থেকে জানা যায়-

> গত মাসের "প্রবাসীতে" দেশে তাঁত-চর্‌কা প্রচলন সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া সম্পাদক মহাশয় এই মন্তব্য করিয়াছেন যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিতে চাহেন "যাঁহারা ঐরূপ (ঘরবোনা) কাপড় ব্যবহার না করিয়া অন্যবিধ কাপড় পরিবে, তাহাদের ধোপা নাপিত বন্ধ করা- বা তাহাদিগকে একঘরে করা" উচিত। আচার্য্যের আদেশানুসারে আমার স্বগ্রাম কাটীপাড়াতে তাঁত-চর্‌কার প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিতেছি, ও আমি এই সভার উদ্যোক্তা এবং সেই সভাতে উপস্থিতও ছিলাম। তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি সমাজচ্যুতি সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি এমন একটা ভাবের স্রোত প্রবাহিত করাইতে চাহেন যাহাতে সকলেই নিজের হাতে চর্‌কাকাটা-সুতার কাপড় পরিধান করেন এবং বিদেশী ও বিলাতী কাপড় পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করেন। এবং যে এইরূপ করিতে অনিচ্ছুক, 'তাহাকে লোক যেন স্বদেশদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করে। জনসাধারণ বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সামাজিক অত্যাচার কখনই পছন্দ করেন না। জবরদস্তি করিয়া লোককে নিজমতাবলম্বী করা তাঁহার মূলমন্ত্র (persuastion not coercion, is his motto) নহে।
>
> শ্রীকুঞ্জলাল ঘোষ
>
> সম্পাদকের মন্তব্য।– লেখক আমাদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। আমরা যাহা ইংরেজী দৈনিকে পড়িয়াছিলাম, তাহাই লিখিয়া, তাহা সত্য হইলে দুঃখের বিষয়, ইহাই বলিয়াছিলাম। আচার্য্য রায় মহাশয় প্রবাসী বাহির হইবার পর আমাদিগকে বলিয়াছেন, যে, লোককে বুঝাইয়া কাজ করানই তাঁহার অভিপ্রেত, কোনপ্রকার বলপ্রয়োগের

তিনি বিরোধী। তিনি চান যে, এরূপ লোকমত গঠিত হউক যেন কেহ ঘরবোনা কাপড় না-পরিয়া লোকসমাজে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করে।[৯]

এইভাবে স্বদেশী, স্বদেশজাত ইত্যাদি বিষয়গুলি বাঙালি যাপনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যায়। অনিচ্ছুকরা সেখানে চিহ্নিত হন স্বদেশদ্রোহী নামে।

আরেকটি উদাহরণ বেশ চমকপ্রদ। ১৩২৮ বঙ্গাব্দেরই পৌষ সংখ্যায় *প্রবাসী*-তে আরেকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেটি এইরকম-

মৃতের গায়ে খদ্দর- বিগত ১২ ই নভেম্বর তারিখে ঝরিয়ায় এক অতি করুণ ঘটনা ঘটে। ঐ দিন তথাকার একজন দরিদ্র মুসলমানের মৃত্যু হয়। মৃতের সৎকারার্থ তাহার আত্মীয়েরা প্রায় ১২ টাকার বিদেশী বস্ত্র কিনিয়া আনে। ইহাতে পারিপার্শ্বিক কবরযাত্রীরা খুব আপত্তি করে। মৃতের গায়ে খদ্দর না দিলে তাহারা কিছুতেই মৃতদেহের সৎকারার্থ যাইবে না। অগত্যা ঐ বিদেশী বস্ত্র দোকানদারকে ফিরাইয়া দিতে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু কিছুতেই সে তাহা ফিরাইয়া লইবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণকে হরদিওদাস নামক জনৈক উন্নতমনা ভদ্রলোকের নিকট যাইয়া সবিশেষ বলিতে হয়। দয়ার্দ্র হৃদয় হরদিওদাস ঐ বিদেশী বস্ত্র স্বয়ং লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং খদ্দরের দাম দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিয়া দোকানদার এক টাকা কাটিয়া রাখিয়া বিদেশী বস্ত্রগুলি ফিরাইয়া লয় এবং বাকী টাকার খদ্দর দেয়। অবশেষে আত্মীয়েরা যাইয়া মৃতের সৎকার করে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় মহাত্মার অকৃত্রিক ভক্তেরা তাঁহার আজ্ঞা পালনে কতদূর বদ্ধপরিকর হইয়াছে।[১০]

মৃতের গায়ে খদ্দর না থাকলে তার সৎকার হবে না, এই ধরনের ঘটনাগুলিকে আজকের সমাজ-অর্থনীতিতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা একটু অসুবিধাজনক হলেও, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে এই ছিলো মোটামুটিভাবে বাংলার পরিস্থিতি।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে স্বদেশী যুগের সূত্রপাত বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকে হলেও বৃহত্তর অর্থে দেখতে গেলে এই যুগের সুচনা তারও কয়েক দশক পূর্বে।

অমিত ভট্টাচার্য তাঁর ‘ঔপনিবেশিক বাংলার স্বদেশী অর্থনৈতিক চিন্তা’ প্রবন্ধে লিখছেন,

‘স্বদেশী শিল্প’ বলতে পরাধীন ভারতবর্ষে কী বোঝায়? সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হল এই যে, যে সব শিল্প দেশীয় মালিকানাধীন, সে সবই স্বদেশী শিল্প। কিন্তু দেশীয় শিল্প হলেও তা স্বদেশী শিল্প হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে না। এখানে যে প্রশ্ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আমরা এমন একটি দেশের কথা আলোচনা করছি যা

ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত একটি পরাধীন দেশ। পরাধীন ভারতবর্ষে দেশীয় শিল্পকে শুধুমাত্র দেশীয় মালিকানাধীন হলেই চলবে না, একই সঙ্গে মূলধন, পরিচালনা, কারিগরী জ্ঞান, বাজার, এমনকি যন্ত্রপাতির জন্যও যতটা সম্ভব দেশজ উপাদানের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। স্বনির্ভরতার সঙ্গে আরও যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরোধিতা এবং তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার মানসিকতা। বস্তুতঃ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিদেশী অর্থনৈতিক নাগপাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন শিল্প হিসাবে বেড়ে ওঠার প্রচেষ্টাই 'স্বদেশী শিল্প' হিসাবে বিবেচিত হওয়ার মৌলিক পূর্বশর্ত।

এই স্বদেশী বুর্জোয়াশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সমগোত্রীয়। বিদেশী পুঁজি ও শাসকশ্রেণীর সঙ্গে এই শ্রেণীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা ও বিরোধিতা এই দুটি দিকের অস্তিত্ব থাকলেও প্রধান দিক ছিল ব্রিটিশ বিরোধিতা। এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিক তাকে স্বতন্ত্র আসনে বসিয়েছিল। বস্তুতঃ বিংশ শতকে অবিভক্ত বাংলার শিল্পক্ষেত্রে এই স্বাদেশিকতা বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কখনও তা বিদেশী দ্রব্য বয়কটের প্রকাশ্য আহ্বানের মাধ্যমে, কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা না করে পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা প্রচারের মাধ্যমে। লক্ষণীয় বিষয় হল, বিদেশী, বিশেষতঃ ব্রিটিশ-বিরোধিতা সরাসরি আসছে তখন, যখন রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করছে। যেমন, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও তার অব্যবহিত পরে, ১৯২০-এর দশকের প্রথমে, কিংবা ১৯৩০-এর দশকের প্রথমে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পস্থাপনের কাজ যেমন তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনও সেই গতিতে বেগ এনেছে, নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে এবং এইভাবে তার পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে।...[১১]

ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘদিন ধরে চলার ফলে দেশীয় শিল্পের ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে। এই দেশ থেকে ক্রমান্বয়ে লুণ্ঠন চলার ফলে দেশীয় অর্থনীতির অবস্থা হয়ে উঠেছিল ভগ্নপ্রায়। ভারত পরিণত হয় কাঁচামাল সরবরাহকারী ব্রিটেনের উপাঙ্গে। এইভাবে শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ক্রমে ক্রমে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে, এ দেশের স্বদেশী ভাবনাকে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তিনি আরও লিখছেন-

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই স্বদেশী চিন্তা দানা বাঁধতে থাকে। বাংলায় তা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। বস্তুত বাংলায় এই চিন্তা শুধু দানা বাঁধে না, বেশ কিছু সংখ্যক উদ্যোগী বাঙালি শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতেও শুরু করেন। এইসব শিল্পোদ্যোগীরা ছিলেন ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের উল্লেখযোগ্য বাঙালি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির মধ্যে ছিল 'জবাকুসুম' কেশ

> তেলের প্রস্তুতকারক *সি কে সেন এন্ড কোং* (১৮৭৮); কালী, সুগন্ধি দ্রব্য, কেশ তেল, পঞ্জিকা এবং আরও নানাধরনের ভোগ্য দ্রব্য প্রস্তুতকারক পি এম বাকচি এন্ড কোং (১৮৮৩); হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক *ওরিয়েন্টাল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং* (১৮৯৩); কাচের দ্রব্য প্রস্তুতকারী *পাইওনিয়ার গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং* (১৮৯০); ছাতা প্রস্তুতকারক *সুকিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং কোং* (১৮৯৫); ঔষধ ও নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক *বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কোং* (১৮৯২); রান্নার পাত্র ও জলের পাইপ প্রস্তুতকারক *সিকদার এন্ড কোং* (১৮৭৬) প্রভৃতি। এইসব নানাবিধ ভোগ্যপণ্য প্রস্তুতকারক ছাড়াও চন্দননগর, কাঞ্চননগর, সোদপুর, হাওড়া, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বহুসংখ্যক হস্তশিল্প কেন্দ্র ছিল যেগুলি পেরেক, ছুরি, কাচি, বটি, তালা-চাবি, শল্যচিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করত।[১২]

স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের স্বপক্ষে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার ঠিক কবে শুরু হয় তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, হিন্দু মেলাও ছিল প্রচারের মাধ্যম। তবে তার ধরনটি ছিল অন্য। প্রাবন্ধিক অমিত ভট্টাচার্য তাঁর অন্য একটি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন-

> একদম প্রথম দিকের বিজ্ঞাপন পাই ১৭৯০ সালে। মদন মিত্তির নামে খুলনা জেলার মোমবাতি প্রস্তুতকারক *The Calcutta Gazette of Oriental Adviser* পত্রিকায় ১ মন মোমবাতি ৬৫ টাকায় বিক্রির বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনের বয়ান অনুযায়ী ১৭৮৮ সাল থেকে তিনি এই মোমবাতি প্রস্তুত করছিলেন। এটি স্বনির্ভরতার প্রতীক স্বদেশী যদি নাও হয়, দেশী দ্রব্য নিশ্চয়ই ছিল। বস্তুত ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ধীরে ধীরে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার হতে থাকে। বিজ্ঞাপন জগতের তখন ছিল শৈশবাবস্থা। সবচেয়ে প্রথম দিকের স্বদেশী কোম্পানি বলতে আমরা সি কে সেন এন্ড কোং (১৮৭৮) ও পি এম বাকচি এন্ড কোং- এর (১৮৮৩) নাম করতে পারি।[১৩]

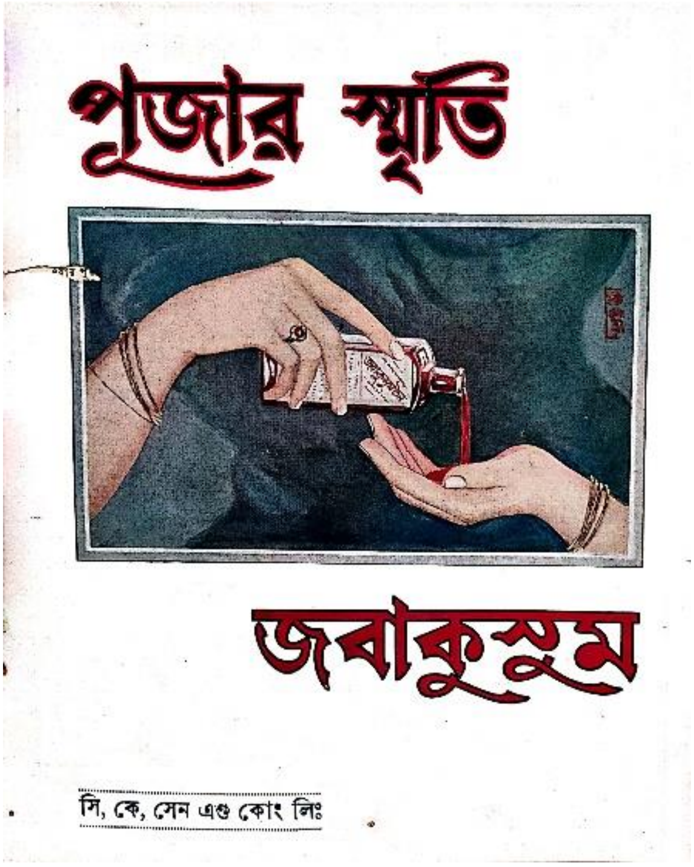

চিত্র ৪.১ প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

সি কে সেন এর বহমান ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে এই বিজ্ঞাপনটি তুলে দেওয়া হল। বিজ্ঞাপনটি স্বাধীনতার বহু পূর্বের হলেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের দুই দশকেরও পরের। কিন্তু সবচেয়ে প্রথম দিকের স্বদেশী কোম্পানি জবাকুসুমের বিজ্ঞাপনও কত উজ্জ্বলবর্ণের এবং সুন্দর হত তার উদাহরণস্বরূপ এই বিজ্ঞাপনটি থাক।

স্বদেশী আন্দোলন, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বাংলার মানুষের আবেগ যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে সে আবেগের সূত্রপাত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আগে থেকেই যে বাঙালি পরিবারগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছিলো, বিশেষত প্রভাবশালী পরিবারগুলিতে। তা *জীবনস্মৃতি*-র 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়টিকে পড়লেই বোঝা যায়। *প্রবাসী* পত্রিকায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় *জীবনস্মৃতি*। কিন্তু পাঠকমাত্রেই জানেন, *জীবনস্মৃতি*-তে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর যে বয়সের স্মৃতির ছবি লিখেছেন, তা তাঁর শৈশব-কৈশোর। এই 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়টিতে তাঁদের পরিবারের নানা ঘটনাবলির বিবরণের মধ্যে শ্লেষের ভাবও যুক্ত হয়ে থাকে। ঠাকুর পরিবারে স্বদেশী নানান উদ্যোগের বর্ণনার মধ্যে একটি ছিল স্বদেশী দেশলাই তৈরি।

> স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের এক দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশলাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুরপরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে- আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে

লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরও একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তান্ডব নৃত্য- তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।[১৪]

এই ঘটনার সময়কাল ১৯০৫ এর বেশ কয়েক দশক পূর্বের। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এই দেশীয় শিল্পকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, সেরকম কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য।

১৯৩৪ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখে, বারাকপুরের পাণিহাটিতে বাসন্তী কটন মিলের উদ্বোধন করেন। বাংলার মানুষের এই মিলের উদ্বোধনের প্রতি সহানুভূতি ছিল, সেই কথাও জানা যায়। নানান বিখ্যাত মানুষ, স্যার নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩), স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা (১৮৮৩-১৯৭৩), শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী(১৮৮০-১৯৭৪), কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা, মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত মাখন সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা সেদিনকার কটন মিলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন-

বাসন্তী কটন মিলের কর্তৃপক্ষ একজন কবিকে মিলের উদ্বোধন করিতে আহ্বান করিয়া চরম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আমি যদি বলি যে, আমি এই প্রতিষ্ঠানের কেবল আর্থিক সাফল্যই কামনা করি না, তাহা হইলে আশা করি, তাঁহারা আমাকে সমর্থন করিবেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। তাঁহারা যেন লক্ষ্মীদেবীর এমন একটি পূজা বেদী নির্ম্মাণ করিতে পারেন, যেখানে তাঁহাদের অর্জ্জিত অর্থ জাতীয় অর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এবং তাঁহারা যেন ঐ অর্থ দ্বারা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে নিরক্ষরতা, অস্বাস্থ্য ও নিরানন্দ দূর করিতে পারেন।[১৫]

এই অনুষ্ঠানের ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-তে 'যৎকিঞ্চিৎ' শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, সেখানে লেখা হয়-

> বাসন্তী কটন মিলের উদ্বোধন উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছে,- "আধুনিক যুগের বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের চতুর্দ্দিকে নৈতিক ও কায়িক জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া আছে। এই সকল বিরাট প্রতিষ্ঠান এরূপ বিপুল পরিমাণে জগতের বাজারে পণ্য উৎপাদন করে যে, সীমাহীন ভোগাসক্তি সত্ত্বেও জগতের বাজার তাহা নিঃশেষ করতে পারিতেছে না। অতিরিক্ত লাভের দুষ্প্রবৃত্তি সহযোগিতার মনোবৃত্তি নষ্ট করিয়া সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সাম্য নষ্ট করিতেছে। এই শোচনীয় অবস্থার অনিবার্য্য পরিণতি ব্যাপক ধ্বংস।" সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বাসন্তী কটন মিলের কর্তৃপক্ষকে উপদেশ দিয়াছেন,- তাঁহারা যেন লক্ষ্মীদেবীর এমন একটি পূজাবেদী নির্ম্মাণ করিতে পারেন, যেখানে তাঁহাদের অর্জ্জিত অর্থ জাতীয় অর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তাঁহারা যেন এ অর্থ দ্বারা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও দেশের নিরক্ষরতা অস্বাস্থ্য ও নিরানন্দ দূর করিতে পারেন। আমরা আজ আধুনিক বাণিজ্য যুগ এবং যন্ত্র সভ্যতার সম্মুখীন; সুতরাং পাশ্চাত্য যে ভুল করিয়াছে, তাহা যেন আমরা অনুকরণ না করি। এই জন্যই কবি আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সে পরের কথা। আপাততঃ বাঙ্গালীর যে শিল্পপ্রচেষ্টা বাসন্তী কটন মিল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার জন্য আমরা আনন্দিত। আমরা এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর মূলধনে বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কলের সংখ্যা মুষ্ঠিমেয়। বাসন্তী মিলের দৃষ্টান্তে বাঙ্গলাদেশে আরও বহু কাপড়ের কল হোক এবং বাঙ্গলাদেশ যন্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হোক, আমরা সেই আশাই করি।[১৬]

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন পুঁজি ব্যাপারটাকে কেবলমাত্র লোভের উপকরণ করলে চলবে না। প্রতিবেদনটিতে প্রথমে সেই কথা সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হলেও তারপরে জানানো হয়, বাঙালির কারখানা বানানোয় তাঁরা খুশি, একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান নির্মিত হবার আনন্দের কথা। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র এই ঘটনাগুলিকেই বলেন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, বিনয় সরকার বলছেন স্বদেশী অর্থনীতি।

হরপ্পা পত্রিকার অক্টোবর, ২০২১ (পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)-এর সংখ্যাটিতে 'স্বদেশী আন্দোলন ও কয়েকটি বাঙালি শিল্পোদ্যোগ' শিরোনামের প্রবন্ধে সৌমেন নাথ লেখেন-

> স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী, বিদেশি পণ্যের বদলে দেশজ জ্ঞান, যন্ত্র, কাঁচামাল দিয়ে তৈরি দেশি সামগ্রীর উৎপাদনে ঝুঁকে পড়ে। সারাভারত মেতে ওঠে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান তৈরিতে। বাংলাও তার বাইরে ছিল না। সাহেবদের বেনিয়ান আর হাউসের চাকরির বাইরে তাঁদের চোখে চোখ রেখে দেশীয় উদ্যোগ শুরু হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষিত

কর্মী, দেশজ পুঁজি, দেশজ জ্ঞান, প্রয়োজনে পশ্চিমি বিজ্ঞানের সাহায্য আর বিরাট এক বাজার নিয়ে উদ্যোগপতিরা দেশমাতার নামে নেমে পড়েন। এই পথে প্রতিবন্ধকতা ছিল অনেক। প্রথমত অভাব ছিল উপযুক্ত যন্ত্রের। অনেকসময় বাধ্য হয়েই বিদেশ থেকে যন্ত্র আনতে হত। প্রায়শই প্রয়োজনীয় মানের দেশজ কাঁচামাল পাওয়া যেত না। পরবর্তীকালে অনেক প্রতিষ্ঠান এই যন্ত্র আর কাঁচামাল তৈরি করে এর সমাধান করেন। এই শিল্পোদ্যোগে ওষুধ থেকে শুরু করে পেনের কালি, বিস্কুট থেকে কাপড়, সাবান থেকে চিরুনি, সুগন্ধী থেকে জুতো, কী না ছিল! এর সাথে সাথে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। বাঙালি ব্যবসা করতে পারেনা- এই অপবাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে অবিভক্ত ভারতে দাপিয়ে বেড়াতেন বাঙালি উদ্যোগপতিরা। তাঁদের মধ্যে যেমন একদম সাধারণ লোক ছিলেন, অন্যদিকে বিলেতফেরত উচ্চশিক্ষিতরাও ছিলেন। দেশবরেণ্য প্রাতঃস্মরণীয়রা ছিলেন এঁদের গুরু, পরামর্শদাতা। সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এঁদের উৎপাদিত পণ্যের ভূয়সী প্রশংসা পাওয়া যায়। অনেক পণ্য কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে যায়।[১৭]

চিত্র ৪.২ নিরুপমা বর্ষ স্মৃতি, শারদীয়া ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

এই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সূত্রে বিজ্ঞাপনকে দেখা হবে।

দেশীয় দ্রব্যকে গুণমানে সেরা প্রতিপন্ন করা অবশ্যই এই বিজ্ঞাপনগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বেঙ্গল পারফিউমারীর স্বদেশী সুগন্ধির বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হচ্ছে, "দেশী এসেন্স অনেক মাখা গিয়াছে, কিন্তু বিলাতীর সমকক্ষ কেবল ইহাই; গন্ধের মিষ্টত্বে-স্থায়ীত্বে, অঙ্গ-সৌষ্ঠবে

অতুলনীয়”। এই বিজ্ঞাপন থেকে স্বদেশী কোম্পানিগুলির মধ্যেকার প্রতিযোগিতার বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যায়। তবে নিশ্চিতভাবেই এই কথাও সত্যি যে তারা বিদেশী প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে যতটা সরব ছিল, দেশী প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে ততটা ছিল না। এই বিজ্ঞাপনে প্রখ্যাত চিত্রকর বিনয় বসুর আঁকা ছবির সঙ্গে গর্বের ভঙ্গিতে জানানো হয়, “গন্ধেই বুঝিতে পারি যে ইহা বেঙ্গল পারফিউমারির স্বদেশী সুগন্ধী”।

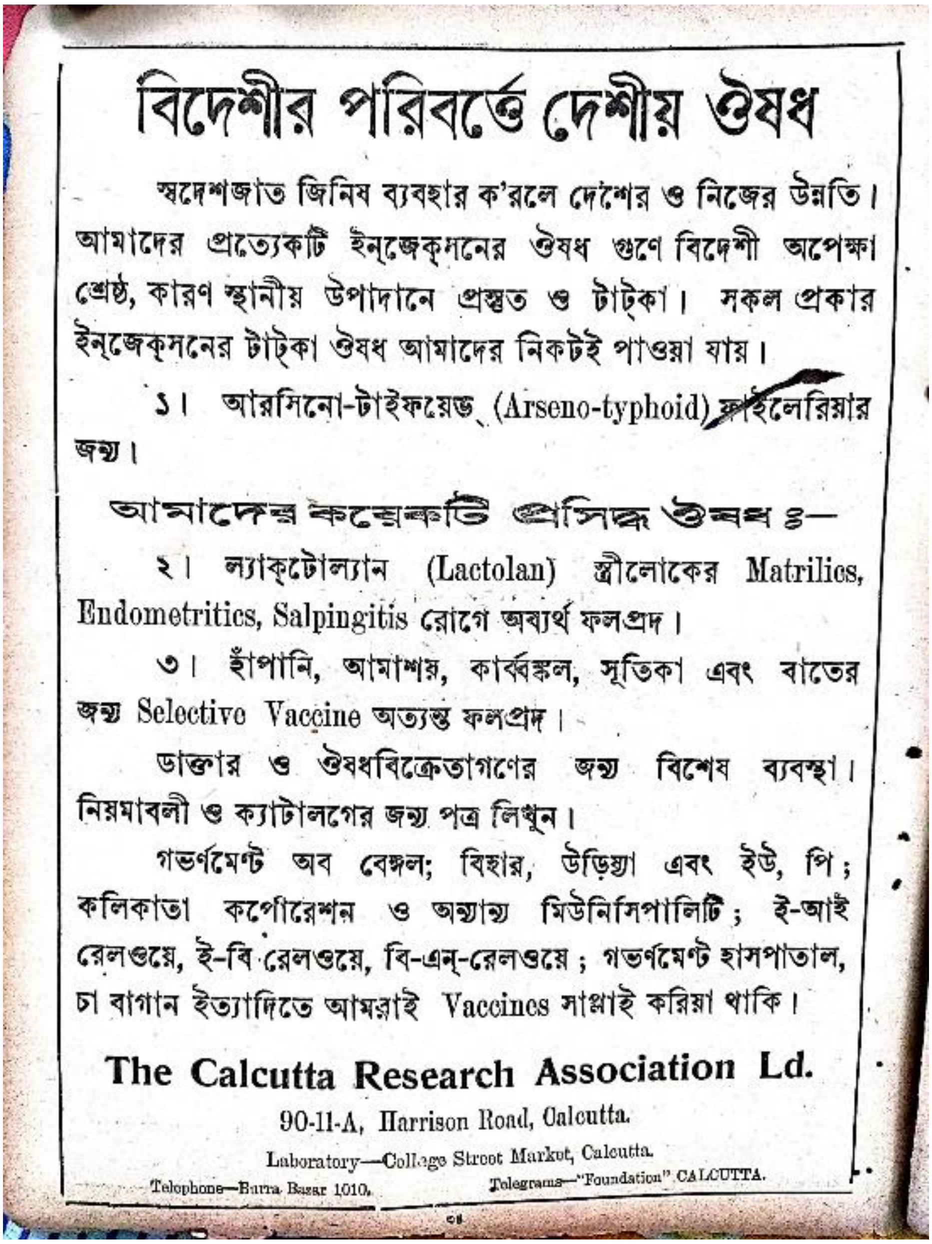

চিত্র ৪.৩ প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

বিদেশী পণ্যের বিরোধিতা, জাতীয় পণ্যের উপর জোর দেওয়ার বিষয়টি মোটামুটি সব বিজ্ঞাপনেই স্পষ্ট ছিল। অমিত ভট্টাচার্য লিখছেন,

> বিংশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন পি এম বাকচি কোং বিজ্ঞাপন দেয় : “আমরা কীভাবে স্বদেশীয় পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারি- একমাত্র দেশীয় পণ্যের বিকাশের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করে।” ১৯৪৫ সালে তার আবেদন ছিল অনেক প্রত্যক্ষ : “স্বদেশী কিনুন” ছিল তখনকার আবেদন।[১৮]

The Calcutta Research Association Ld. তাদের ঔষধের বিজ্ঞাপনের শিরোনামে জানায় "বিদেশীর পরিবর্তে দেশীয় ঔষধ"-এর কথা। বলা হয়, "স্বদেশজাত জিনিষ ব্যবহার ক'রলে দে'শের ও নিজের উন্নতি। আমাদের প্রত্যেকটি ইন্‌জেক্‌সনের ঔষধ গুণে বিদেশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ স্থানীয় উপাদানে প্রস্তুত এবং টাট্‌কা। সকল প্রকার ইন্‌জেক্‌সনের টাট্‌কা ঔষধ আমাদের নিকটই পাওয়া যায়।"

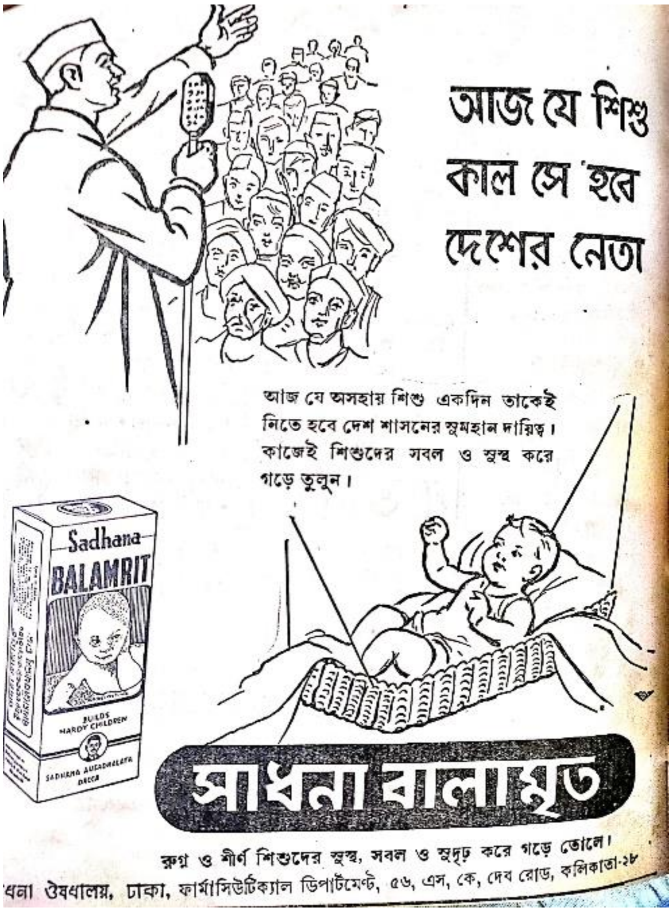

চিত্র ৪.৪ মৌচাক, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

বিজ্ঞাপনে যখন কোনও কথা বলা হয়, তার মূল লক্ষ্য থাকে বিক্রয় বৃদ্ধি করা। এইখানে জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করা হয় বিপণনের উপাদান হিসাবে। 'স্বদেশ' বিষয়টা সেই সময়ে তেমনই বিক্রয়যোগ্য একটি ইন্ধনে পরিণত হয়।

'স্বদেশী'র বিভিন্ন উপাদানকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি মাধ্যম ছিল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, মূলত কবি, লেখক, সমাজকর্মী, জননেতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতামত এবং ছবি ব্যবহার করা। পূর্বে বাসন্তী কটন মিলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বোধনী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, সে উদাহরণ আগে দেওয়া গেছে। স্বদেশী নির্মাণকেন্দ্র তাঁরা

চিত্র ৪.৫ প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

পরিদর্শনে আসতেন এবং নিজেদের মন্তব্য জানাতেন। সেই মন্তব্য কোম্পানিগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে দেওয়া হত।

১৩৪১ বঙ্গাব্দের *মৌচাক*-এ সাধনা বালামৃত নামের যে শিশু টনিকটির বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় বক্তৃতারত একজন নেতার ছবি। পোশাকের ধরন দেখে সহজেই আন্দাজ করা যায় ছবিটি জওহরলাল নেহরুর (১৮৮৯-১৯৬৪) অনুকরণে আঁকা। এই টনিকটি নিয়মিত সেবনে শিশুরা সবল, সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠবে। সেই শিশুর মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যতের দেশনায়ক হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমান প্রজন্মের অভিভাবকেরা, সন্তান বড় হয়ে দেশের নেতা হবেন, এমন স্বপ্ন সাধারণত দেখেন না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয়-সাতটি দশক জুড়ে অন্তত মাতা-পিতার চোখে দেশনায়কদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধার। স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েকটি দশকে সন্তানদের নাম স্বদেশ, স্বাধীন, সুভাষ, বিপ্লব রাখার চল ছিল।

স্বদেশী-পূর্ববর্তী সময় থেকে শুরু করে স্বদেশী যুগের একটি উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে ওঠে এইচ বোস এন্ড কোং। হেমেন্দ্রমোহন বোস (১৮৬৪-১৯১৬) এই সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর কোম্পানির 'কুন্তলীন' কেশ তৈল এবং 'দেলখোস' এসেন্স সে যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অন্য কোনও দেশীয় কোম্পানি এইচ বোসের প্রসাধনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতাতে আসতে পারেনি। প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে আজকের দিনে চিত্রতারকা অথবা মডেলদের ছবি ব্যবহার প্রায় বাধ্যতামূলক বিষয় হয়ে উঠেছে। সুন্দর স্বাস্থ্য এবং চেহারার অধিকারী, অধিকারিণীরা আলো করে থাকেন বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা। প্রসাধনের সঙ্গে জৌলুস বা 'গ্ল্যামার' বিষয়টির গভীর যোগ তৈরি হয়েছে। যদিও বিজ্ঞাপনে চিত্রতারকাদের ব্যবহার করা কোনও নতুন ঘটনা নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী দশক গুলি থেকেই তার চল। কিন্তু গত শতাব্দীর তিনের দশকের এই বিজ্ঞাপনটিতে দেখতে পাওয়া যায়, সেই সময়কার সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান তাদের 'সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈলাদি প্রসাধন সামগ্রী'র বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করছেন রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল নেহরু, লাজপত রায় এবং সুরেন্দ্রনাথের ছবি ও মন্তব্য। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নানান পণ্যের বিষয়ে তাঁর মতামত দিলে তা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মতিলাল নেহরু বা লাজপত রায়ের ছবি এবং তাঁদের মতামত প্রসাধনের বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের বিষয়টি অভিনব। তবে আজকের দিনে তা বিস্ময়ের জন্ম দিলেও, একদা, মূলত স্বদেশী যুগে, বহু বাঙালির আবেগ যেভাবে দেশনায়কদের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, তাতে দৃশ্যত তাঁরা চিত্রতারকাদের মতন তথাকথিত 'সুদর্শন' না হলেও ক্রেতার মনে অনুরণন সৃষ্টিতে সর্বাধিক উপযোগী ছিলেন।

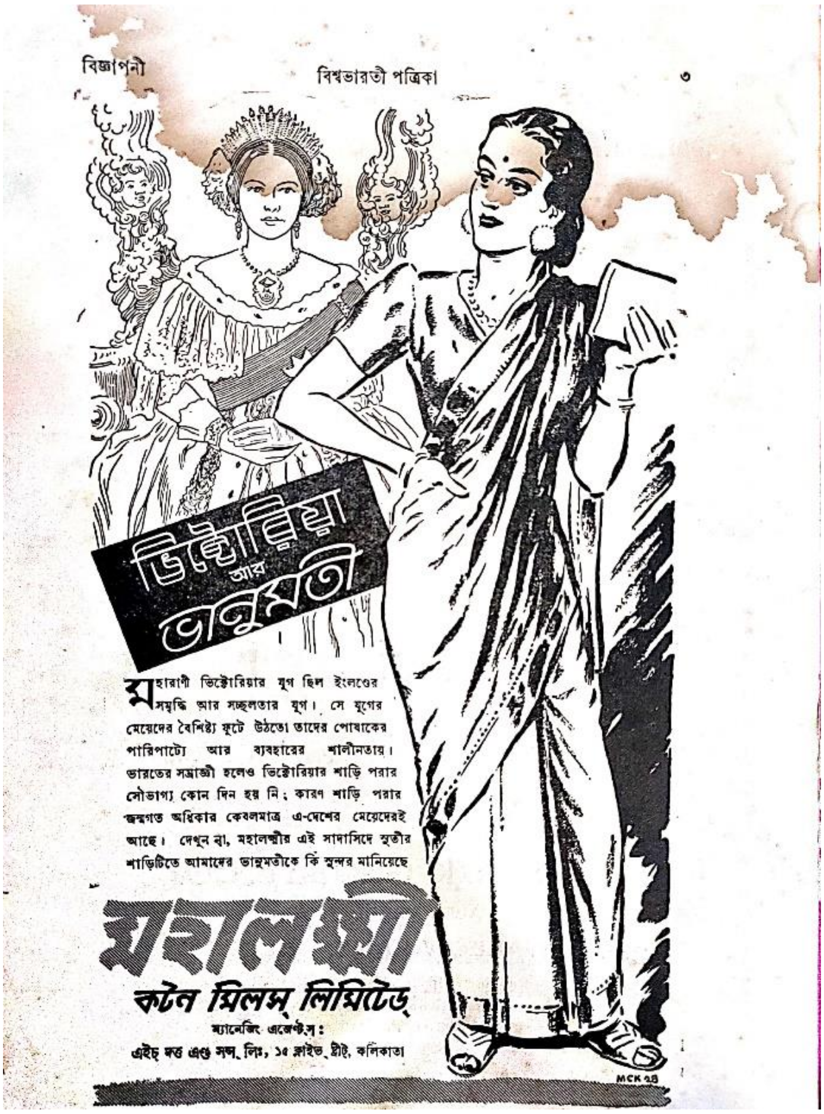

চিত্র ৪.৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৫০

বঙ্গলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি কাপড়ের কল স্বদেশী যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোদ্যোগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। তাদের বিজ্ঞাপনগুলিও হত অতীব চমৎকার। বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য, মূলত যে প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন, তাদের পণ্যই ব্যবহার করতে বলার পরিচিত যে পদ্ধতি, তার বাইরে গিয়ে অলংকরণ থেকে কপি সবদিক থেকেই কিছু বিজ্ঞাপন অসম্ভব মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। ‘মহালক্ষ্মী কটন মিলস’ তাদের পণ্যকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি সিরিজ বিজ্ঞাপন তৈরি করে। ‘ক্যাথারীন আর কৃষ্ণকুমারী’, ‘ভিক্টোরিয়া আর ভানুমতী’ এই বিজ্ঞাপনগুলি ছিল তার মধ্যে একটি সিরিজের। ‘ভানুমতী’, ‘কৃষ্ণকুমারী’ প্রভৃতি নামগুলিও লক্ষ্য করার মতন। নামগুলি যেন তুলে আনা হয়েছে ভারতীয় সাহিত্যের পাতা থেকে। এবং ঝরঝরে গদ্যে জানানো হয়েছে, ভিক্টোরিয়ার যুগ ইংলন্ডে সমৃদ্ধি, সচ্ছলতার যুগ হলেও, সে যুগে মেয়েদের পোশাকে পারিপাট্য এবং শালীনতা থাকলেও তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন ভানুমতীর ঈর্ষণীয় এবং আরামদায়ক পোশাকটির থেকে। যদিও ভিক্টোরিয়া ছিলেন ভারতের সম্রাজ্ঞী, তবুও মহালক্ষ্মীর শাড়ি তিনি পরতে পাননি, কিন্তু ভানুমতী এ দেশের সাধাসিধে মেয়েটি হয়েও কেমন সেজেছে মহালক্ষ্মীর শাড়িতে। সমগ্র বিজ্ঞাপনটি জুড়েই রয়েছে ভারতীয়ত্বের ঈঙ্গিত।

এই গবেষণাপত্রের ‘অর্থনীতি ও বাংলা বিজ্ঞাপন’ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে মহালক্ষ্মীর অপর সিরিজটি নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সিরিজটি মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজারে নির্মিত, যখন খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি জীবনধারণের প্রধান অবলম্বনগুলির অভাব দেখা দিয়েছিল এই বাংলায়। বিজ্ঞাপনে একটি পরিবারের ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, পুত্রসন্তান, কন্যাসন্তান সকলকে মহালক্ষ্মী প্রত্যেকের উপযোগী ভাষায় জানিয়েছে এই আকাল আর দুর্যোগের পরিস্থিতিতে তাঁরা যেন একটু বুঝেশুনে যত্ন নিয়ে তাঁদের শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি ব্যবহার করেন, কারণ কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো বাজার থেকে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উধাও হয়ে যাবে। তবে এই যুদ্ধের অন্ধকার কাটলে মহালক্ষ্মীই সকলের মনের মত কাপড় জামা উপহার দিতে পারবে। ততদিন যেন একটু সজাগ থাকেন সবাই।

এই বিজ্ঞাপনের নির্মাণের মধ্যে ছিল এমন এক বাঙালিত্বের স্বাদ, যা একুশ শতকের পাঠক-দর্শকদের বহু দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও আকৃষ্ট করতে পারে।

কাজল কালির বিজ্ঞাপন এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের লেখা সংশাপত্রটি বহুআলোচিত। যদিও বিজ্ঞাপনটি ইংরেজি ভাষায় এবং এই গবেষণাপত্রটির কাজ মূলত বাংলা বিজ্ঞাপনকে নিয়েই, তবুও রবীন্দ্রনাথ এবং ‘স্বদেশী’ এই দুইয়ের এমন চমৎকার মেলবন্ধন ঘটে যে বিজ্ঞাপনে, সেই বিজ্ঞাপন যে ভাষাতেই লেখা হোক না কেন, এখানে থাকা বাঞ্ছনীয়।

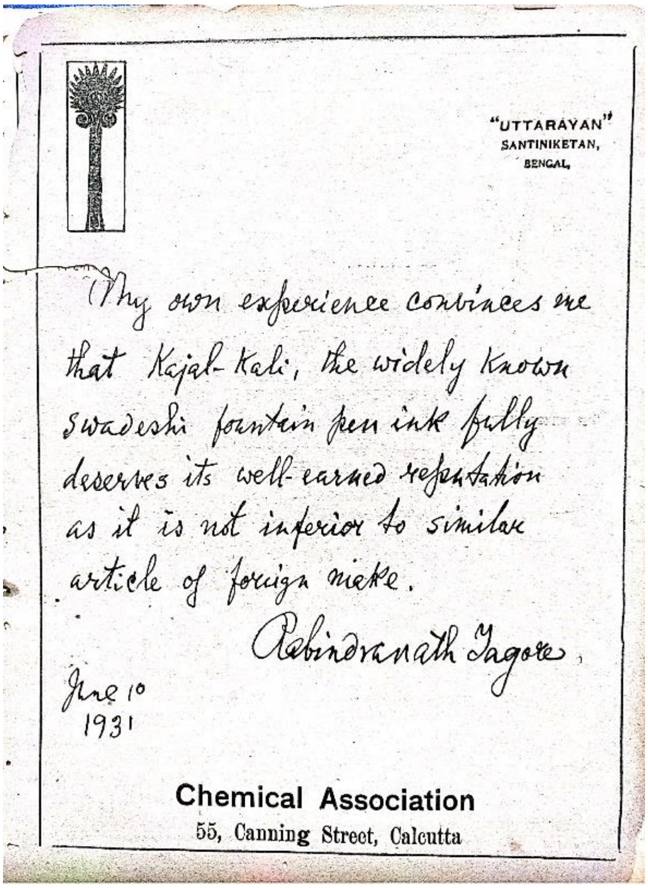
"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN,
BENGAL,

My own experience convinces me that Kajal-Kali, the widely known swadeshi fountain pen ink fully deserves its well-earned reputation as it is not inferior to similar article of foreign make.

Rabindranath Tagore

June 10
1931

Chemical Association
55, Canning Street, Calcutta

চিত্র ৪.৭ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৮

বিজ্ঞাপনটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে জানাচ্ছেন যে এই ‘স্বদেশী’ ‘কাজল-কালি’ সর্বাংশেই যে কোনও বিদেশী কালির সমগোত্রীয় হওয়ার যোগ্য। এই কালির জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে দেশনায়কদের ছবি ও মতামত বেশ আশ্চর্য বিষয় মনে হলেও, ঝর্ণাকলমের কালির বিজ্ঞাপনে কিন্তু কবির হাতে লেখা ছোট্ট প্রশংসাবাণীখানি বড়োই

উপযুক্ত ও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। কালির খরিদ্দাররা সাধারণত পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, এমনটাই আশা করা যায়। ফলে এই বিজ্ঞাপনটি তার ক্রেতাদের মুগ্ধ করার পক্ষে যথাযথ মনে হয়।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ‘স্বদেশী’ পণ্যের সংখ্যা ছিল অজস্র। সেই সমস্ত পণ্য নিয়ে বিজ্ঞাপনও তৈরি হয়েছে বহুবিধ। তার মধ্যে অল্প কয়েকটি বিজ্ঞাপন বেছে নেওয়া হল, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের বিষয়টিকে মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

পরের অংশে স্বাধীনতা পরবর্তী বিজ্ঞাপনগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং তৎসংলগ্ন স্বদেশের উপস্থাপনের থেকে, দেশভাগ এবং স্বাধীনতা-উত্তর বিজ্ঞাপনগুলির ধরনে কিছু পরিবর্তন হয়। দেশ এবং জাতীয়তাবাদের ধারণাকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হয় সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের স্বার্থে। বিজ্ঞাপন কীভাবে ধারণ করে রেখেছে সেই পরিবর্তনের চিহ্নগুলিকে, নির্বাচিত কয়েকটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে গবেষকের কাজ।

২.

১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের *যুগান্তর*-এর একটি মূলত বিজ্ঞাপনী পৃষ্ঠার ছবি পাশে রাখা হল। এর মধ্যে প্রধানত যে ধরনের বিজ্ঞাপন আছে, তার প্রতিটিতেই ধরা পড়েছে এক ধরনের আশা, উদ্দীপনার ছাপ।

এন, সি, কোলে এন্ড সন্স্, মন্ডল বার্লি ম্যানুফ্যাকচারিং, প্যারাডাইস স্নো, নদীয়া জুয়েলারী ওয়ার্কস থেকে বোরোলীন পর্যন্ত প্রতিটি সংস্থার বিজ্ঞাপনেই সেই স্বাধীনতা দিবসের নতুন ভোরের স্বপ্ন। আছে সেই সমস্ত মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, যাঁরা তাদের বীরত্ব, ত্যাগ এমনকি জীবনের বিনিময়ে এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা।

৬ যুগান্তর ১৫ই আগষ্ট ২৯শে শ্রাবণ

বন্দেমাতরম
নদীয়া জুয়েলারী ওয়ার্কস
১১০ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৩

খাঁটী পদ্মমধু

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে
বিনামূল্যে এক লক্ষ বোরোলীন বিতরণ!!

বোরোলীন

কুমার ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিমিটেড

হাঁপানী (দম)

ফাউণ্টেন-ইঙ্ক

সেন কেমিক্যাল ওয়ার্কস
সুবাসিত রাঙা-চরণ তরল আলতা

রাতে কাশবার দরকার নেই

'কারসোট ভেপার রাব'

Our Humble Homage
AMRUTANJAN LIMITED
মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই

বিনোদ এণ্ড কোং
১৩,ডালহৌসী স্কোয়ার (ইষ্ট)

স্বাধীনতা দিবসে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান
ব্যাপক কার্যসূচী

—শুভেচ্ছা—
লক্ষ্মী কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী লিঃ

—অভিবাদন—
ফ্রেণ্ডস্ কেমিক্যাল কোং
কলিকাতা

১৫ই আগষ্ট—
স্বাধীনতা- সূর্য্যের প্রথম আলোকপাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক জাতির ভবিষ্যৎ
প্যারাডাইস স্নো
প্যারাডাইস কসমেটিক ওয়ার্কস

১৫ই আগষ্টের আনন্দ-উৎসবে সকলের মনোরঞ্জন করবে
ফেয়ারডিল এম্পোরিয়াম্
২০, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জে, সুর এণ্ড কোং
জরিপ ও নকসার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা
৩, ডালহাউসী স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭
ভারতের স্বাধীনতা দিবস
এন, সি, কোলে এণ্ড সন্স্
প্রোপাইটার্স
মণ্ডল বার্লি ম্যানুফ্যাকচারিং, কলিকাতা।

চিত্র ৪.৮ যুগান্তর, ১৫ অগাস্ট, ১৯৪৭

বোরোলিন কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনে জানায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তারা "বিনামূল্যে এক লক্ষ বোরোলীন বিতরণ" করবে। এই বোরোলিন কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৯ সালে[১৯]। এর স্থাপনের পিছনে একটা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। প্রতিষ্ঠানের

জনক গৌরমোহন দত্ত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তও হন। দেশের অর্থনীতিকে সবল করে তোলার মাধ্যমে যেভাবে দেশমাতৃকার পূজা সম্ভব, সেই পথটিই বেছে নেন গৌরমোহন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এই যে গভীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতা এলো, প্রতিটি বিজ্ঞাপনে তার সুস্পষ্ট ছাপ। তারপর ধীরে ধীরে যত সময় গড়াতে লাগলো, দেশ নানান কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে শুরু করলো। পরবর্তী এক দশকের ইতিহাস বহুক্ষেত্রেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে আসে। একদিকে প্রবল উদ্বাস্তু সমস্যা, অপরদিকে নতুন দেশের আর্থিক-সামাজিক সংকট, অস্থিরতা দেখা যায়। ১৯৪৮ সালে, স্বাধীনতার পরবর্তী বছরেই স্বাধীন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়।

> এই দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটও দ্রুত পরিবর্তিত হয়। 'হিংসাত্মক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করার অভিযোগে' ১৯৪৮-এর ২৭ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি করা হয়। ১৯৫০-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের এক রায়ে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রকাশ্যে পার্টির কাজকর্ম শুরু হয়।[২০]

১৯৫৩ সালে এক পয়সার ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন হয়, গুলি চলে।

> পরিবহন সমস্যা আজকের মতো সেদিনও। তবে পয়সার মূল্য সেদিন অনেক বেশি। প্রতিবাদের প্রবণতাও। তা না হলে মাত্র এক পয়সার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে শহর কলকাতায় কী কান্ডই না ঘটেছিল ১৯৫৩ সালে। ক্রুদ্ধ জনতার তান্ডবে শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌরঙ্গি সেদিন এক রণক্ষেত্র। ট্রাম-বাস ভাঙচুর, লাঠি, বোমা, গুলি, বহু লোক আহত। সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল, পরিবহনে আর্থিক ক্ষতি কমানোর জন্য ভাড়া না বাড়িয়ে উপায় নেই। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বুঝিয়ে বলেছিলেন সে কথা। স্থির হয়, বাড়তি ভাড়া ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। কিন্তু যাত্রী সাধারণ তা মেনে নিতে রাজি নন। নাগরিকদের তরফে সভা সমিতি, বাদ প্রতিবাদ বিক্ষোভ কদিন ধরেই চলছিল। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ট্রাম যাত্রী সমিতি একটানা ৪২ দিন ধর্মঘটও করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট, ব্যাপক বেকারি ও ছাঁটাই এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার দ্রুত অবনতির মুখে ট্রাম কোম্পানি ও সরকারের এই সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের দুঃখের বোঝা আরও বাড়বে।
>
> শুধু কলকাতা নয়, সারা দেশের পরিবহনের ইতিহাসে এই আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে স্থান পেয়েছে।[২১]

আজকে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রায় প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে দ্রব্যমূল্য। খাবার-দাবার থেকে পেট্রল-ডিজেল সবকিছুরই দাম গগনচুম্বী। এখনকার এই প্রায়-প্রতিবাদহীন সময়ে দাঁড়িয়ে সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে মাত্র এক পয়সা মূল্যবৃদ্ধির পরবর্তী ঘটনা জানলে বিস্মিত হতে হয় বৈকি।

পাঁচের দশকের সূত্রপাতে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় গভীর খাদ্যসঙ্কট।

> ১৯৫০-এ কোচবিহার, ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলায় তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। '৫২ সালে খাদ্য সংকট আরও উদ্বেগজনক হয়। গ্রামের গরিব জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যের হাহাকার এত প্রকট হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'সংশোধনী রেশন' মারফত আমদানি খাদ্য থেকে কিছু কিছু গ্রামেও সরবরাহ করতে বাধ্য হয়। এইভাবে ১৯৫০-এ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন, ১৯৫১ সালে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন এবং ১৯৫২ সালে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টন গ্রামে সরবরাহ করা হয়। রেশনের চালে অখাদ্য কাঁকর মেশানো থাকত বলে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নামই হল 'কাঁকর মন্ত্রী'।[২২]

১৯৫২ সালে খাদ্যের সংকট চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছোলে আন্দোলন হয় তীব্র এবং কুচবিহারের মিছিলে পুলিশের গুলি চলে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ছিল টালমাটাল। ফলে দেশ সম্পর্কে যে আবেগ ১৯৪৭ এর আগে ছিল, তার চরিত্র খুব দ্রুতই পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে।

উত্তর-উপনিবেশ কালে জাতীয়তাবাদের যে চরিত্র, তা যে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ের থেকে বেশ খানিক আলাদা হবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের একটা স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে উত্থান হল। স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয়তার ধারণা এবং জনচেতনায় জাতীয়তাকে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হয়। এই কথাটা ব্যাখ্যা করতে গেলে, জাতি রাষ্ট্র (Nation State) সম্বন্ধে কিছু কথা প্রথমে বলে নেওয়া আবশ্যক। Nation State নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের নানান বক্তব্য, বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা সমীচীন নয়। Ernest Renan (১৮২৩-১৮৯২) হলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন তাত্ত্বিক। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'নেশন কী'[২৩] হল Renan এর 'What is a Nation'[২৪] অবলম্বনে লিখিত। সেই Renan থেকে শুরু করে Benedict Anderson[২৫] (১৯৩৬-২০১৫) হয়ে Hobsbawm[২৬] (১৯১৭-২০১২) পর্যন্ত অনেকেই 'নেশন' নিয়ে নানা কথা বলেছেন, যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার এখানে অবকাশ নেই।

John Mcleod (১৯৬৯-) তাঁর *Beginning Postcolonialism* বইয়ের ‘Imagining the nation : forging tradition and history’ অধ্যায়ে লিখছেন-

> Nations are not like trees or plants, they are not a naturally occurring phenomenon. Yet the nation has become one of the most important modes of social and political organisation in the modern world and we perhaps assume that they are simply ‘just there’. Most commentators agree that the idea of the nation is Western in origin. It emerged with the growth of Western capitalism and industrialisation and was a fundamental component of imperialist expansion. It is almost second nature these days to map the world as a collection of different nations, each separated from the other by a border. But borders between nations do not happen by accident. They are constructed, defended and (in too many tragic cases) bloodily contested by groups of people. It is important that we try to think about nations fundamentally as *fabrications.* As Ernest Gellner argues in his book *Nations and Nationalism* (Blackwell, 1983), “nations are not inscribed into the nature of things” (p. 49). Nations, like buildings, are planned by people and built upon particular foundations which also means that, like buildings, they can both rise and fall.
>
> So, the nation is primarily an idea.[২৭]

গাছ, লতা-গুল্মের জন্ম থেকে বৃদ্ধি, ইত্যাদি যেমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে, ‘নেশন’ জিনিসটা তেমন ‘প্রাকৃতিক’ নয়। মানুষ তার আবেগ দিয়ে বহুক্ষেত্রে ভেবে নিতে চান রাষ্ট্র হয়তো এভাবেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু যন্ত্রণার বিষয় হল মানচিত্রের মধ্যেকার বিভেদরেখাগুলি অর্থাৎ দেশের মাঝের সীমান্তগুলি ঘটনাচক্রে অথবা ভৌগোলিক ঘটনা পরম্পরায় তৈরি হয়নি। সেগুলি নির্মিত এবং কিছুক্ষেত্রে রক্তাক্তও বটে। এই সীমারেখাকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে মানুষের হাতে মানুষের রক্ত কম ঝরেনি।

গাছের মতন না বলে, বরঞ্চ বলা ভালো, ‘নেশন’ বিষয়টা হল অনেকটা অট্টালিকার মতন। অট্টালিকা যেমন মানুষই নির্মাণ করে, মানুষই তাকে সাজিয়ে তোলে, তা কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এবং সেই কারণেই তার

সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ইতিহাস আছে। 'নেশন'-এর নির্মাতাও তেমনই মানুষই। তারাওই তার নির্মাণ করে, তার আকৃতিতে পরিবর্তন আনে, ইতিহাসে বারবার 'নেশন'-এর চেহারা, আকৃতি, সীমারেখা, সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটে। এবং অট্টালিকার মতই বারেবারে তার উত্থান-পতনের ইতিহাস চলতে থাকে।

'নেশন স্টেট' সত্যিই কৃত্রিম একটা সংগঠন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষের ই দুটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং নাগাল্যান্ড। কিন্তু এই রাজ্যের বাসিন্দা এবং নাগাল্যান্ডের একজন মানুষ একই জাতিরাষ্ট্রের অংশ হলেও, একে কোনও প্রাকৃতিক উদাহরণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। দুই জায়গার সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্য, পোশাক, ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার কিছুরই মিল নেই। কোনও মিলের দ্বারাই দুই অঞ্চলের মানুষেরা মিলে নেই। কিন্তু তারা একই 'নেশন'-এর অংশ, মিলে থাকা যেখানে অত্যন্ত জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

Hobsbawm বলছেন-

> Entirely new symbols and devices came into existence as part of national movements and states, such as the national anthem (of which the British in 1740 seems to be the earliest), the national flag (still largely a variation on the French revolutionary tricolour, evolved 1790-4), or the personification of 'the nation' in symbol or image, either official, as with Marianne and Germania, or unofficial, as in the cartoon stereotypes of John Bull, the lean Yankee Uncle Sam or the 'German Michel'.[২৮]

Mcleod আরও বলেন-

> It is often pointed out that a sense of mutual, national belonging is manufactured by the performance of various *narratives, rituals* and *symbols* which stimulate an individual's sense of being a member of a select group.[২৯]

আমরা একই 'নেশন'-এর অন্তর্গত এই বোধটাকে নির্মাণ করি। নির্মাণ করার মাধ্যম হয়ে ওঠে কিছু কাহিনি, আচার-অনুষ্ঠান, চিহ্ন; যেগুলির দ্বারা মানুষ নিজেদের একই 'নেশন'-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারে।

এই 'ন্যারাটিভ' অথবা বর্ণনা, কাহিনিগুলিই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে মিশে থাকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূল কথাটি। এরপরে আসে 'rituals' এবং 'symbols' এর কথা। এই চিহ্ন বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ,

তা নানানরকম হতে পারে। জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এই ‘symbol’ এর মধ্যে পড়ে। ঐ পতাকায় একটি গোটা দেশের মানুষ, তাদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুন, তারা মিলে আছেন, এই আবেগটা কাজ করে ‘নেশন’ এর নির্মাণের ক্ষেত্রে। বর্তমান সময়ে ক্রিকেট খেলা ওই চিহ্নের-ই একটি অংশ হয়ে ওঠে। ভারতের ক্ষেত্রে এই কথাটিকে আমরা নিজেদের সঙ্গে মেলাতে পারবো। ভারতীয় দর্শক, তাঁরা যে অঞ্চলেরই অধিবাসী হন না কেন, প্রিয় ক্রিকেটার ভালো খেললে আনন্দ হবেই। ‘নেশন’-এর কৃত্রিমতা ধরা পড়ে তখন যখন কোনও একটি বিশেষ রাজ্যের ক্রিকেট খেলোয়াড় দল থেকে বাদ পড়লে, সেই রাজ্যের বাসিন্দাদের জাতীয়তাবাদের ধারণার উপরে তীব্রতর হয়ে ওঠে রাজ্য বা অঞ্চলভিত্তিক আবেগের ধারণা। সেই সময়ে জাতীয় দলটির জয়-পরাজয়ের থেকে তাঁদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে ভাষার আবেগ, অঞ্চলের আবেগ। এই ঘটনার মধ্যে খুব অস্বাভাবিকতা নেই। কারণ ভাষা জিনিসটা তুলনামূলকভাবে অনেক কম কৃত্রিম। ফলে ভাষার প্রতি আবেগ জিতে যায়।

আরেকটি জায়গায় মিলে থাকতে পারেন একটি ‘নেশন’-এর মানুষ, যেখানে তাঁরা চিহ্নিত করতে পারেন তাঁদের ‘common enemy’ বা সাধারণ শত্রুকে। যখন ভারত ছিল ইংরেজদের শাসনের অধীনে, তখন সেই শাসকরা ছিল ভারতের সাধারণ শত্রু। উত্তর-উপনিবেশকালে যতবার বিভিন্ন যুদ্ধ হয়েছে, তখন জাতীয়তাবাদ অনেক তীব্রভাবে জ্বলে উঠেছে।

১৯৪৭ সালের ঠিক পরবর্তী সময়ে আমাদের যে ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদের স্মৃতি, তা রাতারাতি মন থেকে মুছে যায়নি। সেই জাতীয়তার ধারা আমরা পরবর্তীতে বহন করেছি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেয়েছি জাতীয়তার নতুন ধারা। যুদ্ধের সময়ে জাতীয়তার প্রতাপ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেলেও প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের জাতীয়তার জোয়ার স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অনেক কমে আসতে শুরু করে। বিজ্ঞাপনেও এই ঘটনাগুলির প্রভাব পড়ে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ঘটনা প্রায় একইসঙ্গে ঘটে। তার মধ্যে মানুষের মধ্যে তীব্রতর অভিঘাত রেখে যায় যে ঘটনাটি, তা হল দেশভাগ। দেশভাগ কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। মুষ্ঠিমেয় মানুষের সিদ্ধান্তে একটি অঞ্চল থেকে আরেকটি অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল কাঁটাতারের মাধ্যমে। একই অঞ্চল, পাড়া, বাড়ির মধ্যে দিয়ে নির্দয়ভাবে চলে যায় কাঁটাতারের বেড়া। আগেরদিন অবধি একটি দেশে বংশ পরম্পরায় কাটানো মানুষটি যে জায়গাকে নিজের দেশ বলে জ্ঞান হওয়ার মুহূর্ত থেকে জেনে এসেছেন, তাঁকে পরেরদিন থেকে নিজের দেশে বিদেশী হয়ে পড়তে হয়। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের কারণে মৃত্যুকে পাথেয় করে বেরিয়ে পড়তে হয় পথে। ফেলে আসতে হয় ঘর-বাড়ি, জমি-জমা, বাগান, পুকুর আর আজন্ম-লালিত স্মৃতি।

কোনও মতে প্রাণ নিয়ে নতুন দেশে পৌঁছোলেও সেখানে সেসময় তাঁরা উদ্বাস্তু। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রাথমিক সংস্থানটুকুও হারাতে হয় একদা সচ্ছল পরিবারের বহু মানুষকে। এমত পরিস্থিতিতে অকস্মাৎ প্রাপ্ত নতুন দেশটিকে আপন ভাবতে পারা কতখানি অসম্ভব তা আন্দাজ করা যায়। আর এইখান থেকেই 'নেশন'-এর কৃত্রিমতা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। একদিকে দেশভাগের গভীর ক্ষত সামলাতে হচ্ছিলো প্রতিনিয়ত, অন্যদিকে টুকরো টুকরো দেশ তখনও জুড়ে জুড়ে নতুন দেশ তৈরির প্রক্রিয়া চলছিল। জুড়ছে চন্দননগর, সিকিম, গোয়া, পন্ডিচেরী। ফলে 'নেশন'-এর ধারণাটা কত খন্ডিত, তার ব্যক্তিগত স্মৃতি সেসময় মানুষের মনে টাটকা। নিজের প্রাণপ্রিয় 'দেশ'টি দেশপ্রেমের বাউন্ডারি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ছে অন্য 'দেশ'।

চিত্র ৪.৯ সুন্দরম্‌, তৃতীয়-দ্বাদশ সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ, ১৩৬৭

দেশভাগ পরবর্তী পরিস্থিতি যখন সামগ্রিকভাবে দোদুল্যমান, খন্ডিত, রক্তাক্ত; সেই সময়ে দেশের মধ্যে ঐক্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়া ছিল সবচেয়ে জরুরি ঘটনা। অনেক দূরের রাজ্যগুলি, যেখানকার মানুষদের সঙ্গে এ রাজ্যের মানুষের দূরত্ব বহু যোজনের, সেই রাজ্যের বাসিন্দার সঙ্গেও যাতে এখানকার মানুষ একাত্মতা অনুভব করেন, সেই কাজটি বিজ্ঞাপন করেছিল। স্বাধীনতা-

পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনগুলিতে যেমন ছিল দেশনায়কদের মতামত; স্বাধীনতা-পরবর্তীতে সেই ধরনের বিজ্ঞাপন বিরল হয়ে আসে। তার মধ্যে সচেতনভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয় ঐক্য এবং সমন্বয়ের বাণী। স্বাধীন ভারতে এই পথটি গ্রহণ করতেই হত। এ দেশের প্রতিটি মানুষ একই 'নেশন'-এর অংশ, তারা কোথাও না কোথাও এ দেশে দীর্ঘকাল বহমান ধারারই উত্তরাধিকার বহন করছে, সে কথা প্রতিটি মাধ্যমকে ব্যবহার করে ঘোষণা করা নতুন দেশ গঠনের অন্যান্য প্রকল্পগুলির মধ্যে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ছিল। রেলওয়ে এবং ট্যুরিজম, উভয়েই যেমন পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তেমনই 'নেশন'-এর ধারণাকে দৃঢ় করে তুলতে বিজ্ঞাপনেও এদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞাপনের একেবারে শুরুর বাক্যেই বলা আছে মূল কথাটুকু, "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের-বহুর মধ্যে সমন্বয় সাধনের সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি আর শিল্পকলার মধ্যে..." স্পষ্ট ঘোষণা করা হয় ভিন্ন ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতির যে বিপুল সম্ভার ধারণ করে আছে এই দেশ, তাদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাক, ভাতৃত্বের, ঐক্যের সূত্রটি দৃঢ়। সেই দাঢ্য বজায় রাখার কাজটি প্রতিনিয়ত দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে পূর্ব রেলওয়ে, যাতে ভৌগোলিক দূরত্ব এই বন্ধনের পথে কখনো বাধা হয়ে না আসে।

বিজ্ঞাপনে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্রে সাজানো নবোদ্ভূত দেশের গুরুত্বপূর্ণ নৃত্যের ধারাগুলির উল্লেখ করা হয়। সুন্দর কপির সঙ্গে ছবিটিও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য, যেখানে বড় করে আঁকা আছে দক্ষিণভারতের কথাকলি নৃত্যশিল্পীর ছবি। বহুবিধ মানুষের বিচিত্র নৃত্যকৌশল রেলওয়ের মাধ্যমে আর অজানা থাকে না।

লেখার সূত্রেই অল্প আগে উঠে এসেছিল নাগাল্যান্ডের কথা, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সংস্কৃতি, জীবন, যাপন, খাদ্যাভ্যাস সবকিছুর সঙ্গেই যে অঞ্চলের মানুষের বিস্তর তফাৎ। রেলওয়ে যেভাবে তাদের বিজ্ঞাপনে বহন করেছে দেশের বিবিধ অঞ্চলের সংস্কৃতির চিহ্ন; তেমনই আরও বহু সংস্থা তাদের নিজস্ব বিজ্ঞাপনকে সাজিয়ে তুলেছে বাঙালি পাঠকদের নানান জানা-অজানা তথ্যে, যে

চিত্র ৪.১০ সুন্দরম্, চতুর্থ-দ্বাদশ সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৬৯

তথ্যের পরিবেশন ছিল অতীব সুদৃশ্য। এই বিজ্ঞাপনের একটি সিরিজ তৈরি করে ডানলপ কোম্পানি। বিজ্ঞাপনের অলংকরণের দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলি। কেবলমাত্র নাগাল্যান্ডের 'স্প্রিং ডান্স' ই নয়, গুজরাটের 'গরবা' নাচ, তাঞ্জোরের 'ডামি হর্স'-এর নাচ, ত্রিবাঙ্কুরের 'ডান্স অফ কনসেন্ট' ইত্যাদি স্থানীয় অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যাতে এ রাজ্যের পাঠক পরিচিত বিশেষভাবে হতে পারেন এ দেশেরই নানান অঞ্চলের অধিবাসীদের নানান জমকালো সংস্কৃতির সঙ্গে। যে সাংস্কৃতিক প্রথা দীর্ঘদিন ধরে সেই সব অঞ্চলের মানুষ বহন করে চলেছেন। সঙ্গে দেওয়া আছে সেই নাচের ইতিহাস ও তার উপস্থাপনের বর্ণনা এবং একটি ছোট সহজ মানচিত্রের সাহায্যে সেই অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করা আছে। পড়শিদের এই আনন্দানুষ্ঠানের অংশ হতে পারেন যাতে অন্য রাজ্যের মানুষজন, সেই পথটিই সুগম করে ডানলপ। বিজ্ঞাপনের সিরিজটির কপি ইংরেজিতে লেখা হলেও একদা বাংলা পত্রিকাতে এই বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশিত হবার কারণে এখানে ব্যবহার করা হল। রেলওয়ের মতনই এই বিজ্ঞাপনগুলিতেও বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরা হচ্ছে। পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়। প্রাচীন, গৌরবময় ঐতিহ্যকে খুঁজে তা সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপনের ধারাটি বিজ্ঞাপনের মধ্যে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও বহমান ছিল। বিজ্ঞাপনের স্বল্প পরিসরের মধ্যেও

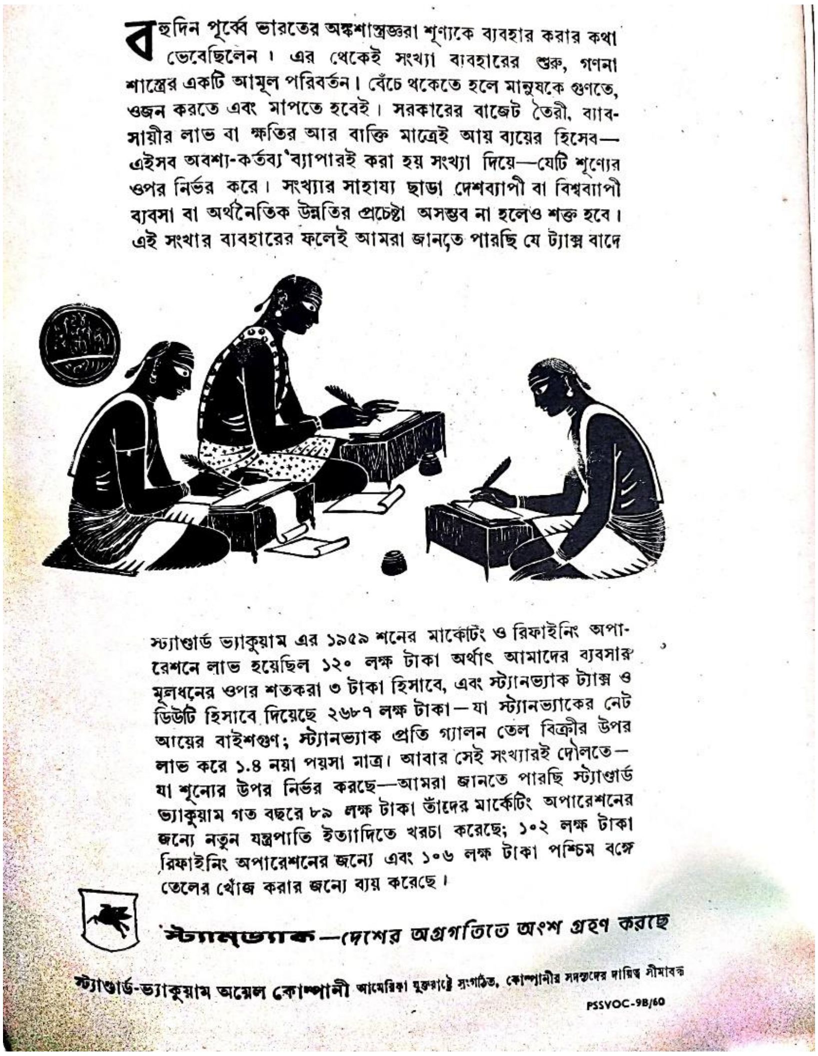

চিত্র ৪.১১ সুন্দরম্‌, চতুর্থ-দ্বাদশ সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৬৯

ছবি সহযোগে কাহিনিগুলিকে সাজিয়ে তোলা হত। স্ট্যানভ্যাক অর্থাৎ ‘স্ট্যান্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী’র বিজ্ঞাপনগুলি (চিত্র ৪.১১) ছিল এইরকম। যাদের কোম্পানির নামের পাশে লেখা থাকতো- “দেশের অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করছে”। লক্ষ্যণীয়, বিজ্ঞাপনটি দেশ স্বাধীন হবার প্রায় এক দশকেরও বেশি পরের। প্রাচীন ভারতের অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞরা করেছিলেন শূন্যের ব্যবহার, এই দেশেই প্রচলিত ছিল ‘পবিত্র’ ‘আশ্রম’ প্রথা, ঐতিহ্যবাহী কোণারকের মন্দির স্থাপন করেছিলেন এই দেশেরই সুদক্ষ সহস্রাধিক শ্রমশিল্পী- ইত্যাদি নানান প্রাচীন ইতিহাসকে সুখপাঠ্য রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে পাঠক-দর্শকের সামনে। তৈরি হয়েছিল বিজ্ঞাপনের সিরিজ। নিপুণ ছবির ব্যবহার পাঠকদের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল নিঃসন্দেহে। এবং এই সমস্ত প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সুকৌশলে জুড়ে দেওয়া হত স্ট্যানভ্যাকের কৃতিত্ব। জানানো হত তাদের কর্মীরাও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আশ্রম পদ্ধতিতে শিক্ষিত, যে ভারতের গণিতজ্ঞরা একদা শূন্যের আবিষ্কার করেছিলেন, সেই গণনার মাধ্যমেই কোম্পানি দেখিয়ে দেয় তার লাভ ক্ষতির হিসাব অথবা সবিনয়ে জানায় তাঁদের কর্মীরাও কোণারকের শ্রমশিল্পীদের মতই দক্ষ এবং পরিশ্রমী। প্রতিটি বিজ্ঞাপনেই দেশীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজটি ত্রুটিহীনভাবে ঘটে।

বর্তমানকালে ‘নেশন’-এর ধারণাকে সবল করতে ক্রিকেট খেলা, সিনেমা ইত্যাদি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মূলত নানান হিন্দি ছবিতে জাতীয়তাবাদকে আবেগের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী দশকগুলিতে জাতীয়তাবাদের ধরন আজকের মত ছিল না কিন্তু বিবিধের মাঝে মিলনের

চিত্র ৪.১২ চতুরঙ্গ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৮

মহামন্ত্রটি মানুষকে বারেবারে দেখিয়ে দেওয়ার কাজ চলছিল।

১৩৬৮ বঙ্গাব্দে, ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী’র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ভারতের হ্যান্ডলুম বোর্ডের বিজ্ঞাপনটির মধ্যে দেখা যায় তামিল ভাষায় লেখা পল্লীগীতি (চিত্র ৪.১২)। পাশে যদিও বাংলা ভাষায় তার তর্জমা করা থাকে,

তবুও বাংলা বিজ্ঞাপনে তামিল সংস্কৃতির যে ছাপ, তা আজকের দিনে দুর্লভ। সেই সময়ে মানুষের মনে এই নেশনগত ঐক্যের বোধটি জাগরুক করতে এই ধরনের বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘ট্যুরিস্ট ব্যুরো’ ‘নিজের দেশকে চিনুন’ শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গের ভ্রমণোপযোগী স্থানগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে কালীঘাটের পটের ছবি।

চিত্র ৪.১৩ কবি ও কবিতা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৬৮

আজ একুশ শতকের দুটি দশক অতিক্রম করে, স্বাধীনতার পরে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম যখন পশ্চিমবঙ্গের জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন, সেই সময়ে শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং, বিষ্ণুপুর, কালীঘাট ইত্যাদি ভ্রমণপিপাসুদের কাছে

একইরকম আগ্রহের স্থান হলেও; সেই জায়গাগুলি তাঁদের কাছে আর অজানা নয়। কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী কয়েকটি দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অগণিত মানুষকে অথবা নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে চাওয়া এখানকার বাসিন্দাদেরকেই, তাদের ঘরের কাছের একান্ত ‘দেশ’টিকে চিনিয়ে দেওয়ার বিষয়টি মনোগ্রাহী তো বটেই, অতীব প্রয়োজনীয় বলেও বোধ হয়।

নিজেদের ‘নতুন’ ‘দেশ’টির প্রাচীন ঐতিহ্য, পুরাতন প্রথা, স্থানীয় সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিতি ঘটে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা বিজ্ঞাপনগুলিকে লক্ষ্য করলে।

এমনকি সিগারেট-এর মতন পণ্যের বিজ্ঞাপনে, যেখানে দেশের রীতি-নীতি, বিশ্বাস, বৈচিত্র্যের কথা বর্ণনা না করলেও পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পথে কোনও বাধা সৃষ্টি হবার কথা নয়; যে পণ্যের বিজ্ঞাপনে পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বময় পুরুষ এবং তাঁদের দেখে মুগ্ধ নারীদের ছবি থাকাই দস্তুর- সেই বিজ্ঞাপনেও শোনা গেছে দেশের কথা। বাংলার বহুমুখী সংস্কৃতির টুকরো টুকরো ছবি ধারণ করে রেখেছে ‘গোল্ডফ্লেক’ ইত্যাদি সিগারেট কোম্পানিও।

চিত্র ৪.১৪ সন্দেশ, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭০

ধর্মের ভিত্তিতে যে দেশ বিভক্ত হয়, সেই দেশের সংবেদনশীল মানুষ এই বিষয়টি নিয়ে যে বিশেষভাবে সচেতন হবেন; গুরুত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী সংস্থার বিজ্ঞাপনও যে সেই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার কথা জানান দিয়ে যাবে তাদের পাঠকদের কাছে, তা প্রত্যাশিত। টাটা স্টীল দীর্ঘদিন ধরে বিখ্যাত শিল্পীর ছবি সমন্বিত, অতীব সুখপাঠ্য নানান বিজ্ঞাপন তৈরি করে এসেছে।

তৈরি হয়েছে বিবিধ সিরিজ। জামসেদপুরের ইস্পাত নগরীর কর্মচারিদের দক্ষতার ছবি স্পষ্ট হয়েছে সেই বিজ্ঞাপনগুলি থেকে।

সেই অজস্র বিজ্ঞাপনমালার থেকে একটিমাত্র বিজ্ঞাপনকে বেছে নেওয়াও এক কঠিন কাজ।

তবু স্বাধীন ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার জরুরি বাণীটিকে ধরে রেখেছে যে যে বিজ্ঞাপন তারই একটিকে বেছে নেওয়া হল (চিত্র ৪.১৪)।

জামসেদপুরের ইস্পাত কারখানায় একটি প্রকান্ড লেডল্ পঁচাত্তর টন গলানো লোহা সহ মাথার উপরের ক্রেন থেকে ছিঁড়ে পড়ে গেলে, রাজমিস্ত্রীরা নিরাপদ দূরত্বে থাকলেও গভীরভাবে আহত হন। সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার মধ্যে, যখন কেবল আর একটি লোককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সেই সময়ে, মৃত্যুর অতি নিকটে দাঁড়িয়ে এক হিন্দু রাজমিস্ত্রী নিজে হাসপাতালে যেতে অস্বীকার করেন, জোর দিয়ে বলেন, "হামারে ভাই কো লে যাও"।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের মুসলমান ভাইটির জন্য যিনি এমন অনায়াসে জীবন দিয়ে দিতে পারেন, তাঁর সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব, মানবতার কাহিনি টাটা স্টীল স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে বিশেষভাবে জানান দিয়ে যায়। টাটা স্টীলের এই বিজ্ঞাপন আজ বেশ কয়েকটি দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও সমান প্রাসঙ্গিক এবং মর্মস্পর্শী।

স্বাধীনতা পরবর্তী নবোদ্ভূত দেশটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বপ্ন যতবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, 'দেশ'-এর প্রতি আবেগের জায়গাটিও ততবার আহত হয়েছে। তবে দেশানুরাগের ক্ষীয়মাণ প্রদীপটি জ্বলে উঠেছে স্বাধীনতা-পরবর্তী এক-একটি যুদ্ধের ঘটনায়।

বিজ্ঞাপনেও সেই হঠাৎ জ্বলে ওঠা দেশপ্রেমের ছবি ধরা পড়েছে।

ছয়ের দশকের শুরুতে, ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে দীর্ঘ ছায়া ফেলে যায়।[৩০]

চিত্র ৪.১৫ চতুরঙ্গ, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭০

চীন যুদ্ধের সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে তৈরি হয় নানান বিজ্ঞাপন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার ডাক দেওয়া হয়। সদ্য-প্রাপ্ত স্বাধীনতা যাতে ফের হাতছাড়া না হয়ে যায়, এই লড়াই হয়ে ওঠে তেমনই জানকবুল।

লক্ষ্যণীয়, বিজ্ঞাপনে দেখা যায় এক চৈনিক বিপুলাকৃতি দস্যুকে, সম্ভবত হাতে যার মুগুর। কিন্তু সেই চীনা দানবকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরাস্ত করছেন যারা, তারা আমার-আপনার মতন, আমাদেরই পাড়াতেই হয়তো তাঁদের বসবাস। ধুতি-হাফশার্ট পরে যাঁরা নিয়মিত বাজার করতে যান, অথবা অফিস যাওয়ার সময়ে শার্ট-প্যান্ট; তাঁরা আর কেউ নন, এই আমরাই, সমবেত লড়াইয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কুপোকাৎ করছি শত্রুকে।

বিজ্ঞাপনের কপি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট। ছবিটি কিছুটা কার্টুনধর্মী। কিন্তু একটি ছবিই পরিস্থিতিকে প্রতিরোধের পূর্ণ বার্তা দিতে সক্ষম।

ছয়ের দশকে যে একাধিক যুদ্ধ হয়েছে, সেই যুদ্ধ চলাকালে বারে বারে ভারত সরকারের বিজ্ঞাপনে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। একদা ইংরেজদের এই ভারতীয়রাই প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন, আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করবার সময় এসেছে, দেশ-রক্ষার্থে জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছে। উনিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের শারীরিকভাবে সবল যুবকদের ভারতের প্রতিরক্ষায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়, কেবলমাত্র সেইভাবেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব, এই কথায় উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস চলেছে বিজ্ঞাপনগুলিতে।

কেবলমাত্র পুরুষরাই দেশের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন না, স্বদেশী অধ্যায়ে যেভাবে বীর নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন দেশের কাজে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যখন পুনরায় স্বাধীনতা টালমাটাল, তখন সেই নারীদেরকেও এগিয়ে আসতে বলা হয় দেশের কাজে। বিজ্ঞাপনের ছবিতেও থাকে নারীর মুখ, বলা হয়, বিশেষত তিনি যদি সন্তানবিহীন এবং নির্দায় হন, তাহলে এই মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসের অস্থায়ী কমিশনের কাজের জন্য তিনি উপযুক্ত।

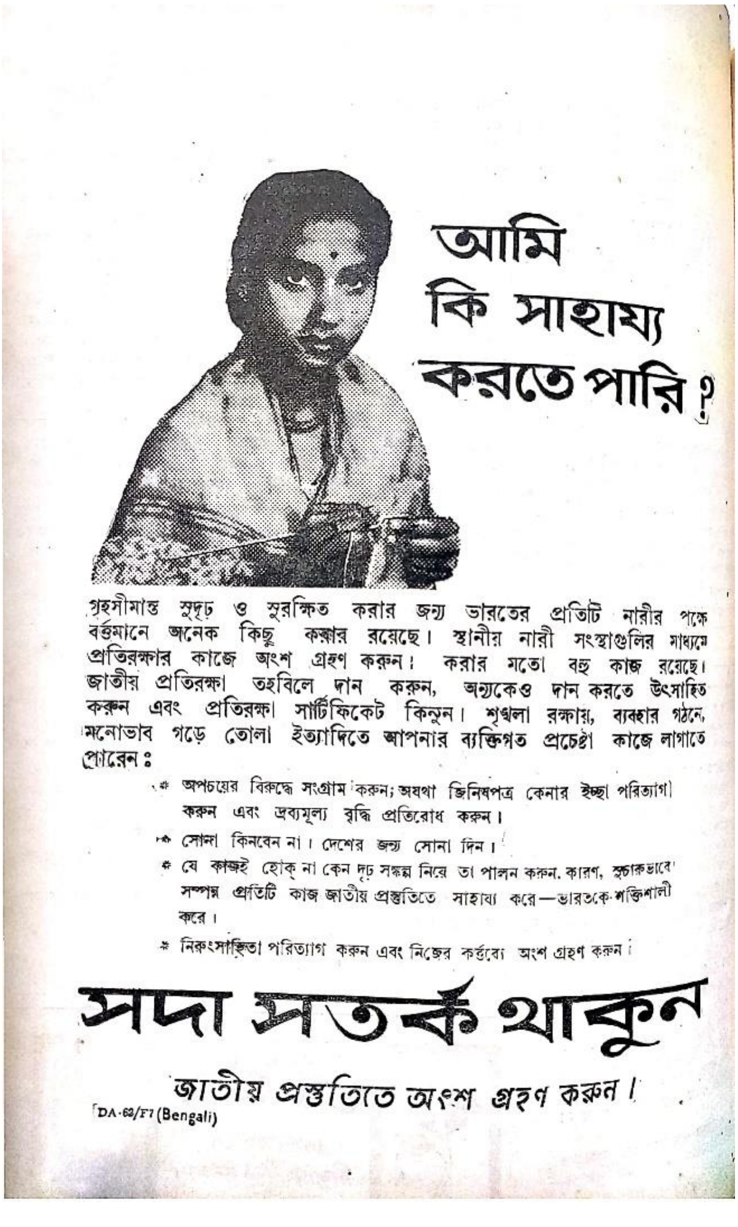

চিত্র ৪.১৬ দেশ, ৩০ বর্ষ, ১৪-২৬ সংখ্যা, ১৩৬৯

কিন্তু কেবলমাত্র নির্দায়, সন্তানবিহীন মহিলারাই নন, যে মহিলারা স্বামী-সন্তানকে প্রতিদিন রক্ষা করেন, তাঁদেরও অনুরোধ করা হয় দেশকে সাহায্য করতে। এই বিপদের মুহূর্তে প্রতিটি সাহায্যই মূল্যবান। পরিবারের রক্ষাকর্ত্রী এসময়ে কীভাবে রক্ষা করতে পারেন তাঁর

‘গৃহসীমান্ত’ , সেই কথাই সহজ ভাষায় বিজ্ঞাপনে বলা হয়।

অপচয়ে বাধা দিতে অনুরোধ করা হয়, বারণ করা হয় সোনা কিনতে, তার পরিবর্তে আবেদন করা হয় দেশের জন্য সোনা দান করতে।

যুদ্ধের সময়ে দেশের সরকারের কাছে এই বিজ্ঞাপনগুলি প্রত্যাশিত।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে বাটা কোম্পানি একটি বিজ্ঞাপন করে। যুদ্ধ বিষয়ে কোনও গুরুগম্ভীর মতামত সেই বিজ্ঞাপনে না থাকলেও, এবং বিজ্ঞাপনটি কিশোরপাঠ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও যুদ্ধের ঝাঁঝটুকু ছিল ষোলআনা।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, মুষ্ঠিবদ্ধহাত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জুতো হল বাটা কোম্পানির জুতো। যুদ্ধের ধকল সইতে যে সর্বতভাবে প্রস্তুত।

চিত্র ৪.১৭ সন্দেশ, মে, ১৯৬৫

কখনো পাঠককে আবেগবিহ্বল স্বরে, কখনো বা স্পষ্ট কথায়, আবার কখনো এমন অতি অল্প একটি-দুটি বাক্যে দেশরক্ষার কাজটিকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রভাবিত করেছে বিজ্ঞাপনগুলি। স্বাধীনতা পরবর্তী বেশ কয়েকটি দশক ধরে নিয়মিতভাবে ভারতবাসীকে শরীরচর্চায় উৎসাহিত করা হয়েছে। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে ‘বীরত্বে বাঙালী’, ‘ব্যায়ামে বাঙালী’ ইত্যাদি বই লেখা হতে থাকে। খেলাধূলার চর্চার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের যোগসূত্র বহু পূর্বের।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোকে একটি গঠনমূলক বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করেন ইংরেজ শাসকরাই। ফুটবলও ছিল তেমনই একটি খেলা। উনবিংশ শতাব্দীতে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) কিছু বছর পূর্বে প্রথম ফুটবল খেলেন ইংরেজরা। ক্রমে বাঙালি তরুণ-যুবকদের মধ্যেও খেলাটির

বিষয়ে উৎসাহ তৈরি হয়। পরবর্তীকালে সাহেবদের সঙ্গে খেলায় যারপরনাই হার হয়েছে বাঙালিদের। কিন্তু সেই ইতিহাসই একদিন বদলে যেতে শুরু করে।

অভীক চট্টোপাধ্যায় তাঁর "কলকাতা ফুটবল ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ" প্রবন্ধে লিখছেন,

> ১৮৯২ সালে, এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়ে দিল এই শোভাবাজার দল। প্রথম কোনো ভারতীয় দল হিসেবে, ব্রিটিশ ফৌজি দলকে হারিয়ে দিল এই ট্রেড্‌স্ কাপের একটি খেলায়। সেই থেকেই শুরু হল মানসিকতার পরিবর্তন। বাইরের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মতোই মাঠেও ব্রিটিশ ফুটবল দলকে, অত্যাচারী বিদেশি শাসকের দল হিসেবে দেখতে শুরু করল দেশীয় ক্লাবগুলো।[৩১]

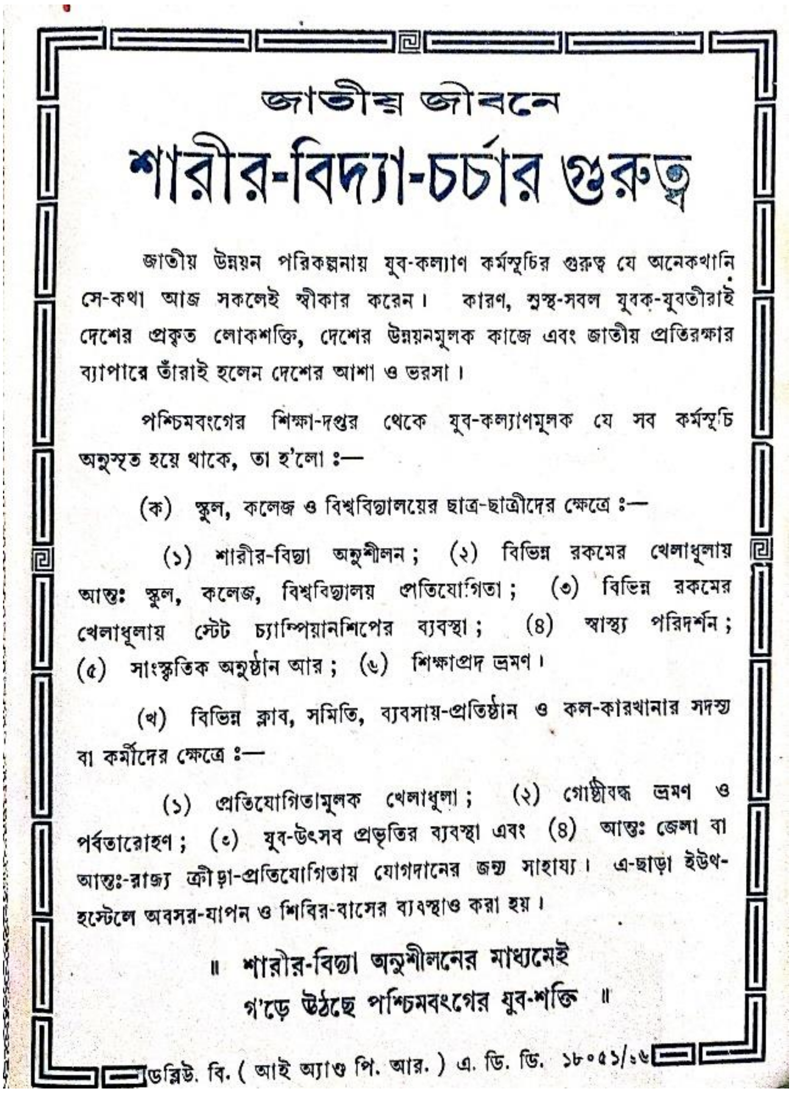

চিত্র ৪.১৮ বার্ষিক শিশুসাথী, ১৩৭৩

দেশ যখন ইংরেজ শাসকের অধীনে, তখন খেলাধুলার ক্ষেত্রটিতেও বাঙালি খেলোয়াড়রা তাঁদের প্রতিপক্ষ ইংরেজদের কেবলমাত্র ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিপক্ষ ভাবতে পারেননি। দেশ যাদের হাতে পরাধীন, তাদের সঙ্গে খেলার লড়াইয়ে জয়যুক্ত হওয়া যেন দেশমাতৃকারই জয়; এই মনোভাব তাঁদের মধ্যে দৃঢ় হয়ে ওঠে।

কেবলমাত্র ফুটবলই নয়। যে কোনও রকম শরীরচর্চার মাধ্যমে নিজের শরীরকে সুগঠিত করে তোলা যে শেষপর্যন্ত দেশের শক্তিকেই মজবুত করা এই মানসিকতার সূত্রপাত বহু অতীতে হলেও, স্বাধীনতার পরেও শরীর চর্চায় বাঙালিকে উৎসাহ দেওয়ার ধারাটি অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের মধ্যভাগে, দেশ জুড়ে যখন পুনরায় যুদ্ধের পরিবেশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, "জাতীয় জীবনে শারীর-বিদ্যা-চর্চার গুরুত্ব"-এর প্রচার নজরে আসে। জানানো হয় পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-দপ্তরের যুবকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলির কথা। যুবক-যুবতীরা দেশের মেরুদন্ড, তাদের বলিষ্ঠ নির্মাণ দেশকে বলীয়ান করারই একটি মাধ্যম। এই যুবশক্তি দেশের উপর অকস্মাৎ নেমে আসা যে কোনও রকম বিপদকে প্রতিহত করতে পারবে, তাই ছিল বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে যতবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, দেশপ্রেম নতুন রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনে জাতীয়তাবাদের প্রভাব ফিকে হয়ে এসেছে। পরিবর্তে যুদ্ধ এবং দেশপ্রেমকে প্রায় সমার্থক অবস্থানে রেখে প্রতিনিয়তই তৈরি হচ্ছে নানান বড় পুঁজির ছবি। মোটামুটিভাবে গত শতাব্দীর সাত-আটের দশক পর্যন্ত এই ধরনের বিজ্ঞাপন অহরহ প্রকাশিত হয়েছে বাংলা পত্র-পত্রিকায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশে ফারাক ঘটেছে বিস্তর।

পুরনো বিজ্ঞাপনগুলি দেশানুরাগের স্মারক হিসাবে জেগে রয়েছে পুরনো পত্র-পত্রিকার পাতা জুড়ে।

তথ্যসূত্র :

১. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,* তৃতীয় খন্ড, শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা : দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২।

২. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ,* পঞ্চম খন্ড, কলকাতা : মন্ডল বুক হাউস, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ২৪৫।

৩. নবকুমার দত্তগুপ্ত, "বাঙ্গালীর ব্যবসা", *স্বদেশী,* তৃতীয় খন্ড, শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত), কলকাতা, ১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৭৫।

৪. বিনয় সরকার, *বিনয় সরকারের বৈঠকে (বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি),* দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা : চক্রবর্তী, চাটার্জ্জি এন্ড কোং লিমিটেড্‌, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৪৬।

৫. অনাথগোপাল সেন, "দেশীয় শিল্পের অন্তরায়", *টাকার কথা,* কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯১-৯২।

৬. বিপান চন্দ্র, "ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ : ১৯৪৭ সালের আগে", *ঔপনিবেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ,* কলকাতা : পাল পাবলিশার্স, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪১।

৭. লবঙ্গলতা দেবী, "স্বদেশী ভূত", *স্বদেশী,* তৃতীয় খন্ড, শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত), কলকাতা, ১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৭০-৪৭২।

৮. ভবতোষ দত্ত, *আট দশক,* কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৮১।

৯. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *প্রবাসী,* কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৭৫।

১০. প্রাগুক্ত, পৌষ, ১৩২৮, পৃষ্ঠা ৪০৮-৪০৯।

১১. অমিত ভট্টাচার্য, "ঔপনিবেশিক বাংলার স্বদেশী অর্থনৈতিক চিন্তা", *পরিকথা,* সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), মে, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১।

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯১-১৯২।

১৩. অমিত ভট্টাচার্য, "বিজ্ঞাপনের আলোয় স্বদেশী শিল্প : স্বনির্ভরতার নূতন জগৎ", *বাংলার স্বদেশী নবজাগরণ,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৭৭।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “স্বাদেশিকতা”, *জীবনস্মৃতি,* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০।

১৫. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), “বাসন্তী কটন মিলের উদ্বোধন : রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন বক্তৃতা”, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ,* তৃতীয় খন্ড, আনন্দবাজার পত্রিকা (২২ মার্চ ১৯৩২- ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪১), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩৯৬-৩৯৮।

১৬. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), “যৎকিঞ্চিৎ”, *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ,* তৃতীয় খন্ড, আনন্দবাজার পত্রিকা (২২ মার্চ ১৯৩২- ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪১), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩৯৯।

১৭. সৌমেন নাথ, “স্বদেশি আন্দোলন ও কয়েকটি বাঙালি শিল্পোদ্যোগ”, *হরপ্পা,* পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সৈকত মুখার্জি (সম্পাদিত), অক্টোবর, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০।

১৮. অমিত ভট্টাচার্য, “বিজ্ঞাপনের আলোয় স্বদেশী শিল্প : স্বনির্ভরতার নূতন জগৎ”, *বাংলার স্বদেশী নবজাগরণ,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৮৪।

১৯. http://www.boroline.com. Accessed on 13.12.2021.

২০. অমলেন্দু দে, “এবার নতুন পথে, নতুন লক্ষ্যের দিকে”, *সাত দশক : সমকাল ও আনন্দবাজার,* এবিপি লিমিটেড (সম্পাদিত), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১০০।

২১. এবিপি লিমিটেড (সম্পাদিত), *সাত দশক : সমকাল ও আনন্দবাজার,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৮৯।

২২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৯।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “নেশন কী”, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* দ্বাদশ খন্ড-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৮।

২৪. Renan,Ernest. “What is a Nation?”. Text of a Conference delivered at the Sorbonne on March 11th, 1882, in Ernest Renan, *Qu’est-ce qu’une nation?.* Ethan Rundell (Translated). Paris : Presses-Pocket, 1992.

২৫. Anderson, Benedict. *Imagined Communities : Reflections on the origin and spread of Nationalism.* London : Verso, 2006.

২৬. Hobsbawm. E. J. *Nations and nationalism since 1780 : Programme, myth, reality.* Cambridge : Cambridge University Press. 2000. Page 175.

২৭. Mcleod, John. "Imagining the nation : forging tradition and history". *Beginning Postcolonialism*, Manchester : Manchester University Press. 2000. Page 68.

২৮. Hobsbawm, Eric. "Introduction : Inventing Traditions", *The invention of Tradition*, Cambridge : Cambridge University Press. 1983. Page 7.

২৯. Mcleod, John. "Imagining the nation : forging tradition and history". *Beginning Postcolonialism*, Manchester : Manchester University Press. 2000. Page 69.

৩০. শিপ্রা সরকার, "অস্থিরতার দিন এল", *সাত দশক : সমকাল ও আনন্দবাজার*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১১৬-১৩২।

৩১. অভীক চট্টোপাধ্যায়, "কলকাতা ফুটবল ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ", *চার্বাক*, প্রথম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০৭।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা বিজ্ঞাপন ও মেয়েদের কথা

রবীন্দ্রনাথ ১২৯৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ পুনেতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের বিদূষী রমাবাইয়ের একটি বক্তৃতা শুনে তিনি 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানান তিনি 'স্ত্রীশিক্ষা' এবং 'স্ত্রীস্বাধীনতা'র পক্ষপাতী, কিন্তু এটা জানানোর পরেও নারী এবং পুরুষের যে সমাজগত এবং প্রকৃতিগত বিভাজন, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি জরুরি মন্তব্য এই প্রবন্ধে করেন।

তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল কাজের ক্ষেত্র এবং পরিসর সংক্রান্ত তফাৎ বিষয়ে।

> স্ত্রীপুরুষের অবস্থাপার্থক্য সম্বন্ধে আমার এই মত; কিন্তু এর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই। মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতি ও পুরুষের হৃদয়ের উন্নতি, পুরুষের যথেচ্ছাচার ও স্ত্রীলোকের জড়সংকোচভাব পরিহার একান্ত আবশ্যক। অবশ্য, শিক্ষা সত্ত্বেও পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এবং না হলেই বাঁচা যায়। রমাবাই যখন বললেন, মেয়েরা সুবিধে পেলে পুরুষের কাজ করতে পারে, তখন পুরুষ উঠে বলতে পারত, পুরুষরা অভ্যেস করলে মেয়েদের কাজ করতে পারত; কিন্তু তাহলে এখন পুরুষদের যে-সব কাজ করতে হচ্ছে সেগুলো ছেড়ে দিতে হত। তেমনই মেয়েকে যদি ছেলে মানুষ না করতে হত তাহলে সে পুরুষের অনেক কাজ করতে পারত। কিন্তু এ 'যদি' কে ভূমিসাৎ করা রমাবাই কিম্বা আর কোনো বিদ্রোহী রমণীর কর্ম নয়। অতএব এ-কথার উল্লেখ করা প্রগলভতা।[১]

রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষা অথবা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষেই কথা বলছেন, কিন্তু সমাজে কতকগুলি কর্মের ভাগ আছে, তাকে তিনি প্রায় একটা অনড় বিভাজন বলেই যেন দেখতে চাইছেন।

এর পরে দেখতে পাওয়া যায়-

> মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তাহলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় অবিচার বলতে হয়। কেননা কতক বিষয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন, রূপে এবং অনেকগুলি হৃদয়ের ভাবে; তার উপরে যদি পুরুষের সমস্ত গুণ তাদের সমান থাকে তাহলে মানবসমাজে আমরা আর প্রতিষ্ঠা পাই কোথায়। সকল বিষয়েই প্রকৃতিতে একটা Law of Compensation অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে। শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে

> শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বলে অবশ্য এ-কথা কেউ বলবে না যে, তবে তাদের লেখাপড়া শেখানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত; যেমন, স্নেহ দয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা মেয়েদের চেয়ে অল্প বলে এ-কথা কেউ বলতে পারে না যে, তবে পুরুষদের হৃদয়বৃত্তির চর্চা করা অকর্তব্য। অতএব স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান ঐ-কথা গায়ের জোরে তোলবার কোনো দরকার নেই।[২]

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি যে কম এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই এখানে বলছেন।

এরপর তিনি এখানেই জানান,

> আমার তো বোধ হয় না, কবি হতে ভূরিপরিমাণ শিক্ষার আবশ্যক। মেয়েরা এতদিন যে-রকম শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল। Burns খুব যে সুশিক্ষিত ছিলেন তা নয়। অনেক বড়ো কবি অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথমশ্রেণীর কবির আবির্ভাব এখনও হয় নি। মনে করে দেখো, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সংগীতবিদ্যা শিখছে এত পুরুষ শেখেনি। য়ুরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডোরেমিফা চেঁচিয়ে মরছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা Mozart কিংবা Beethoven জন্মাল। অথচ Mozart শিশুকাল থেকেই musician। এমন তো ঢের দেখা যায়, বাপের গুণ মেয়েরা এবং মায়ের গুণ ছেলেরা পায়, তবে কেন এ'রকম প্রতিভা কোনো মেয়ে সচরাচর পায় না। আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (Energy), তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই।[৩]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে তিনটি কথা স্পষ্টত বলেছেন,

প্রথমত, মেয়েদের এবং পুরুষের কাজের যে বিভাজন এই সমাজে, সেই বিভাজনটা সত্য এবং তা এক অনড় বিভাজন। কেননা পূর্বোদ্ধৃত "তেমনই মেয়েকে যদি ছেলে মানুষ না করতে হত তাহলে সে পুরুষের অনেক কাজ করতে পারত। কিন্তু এ 'যদি'কে ভূমিসাৎ করা রমাবাই কিম্বা আর কোনো বিদ্রোহী রমণীর কর্ম নয়।" এই বাক্যের শব্দ ব্যবহারে একধরনের ব্যঙ্গ আছে। তিনি এই নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজনকে খুবই যথাযোগ্য বলে মনে করছেন। এটা তুলে দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী নন এবং এর সঙ্গে নারী স্বাধীনতার কোনও সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন না।

দ্বিতীয়ত, মেয়েদের বুদ্ধি কম।

এবং তৃতীয়ত, মেয়েদের সৃজনশক্তি বা মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতা নেই।

এর চল্লিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালের ২৮ শে এপ্রিল আশালতা সিংহকে যে চিঠি লিখছেন, তাতে বলছেন,

> পূর্ব্বযুগে মেয়েরা ছিল পুরুষদের আওতায়। সংসারের সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের চাপে তারা পারিবারিক কল-টেপা পুতুলের মত বিহিত নিয়মে আওয়াজ করেচে, হাত পা নেড়েচে। অজ্ঞতা ও অশক্তিই যে তাদের ভূষণ এই কথাই তারা জানে। মাতা বা গৃহিণীর বিশেষ বিশেষ মোড়কেই তাদের পরিচয়- তাদের মনুষ্যত্বের যে স্বাতন্ত্র্যটি মোড়ক ছাপিয়েও প্রকাশ পায় তা কখনো বা অস্বীকৃত, কখনো বা নিন্দিত। এমনি ভাবে মেয়েরা মানুষের একটা অংশমাত্র হয়েছিল। সমাজে অর্দ্ধেক বা অর্দ্ধেকের বেশি মানুষের পূর্ণতা খর্ব্ব হয়ে একটা প্রকান্ড লোকসান ঘটিয়ে এসেচে। আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবি করচে। জননার্থং মহাভাগাঃ বলে তাদের গণনা করা হবে না সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য। মানব সমাজে এই আত্মশ্রদ্ধার বিস্তারের মতো এত বড়ো সম্পদ আর কিছুই হতে পারে না। গণনায় মানুষের পরিমাণ পাওয়া যায় না, পূর্ণতাতেই তার পরিমাণ। আমাদের দেশেও কৃত্রিম বন্ধনমুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা।[৪]

এটি অসামান্য একটি চিঠি। মেয়েরা আত্মশ্রদ্ধা অর্জন করছে, তারা কারুর জায়া, কন্যা বা জননী হিসাবে না মানুষ হিসাবে তার পূর্ণমূল্য দাবি করছে। পূর্বোক্ত ‘রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে’-র থেকে তাঁর বক্তব্যের পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি আরও বলছেন,

> পুরুষ যাকে বলে মেয়েলি, সেটা স্বাভাবিক মেয়েলির চেয়ে অনেকটা বেশি বলেই তাকে টানাটানি করে বাড়িয়ে মেয়েদের স্বভাবটা এক-ঝোঁকা হ’য়ে উঠেচে। সুপরিমিত মানুষের সামঞ্জস্য নষ্ট ক’রে তারা অপরিমিত নারীকে গ’ড়ে তুল্‌লে। এতে ক্ষতি না হ’য়ে যায় না।[৫]

সম্পূর্ণ মানুষের সীমানা কে দূরে রেখে তার ‘মেয়েলি’ দিকটাকে নিয়ে পুরুষ বেশি ভাবিত হয়, এ কথাও তিনি বলেন।

> শুধু সংসারে নয়, আধ্যাত্মিক সাধনাতেও কথায় কথায় বলচি নারী বর্জ্জনীয়া। কাঞ্চনের সঙ্গে নারীকে এক কোঠায় ফেলেচি যেন থলির আঁট গিঠটা খুলে উপুড় ক’রে দিলেই হোলো। এ কথা বল্‌তে আমাদের সঙ্কোচ এই জন্যে

হয় না যে, নারী বস্তুতই নিজের জোরে নেই। পুরুষের উপরেই তার ভর। পুরুষ তাকে যে মূল্য দিয়েছে সেই তার মূল্য।[৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই চিঠির বক্তব্যে কেবলমাত্র সংসারে নারীদের পুরুষদের সঙ্গে সমান করে দেখতে চাইছেন তাই নয়, আধ্যাত্মিক সাধনা, একটু বড় যে জীবনবোধ, সেখানেও তিনি নারী পুরুষকে একসঙ্গে দেখতে চাইছেন।

কিন্তু, সমগ্র চিঠিটি জুড়ে খুবই যৌক্তিক এবং অসাধারণ কথা বলবার পরেও ১২৯৬ বঙ্গাব্দ থেকে প্রায় চার দশক অতিক্রম করে ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ একটি কথা বলেন, সেটি হল-

> বস্তু পরিচ্ছিন্ন (abstract) ভাবের সৃষ্টিতে, অব্যবহারিক সত্যের সন্ধানে, মেয়েদের যে বাধা সে বাহিরের নয়, সে অন্তরের। সাহিত্যকলা বা বিজ্ঞান প্রভৃতিতে মেয়েদের কৃতিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় না তার বাহ্য কারণ অনেকে অনেক রকম নির্ণয় করেন। বাহিরের প্রভাবকে আমি বড়ো বলে মানিনে। তোমার লেখায় গান সম্বন্ধে মেয়েদের বিশেষ শক্তির উল্লেখ করেচ। একটা কথা ভুলেচ, মেয়েরা গান গেয়েছে, গান সৃষ্টি করে নি। ভাবলোকের জ্ঞানলোকের সৃষ্টিতে অনেকটা পরিমাণে বুদ্ধির বৈরাগ্য থাকা দরকার,- ব্যক্তিগত, বস্তুগত ব্যবহারগত সংসক্তি বেশি থাকলে সেই বৈরাগ্যের অভাব ঘটে। অপর পক্ষে সেই বৈরাগ্যের প্রাবল্য ঘটলে জীব-সমাজে আমাদের ঔৎসুক্যের ক্ষীণতা হয়।[৭]

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ১৯২৮-এও মেয়েদের পূর্ণ মনুষ্যত্বের দাবি স্বীকার করে, তাঁর পুরনো মতকে অতিক্রম করেও, একটি কথাতে স্থির হয়ে থাকেন, Abstract ভাবের সৃষ্টিতে, অব্যবহারিক সত্যের সন্ধানে মেয়েদের যে বাধা, তা আসলে অন্তরের বাধা। এইটা সমাজ-নির্মিত নয়, মেয়েদের যে ব্যক্তিগত নির্মাণ, তার মেয়ে হয়ে ওঠার বিবর্তনেই এই বাধাটা তৈরি হয়েছে, সেই কথাই তিনি বলেন। যা কিছু প্রয়োজন নয় তার প্রতি তাদের আগ্রহ নেই।

এরই বিপরীত দিকে তিনি বলতে চান, বৈরাগ্য বেশি বলেই পুরুষদের মুক্তির সন্ধানে ছুটে যাওয়া আছে। মেয়েদের মধ্যে মুক্তির কোনও সন্ধান নেই। ফলে রবীন্দ্রনাথের 'তারাপদ' বা বিভূতিভূষণের 'অপু'র কোনও counter-part তৈরি হয় না। বাংলা সাহিত্যে তার উদাহরণ প্রায় নেই। মেয়েরা তাই গান গাইলেও, গান বাঁধে না।

রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষের এই মন্তব্যগুলির প্রেক্ষিতে বোঝা যায়, সমাজে মেয়েদেরকে পুরুষরা কীভাবে দেখেন। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক প্রগতিশীলতা এবং তার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব বোধ, সমস্তকে সামনে রেখেও যখন এই মন্তব্যগুলি আসে, তখন উনিশ শতক আসলে সমাজে নারীদের অবস্থানকে কীভাবে দেখছে, তার একটা হদিশ

পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের যে মনোভাব ধরা পড়ে আলোচিত প্রথম প্রবন্ধটিতে, সেই মনোভাব নিঃসন্দেহে পরিবর্তিত হয়েছিল আরও চার দশক পরে। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছোন, তখন, আশালতা সিংহকে এই চিঠি লিখছেন। কিন্তু তখনও তিনি জানাচ্ছেন, "বস্তু পরিচ্ছিন্ন (abstract) ভাবের সৃষ্টিতে, অব্যবহারিক সত্যের সন্ধানে, মেয়েদের যে বাধা সে বাহিরের নয়, সে অন্তরের"। বাংলার শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধিজীবী পুরুষমন, তাঁর লেখা থেকেই এই কথাগুলি পাওয়া যায়।

ফলে পুরুষ এবং পুরুষশাসিত সমাজ মেয়েদেরকে কীভাবে দেখে এবং বিজ্ঞাপনে কী ভাবে তার প্রতিফলন হয়েছে তা এই অধ্যায়ে খুঁজে দেখা হবে। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের চাইতে সম্ভবত বিজ্ঞাপন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হবে অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। বিজ্ঞাপন যেহেতু মূলত একটা জনপ্রিয় সমাজমনের ধারক, ফলে রবীন্দ্রনাথের মতন উচ্চস্তরীয় মনন, মেধা বিজ্ঞাপনের কাছে আশা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

রবীন্দ্রনাথ মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতা বলতে বুঝেছিলেন Abstractness কে। মেয়েরা বর্ণনা দিতে পারবে কিন্তু তার মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা নেই। সে উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে চমৎকারভাবে পাই। 'নষ্টনীড়' গল্পে অমলের অন্যান্য লেখার মধ্যে যে 'আষাঢ়ের চাঁদ' নামে একটি লেখাও ছেপে বের হয়। চারু অমলকে অনুকরণ করে প্রথমে লেখে 'শ্রাবণের মেঘ'।

> প্রথমে সে লিখিয়াছিল 'শ্রাবণের মেঘ'। মনে করিয়াছিল, 'ভাবাশ্রুজলে অভিষিক্ত খুব-একটা নূতন লেখা লিখিয়াছি।' হঠাৎ চেতনা পাইয়া দেখিল, জিনিসটা অমলের 'আষাঢ়ের চাঁদ'- এর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিয়াছে, 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।' চারু লিখিয়াছিল, 'সখী কাদম্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ' ইত্যাদি।
>
> কোনোমতেই অমলের গন্ডি এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চারু রচনার বিষয় পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও এ-সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায়-অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল; সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরানীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প- এই-সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লিগ্রামের ভাষা-ভঙ্গি-আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।[৮]

যা কিছু বিমূর্ত, যা লেখার জন্য মৌলিক ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন, তা চারু লিখতে পারে না। সেও লেখে, তারও সুন্দর প্রকাশভঙ্গি আছে কিন্তু সেই লেখার মধ্যে আছে বর্ণনা, তার শৈশবস্মৃতি সে ভাগ করে নেয়। একেবারে মৌলিক কিছু ভাবতে গেলেই তা হয়ে যায় অমলের লেখার মতন। অমলের মধ্যে একটা মৌলিক কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই যে মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতা, সেখান থেকেই গড়ে ওঠে একটা স্বাধীন আত্মপরিচয়। অপু কিংবা তারাপদ'র মতন কোনও নারীচরিত্র তাই বাংলা সাহিত্যে মেলে না।

তাঁরই লেখা 'বিদায় অভিশাপ' এ দেখা যায়, কচ বড় জীবনের দায়িত্ব নিয়ে পথে বেরোবেন, আর দেবযানী তাকে পিছন থেকে টেনে ধরবেন, এই হল এক নির্দিষ্ট স্টিরিওটাইপ। আর তা না হলে দেবযানী তাকে অভিশাপ দেবেন এবং কচ তাঁকে বলবেন-

> কচ। আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।
>
> ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।[৯]

এই আত্মনির্ভরতার প্রশ্নেই আরও কিছু পুরুষ চরিত্র সাহিত্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ, চিরকালীন হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার স্বাদ অর্জন করে অপু বা তারাপদ, তাদের মধ্যে তৈরি হয় মুক্তির বোধ, কারুর সাপেক্ষহীনভাবে তারা বাঁচার দিকে যায়।

'অতিথি' গল্পের তারাপদ একটি পরিবারের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অতি নিবিড়, ঘনিষ্ঠ ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও-

> পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত্ব এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল- কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।[১০]

সমগ্র *অপরাজিত* উপন্যাস পাঠককে বহু পাঠে একইরকম অভিভূত করে রাখে। তবু এই স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রসঙ্গে একটি জায়গার উল্লেখ করা যাক-

> ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হয়ত লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রাখতে কোন্ পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের
>
> সোনার সন্ধানেই বা বাহির হইয়াছে। গিয়াছেও প্রায় ছ'সাত মাস হইল।[১১]

সন্তানহারা নিতান্ত অসহায় শিশুসন্তানটিকে নিশ্চিন্দিপুরে ফেলে রেখে অপু যখন চলে যায়, তখন তার সেই নির্লিপ্তি, নিষ্ঠুরতা অবর্ণনীয়। কিন্তু 'ভবঘুরে' অপুকে পাঠক ক্ষমা করে দেন মুহূর্তে। পুরুষের ঔদাসীন্য, নির্লিপ্তি, অনিশ্চয়তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া, খেয়ালী মনোভাব, কখনো কখনো স্বেচ্ছাচারকে সমাজ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে দ্বিধা করে না। বরঞ্চ তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তাদের 'পৌরুষ', যার প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়, মুগ্ধতা থাকে সমাজের।

এই যে একা বাঁচার, পথ আর পিছুটানের দ্বন্দ্বে শেষে পথকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার, একা, কারুর সাপেক্ষহীনভাবে এগিয়ে চলার জীবন বেছে নিতে পারছে তারাপদ, অপু, যেমন বেছে নিয়েছিল বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্কর, ঠিক সেভাবেই কি নারীরাও পারছে তাদের এমন কাঙ্ক্ষিত জীবন বেছে নিতে? নাকি তা তারা আকাঙ্ক্ষাই করেনি কখনও? সে কেবল গ্রামের বর্ণনাই দিতে পারে, তার 'আষাঢ়ের চাঁদ'-এর বর্ণনা বা রাতের আকাশকে দেখে মুগ্ধ হবার ক্ষমতা নেই, সেই জন্য সে কেবল ছোট, পরিচিত জীবনের শরিক হয়ে, পরিবারের ধারক হয়ে থেকে গেছে আমৃত্যু? বড় জীবন, যে জীবন কারুর সাপেক্ষ দ্বারা তৈরি নয়, যে জীবনে সে নিজেই পূর্ণ, এই জীবনকে কি সে দেখতে পারে? বিজ্ঞাপনেও তারই খোঁজ করে দেখা হবে।

প্রাথমিকভাবে কয়েকটি বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করা যাক। অধিকাংশই পুরুষ-কেন্দ্রিক। উল্লেখ্য, বিজ্ঞাপনগুলি অতি জনপ্রিয়, মূলত দৃশ্য মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে এবং একবিংশ শতাব্দীর।

চিত্র ৫.১ indiainfoline.com/article/news-business/mountain-dew-unveils-inspiring-brand-campaign-with_hrithik-roshan-113110801383_1.html/accessed on 22.08.2021.

একটি হল 'মাউন্টেন ডিউ' নামক ঠান্ডা পানীয়র বিজ্ঞাপন, যে বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইন ছিল। "ডর্ কে আগে জীত্ হ্যায়..."। বিজ্ঞাপনে মূলত দেখা যেত বলিউডের বিখ্যাত তারকা ঋত্বিক রোশনকে। অতি দ্রুতগামী চলন্ত বাইক নিয়ে তিনি সাহসে ভর করে পার করেন একের পর এক পাহাড়, অথবা প্যারাসুট থেকে ঝাঁপ দেন আকাশের গায়ে, নীল জলে লাফিয়ে পড়েন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়, তিনি জানেন এই পথে বিপদ আছে, আসতে পারে মৃত্যুও, তবু কোনও সংশয় বা ভয়ই তাঁর অনিশ্চয়তায় ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাককে অতিক্রম করতে পারে না।

নারীদের স্টিরিওটাইপের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে আসার আগে এই সমাজের পুরুষদের স্টিরিওটাইপ গুলি একবার দেখা যাক। নারীর স্টিরিওটাইপ যদি হয় 'সৌন্দর্য', 'কোমলতা'; তেমনই পুরুষের স্টিরিওটাইপগুলি হল 'সাহস', 'শক্তি'- এও এক বিপরীত সমস্যা, অর্থাৎ কোনও পুরুষ যদি তেমন শক্তিশালী না হন, যিনি একা হাতে বহু গুন্ডার সঙ্গে মারামারি করে নায়িকাকে উদ্ধার করতে পারেন, তাহলে তিনি যথেষ্ট ভালো 'পুরুষ' নন, সেটা পুরুষেরও একটা সমস্যা। এই বিপরীত স্টিরিওটাইপও কম সমস্যার নয়।

কিন্তু এই 'সৌন্দর্য' এবং 'শক্তি'র অতিরিক্ত একটি কথা আছে, তা হল একজন মানুষের স্বাধীন, সাপেক্ষহীন পরিচিতি। তার প্রভাব দেখা যায় পূর্বোক্ত 'মাউন্টেন ডিউ' এর বিজ্ঞাপনে। এই বিজ্ঞাপনের পুরুষটি যখন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তা তাঁর প্রেয়সীকে আকর্ষিত করতে, বা মুগ্ধ করতে চেয়ে তিনি করেন না। তাঁর কেবলমাত্র আছে মুক্তির টান। বিজ্ঞাপনে কিন্তু 'ডর্' বা ভয়ের উল্লেখও আছে। ভয়ে কখনও কখনও শুকিয়ে আসে গলা, তখনই প্রয়োজন পড়ে এই ঠান্ডা পানীয়র, গলা ভিজিয়ে নিতে। এই বিজ্ঞাপনে পুরুষের বহুদিনের বাঁধাধরা বীরের ছবিটি ভাঙাও হয় এবং তারই সঙ্গে আকাশে অথবা গহন সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার ছবিটিও উঠে আসে। এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। পুরুষ আকাশের বুকে লাফিয়ে পড়তে পারে।

এরই পাশে রাখা যাক 'নির্মা' কাপড় কাচার সাবানের বিজ্ঞাপনকে। এই বিজ্ঞাপনটি অবশ্য একবিংশ'র নয়, বিংশ শতাব্দীর আটের দশক থেকেই টেলিভিশনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বিজ্ঞাপনটি। 'হেমা', 'জয়া', 'রেখা' আর 'সুষমা' এই চার নারী এই বিজ্ঞাপনের চরিত্র। এমনিতে তো কাপড় কাচার সাবানের সঙ্গে মেয়েরা ওতোপ্রতভাবে জড়িত। এটা একটা গৃহকার্যে ব্যবহারের উপাদান। তা যে হেমা, জয়া, রেখা অথবা সুষমারাই ব্যবহার করবেন এ নিয়ে কোনও সংশয়ই নেই। যদিও বাইরের কাপড় কাচার লন্ড্রিগুলি পুরুষচালিত, কারণ তা বাইরের কাজ। তবু গৃহকাজের প্রেক্ষিতে তা একান্তভাবে মহিলাদেরই ব্যবহার্য বস্তু।

চিত্র ৫.২ freepressjournal.in/analysis/how-are-hema-rekha-jaya-sushma.accessed on 22.08.2021

একুশ শতকে, প্রায় বর্তমানে 'নির্মা' একটি নতুন বিজ্ঞাপন তৈরি করে। চরিত্ররা যদিও সেই হেমা, জয়া ইত্যাদিরা। কিন্তু আজ তাঁরা একুশ শতকের নারী। ঘরের বাইরে তারা বেরোতে শিখেছেন। তারা কেবলমাত্র কাপড় কাচার সাবান কিনতে বাজার যান না। পথেঘাটে নানান বিপদে, যেখানে তথাকথিত সুবেশ 'পুরুষ'রা হাত বাড়াতে

খানিক ইতস্তত করেন, দাঁড়িয়ে থাকেন স্তম্ভিত হয়ে, সেইরকম পরিস্থিতিতে নেমে পড়েন এই মেয়েরা। ঝকঝকে সাদা পোশাকের সুকুমার নিরাপত্তা ছেড়ে তারা কাদায় গেঁথে যাওয়া একটি অ্যাম্বুলেন্সকে তুলে দেন মিলিত প্রয়াসে, গায়ের ঘাম ঝরিয়ে। হয়তো সেই চার নারীর জন্যই বেঁচে যায় কোনও অসুস্থ মানুষের প্রাণ। পোশাক তাদের কর্দমাক্ত হয় ঠিকই, কিন্তু সেসব তাঁরা পরোয়া করেন না। কার্যোদ্ধারের পরে সেই 'বীর' পুরুষদের প্রতি কটাক্ষ করে তাঁরা নিজ নিজ কাজে গমন করেন। এই হল বিজ্ঞাপন।

আপাতদৃষ্টিতে এই বিজ্ঞাপনকে প্রথাগত ছকের কিছুটা বাইরে মনে হলেও, শেষ পর্যন্ত মেয়েদের বিজ্ঞাপনের স্টিরিওটাইপ কিন্তু ভাঙে না। বিজ্ঞাপনের প্রধান চরিত্র থাকে সেই চারটি মেয়েই, 'হেমা', 'জয়া', 'রেখা' আর 'সুষমা'। প্রাথমিকভাবে মনে হয়, মেয়েরা সম্মিলিত শক্তিতে গাড়ি টেনে তুলছে, এ দৃশ্য বেশ অন্যরকম, কিন্তু 'নির্মা' কিনে কাপড় কাচার দায়িত্ব, সিদ্ধান্তও তাদের। বাইরের পৃথিবীতে তারা কখনো বেরোয় বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত গৃহকোণে পোশাক কাচা-ধোওয়ার দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হয়। যুদ্ধজয়ের শেষে কর্দমাক্ত শরীরে তাই কাপড় কাচার সাবান কিনেই তারা ঘরে ফেরেন।

অন্যদিকে 'ইম্পেরিয়াল ব্লু' কোম্পানি দেখায় এক আশ্চর্য বিজ্ঞাপন।

চিত্র ৫.৩ financialexpress.com/industry/imperial-blue-will-be-imperial-blue/1014096.accessed on 22.08.2021

লিফটে একজন মহিলার সহযাত্রী দুই পুরুষ। ঘটনাচক্রে তাঁরা দুজনেই স্থূলাঙ্গ এবং তাঁদের উদর বেশ স্ফীত। এই বিজ্ঞাপনে যথার্থ অর্থে পুরুষের স্টিরিওটাইপ ভেঙে যাচ্ছে। 'মাউন্টেন ডিউ' এর বিজ্ঞাপনে যে পুরুষ আকাশে অথবা সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তা সম্পূর্ণভাবে নারী নিরপেক্ষ। এবং এই 'ইম্পেরিয়াল ব্লু' এর বিজ্ঞাপনে উদরের আয়তন সেই নারীর কাছে গোপন করতে দুই পুরুষ লিফট-ভ্রমণের সময়টুকুতে নিঃশ্বাস চেপে আটকে রাখেন উদরের অগ্রগমন। মেয়েটি বেরিয়ে গেলে তাঁরা আবার সহজ হয়ে, আরাম করে

দাঁড়ান। বিজ্ঞাপনটির রসবোধ উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞাপনের পুরুষের উদরের মাপ বেশি হলে খুব অসুবিধা হয় না। বর্তমানে মূলত সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনে এমন কিছু মহিলাদের দেখা যায়, যাঁরা সৌন্দর্যের পূর্বনির্ধারিত, পরিচিত ও প্রায় বস্তাপচা মাপকাঠি মেনে যে শারীরিক গঠন, তার থেকে দৃশ্যগতভাবে কিছুটা অন্যরকম। কিন্তু এই ঘটনা খুবই দুষ্প্রাপ্য। বিজ্ঞাপনে প্রধানত সেই মেয়েদেরই দেখানো হয় যাঁদের সৌন্দর্য সমাজস্বীকৃত। যাঁরা ক্ষীণতনু হলেও স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল। স্থূলকায়া নারীরা এই বিজ্ঞাপন আওতার বাইরেই থাকেন মোটামুটিভাবে। কেবলমাত্র অধিক স্বাস্থ্যবানদের তেমন বিজ্ঞাপনেই দেখা যায় যেখানে কোনও ওজন কমানোর উপায় বলা থাকে।

আলোচনার সূচনায় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ ও একটি চিঠির উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই প্রবন্ধ 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে'-তে রবীন্দ্রনাথ নারী আর পুরুষের কর্ম-পরিসরের যে বিভাজনটা করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি সরে আসেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতা এবং মুক্তির জায়গায় নারীদের বসাতে পারেননি। নারী-পুরুষের এই পার্থক্যগুলি যুগে যুগে কীভাবে ধরা পড়েছে শাস্ত্রে, সাহিত্যে, আলোচনায়, বিজ্ঞাপনে; সেগুলি খুঁজে দেখা হবে এই অধ্যায়ে। বিজ্ঞাপন সমাজমনকে নির্মাণ করে, নাকি সমাজমনই আসলে বিজ্ঞাপনগুলি কেমন হবে, সেটাকে প্রস্তুত করে দেয়; সেটা তো একটা তর্কের বিষয়। এক্ষেত্রে, সমাজমন কীভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ধরা দিচ্ছে, সেটা দেখে নেওয়া যাবে।

বিজ্ঞাপনে নারী-পুরুষের একটি স্টিরিওটাইপ প্রচলিত ছিল। সেই স্টিরিওটাইপের সংক্ষিপ্ত বিবর্তনকেই এই আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করা হবে। সেই একদা জনপ্রিয় স্টিরিওটাইপ কি ভেঙে গেছে? নাকি সেই স্টিরিওটাইপের আদৌ কোনও পরিবর্তন হয়নি? অথবা সেই পুরনো গতানুগতিকতার পরিবর্তে কোনও নতুন ধরনের গতানুগতিকতা জায়গা করে নিয়েছে? এইটাই খুঁজে দেখা হবে অধ্যায় জুড়ে।

হিন্দু শাস্ত্রগুলি নারীদেরকে কেমনভাবে দেখে, তার সামান্য কিছু অংশ দেখে নেওয়া যাক।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত *মনুসংহিতা*-র[১২] পঞ্চম অধ্যায়ে নারীদের বিষয়ে যে যে নির্দেশ দেওয়া আছে, তার কয়েকটি তুলে ধরা হল-

> ১৪৭। বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
>
> ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষ্পপি।।

বাড়ীতেও বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধা নারী স্বাধীনভাবে কিছু করবেন না।

১৫০। সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্যেষু দক্ষয়া।

সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া।।

স্ত্রীলোক সর্বদা আনন্দিত ও গৃহকর্মে দক্ষ হবেন! তিনি গৃহপোকরণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন এবং ব্যয়ে অমুক্তহস্ত (হিসাবী) হবেন।

অথবা,

১৫৩। অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।

সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ।।

ঋতুকালে, ঋতু ভিন্ন অন্য কালে বিবাহকারী পতি ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা নারীর সুখদাতা।

১৫৪। বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।

উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।।

পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা গুণহীন হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য।

১৬৪। ব্যভিচারাত্তু ভর্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।

শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপোরগৈশ্চ পীড্যতে।।

স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে ব্যভিচারিণী হলে সংসারে নিন্দনীয় হয়, শৃগালের জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি) পাপরোগের

দ্বারা আক্রান্ত হয়।

এবং এই বইয়েরই নবম অধ্যায়ে বলা হচ্ছে-

২। অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্।

বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে।।

স্ত্রীলোকদের (স্বামী প্রভৃতি) ব্যক্তিগণ তাদের দিনরাত পরাধীন রাখবেন, (অনিষিদ্ধ) রূপাদি বিষয়াসক্ত স্ত্রীলোকদেরও নিজের

বশে রাখতে হবে।

অথবা,

১৩। পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনম্।

স্বপ্নোহন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্।।

মদ্যপান, দুষ্টলোকের সংসর্গ, স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, ঘুরে বেড়ান, (অকালে) নিদ্রা, পরগৃহে বাস- এই ছয়টি নারীর

(ব্যভিচারাদি) দোষের কারণ।

৭৬। প্রোষিতো ধর্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষোহষ্টৌ নরঃ সমাঃ।

বিদ্যার্থং ষড়্‌যশোহর্থং কামার্থং ত্রীংস্তুবৎসরান্।।

(স্বামী) ধর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রবাসে গেলে (স্ত্রী তার) জন্য আট বৎসর, বিদ্যার্জন বা যশ লাভের জন্য গেলে ছয় বৎসর এবং

(অপর স্ত্রী সম্ভোগরূপ) কামের জন্য গেলে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করবেন; (তৎপর পতি সকাশে যাবেন)।

উনিশ শতক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দিক থেকে অষ্টাদশ অথবা বিংশ শতকের তুলনায় কিছুটা ম্লান। অষ্টাদশ শতকে এই দেশের ইতিহাসে পরপর কতকগুলি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ১৭৫৭-এ হয় পলাশীর যুদ্ধ। ১৯৭০ এ হয় বাংলাজুড়ে ভয়াবহ মন্বন্তর। অপরদিকে বিংশ শতাব্দীতে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ, প্রথম (১৯১৪-১৯১৮) এবং মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রভাব পড়ে সমগ্র দেশ জুড়ে, তারই রেশ ধরে আসে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), দাঙ্গা (১৯৪৬) এবং সর্বোপরি ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে একটা আপাত শান্ত পরিবেশ বিরাজ করলেও উনিশ শতকের মধ্যে একধরনের অন্তর্ঘাত রয়েছে। আমাদের আধুনিকতার বোধ তৈরি হয়েছে এই উনিশ শতকে, ফলে আধুনিকতার নানান সংঘাত ও সম্পর্কও গড়ে উঠেছে এই সময়কালে। এই অন্তর্ঘাতেরই একটি অংশ হল যুক্তিবাদ। মানুষ প্রশ্ন করতে শেখে। রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩)-বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) নারীমুক্তির যে কর্মকান্ড, তার মধ্যেও এই অন্তর্ঘাতের

বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে মিশে আছে। এই কর্মকান্ডের একটি দিক ছিল স্বভাবতই সামাজিক দিক, মানুষের সঙ্গে কথা বলা, তাদের মতামত নেওয়া, সই সংগ্রহ ইত্যাদি। কিন্তু কর্মকান্ডের বৌদ্ধিক দিকটির মধ্যেই খুব অভাবনীয় কয়েকটি বিষয় মিশে ছিল। রামমোহন যে পুস্তিকাগুলি লেখেন, তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল *সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ*। এই যে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক দুই প্রতিপক্ষ, এঁরা পরস্পর তর্ক করেন। এই দুটি চরিত্র'র স্রষ্টা রামমোহন স্বয়ং। এই দুই প্রতিপক্ষ সহমরণের মতন অত্যন্ত গুরুতর সামাজিক প্রথা নিয়ে তর্ক করেন, যে তর্ক সম্পূর্ণ রামমোহনের নিজের সৃষ্ট হলেও তিনি প্রবর্ত্তক অর্থাৎ যিনি সহমরণের প্রবর্তনা চান, তাঁকে নিবর্ত্তকের থেকে বেশি জায়গা করে দেন, যাতে প্রবর্ত্তককে কখনোই দুর্বল বলে পাঠকের বোধ না হয়। নিবর্ত্তককে সহজে জিতিয়ে দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। উল্লেখ্য, রামমোহন, বিদ্যাসাগরের হাত ধরে বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক 'non-fiction' গদ্য লেখা হচ্ছে।

প্রবর্ত্তকের যুক্তিগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ *ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হারিতের সংহিতা, অঙ্গীরা সংহিতা* থেকে তাঁরা জানাচ্ছেন সহমরণ কেন জরুরি। নিবর্ত্তক তাঁর তর্কে সেই *মনুসংহিতা*-কে ব্যবহার করলেন, যে *মনুসংহিতা*-র প্রতিক্রিয়াশীলতা বিমূঢ় করে দেয়।

মনুসংহিতা-র পঞ্চম অধ্যায়ের ১৫৭ নম্বর শ্লোকে বলা হয়-

১৫৭। কামন্তু ক্ষপয়দ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।

ন তু নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।।

স্ত্রী বরং পবিত্র ফল, মূল, ফুল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, তথাপি পতি মৃত হলে অন্যের নামোচ্চারণ করবেন না।

'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'-এ 'নিবর্ত্তক'কে দিয়ে রামমোহন রায় বলান,

পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না।। আর আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক থাকিবেন।– ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পরি মরিলে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন ।।যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং।।

যাহা কিছু মনু করিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্মৃতি ।। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।।

মনু স্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে।[১৩]

কেবলমাত্র বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে রামমোহন এই *মনুসংহিতা*-র আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, আজকের পাঠক হিসাবে সে কথা মনে হয় না। বোঝা যায় এই *মনুসংহিতা*-কে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কার্যসিদ্ধির আয়ুধ হিসাবে। এই স্থবির নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথার পরিবর্তনের পিছনে ছিল রামমোহনের দীর্ঘ শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক পরিশ্রম।

এর পরে *পরাশর সংহিতা*-র বিশেষ বিশেষ অংশ দেখে নেওয়া যাক। এখানেও নারীদের বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে অতি অল্প কিছু অংশের উল্লেখ করা হল-

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ।।২৭।।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।

সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ।।২৮।।

তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।

তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ।।২৯।।

ক্লীব নির্ণীত কিম্বা পতিত হইলে এই পঞ্চবিধ আপদে রমণীর পত্যন্তঃ গ্রহণ বিধিবিহিত। (২৭)

কিন্তু ভর্ত্তার মৃত্যুর পর যে নারী ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্ব্বক কাল যাপন করেন, মৃত্যুর পর তিনি (নৈষ্ঠিক) ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। (২৮)

মানব শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে রমণী স্বামীর অনুগমন করেন, অর্থাৎ সহমৃতা হন তিনি সেই পরিমাণ বৎসর স্বর্গে বাস করেন। (২৯)[১৪]

রামমোহনের পরে এলেন বিদ্যাসাগর, তাঁর কাজ বিধবাদের বিবাহ দিতে হবে। এ কাজে সফল হবার জন্য বিধবাদের বিবাহ কতটা শাস্ত্রসম্মত তা তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। কারণ হৃদয়ের বা মানবতার যুক্তি সেই সমাজ গ্রহণ করার অবস্থায় ছিল না। রামমোহন দেখান *মনুসংহিতা*-য় সহমরণের প্রসঙ্গ নেই, বরঞ্চ বিধবাদের ফলমূল

খেয়ে শরীর কৃশ করার কথা বলা আছে। আর বিদ্যাসাগর নামেন বিধবাদের আমৃত্যু জীবনযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির কাজে। সেই কাজে তাঁর প্রয়োজন হয় এমন শাস্ত্র, যা *মনুসংহিতা*-র ওই নির্দিষ্ট মতটিকে খন্ডন করে। এমন শাস্ত্র তাঁর প্রয়োজন যেখানে বিধবা বিবাহের সমর্থনে কথা বলা আছে। একদা যে *মনুসংহিতা*-কে রামমোহন বলেছিলেন 'শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র', সেই শাস্ত্রের পরিবর্তে তিনি খুঁজতে শুরু করেন 'কলির শাস্ত্র'। আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে দুই শতাব্দী পূর্বের এই মহাপুরুষদের আধুনিকতা বিস্মিত করে। যাঁরা শাস্ত্রকে তাঁদের কার্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এমন উদ্দেশ্য যাতে তাঁদের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি বিন্দুমাত্র যুক্ত নয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই কাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন। দিনের পর দিন তাঁদের পরিশ্রম করতে হয়েছে কী বিপুল, তা বহু মানুষের স্মৃতিকথায় ধরা আছে।

মূল কথা হল, রামমোহন আর বিদ্যাসাগর উভয়েই ব্যবহার করেন শাস্ত্রের যুক্তি। কিন্তু উভয়ের শাস্ত্র ছিল পরস্পরবিরোধী। যুক্তির খেলায় তাঁরা একে অন্যের প্রতিপক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু নারীমুক্তির প্রাথমিক লড়াইয়ের প্রসঙ্গে তাঁদের কথা আজ একুশ শতকে একত্রেই মনে পড়ে। এই শাস্ত্রগুলি স্বভাবতই বহুক্ষেত্রে তাঁদের জীবন দর্শনের বিরোধী ছিল, কিন্তু সমাজের সঙ্গে এই অসম লড়াইয়ে তাঁরা সেই শাস্ত্রকেই হাতিয়ার করেন। শাস্ত্রের যুক্তির মধ্যে থেকে ঠিক তাঁদের প্রয়োজনীয় অংশটি বেছে, নির্দিষ্টভাবে সেইটুকু ব্যবহারের কাজটি ছিল গুরুতর, ফলে তাঁদের শাস্ত্রের মধ্যে অন্তর্ঘাত ঘটানোর মতন কিছু কৌশল গ্রহণ করতে হয়।

উনিশ শতক থেকেই, মেয়েদের প্রশ্নে, তার মুক্তি এবং বদ্ধতার যে দ্বন্দ্ব, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এবং তার মুক্তি আসলে কতটা মুক্তি, সেই মুক্তির ধারণার নানান যে সূত্র, সেগুলিকে নিয়েও স্বাভাবিকভাবেই চর্চা হচ্ছিলো। এই চর্চা আজও আমাদের সমাজে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও চোরাগোপ্তা প্রবহমান। নারীদের কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হবে অথবা হবে না, এই নিয়ে আলোচনা বন্ধ হয়নি। তবে তাদের যে লেখাপড়া শেখা প্রয়োজন, এই জায়গায় আজ সমাজ একটা প্রশ্নাতীত অবস্থায় এসেছে। কিন্তু তাই বলে কী তাদের মুক্তির সমস্ত পথ খুলে গেছে? তা হয়নি। মানুষ হিসাবে যে মর্যাদা পুরুষ পায়, মেয়েরা আজও তা পেয়ে উঠতে পারেনি। উনিশ শতক থেকে এই যে আধুনিকতা, প্রগতি, পথ চলা, মুক্তি এবং অপরদিকে বদ্ধতা, তার প্রতি সমাজের অতিরিক্ত নজরদারি, এই দ্বন্দ্ব শুরু হয় রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাত ধরে।

বিজ্ঞাপনেও সেই দ্বন্দ্বটা দেখতে পাওয়া যায়।

মনুসংহিতা এবং *পরাশর সংহিতা*-র উদাহরণগুলি তুলে ধরলে, হিন্দু শাস্ত্র নারীদের কীভাবে দেখেছে, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

সেই আপাত আলোড়নহীন উনিশ শতকই নারীমুক্তির বন্ধুর পথে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী এই উনিশ শতকের শেষ ভাগে অথবা বিংশ শতকের সূচনায় নারীদের ব্যাপারে কী মতামত দিয়েছেন, তাও দেখা দরকার। সে কারণেই রামমোহন, বিদ্যাসাগরের প্রকৃত আধুনিকতার পাশে আমরা দ্বন্দ্বের নমুনা হিসাবে পড়ি উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে। যে শতাব্দীতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ছিলেন; সেই শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা পরবর্তী শতাব্দীর সূচনায় উপেন্দ্রনাথের মতন মানুষও ছিলেন এই সমাজে। এবং বলা বাহুল্য, রামমোহন-বিদ্যাসাগর এর তুলনায় অনেকাংশে প্রবলভাবেই ছিলেন।

উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩২৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৯ সালে *ভারতের নারী* নামের একটি বই লেখেন। 'নারী শিক্ষা' দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বইটি লিখিত হয়েছিল। নারীদেরকে কিছু বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করবার একটা প্রবণতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় দেখতে পাওয়া যায়। এই বইয়ের লেখক মন্তব্য করেন, এতদিন পর্যন্ত এই 'নারী শিক্ষা'র উদ্দেশ্যে যে বইগুলি লিখিত হয়েছে তাতে, "রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নাই"। সেই অভাব পূরণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নারীদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক অবশ্যপালনীয় বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয় এই বইতে এবং ভারতের দশটি আদর্শ নারীর 'পূণ্যচরিত্র' বর্ণনাও করেন তিনি। এবং ভূমিকা অংশেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় এ গ্রন্থ গৃহলক্ষ্মীদের অবশ্যপাঠ্য। আজকের পাঠক যাকে নারীশিক্ষা বলে আন্দাজ করছেন, সেই ভাবনা নিয়ে এই বইটি পড়তে শুরু করলে অসুবিধা হবে। পূর্বোদ্ধৃত *মনুসংহিতা*-র স্মৃতি মনের মধ্যে জাগরুক রেখে বইটি পড়া সুবিধাজনক। এই বইতে প্রথমেই 'সতী'র একটি ধারণা দেওয়া হয়। সীতা, বেহুলা, রাজপুত রমণী, দ্রৌপদী, গান্ধারী'র জীবনকে বর্ণনা করা হয়। এই বইয়ের 'নারীর আবশ্যকতা' অংশে লেখক জানাচ্ছেন-

> বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্ব আদর্শের সারভূতা রূপে ভগবান্ নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে জগদ্ বন্ধনের সমুদয় উপাদান আমরা নারী-জাতির মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রকৃতি বিশ্বজগতের বন্ধন- নারীর অন্য নাম প্রকৃতি। বিশ্ব-প্রসবিনী আদ্যাশক্তির অংশরূপে তাঁহাদের জন্ম, সেই জন্য জগৎ স্ত্রীজাতিকে মাতৃচক্ষে দেখে। জগতে সর্ব্বসন্তাপ হরণ করিবে মার ন্যায় কে আছে? মাতৃগর্ভে স্থানপ্রাপ্তির পর হইতে পূর্ণ জীবন কাল আমরা অশেষপ্রকারে তাঁহার যত্নে রক্ষিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হই। কবিতার চক্ষে অনেক সময় স্ত্রীজাতিকে

সৌন্দর্য্যের সারভূতা রূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু পুষ্পের সহিত তুলনা করিয়া তাহার মাধুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; পুষ্পকে বিশ্ববনস্পতির বীজরূপে উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। রমণীর কোলে কমনীয়কান্তি শিশু যে শোভা বর্দ্ধন করে, জগতের সমগ্র অলঙ্কার বা সৌন্দর্য্য তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। সংসার-জীবনে নারীজাতির কর্ত্তব্যপালনের সহিত তাঁহার সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে গেলে শেষোক্তটী একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। নারী, জন্মের প্রথম প্রভাত হইতে সংসারকে মধুর স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ করেন। নারীকে কুমারীরূপে পার্ব্বতী, যুবতীরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, মাতৃরূপে জগদম্বা, প্রৌঢ়ারূপে জগৎপালিকা ও বৃদ্ধারূপে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রোগে শোকে, দুঃখে-দৈন্যে অভাবে-অভিযোগে মানবের সর্ব্ববিধ অশান্তিতে তাঁহারই একমাত্র শান্তিপ্রদায়িনী। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহিমা কথঞ্চিৎ আলোচনা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।[১৫]

আজ একবিংশ শতাব্দীর পাঠক হিসাবে, কেবলমাত্র সন্তানধারণ এবং সন্তানের জন্মদাত্রী হিসাবে নারীকে দেখতে কিছু অস্বস্তি বোধ হলেও, মাতা ও সন্তানের যৌথ সৌন্দর্যই নারীর প্রকৃত এবং কাঙ্ক্ষিততম চেহারা ভেবে নিতে মনে কিছু আপত্তি তৈরি হলেও, *মনুসংহিতা*-র প্রেক্ষাপটে এই বইটিকে পড়লে আর তেমন অসুবিধা হয় না। উনিশ শতক থেকে বিংশ শতক পেরিয়ে বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে, এমনটা সম্ভবত বলা যায় না। তবে উপস্থাপনগত পার্থক্য ঘটেছে স্বভাবতই। নারী হিসাবে জন্মানোর একমাত্র সার্থকতা মাতৃত্বে, এই কথা বারেবারে নানাভাবে শৈশব থেকে একটি মেয়েকে বোঝানো হলে, যে মেয়েটি সন্তানধারণে ইচ্ছুক নয়, তার মনের অবস্থা কেমন হয়, সেই প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, যে সমস্ত নারী সন্তানধারণে শারীরিকভাবে সক্ষম নন, অথচ ইচ্ছুক, তাঁদের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে, নারী হিসাবে নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে হতে পারে কিনা, সে প্রসঙ্গ আপাতত সরিয়ে রেখে সরাসরি একটি বিজ্ঞাপনের আলোচনায় চলে যাওয়া যাক।

মহৎ মাতৃরূপে নারীদের দেখার অতিপরিচিত স্টিরিওটাইপ বহুদিনে ধরে বাংলা বা ভারতীয় বিজ্ঞাপনে প্রায় একইভাবে ধরা পড়ে আসছে।

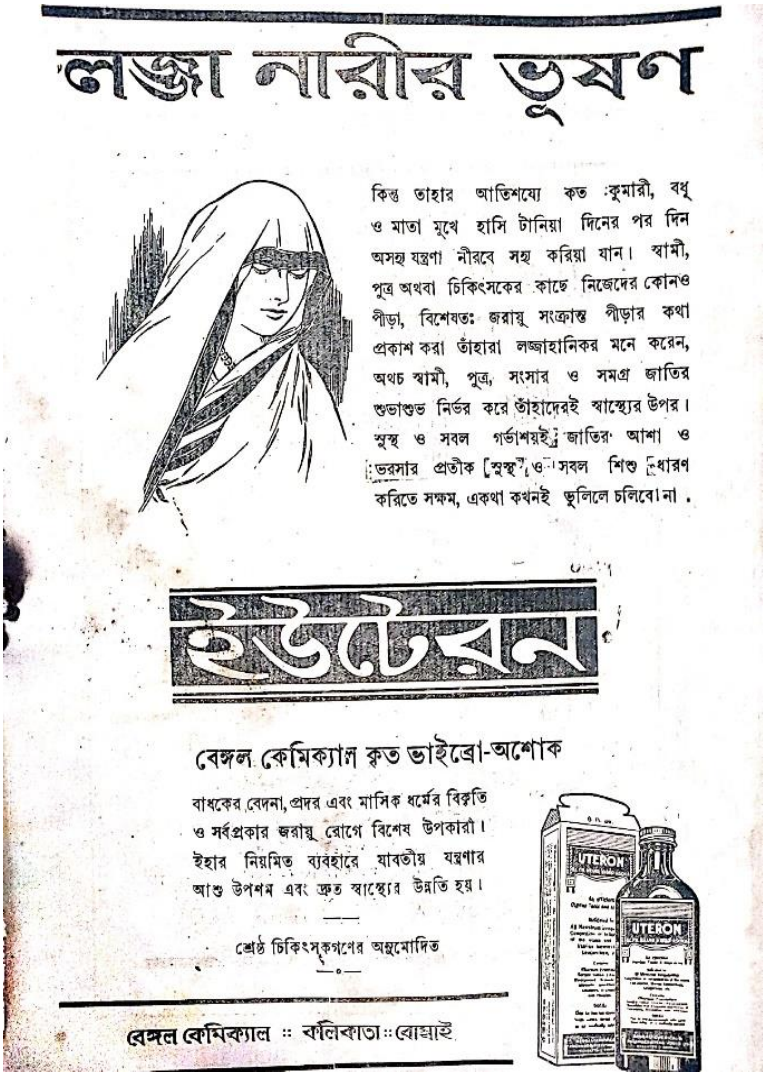

চিত্র ৫.৪ ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৫১

এই বিজ্ঞাপনটির শিরোনামে লেখা থাকে সেই অতি পরিচিত বাক্য, "লজ্জা নারীর ভূষণ"। শিরোনামে বড় বড় করে ব্যবহৃত এই তিনটি শব্দের মাধ্যমে নারীর এই ভূষণটিকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে বলেই মনে হয়। যদিও বিজ্ঞাপনের মূল কপিতে "কুমারী, বধূ ও মাতা মুখে হাসি টানিয়া দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া যান" এই কথা বলা হয়। এবং সেই যন্ত্রণার প্রতিকারস্বরূপই এই 'ইউটেরন' নামক টনিক ব্যবহারের কথা বলা হয়। বোঝা যায় যে জরায়ুকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান করতে পারে এই ওষুধ। একদিকে শিরোনামে নারীর লজ্জার জয়গান এবং অপরদিকে কপিতে নিজের অসুস্থতার কথা জানানোর মতন সামান্য লজ্জা দূর করার উপদেশ দিয়ে বিজ্ঞাপনটিতেই এক অসামান্য দ্বিচারিতা তৈরি হচ্ছে। কপিটি পড়ে বোঝা যাচ্ছে, মেয়েদের এই 'লজ্জা' প্রতি একটি সবিশেষ স্নেহপূর্ণ প্রশ্রয়ই দেওয়া হচ্ছে, যাতে লজ্জা ত্যাগের কথা সে ভুলেও না ভাবে। এবং শেষে মেয়েদের নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক যন্ত্রণার প্রতি অকস্মাৎ এহেন ঔদার্যের কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। সুস্থ ও সবল গর্ভাশয়, সুস্থ ও সবল শিশুকে ধারণ করতে পারে, এই বক্তব্যে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে সমাজে নারীর প্রধানতম ভূমিকাটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রায় সমসময়েই 'Ladilux with Ashoke' নামক আরেকটি আয়ুর্বেদিক টনিকের বিজ্ঞাপনে নারী সমাজের একটি মর্মান্তিক চিত্র ফুটে ওঠে। চিঠির বয়ানে বিজ্ঞাপনের একটি ধারা প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞাপনে জনৈক সবিতাদি

আন্নাকালীকে লেখেন "লেডিলাক্স্ উইথ্ অশোক" টনিক পান করার জন্য। অজস্র সন্তানধারণ করে যে আনু'র শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু সাংসারিক চাপে, সংসারের নির্বাক চালিকাশক্তি এই মেয়েটির খেয়াল কেউ রাখে বলে বোধ হয় না। সবিতাদি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই সেই চিঠিতে লেখেন, "যে অবস্থায় আজ তোমাকে দেখে এলাম, তা কেবল আমাদের এই হতভাগা দেশেই সম্ভব। তা যদি না হ'ত, তবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিশু এখানে এসে মরত না, এদেশে মেয়ে হওয়াটা যেন একটা মস্ত অভিশাপ!"... এই দেশে নারীদের প্রকৃত অবস্থার ছবি, কোনও ভূমিকাহীনভাবে এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত। সন্তানধারণের মত আনন্দের বিষয়ে, যত্ন, পুষ্টির অভাবে হয়ে পড়ে অভিশাপের বিষয়। এর সঙ্গে সঙ্গে নারীদের নির্দিষ্ট শারীরিক সংকটগুলি যে লেগেই থাকে নিয়মিত, তার কথাও জানানো হয় বিজ্ঞাপনে। এমনকি এই যে 'আন্নাকালী', সেই 'আন্না' নামটিও এসেছে 'আ-র-না' থেকে, সে কথাও বিজ্ঞাপনে বর্ণনা করা থাকে। তার মা নিজেই একদা চাননি তাঁর আরেকটি কন্যাসন্তান জন্ম নিক এবং সেও তার মা এর মতই জীবনের প্রতিটি দিন দুর্বিষহ যন্ত্রণায় কাটাক। পূর্ববর্তী "লজ্জা নারীর ভূষণ" শিরোনামের বিজ্ঞাপনটিতে এই লজ্জার আলো-ছায়ায় প্রকৃত সমস্যাটি কিছু ম্লান হয়ে পড়ে। এই বিজ্ঞাপনে তা নয়। আন্নাকালীর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি নিয়ে সবিতাদি বিজ্ঞাপনে মেয়েটির প্রকৃত বন্ধুর মতন পাশে দাঁড়ান, স্পষ্টভাষায় আড়ষ্টতা ছাড়া তিনি মেয়েটির "সংসারের সঙ্গে যুঝবার" পথটি দেখিয়ে দেন।

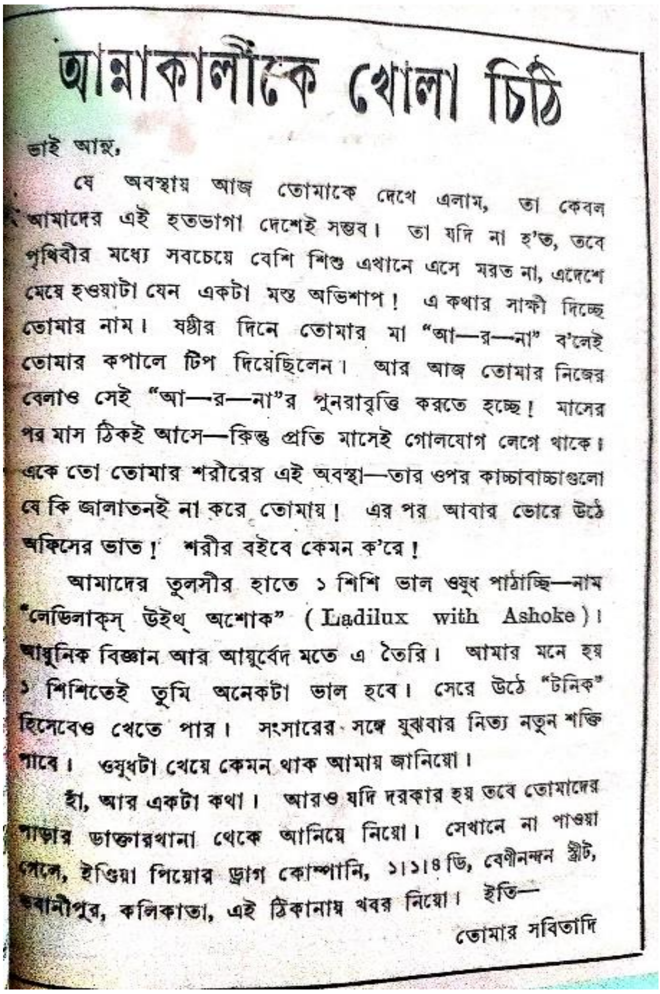

আন্নাকালীকে খোলা চিঠি

ভাই আন্নু,

যে অবস্থায় আজ তোমাকে দেখে এলাম, তা কেবল আমাদের এই হতভাগা দেশেই সম্ভব। তা যদি না হ'ত, তবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিশু এখানে এসে মরত না, এদেশে মেয়ে হওয়াটা যেন একটা মস্ত অভিশাপ! এ কথার সাক্ষী দিচ্ছে তোমার নাম। ষষ্ঠীর দিনে তোমার মা "আ—র—না" ব'লেই তোমার কপালে টিপ দিয়েছিলেন। আর আজ তোমার নিজের বেলাও সেই "আ—র—না"র পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে! মাসের পর মাস ঠিকই আসে—কিন্তু প্রতি মাসেই গোলযোগ লেগে থাকে। একে তো তোমার শরীরের এই অবস্থা—তার ওপর কাচ্চাবাচ্চাগুলো যে কি জ্বালাতনই না করে তোমায়! এর পর আবার ভোরে উঠে অফিসের ভাত! শরীর বইবে কেমন ক'রে!

আমাদের তুলসীর হাতে ১ শিশি ভাল ওষুধ পাঠাচ্ছি—নাম "লেডিলাক্স্ উইথ্ অশোক" (Ladilux with Ashoke)। আধুনিক বিজ্ঞান আর আয়ুর্বেদ মতে এ তৈরি। আমার মনে হয় ১ শিশিতেই তুমি অনেকটা ভাল হবে। সেরে উঠে "টনিক" হিসেবেও খেতে পার। সংসারের সঙ্গে যুঝবার নিত্য নতুন শক্তি পাবে। ওষুধটা খেয়ে কেমন থাক আমায় জানিয়ো।

হাঁ, আর একটা কথা। আরও যদি দরকার হয় তবে তোমাদের পাড়ার ডাক্তারখানা থেকে আনিয়ে নিয়ো। সেখানে না পাওয়া গেলে, ইণ্ডিয়া পিয়োর ড্রাগ কোম্পানি, ১।১।৪ ডি, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা, এই ঠিকানায় খবর নিয়ো। ইতি—

তোমার সবিতাদি

চিত্র ৫.৫ শনিবারের চিঠি, আষাঢ়, ১৩৫০

বিজ্ঞাপনগুলির আলোচনা যে বইয়ের সূত্রে এসেছিল, সেই *ভারতের নারী* বইয়েরই আরও দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন-

> আজ এই দুর্দ্দিনেও ভারত ভারতই আছে; কারণ আজও ভারতের নারীগণ সর্ব্বত্র পূজিতা। ভারতের পুরুষগণ নারীকে এখনও দেবীভাবে পূজা করে বলিয়াই তাহারা স্ত্রীজাতিকে বাসনার বিষয়ীভূত করে নাই। পাছে পাপস্পর্শে পুণ্যপ্রতিমা কলুষিত হয় এই ভয়ে তাহারা স্ত্রীলোকের জন্য নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। অন্যদেশ প্রকৃত নারীপূজা জানে না। যাঁহারা 'নারীপূজা'র দাবী করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন, একটু অপক্ষপাত বিচার করিলেই কিন্তু স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তাঁহারা 'নারীপূজা' না করিয়া সর্ব্বত্রই নারীদের অপহরণ ও অবমাননা করিতেছেন। স্ত্রীজাতিকে উচ্চাসন দিতে আমাদের ন্যায় অন্য কোন জাতির শাস্ত্র বাস্তবিক পারে নাই ও জানে না। পতিব্রতা নারীর এরূপ গৌরব অন্য জাতি ভাবিতেও পারে না।
>
> আমাদের দেশও যে আজ আদর্শ হইতে কিছু পিছাইয়া পড়ে নাই, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু এই অধঃপতনের মূল কি? তাহা আমরা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব। অশিক্ষিত কান্ডজ্ঞানহীন গুরুজনে ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরাই তাহাদের স্ত্রীকে বিলাসের পুত্তলি করিয়া তুলে, সেই সঙ্গে দেবীপ্রতিমা বিলাসের সংস্পর্শে কলুষিত হয়। তাহাদের দেবীপূজার মন্ত্র নাই, সে ধূপধুনা হইতে নরকের পুতিগন্ধই বাহির হয়, সেখানে দেবীপ্রতিমা থাকে না; কেবল আসুরিক পূজার ষোড়শোপচারের ব্যবস্থা।[১৬]

নারীকে দেবী হিসাবে পূজা করবার কথা বেশ শ্রুতিমধুর হলেও, সেই দেবীত্বের চাপ অনেকসময় নারীদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। কেউ কেউ তা আজীবন সহ্য করেন, কাউকে সেই আধ্যাত্মিক, সামাজিক পদের দাবি মেটাতে হয় জীবন দিয়ে। তেমনই দুটি উদাহরণ এইখানে দিয়ে রাখা যাক।

স্বামী গম্ভীরানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একাদশ প্রেসিডেন্ট। অনেক গ্রন্থের লেখক। রামকৃষ্ণমিশন তাঁর বইগুলিকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। বিবেকানন্দের জীবনী, সারদা-জীবনী, রামকৃষ্ণ-র অন্য শিষ্যদের জীবনী এবং উপনিষদের বঙ্গানুবাদ তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধেয় কাজ।

সারদা দেবীকে রামকৃষ্ণ বসিয়েছিলেন দেবীর আসনে। সেই সারদা দেবীর পিত্রালয় থেকে ফেরার একটি ঘটনা স্বামী গম্ভীরানন্দ'র *শ্রীমা সারদা দেবী* থেকে উদ্ধৃত করা হল-

> ইহার পর পিত্রালয় যাইয়া শ্রীমা সাত-আট মাস ছিলেন। অনন্তর ১২৯০ সনের মাঘ মাসে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এই সময়েই ভাবের ঘোরে পড়িয়া যাওয়ায় ঠাকুরের বাম হাতের হাড় স্থানচ্যুত হয় এবং খুব কষ্ট হইতে থাকে। শ্রীমা আসিয়া ঠাকুরের ঘরে কাপড়ের পুঁটুলিটি রাখিয়া প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে রওনা হয়েছ?" শ্রীমায়ের উত্তরে ঠাকুর যেই জানিলেন যে, তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাহির হইয়াছিলেন, অমনি

বলিলেন, “এই তুমি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়েছ বলে আমার হাত ভেঙেছে। যাও যাও, যাত্রা বদলে এসগে।” শ্রীমা সেইদিনই ফিরিতে চাহিলে ঠাকুর বলিলেন, “আজ থাক, কাল যেও।” পরদিনই শ্রীমা যাত্রা বদলাইতে দেশে গেলেন।[১৭]

রামকৃষ্ণের হাত ভাঙার সঙ্গে শ্রীমায়ের যাত্রার সম্পর্ক কী, এ প্রশ্ন এখন উত্থাপন করা বাতুলতা। কিন্তু পিত্রালয় থেকে বহু পথ অতিক্রম করে এসেই, আবার পরদিন ফেরা যে তেমন সহজ কাজ নয়, তা আজকে দ্রুতগামী যানবাহনের উপস্থিতিতে অনুভব করা কিঞ্চিৎ কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

আরেকটি উদাহরণ আরও শোচনীয়।

দক্ষিণেশ্বরের শম্ভু মল্লিকের নির্মিত গৃহে শ্রীমায়ের অবস্থানকালের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অল্পায়তন নহবতেই কাটিয়াছিল। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সে বড়ই কষ্টের জীবন; শ্রীমায়ের বিভিন্ন সময়ের উক্তি থেকে তা স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন নবতখানায় ছিলুম, তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে থাকতে হতো। তারই ভিতর কত সব জিনিসপত্র। কখনো কখনো একাও ছিলুম।... মধ্যে মধ্যে গোলাপ, গৌরীদাসী, এরা সব থাকত। ঐটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হতো- প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল কিনা, কালীর ভোগ সহ্য হতো না। অপর সব ভক্তদের রান্না হতো। লাটু ছিল; রাম দত্তের সঙ্গে রাগারাগি করে এল। ঠাকুর বললেন, ‘এ ছেলেটি বেশ, ও তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।’ দিন রাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রাম দত্ত এল; গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, ‘আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।’ আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের ময়দার রুটি হতো। রাখাল থাকত; তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হতো। সুরেন মিত্তির মাসে মাসে ভক্তসেবায় দশ টাকা করে দিত। বুড়ো গোপাল বাজার করত। প্রথম প্রথম (নহবতের) ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যেস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটাসোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, ‘আহা, কি ঘরেই আমাদের সতীলক্ষ্মী আছেন গো- যেন বনবাস গো’। রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। (নহবতের) নিচের একটু খালি ঘর, তা আবার জিনিসপত্রে ভরা। উপরে সব শিক ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করছে- ঠাকুরের জন্য শিঙ্গি মাছের ঝোল হতো কি না। শৌচের আর নাওয়ার জন্যই যা কষ্ট হতো। বেগ ধারণ করে করে শেষে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল। দিনের বেলায় দরকার হলে রাত্রে যেতে পারতুম- গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে। কেবল বলতুম ‘হরি, হরি, একবার শৌচে যেতে পারতুম’! আর ঐ মেছুনীরা

ছিল আমার সঙ্গী। তারা গঙ্গা নাইতে এসে ঐ বারান্দায় চুবড়ি রেখে সব নাইতে নাবত; আমার সঙ্গে কত গল্প করত। আবার যাবার সময় চুবড়িগুলি নিয়ে যেত। রাতে জেলেরা সব মাছ ধরত আর গান গাইত, শুনতুম।”[১৮]

শ্রীমায়ের যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত অংশে পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক শোচনীয় বাক্য মনে হয়, “বেগ ধারণ করে করে শেষে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল”, রামকৃষ্ণ যাঁকে দেবীরূপে শ্রদ্ধা করতেন, সেই নারী দেবীত্বের বোঝা স্কন্ধে নিয়ে স্বাভাবিক শৌচকার্য অথবা প্রাতঃকৃত্য করতে পারতেন না। সেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বেগ তাঁকে চেপে রাখতে হত দিনের পর দিন। পেটের রোগ উপেক্ষা করে অজস্র মানুষের রান্না ও অন্যান্য গৃহকাজ করতে হত হাসিমুখে। এই ছিল উনিশ শতকের দেবীদের অবস্থা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘দেবী’ গল্পের দুই-একটি বাক্য এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবীত্বের অমানবিক চাপে, মানসিক পীড়নে যে কিশোরী মেয়েটির সুখের সংসার, স্বামী, আর বেঁচে থাকবার স্বপ্ন হারিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে নিজের অকস্মাৎ দেবীত্বে আস্থা এলেও তার অতি প্রিয় শিশুটির মৃত্যু হলে নিজের অতিমানবিক ক্ষমতায় সংশয় আসে। ততদিনে তার স্বামী অসহায়ভাবে নিরুদ্দেশ। আত্মহত্যার পথকে ‘দেবী’ হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে সহজ বলে মনে হয় তার।

তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারাদিন চিন্তা করিল। সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। যেমন তেমন করিয়া আরতি হইল। পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ!- পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।[১৯]

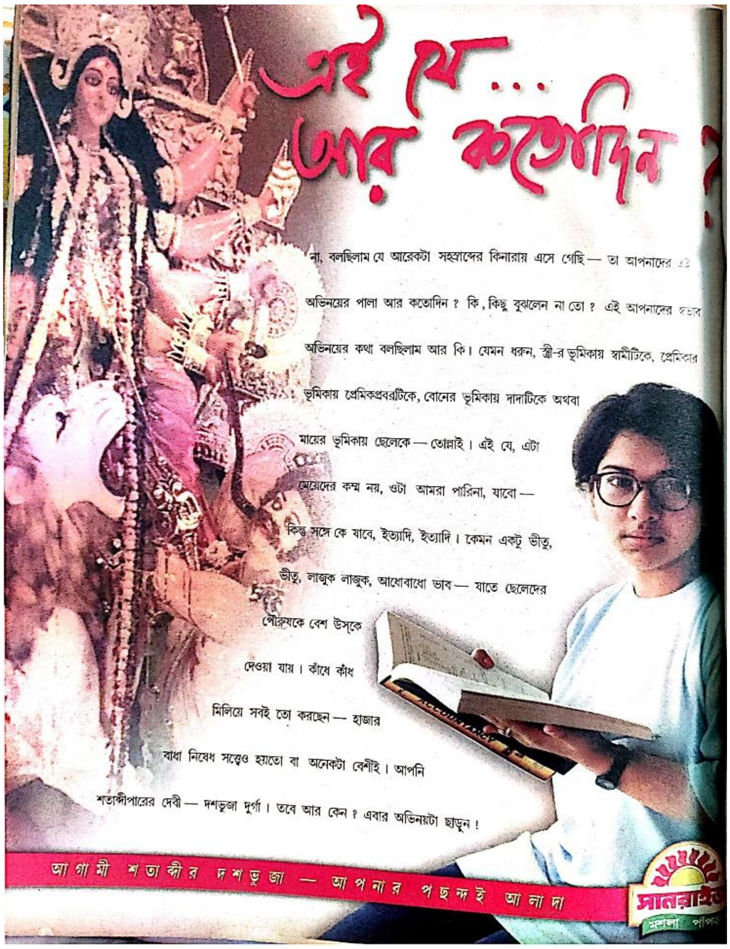

চিত্র ৫.৬ শারদীয়া আনন্দমেলা ১৪০৬

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)-এর এই গল্পটি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) এই গল্পটি চলচ্চিত্রায়িত করেন ১৯৬০ সালে।

নারীদের দেবীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কৌশল থেকে একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়াতেও এই দেশের সমাজ মুক্ত হতে পারেনি। সম্ভবত, এই দেবীত্বের মোড়কে নারীদের উপরে আরও কিছু বাড়তি দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া সহজ হয় বলেই এই কৌশল, এমন ভাবনাও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

আগের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ৫.৬) সানরাইজ মশলা'র। ১৪০৬ বঙ্গাব্দের আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী থেকে এই বিজ্ঞাপনটি প্রাপ্ত। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম থেকে ভিতরের কপিটির বিষয়ে ভালো করে বোঝা না গেলেও, ছবির মেয়েটিকে দেখলে বিজ্ঞাপনটি বেশ প্রগতিশীল বলে মনে হয়। যেখানে মেয়েটির পোশাক টি-শার্ট ও প্যান্ট। হাতে হাতঘড়ি, চোখে চশমা, ছোট করে কাটা চুল, বড় ফ্রেমের চশমা এবং সর্বোপরি হাতে একটি বই। মেয়েটি যে পড়াশোনায় মনোযোগী, তারই একটি সর্বাঙ্গীন চিত্র এই ফোটোগ্রাফটিতে ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞাপনটি পূজাবার্ষিকীতেই সম্ভবত প্রথমবার ব্যবহৃত হয়, কপির একদিকে তাই একটি দেবী দুর্গার মূর্তিও দেখা যায়। এবং তার সঙ্গে মিশে থাকে দশভূজার ধারণাটি।

কপিতে দেখা যায়, মেয়েটিকেই উদ্দেশ্য করে এই কপি। পুরুষদের সঙ্গে হাতে হাত রেখে সবকিছু করেও তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব কেন, কেন তার মধ্যে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতার ভাবটি স্পষ্ট, এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে নারীকে সচেতন করা হয় তার ক্ষমতা বিষয়ে। কপিতে শেষ বাক্যে লেখা থাকে, "কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবই তো করছেন- হাজার বাধা নিষেধ সত্ত্বেও হয়তো বা অনেকটা বেশীই। আপনি শতাব্দীপারের দেবী- দশভুজা দুর্গা। তবে আর কেন? এবার অভিনয়টা ছাড়ুন!" সব মিলিয়ে বিজ্ঞাপনের কথাগুলি চমৎকার। বলার ভঙ্গিও ধারালো। বিজ্ঞাপনের মেয়েদের হাতে দেখা যাচ্ছে বই, সৌন্দর্যের চিরাচরিত সংজ্ঞাকে ভেঙে মেয়েটি তৈরি করছে তার পক্ষে সবচাইতে ব্যবহারপযোগী 'ড্রেস কোড'। কিন্তু এসবের পরেও প্রশ্ন জাগে তখন, যখন সবকিছুর পরে মেয়েটির হাতে ধরানো হয় সেই রান্না করার মশলা। বিজ্ঞাপনটি পড়তে পড়তে প্রায় মনেই থাকে না বিজ্ঞাপনটি কিসের। কিন্তু পড়া শেষ করে পাতার কোণায় চোখ গেলেই দেখা যায় বিজ্ঞাপনটি 'সানরাইজ' এর, অর্থাৎ কিনা গুঁড়োমশলা। মহিলাদের শিক্ষা, আধুনিকতার আবেগকে কাজে লাগিয়ে শেষপর্যন্ত বইপত্রের পাশাপাশি মশলাকেও তো তেমন ভুলতে দেওয়া হয় না। তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় 'শতাব্দীপারের দেবী', 'দশভূজা' ইত্যাদি গুরুতর উপাধি। যে মেয়েটি বাইরের কাজে ব্যস্ত, পড়াশোনা অথবা গবেষণার কারণে যে গৃহকাজে সময় পায় না, অথবা যার গৃহকাজ নিয়ে আদপেই মাথাব্যথা নেই, বাইরের কাজে যে অত্যন্ত দক্ষ, তাকেও কি বিজ্ঞাপনে অলক্ষ্যে ঠেলে দেওয়া হয় না এই 'দেবী', 'দশভূজা' হওয়ার প্রতিযোগিতার দিকে? মেয়েটি 'দশভূজা' বা সর্বগুণসম্পন্না হতেই পারে, তবে তা তার ব্যক্তিগত নির্বাচন। তাকে বাধ্যতামূলকভাবে 'দশভূজা' হতেই হবে, এও এক স্টিরিওটাইপেরই উদাহরণ বলে মনে হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে এরকম কোনও দায়িত্ব থাকে না যদিও। 'লজ্জা নারীর ভূষণ' হবার বিপরীতে এও এক আধুনিক সামাজিক চাপ। বাইরের কাজে নারীকে দক্ষতাকে আপাতদৃষ্টিতে স্বাগত সম্ভাষণের সঙ্গে তাকে একটি মুহূর্তও ভুলতে দেওয়া যাবে না যে রান্নাঘরটিও তাঁরই সামলানো কর্তব্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে প্রকৃত সংসারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনেও যেভাবে নারীকে অজস্র সন্তানধারণ ও প্রতিপালনের মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছিল, সাতের দশক থেকে সেই ছবিতেও বদল আসতে শুরু করে। সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)- এর 'মহানগর' ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬৩ সালে। সত্যজিতের আকর্ষণীয় ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে ছবির পোস্টারে দেখা গিয়েছিল একটি কর্মরত নারীর ছবি। সাংসারের অর্থনৈতিক চাপে যে বাইরের কাজে

যোগ দেয়। কর্মরত মহিলার এই ছবিটি মধ্যবিত্ত, সচেতন, শিক্ষিত বাঙালীর মনে গেঁথে যায় এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে।

উল্টোরথ পত্রিকায় ১৯৭৯ সালে নবনীতা দেবসেনের 'পরভৃৎ' গল্পটি প্রকাশিত হয়, এবং পরে তা তাঁর 'সীতা থেকে শুরু' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র সরমা, সারা জীবন স্বামীর পরিবার, তার ভাই-বোন, বয়স্ক শ্বশুরমশাইকে কিছুটা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল জীবন দিতে গিয়ে নিজের সাধ পূরণ করতে পারেনি। অতি সাধারণ সেই স্বপ্ন। সে তাঁর অপ্রিয় চাকরিটি ছেড়ে নিজের একটি সন্তানকে মানুষ করবে। সারাজীবন পরিবারের মধ্যে বা চাকরিক্ষেত্রে অপরের সন্তানকে মানুষ করে একান্ত নিজের একটি সন্তানের জন্য তাঁর মন তৃষিত হয়ে উঠেছিল।

> ইস্কুলে যেতে হবে ভাবলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আজকাল বাড়ি থেকে বেরুতেই ইচ্ছে করে না সরমার। নাকে-মুখে দুটি গরম ভাত গুঁজে ছাতি বগলে ছোটা। ইচ্ছে করে পান মুখে দিয়ে দুপুর-বেলায় পাখা খুলে, মাদুরে শুয়ে শুয়ে সিনেমার বই পড়তে। আর থাবড়ে থাবড়ে একটা বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে।[২০]

এক সময়ে সমাজ এবং পরিবারের নির্দেশক্রমে যে নারীকে অজস্র যন্ত্রণা সহ্য করে লজ্জাকে ভূষণ বানিয়ে দিনের পর দিন সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে, আর বন্দি থাকতে হয়েছে হেঁসেলে; পরবর্তীতে, সেই পরিবারগুলিতেই আবার পুত্রবধূকে বেরোতে হয়েছে অর্থ রোজগারের জন্য। সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিটি পরিবারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মহিলাদের এমন করে উৎসর্গ করতে হয়েছে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়কে। গৃহ পরিবেশে, অথবা ঘরের বাইরে কোথাওই নিজের মত করে একটু সময় গুছিয়ে নিয়ে "শুয়ে শুয়ে সিনেমার বই" পড়ার মতন অতি সামান্য বিলাসিতা করার সুযোগ মেলেনি। নারীমুক্তির প্রশ্নে এই 'দেবী', 'দশভূজা' ইত্যাদি উপাধি গুলি তাই আরও গোলমেলে হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘদিন ধরে সমাজের একটি রক্তকণিকা থেকে অপরটিতে যে সংস্কার বাহিত হয়ে এসেছে, সেই সংস্কারের শিকার অবশ্যই মেয়েরাও হয়েছেন। মেয়েরাও বিরোধিতা করেছেন নারীমুক্তির। মেয়েদের একটু ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার বিপক্ষে সাড়া দিয়েছেন অন্য মেয়েরাই। তেমনই দুটি মর্মান্তিক উদাহরণ দেওয়া যাক।

১৯৯০ সালের ১৭ মার্চ, *দেশ* পত্রিকার 'কলকাতা তিনশ : নারীর ভূমিকা' সংখ্যায় নীতা সেন সমর্থ একটি লেখাতে লেখেন-

রাজা রামমোহন, কেশব সেন, বিদ্যাসাগর এবং আরও অনেকে প্রতিবাদ করলেন, মেয়েদের কষ্ট দূর করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পর পর কয়েকটি আইন দেশে মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাল। সতীদাহ রোধ (১৮২৯), বিধবা বিবাহ মঞ্জুর (১৮৫৬) এবং Age of Consent এল ১৮৯০-৯২ সালে। মহিলারা কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কিছু বললেন না। যাঁরা সে যুগে বলিয়ে কইয়ে ছিলেন- সেই স্বর্ণকুমারী, কৃষ্ণভাবিনী, জ্ঞানদানন্দিনীরাও চুপ। এমন কি ব্রজবালা যখন বিধবা বিবাহের পক্ষে কবিতা লিখলেন তখন প্রতিবাদ এলো মহিলাদেরই তরফ থেকে। তাঁরা বিধবাদের উন্নতি চাইলেন ঠিকই, কিন্তু বিধবা বিবাহ তাঁদের মনঃপূত ছিল না।

১৮৭৬-এর অক্টোবর-নভেম্বরের বঙ্গমহিলাতে ব্রজবালা কবিতা লিখছেন "আমি কি উন্মাদিনী", বিধবা বিবাহ সমর্থন করতে আবেদন জানাচ্ছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, কেশব সেন এঁদের কাছে। তার প্রত্যুত্তরে কামনা দেবী "আমি তো বিধবা"-তে (বঙ্গ মহিলা ১৮৭৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর) সেই একই ব্যক্তিদের আবেদন জানিয়ে ব্রজবালাকে ব্যঙ্গ করে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে লিখলেন।[২১]

অথবা, ১৯৯৫ সালের ১৫ জুলাই *দেশ* পত্রিকায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 'পুরুষ বাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। রম্য-রচনার আবরণে নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিল দিকগুলি এবং তার ক্রমবিবর্তনকে প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন। সেই লেখারই একটি জায়গায় তিনি বলছেন-

ধোলাইকৃত এই মগজ লইয়া পরিবারে পরিবারে কন্যাদেরও মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা প্রবাহের মতোই চলিয়া আসিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় মাতারাই কন্যাকে সর্বাধিক শাসন করিয়া থাকেন। নারী স্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী মাতারাই। বাল্যে দেখিয়াছি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী পেয়ারাতরুতে আরোহণ করিয়া ডালপালা ভাঙিয়া, কোনো একটি শাখায় শাখামৃগীর মতো পদদ্বয় প্রলম্বিত করিয়া মনের সুখে কষকষ কড়িয়া পেয়ারা চিবাইয়া থু থু করিয়া ফেলিত, তখন আমার মাতা রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করিয়া বলিতেন, 'মনে রাখিস শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে। মদ্দা মেয়েকে কেউ নেবে না। বছর না ঘুরতেই নড়া ধরে বাপের বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে যাবে।' পরবর্তীকালে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম দিদি মা হইবার পর তাহার কন্যাকে ধিঙ্গি বলিয়া তিরস্কার ও ভবিষ্যতে শ্বশুরালয়ে তাহার কি দুরবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া কপাল চাপড়াইতেছে। পতিব্রতা পতিরতা অবিরত সুশীলতা, এই ছিল নারীর আদর্শ।[২২]

নারীরাই যখন হয়ে দাঁড়াচ্ছেন নারীদের মুক্তির পথে বিবিধ অন্তরায়ের একটি, উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখছেন *ভারতের নারী*-র মতন বই, তারই কয়েক দশকের ব্যবধানে ১৯৪১ সাল থেকে *মেয়েদের কথা* নামে একটি

পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এর সম্পাদক ছিলেন কল্যাণী সেন। মেয়েদের সম্পাদনায় একান্তভাবে মেয়েদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করা সেসময়ের নিরিখে অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবেই বিবেচনা করা যায়।

মেয়েদের কথা পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠে *মেয়েদের কথা*-র কার্যাধ্যক্ষ বিজ্ঞাপন দেন, "যুদ্ধের বাজারে আপনার পণ্যের চাহিদা বাড়াতে হলে 'মেয়েদের কথা' তে বিজ্ঞাপন দিন।" অর্থাৎ বিজ্ঞাপিত পণ্যের ক্রেতা হিসাবে মেয়েদের বেশ নামডাক আছে তা বোঝা যায়। এমনকি যুদ্ধের বাজারেও। এই পত্রিকাটিতে অলৌকিক কাহিনি, কবিতা, রম্য রচনা, অণুগল্প, প্রবন্ধ, সমাজ সমালোচনা, অনুবাদ কাহিনি- সবকিছুই প্রকশিত হত। বাদ যেত না রূপচর্চার খুঁটিনাটিও। আটের দশকের মধ্যভাগ থেকে প্রকাশিত হতে থাকা, অপর্ণা সেন সম্পাদিত, আজও জনপ্রিয়, সাড়া জাগানো মেয়েদের পত্রিকা *সানন্দা*-র যেন প্রাচীন বীজটি যেন ছিল *মেয়েদের কথা*-তে।

পত্রিকার ওই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ সংখ্যায় 'স্বাস্থ্য সহায় সৌন্দর্য' নামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ। সেখানে একটি অংশে জানানো হচ্ছে,

> আজ সব তরুণতরুণীকে এই মন্ত্রে আহ্বান করতে হবে-"নিজের মধ্যে, নিজের শক্তিতে, নিজের মাধুর্যে বিশ্বাস রাখ; নিজের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের এমন পূর্ণতা লাভ কর যাতে অন্যে তোমার মূল্য বোঝে, তোমাকে বিশ্বাস করে।........... সৌন্দর্য সাধনায় নিজের রূপ ধারণ করে নিজের বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ কর।"[২৩]

'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী' খ্যাত সৌন্দর্যের গতানুগতিক সংজ্ঞাকে ছাড়িয়ে এই প্রবন্ধাংশ নারীদের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠতে বলে। বলা হয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার কথা।

এই পত্রিকারই 'আমাদের কথা' অংশে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে দেন তাঁদের অবস্থান।

> আমরা নারী, এই আমাদের একমাত্র পরিচয়। নারীসমাজ ভারতের অবনত ও অনুন্নত শ্রেণীসমূহের মধ্যে অন্যতম। তাই আমাদের কাজ দলবদ্ধ হয়ে আমাদের "শ্রেণীস্বার্থ" রক্ষা করবার জন্য জাগ্রত হওয়া, জ্ঞানলাভ করা। আমরা মা তাই শিশুপালন ও শাসনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা আমাদের কর্তব্য। আমরা গৃহিণী, তাই সংসারের সুব্যববস্থার ও গৃহকে শ্রী ও শান্তিমন্ডিত করে তুলবার বিষয়ে পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করে উপকৃত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা নারী, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা আমাদের চরিত্রের অপরিহার্য দুর্বলতা তাই রূপচর্চা ও ফ্যাশান সম্বন্ধে যে আমরা আলোচনা করব না এমন কথা হলফ্ করে বলতে পারিনা।

> সর্বশেষে কিন্তু সর্বোপরি আমরা মানুষ, তাই আমাদের পত্রিকায় হালকা ও গভীর নানা বিচিত্র ভাবপূর্ণ গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে। এর মধ্যেও আমরা একটি বিশেষত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা চেষ্টা করব। এ পত্রিকায় সর্বশ্রেণীর, সর্বমতাবলম্বী মেয়েদের মতামত (অবশ্য যদি তার প্রকাশ আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক না হয়) পক্ষপাত শূন্য ভাবে প্রকাশ করব। নানা আলাপ-আলোচনা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে "মেয়েদের কথার" পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করবার জন্য আমরা মেয়েদের আহ্বান করছি।[২৪]

পূর্বেই দেখা গেছে, এই পত্রিকার সম্পাদক একজন মহিলা এবং এই পত্রিকা সরাসরিভাবে নারীদের কণ্ঠস্বর সকলের সামনে মেলে ধরার ডাক দেন।

বিংশ শতাব্দীর চারেক দশক থেকে এই আলোচনাকে আরেকটু পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের প্রথম অংশ 'জ্যাঠামশাই' তে জানা যায়-

> বালক-বয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তাঁর পূর্ব্বেই তিনি ম্যালথ্স্ পড়িয়াছিলেন, আর বিবাহ করেন নাই।[২৫]

কে এই ম্যালথস, যাঁর মতামত পড়ে জ্যাঠামশাই দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন না? ম্যালথস (১৭৬৬-১৮৩৪)[২৬] ছিলেন একইসঙ্গে অর্থনীতিবিদ এবং গণিতজ্ঞ। তিনি বলেন আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে Geometric Progression-এ। কিন্তু আমাদের খাদ্যের উৎপাদন বাড়ছে Arithmatic Progression-এ। সেই কারণে মানবসভ্যতায় এমন একটা সময় আসবে যখন সমস্ত মানুষের মুখে খাবার জোগানো মুশকিল হবে। তবে তিনি অবশ্যই কোনও কৃত্রিম জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা বলেননি। তিনি বরং বলেছিলেন নৈতিক সংযমের কথা। ম্যালথসের মৃত্যুর পরে উনিশ শতকের শেষ দিকে 'ম্যালথুজিয়ান লীগ' (১৮৭৭) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লীগের সদস্যদের মধ্যে অ্যানি বেসান্তও ছিলেন। এরা প্রথম বিভিন্ন কৃত্রিম পদ্ধতিতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলতে শুরু করেন। প্রচার চালাতে থাকলেও মূল উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছিল না।

এই কথার সূত্র ধরে মার্গারেট সেঙ্গার (১৮৭৯-১৯৬৬)-এর কথায় আসা যাক। জন্মসূত্রে তিনি আমেরিকান। 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ' শব্দটাই তাঁর হাত ধরে পরিচিতি পায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছর (১৯১৪) থেকে। সে সময়ে আমেরিকাতে কৃত্রিমভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ছিল বে-আইনি। ঈশ্বর যে শিশু এনে দেন মাতৃগর্ভে, সেই শিশুর জন্ম-নিয়ন্ত্রণ যেন ঈশ্বরের উপরেই এক দান নেওয়া। এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি সমাজে গভীরভাবে প্রতিহত হচ্ছিলো। মার্গারেট গ্রেপ্তার হলেন। কিছুদিন পরে জামিন পেয়ে তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান।

সেখানে কিছুদিন কাজ করার পরে পুনরায় আমেরিকায় ফিরে তিনি একটি জন্ম-নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র খোলেন। এবং খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হন। কিন্তু সেঙ্গারের গ্রেপ্তার হওয়া, তাঁর লড়াই চালিয়ে যাওয়া; এই ঘটনাগুলি সমাজকে একটু একটু করে প্রভাবিত করতে শুরু করে। মেয়েদের শারীরিক সুস্থতা নিয়ে কথা আরম্ভ হল। বিষয়টি নিয়ে সমাজে বিতর্ক তৈরি হল এবং বলা বাহুল্য খ্রিস্টান ধর্ম এবং গির্জা এর বিপক্ষে দাঁড়াল। এইভাবেই সমাজে প্রগতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। সমাজমনে মেয়েদের এই নিজস্ব সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার পক্ষে একটা মতামত তৈরি হল। বিভিন্ন মানুষ তার পক্ষে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। প্রকৃত নারীমুক্তির ইতিহাস লুকিয়ে আছে মার্গারেট সেঙ্গারের এই সংগ্রামের মধ্যে। মার্গারেট সেঙ্গারের বেশ কিছু বছর পরে (১৯২১) ব্রিটেনে প্রথম জন্ম-নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রিটেনে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেন মেরী স্টোপস্ (১৮৮০-১৯৫৮)। নারী-স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে এই ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করা কর্তব্য, যেখানে নারীর নিজের গর্ভের উপর তার অধিকার জন্মায়।

বিজ্ঞাপনে নারীর ভূমিকা অথবা বিজ্ঞাপন নারীকে কীভাবে ব্যবহার করে, এবং তার ধারাবাহিক পরিবর্তনকে দেখে নেওয়াই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞাপনের স্টিরিওটাইপগুলি নিয়ে আগেই কথা হচ্ছিলো।

তার মধ্যে সবচাইতে প্রাথমিক স্টিরিওটাইপটি ছিল, মেয়েরা হবে গৃহবধূ এবং ছেলেরা বাইরের কাজ করবে। ঘর এবং বাহিরের মূল বিভাজন হয় এখানে। সে গৃহবধূ বলে তার কতকগুলি বিশেষ কাজের দায়িত্ব ধরাবাঁধা হয়ে যায়। ঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তার মধ্যে পড়ে। সন্তানদের দেখভাল, তাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, অথবা স্বামীর পোশাককে গুছিয়ে রাখা, তার পরিচ্ছন্নতা এসব বিশেষভাবে নারীদের দপ্তর। সংসারকে গুছিয়ে তোলার দ্রব্যগুলিকে বিজ্ঞাপিত করা হত বা হয় মেয়েদের সামনে রেখে।

এই ঘর ও বাহিরের গতানুগতিক দেখার বাইরে আরেকটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ তৈরি হয় বিজ্ঞাপনে। এই যে গৃহবধূর ভূমিকা, তারই একটি বর্ধিত অংশ মিশে থাকে এই দৃষ্টিকোণে; সেটি একেবারেই পুরুষের দৃষ্টি থেকে নারীদের দেখা। যখনই পুরুষের দৃষ্টি থেকে মেয়েদের দেখা হবে, পুরুষ যেভাবে নারীর সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করতে চায়, সেই হল তার সংজ্ঞায়িত হয়ে ওঠা। এখানে দুটি ভূমিকা থাকে, একটাকে বলা যায় decorative role, অপরটি recreational role। decorative role মানে হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রতীক সে, তার মুখ সুন্দর, সে থাকলে বিজ্ঞাপনটা সুন্দর হয়ে ওঠে। আর recreational role অর্থে পুরুষকে নারী এক ধরনের বিনোদন এনে দেবে, পুরুষের চোখের সুখ তৈরি করাই প্রধান ভূমিকা। যখনই পুরুষ তাকে কীভাবে দেখছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই নারীর বিশেষভাবে পণ্যায়ন হয়।

চিত্র ৫.৭ পরিচয় শারদ সংখ্যা, ১৩৬৮

মেয়েদের ঘরের কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যাক। সানলাইটের বিজ্ঞাপনের শিরোনামটিতেই বুঝতে বাকি থাকে না, এই বাক্যে এক ধরনের বক্রোক্তি আছে। 'যদি ভাবেন ওঁকে খুশী করা সহজ', পরের অংশটিতে মূল কথা বোঝা যায়, 'তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল করবেন'- এই কথাটি যিনি বলেন তাঁর নাম শ্রীমতী আর আর প্রভু।

বোঝা যায় তাঁর স্বামী ধব্‌ধবে ফরসা কাপড় ছাড়া তুষ্ট হন না, বোঝা যায় তাঁর স্বামী স্ত্রীকে গৃহকাজে আদপেই সাহায্য করেন না, বোঝা যায় তাঁরা সানলাইট ব্যবহার করে সুখী, কারণ ছবিটিতে স্বামীর মুখে সম্ভবত আয়না দেখে এক ধরনের পরিতৃপ্তির ছাপ দেখা যায়, পিছনে তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে উপভোগ করেন স্বামীর তৃপ্তিটুকু, এবং শেষপর্যন্ত বোঝা যায় যে, তাঁর নামটি পর্যন্ত তাঁর নিজের নয়, স্বামীর নামেই তিনি পরিচিত। ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে কখনো নামের প্রাথমিক বর্ণ ব্যবহার করা হয় না নাম বলার ক্ষেত্রে। 'আর আর প্রভু'র স্ত্রী তাঁর খুঁতখুঁতে স্বামীর সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে ঢুকে যান, সে তাঁর স্বামী যতই অবুঝ, ছেলেমানুষ এবং সামান্য গৃহকর্মে অ-পটু হন না কেন।

যদিও অধিকাংশ পাঠক বা দর্শকের কাছে এই বিজ্ঞাপন এমনকি একবিংশ শতাব্দীতেও অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। স্ত্রী গৃহকর্ম করবেন এবং স্বামী বাইরের কাজ করে বাড়ি এসে স্ত্রীর সামান্য কাজের ভুলে খুঁত ধরবেন, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা তো নেইই, বরং বহু ক্ষেত্রেই মিশে থাকে স্ত্রী অথবা পরিবারের অন্যান্য নারীদের প্রচ্ছন্ন বা প্রকট প্রশ্রয়।

এ তো গেল গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের বিজ্ঞাপন। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চিত্রে কেমন পরিবর্তন আসে তারও তিন দশকেরও বেশি সময় অতিক্রম করে নয়ের দশকে। বিজ্ঞাপনটি ক্যাডবেরি কোম্পানির ডেয়ারি মিল্ক চকোলেটের। 'কখনো কখনো বাচ্চাদের বায়না মেটাতেই হয় (আর বিশেষ ক'রে যেটিকে বিয়ে করেছেন!)' এমন আদুরে শিরোনাম চকোলেটের মতন অতি সুস্বাদু খাদ্যের সঙ্গে মানানসই। বয়স্ক শিশুর মুখেও সেই আহ্লাদি ভাব স্পষ্ট। বিজ্ঞাপনটির মধ্যে আপত্তিজনক কিছু চোখে পড়ে না, স্বামীর কর্তৃত্বের পরিবর্তে এক শিশুসুলভ বায়নার হাসি দর্শককে আনন্দ দেয়। শুধু একটি কথা এ প্রসঙ্গে একেবারে মন থেকে মুছে দেওয়া যায় না যে, মেয়েদের এমন আদুরে ভূমিকায় প্রায় কোনও বিজ্ঞাপনেই দেখা যায় না। তাঁরা কর্ত্রী,

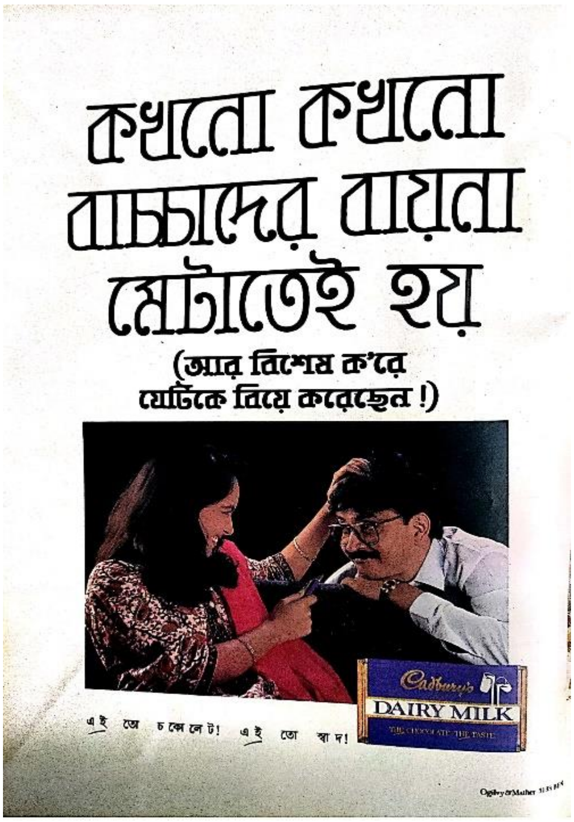

চিত্র ৫.৮ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৪০০

দায়িত্বশীলা, দশভূজা, মা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেদের ভিতরের শিশুটিকে আর আদরযত্ন করবার তেমন সময় পান না। যখন তাঁর আত্মজ-আত্মজাদের সঙ্গে আবার স্বামীও এসে যোগ দেন, তখন দায়িত্ব গুরুতর হয়। বিজ্ঞাপনে পুরুষদের নানান সময়ে দেখা যায় নানা ভূমিকায়; কখনো পুরুষ-সিংহ, কখনো বা পুরুষ-শিশু। মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক, পারিবারিক কারণে এই অবস্থান বদল খুব একটা সম্ভবপর হয় না; স্বামীর দৈনন্দিন ব্যবহারের পোশাক ধব্ধবে সাদা রাখতে, আবার সেই স্বামীরই আদুরে বায়না মেটাতে মেটাতে বিবাহের পরে আর নিজের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সে ভাবে হয়ে ওঠে না।

চিত্র ৫.৯ দেশ, ৪ এপ্রিল, ১৯৮৭

এই আলোচনায় অল্প আগে, বিজ্ঞাপনে নারীদের পুরুষকে বিনোদন করবার ভূমিকাটি, এবং তার ‘সৌন্দর্য’র মাধ্যমে বিজ্ঞাপনকে সুদৃশ্য করে তোলা নিয়ে কথা হয়। ‘Diplomat’ এর বিজ্ঞাপনটিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পাশে রাখা যাক। এটি একটি হুইস্কি-র বিজ্ঞাপন। এই ধরনের পানীয়’র বিজ্ঞাপনে, সেটি কী দ্রব্য, তা কোনওকালেই সরাসরি প্রকাশ করা হয় না। কখনো ‘মিনারেল ওয়াটার’, কখনো ‘কোলন’, কখনো বা ‘মিউজিক সিডি’-ইত্যাদি নামের আবডাল ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও সে আড়াল এমনই বেশিরকম প্রকাশিত হয়ে পড়ে, যে শিশুদেরও আসলে বিজ্ঞাপনটি কীসের, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেবল নিয়ম-রক্ষার্থেই চলে আসছে এই লুকোচুরি। বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য নির্মিত এই উল্লাসের উপকরণ। গত শতাব্দীর আটের দশকেও নারীদের উদ্দেশ্য করে পানীয়’র বিজ্ঞাপন তৈরি হত না। এখানে, বিজ্ঞাপনের মডেল ডিম্পল কাপাডিয়ার চোখে একধরনের মায়াময় ঘোর লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে থাকে পুরুষকে আহ্বানের ঈঙ্গিত। এই পণ্যকে বিজ্ঞাপন কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করেন ‘পুরুষত্বের পরিমাপ’ হিসাবে। ‘পুরুষত্ব’ নামক বিমূর্ত বিষয়টিকে চিহ্নিত করতে

ব্যবহার করা হয় আকর্ষণীয় মহিলার ছবি, যাঁর তাঁর পুরুষসঙ্গীকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর কোনও নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য নয়, কেবল নিবেদিতপ্রাণ Diplomat-প্রেমী হলেই চলে যাবে। বিজ্ঞাপনে ডিম্পল কাপাডিয়া যেন তাঁর চটুল, নেশা-ধরানো দৃষ্টি ছুঁড়ে দেন পুরুষদের উদ্দেশে। জানান, "যে দেবে ডিপ্লোম্যাট-কে সঙ্গ/ সেই হবে আমার অন্তরঙ্গ"। মেয়েরা ঠিক কোন কোন গুণাবলী থাকলে পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন, তার একটা অতি-সরল হিসাব করে রাখে সমাজ, বিজ্ঞাপনেও সেই হিসাবের গরমিল হয় না।

বিজ্ঞাপনে নারীর এই ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। এই Cologne-এর আবডালে এই পণ্যের টার্গেট দর্শক এবং ক্রেতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরাই। কিন্তু বিজ্ঞাপনে সুন্দরী নারীর 'eye candy' হিসাবে উপস্থিতি পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে তুলতে পারে, এই প্রত্যয় বিজ্ঞাপন সংস্থার থাকে।

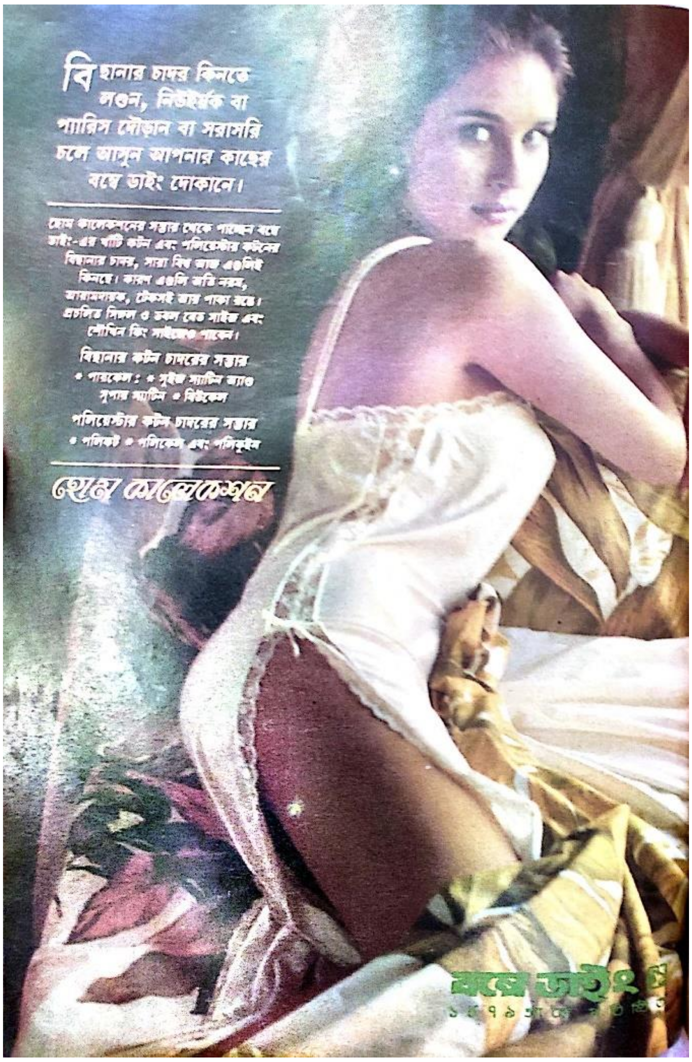

চিত্র ৫.১০ শারদীয় দেশ, ১৪০১

বোম্বে ডাইং এর একটি বিজ্ঞাপনেও সেই একই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বোম্বে ডাইং-এর বিছানার চাদরের উপর শুয়ে আছে একটি স্বল্পপোশাকের সুন্দরী নারী। বিছানার চাদরে কেবল মেয়েরাই শোয়, বিষয়টা এমন নয়। এই রাত্রিবাস পরিহিতা নারী-শরীর যে বিক্রয়যোগ্য এক উপাদান, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিছানার চাদর কেমন কেনা হবে, তা মূলত সিদ্ধান্ত

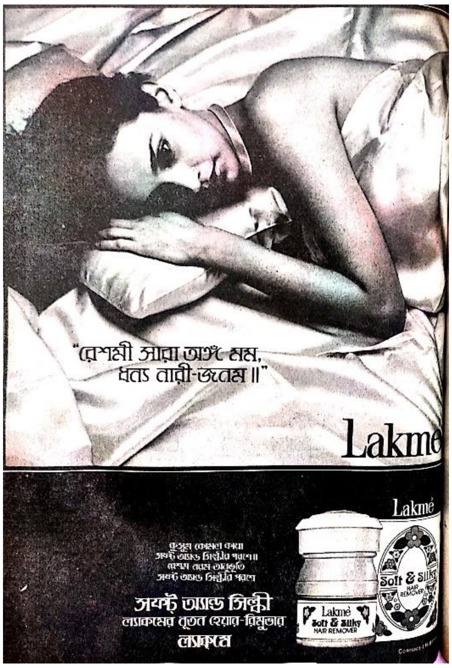

চিত্র ৫.১১ দেশ, সুবর্ণজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৩

নেন বাড়ির মেয়েরাই। তথাপি এই দৃশ্যগত এবং বিনোদনমূলক ভূমিকায় মেয়েদের এমনই চাহিদা যে, চাদর কেনার সিদ্ধান্ত বাড়ির গৃহিনীরা নিলেও এখানে একটি মেয়ের ছবিই বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় এবং হতেই থাকবে। এই নারীদেহই বিজ্ঞাপনটিকে আকর্ষণীয় করে তুলবে। এর বাইরে এই বিজ্ঞাপনের কোনও বাড়তি বক্তব্য নেই, ছবিটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকা ছাড়া।

ল্যাকমে'র এই বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ৫.১১) আটের দশকের। "রেশমী সারা অঙ্গ মম,/ ধন্য নারী জনম।।", এই হল বিজ্ঞাপনটির শিরোনাম। 'Womenhood' বা 'নারীত্ব'কে বিজ্ঞাপন নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, তার মধ্যে এটি হল একটি নারীত্বের পরিচয়, যে তার ত্বক হতে হবে কোমল রেশমের মতন। তার কোমল ত্বক না থাকলে সে ঠিক ততটা নারী হয়ে উঠবে না, যতটা এই ল্যাকমে ব্যবহারকারিণী হয়ে উঠেছেন। অতএব কাঙ্ক্ষিত 'নারীত্ব' পেতে কিনতে হবে 'ল্যাকমে' কোম্পানির 'সফট অ্যান্ড সিল্কী হেয়ার রিমূভার' ক্রীম।

চিত্র ৫.১২ দেশ, ১৯ ভাদ্র, ১৩৭৭

এই সূত্র ধরে 'অ্যান ফ্রেঞ্চ'-এর হেয়ার রিমূভার ক্রীমের কথাও উঠে আসে। সাতের দশকের একেবারে শুরুতে এই বিজ্ঞাপন পাই। হেয়ার রিমূভার ক্রীম একধরনের gender sensitive পণ্য। এটা হল ভোগ্যপণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষৌরকর্ম বিশেষভাবে পুরুষদের কাজ, এই কথা জানান দিয়ে যায় বিজ্ঞাপনটি। ক্রীমের মধ্যে এমন এক ধরনের বিজ্ঞাপিত কোমলতা আছে, যা বিশেষভাবে মেয়েদেরই সাজে। তাই মেয়েদের ক্ষৌরকর্মের মতন রুক্ষ কাজ তাদের জন্য নয়। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, সমাজমন বিজ্ঞাপন তৈরি করে দেয়। মানুষ তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন সেসময়, আজও। এখন একবিংশ শতাব্দীতে

razor নারীদের ব্যবহারের জন্যও পাওয়া যায়। তবে তার ব্লেড কিছু আলাদা কোমলতাযুক্ত নয়, বাণিজ্যিক প্রতিভায় সেই razor- এর রঙ কালো থেকে বদলে করা হয়েছে গোলাপি, বেগুনি অথবা আকাশী নীল, সমাজমনে এই সব কোমল রঙগুলি বিশেষভাবে নারীদের আদরের, এমন একটি ধারণা গেঁথে বসে আছে। রঙের সঙ্গেও জুড়ে যায় লিঙ্গ-পরিচয়। কপির উপরে বড় বড় করে লেখা থাকে, “বাহুমূলে চুল থাকলে এ রূপের কী দশা হত ভাবুন তো...”। আর ভিতরে লেখা থাকে, “ক্ষৌরকর্মের ধার দিয়েও যাবেন না। ওসব পুরুষদেরই সাজে”। এই বিজ্ঞাপন দেখার পরে, অর্থনৈতিক সম্বল থাকলে যে কোনও মেয়েই চেষ্টা করবে এই ‘অ্যান ফ্রেঞ্চ’ ব্যবহার করতে। লক্ষ্যণীয়, বিজ্ঞাপন দীর্ঘদিন তৈরি করে দেয় পুরুষালি রঙ, গন্ধ, চামড়ার বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা। এটা বিজ্ঞাপনের নিজস্ব শক্তি। রূপের ধারণা তৈরি করে দেয় বিজ্ঞাপন, যাঁরা সেই ছকের মধ্যে পড়েন না, তাঁরা সমাজে একঘরে হয়ে পড়েন। দেহকেশ পুরুষদের থাকলে তা বিশেষভাবে হয়ে ওঠে পুরুষালী আর মেয়েদের ক্ষেত্রে সেই একই জিনিস কুৎসিত, এই হল বিজ্ঞাপনের প্রভাব। দশকের পর দশক অতিক্রান্ত হলেও সেই সমাজমনে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না।

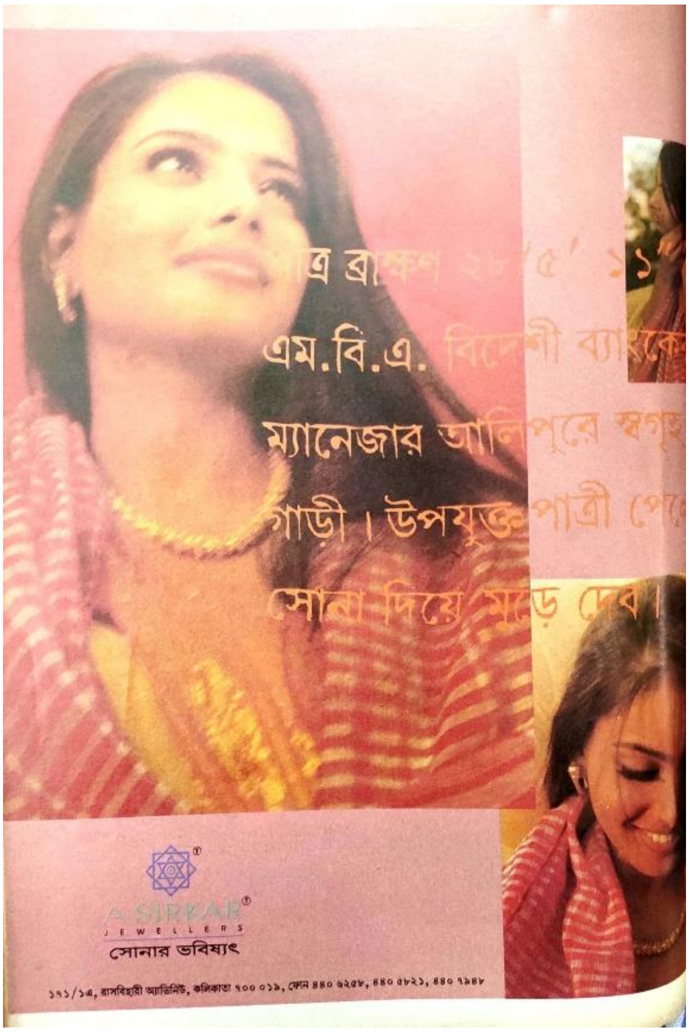

চিত্র ৫.১৩ দেশ, শারদীয় ১৪০৩

পরের বিজ্ঞাপনটি হল সোনার গয়নার। A.SARKAR এর গহনার ট্যাগলাইন হল ‘সোনার ভবিষ্যৎ’। বিজ্ঞাপনটি ‘পাত্রী চাই’ এর ধাঁচে বানানো। ‘উপযুক্ত’ পাত্র’র বর্ণনা দেওয়া হয়, তার বয়স ২৮, উচ্চতা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, এম. বি. এ, বিদেশী ব্যাংকের ম্যানেজার, আলিপুরে বাড়ি এবং গাড়ী। এহেন ‘উপযুক্ত’ পাত্রের জন্য পাত্রপক্ষ ‘উপযুক্ত’ পাত্রী চান। আদর্শ বয়স এবং উচ্চতাযুক্ত এই পাত্র ‘বিদেশী’ ব্যাংকের ম্যানেজার। কলকাতার আলিপুরের মতন ধনী পাড়ায় তার বাসগৃহ এবং অবশ্যই তার

একটি গাড়ি আছে। বিয়ের বাজারে ঠিক এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলে সেই ছেলের জন্য ‘উপযুক্ত’ পাত্রী পেতে অসুবিধা হয় না। ‘উপযুক্ত’ শব্দটি কয়েকটি বিশেষণে সীমাবদ্ধ এ ক্ষেত্রে। ‘সুন্দরী’, ‘স্মার্ট’, ‘স্লিম’ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত মেয়েই বিয়ের বাজারে কাঙ্ক্ষিত, যে ইংরেজি ভাষায় সড়গড় হলেও ‘ঘরোয়া’ হওয়া যার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। তারপরে তার শ্বশুরবাড়ি ও স্বামী তাকে কর্মক্ষেত্রে যেতে ‘অনুমতি’ দিলে সে তাদেরই মহত্ব। এমন একটি ‘দামি’ ছেলের জন্য তাঁরা পাত্রী খোঁজেন, মেয়েটি তাঁদের ছেলের উপযুক্ত হলে যাকে ‘সোনা দিয়ে মুড়ে’ দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে প্রলুব্ধ করার চমৎকার উদাহরণ এটি।

পড়লে এই বিশ্বাস জেগে ওঠে যে কন্যাকূল অথবা স্বয়ং পাত্রী’র তাঁর ‘জীবনসঙ্গী’র ‘রূপ’ এবং টাকাপয়সা নিয়েই একমাত্র ভাবনা। এরপরে ছেলেটি মানুষ হিসাবে কেমন অথবা বৈবাহিক জীবনে দায়িত্বশীল হবে কিনা, এসব প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। মেয়েদের প্রতি এই বিজ্ঞাপনে এক লোভনীয় ফাঁদ পাতা হয়েছে বলে মনে হলেও, এবং সত্যি কথা বলতে, ঘটনাটি প্রায় সেরকম হলেও; এই সমাজে ঠিক এই ‘গুণ’গুলি থাকলে সে পাত্র লাভ যে প্রায় লটারি জেতার সমতুল, এ কথা সত্য। বহু নারীও এইধরনের পাত্রকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, এক্ষেত্রে কে দোষী, সে কথাও অবান্তর হয়ে যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ তাদের মনের মনে বহন করে চলেছেন পুরুষতন্ত্র। নারীরাও সেই মনের অধিকারী বহুক্ষেত্রেই।

তবে এসবের থেকে এমন কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে বিজ্ঞাপনের সবকিছুই নারীপ্রগতিবিরোধী। আপাতভাবে বহু বিজ্ঞাপনেই আছে আধুনিকতার ছাপ, কিন্তু কিছু বিজ্ঞাপন সত্যিই গতানুগতিকতাকে ভাঙতে শুরু করে। আটের দশকে কমপ্লানের বিজ্ঞাপনের শিরোনামে লেখা হয়েছে “বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান”, ভেতরে কিশোরদের বেড়ে ওঠার বয়সে কমপ্লানের প্রয়োজনীয়তা কী তার বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তার সঙ্গে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে দুটি স্বাস্থ্যবান কিশোরী মেয়ের। তাদের হাতে দড়ি-লাফের দড়ি, মুখে হাসি। ‘ছেলেমেয়ে’ বলেও কেবল দুটি মেয়ের ছবি ব্যবহার বেশ উল্লেখযোগ্য বলেই মনে হয়।

চিত্র ৫.১৪ দেশ, ২ জানুয়ারি, ১৯৮৮

এই কমপ্লানেরই প্রায় সমসময়ের অন্য একটি বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয় সাঁতারের পোশাক-পরিহিতা সাঁতারু অনীতা সুদের (১৯৭৩-) ছবি। উল্লেখ্য, মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০) লিখিত 'কোনি' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। এবং সরোজ দে উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত করেন। ছবি হিসাবে 'কোনি' মুক্তি পায় ১৯৮৪ সালে। এই বিজ্ঞাপনে সেই ছবিটির প্রভাব থাকা খুব অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞাপনে প্রগতি, আধুনিকতার সঙ্গে আধুনিকতার মোড়কে গতানুগতিকতার; মুক্তির সঙ্গে বদ্ধতার টানাপোড়েন চলেছে। যেমন টানাপোড়েন চলে সমাজে। অবিরত, ক্রমান্বয়ে।

Desire and Defiance বইতে অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মহিলাদের উপর পরিবারগতভাবে যত কঠিন নিয়ম-কানুনের বেড়াজালই চাপিয়ে দেওয়া হোক না কেন, স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য পুরুষদের প্রতি আনুগত্য এবং ক্রমান্বয়ে দাসত্বের পরিবেশের মধ্যেও কিছু মহিলা সামাজিক নিয়ম অমান্য করে তাঁদের ইচ্ছাপূরণের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন-

> Desire and Defiance retells the story of heterosexual love in Bengal from Woman's perspective. Focusing primarily on upper-caste Bengali women from both Hindu and Brahmo backgrounds, this book explores aspects of heterosexual intimacy that were considered transgressive by upper-caste Hindu society. Resisting societal attempts to confine their sexuality, many upper-caste Hindu and Brahmo women married (or

remarried) according to their own choice, or engaged in non-marital and extra-marital intimacy.[২৭]

সমাজ মেয়েদের জীবনে প্রতিবন্ধকতা যতই বাড়িয়ে তুলুক, সেই ভয়ানক প্রতিকূলতার মধ্যে তীব্র সাহস এবং ইচ্ছাশক্তির বশে; কিছু মহিলা পেয়েছিলেন কঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ। নিজেদের মতন একটি জীবন তাঁরা কাটাতে পেরেছিলেন। মানসিক টানাপোড়েন এবং সামাজিক শাসনের মধ্যেও এমন সাহসী পদক্ষেপ উল্লেখের দাবি রাখে। *কেয়াবৎ মেয়ে* বইতে শ্রীপান্থ লিখছেন,

> ১৮৯২ সনে 'কনসেন্ট বিল'। আইন হল, বারো বছর বয়স না হলে কনে স্বামীর ঘর করতে যেতে পারবে না। প্রতিবাদে গড়ের মাঠে নাকি মহতী সভা। কালীঘাটে লোকে লোকারণ্য। 'জন্মভূমি' লিখছে- "বিলের বিরুদ্ধে অন্তত দশ সহস্র দরখাস্ত বড়লাট ভবনে উপনীত হইবার সম্ভাবনা। বিলের বিরুদ্ধে দেশে সভা-সমিতি যে কত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।" পটলডাঙ্গার আলবার্ট হল, জানবাজারের সাবিত্রী সভা, বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়ি, মজলিস-সভা স্টার থিয়েটার, সিকদারবাগান লেন, ভাগীরথী তটে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট- ইত্যাদি অনেক সভার বিবরণ দিয়েছে 'জন্মভূমি'। কিন্তু আসল অস্ত্র জোগালেন বুঝি অমৃতলাল বসু। তিনি লিখলেন- "সম্মতি সঙ্কট" প্রহসন। কনের মা তাতে বলেছেন- "পুর্নবে হলে জামাই ঘরে শোবে না ত কি তিন ছেলের মা হলে শোবে!" লেখকের কথা : আম যেমন ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ থেকে পাকে না, তেমনই মেয়ের যৌবন আসারও কোনও বয়সের নিয়ম নেই!
>
> শুনে নিশ্চয় বিস্তর হেসেছেন দর্শক এবং শ্রোতারা। হাসির কথাই বটে। ঠিক তেমনই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সেদিন অন্যতম উপলক্ষ আধুনিক-শিক্ষা। বিশেষ করে মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষা। অর্থাৎ, কেয়াবৎ-মেয়েরা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নারী-প্রগতি সংক্রান্ত ব্যঙ্গ "ব্যঙ্গ দর্শন"- এ যে কোর্স বা পাঠক্রম সাজিয়েছেন তাতে অন্যতম- স্ত্রীশিক্ষা। "সঙ্গীত প্রকরণ; নৃত্য প্রকরণ, প্রণয় প্রকরণ, বিরহ প্রকরণ, কুলত্যাগ, গৃহত্যাগ, পিতৃমাতৃ-ভ্রাতৃত্যাগ প্রকরণ, নাটক উপন্যাস, পদ্য রচনা, পত্র রচনা এবং গুরুজন লাঞ্ছনা। মেয়েরা এসব বিদ্যায় পটু হলে তাদের ক্ষেত্রে যে-সব বিয়ে সিদ্ধ সেগুলো হচ্ছে : বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ, কুমারী বিবাহ, অচির বিবাহ, বিবিধ বিবাহ। প্রগতিশীলা মেয়েদের পক্ষে অপ্‌শনাল বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন তিনি মদ ও মুর্গি।"
>
> এর প্রত্যেকটির দায়ে প্রহসন রচয়িতারা সেদিন দায়ী করেছেন শিক্ষিত মেয়েদের।[২৮]

কেয়াবৎ মেয়ে শব্দদ্বয়ের অর্থ হল 'শাবাশ মেয়ে'। বাংলার ঘরে ঘরে দীর্ঘদিন ধরে ব্রত পালন করা যে মেয়েরা স্বামীর পদসেবা করে স্বামী ভক্তি বা পাতিব্রত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন তৈরি করেছেন, সেই পদপ্রান্তে আশ্রিতা নারীর

পরিচিত চেহারা পরিবর্তিত হতে শুরু করে উনিশ শতক থেকেই। স্কুল-কলেজে যেতে শুরু করে তারা। সে নিয়ে সমাজে নিন্দা কম হয়নি। ব্যঙ্গের মুখোমুখি হতে হত তাদের প্রতিনিয়তই। শিক্ষিতা মেয়েদের ব্যঙ্গ করে লেখা হতে থাকে নানান প্রহসন। নারী শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আক্রমণও তীব্র হয়েছে।

অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপান্থ দুজনের বই থেকেই উনিশ শতকের টানাপোড়েনের ছবি পড়ে নেওয়া যায়। উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত, নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি'র ইতিহাস টানাপোড়েনেরই ইতিহাস।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ (১৮৮২-১৯৪১) 'Women and Fiction' বিষয়ে ১৯২৮ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত দুটি কলেজে বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতাই পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত বই হিসাবে প্রকাশিত হয়। বইয়ের নাম *A Room of One's Own*। মহিলাদের যদি সাহিত্য রচনার মতো সৃজনশীল কিছু করতে হয়, যে কাজে নিজেদের চিন্তাশক্তি প্রয়োজন; সেই সৃষ্টির জন্য দুটি জিনিস বাধ্যতামূলক। এক হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং অন্যটি হল একান্ত ব্যক্তিগত একটি ঘর। উল্‌ফ্, মেয়েদের মুক্তির জন্য আক্ষরিক অর্থেই এই দুটি প্রধান উপকরণের কথা বলেন।

> All I could do was to offer you an opinion upon one minor point- a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction; and that, as you will see, leaves the great problem of the true nature of woman and the true nature of fiction unsolved.[২৯]

অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে, এবং একার একটি ব্যক্তিগত জায়গা, একার ভাবনার উপযুক্ত পরিবেশটি পেলে; যা পেয়ে পুরুষ প্রকৃতির বুকে ঝাঁপ দিতে পারে, অপু বেরিয়ে পড়তে পারে শৈশবে পড়া, রত্নভরা ডুবে যাওয়া জাহাজ পোর্তো-প্লাতার খোঁজে, তারাপদ সব বন্ধন ছিঁড়ে পৃথিবীর বুকে হারিয়ে যেতে পারে, নারীও হয়তো তেমনই মুক্তির স্বাদ পেতে পারতো। সমাজ সংসারের বেড়াজালের বাইরে বেরোতে না পারায় বিমূর্ততার সৌন্দর্য্য তার কাছে ধরা পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যাকেই চিহ্নিত করেছিলেন অন্তরের সমস্যা হিসাবে অর্থাৎ তাকে বেরোনোর সুযোগ দিলেও সে বেরোতে পারবে না সেই বেড়াজাল পেরিয়ে। এই গতানুগতিকতাতেই সে সুখী। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ এরই বিপরীতে দাঁড়িয়ে বলেন, নারীরা তাঁদের স্বাধীন চিন্তা বিকাশের সেই উপযুক্ত পরিবেশই পাননি কখনো। বিংশ শতাব্দী পার করেও সে কথার সত্যতা কতখানি এবং বিজ্ঞাপনে তা কী ভাবে ধরা পড়েছে তাই যাচাই করে নেওয়া যাক উদাহরণে উদাহরণে।

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত *চতুরঙ্গ* পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৫ সংখ্যার র‍্যালে'র বিজ্ঞাপনটি নারীমুক্তির প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। বিজ্ঞাপনের সুন্দর ছবি আর ছিমছাম বয়ানের মধ্যে চমৎকার এক আধুনিক ভঙ্গি আছে। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম হল, 'অটুট বন্ধুত্ব'। ছবিতে দুজন নারী-পুরুষকে খুশি মনে সাইকেল চালাতে দেখা যায়।

চিত্র ৫.১৫ চতুরঙ্গ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৫

ছবির নারী এবং পুরুষটির চেহারায় আনন্দের ছাপ স্পষ্ট। কপিতে জানানো হয়, "যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়।"

বলবার মতন বিষয় হল, নারী-পুরুষের সম্পর্ক বোঝাতে 'বন্ধুত্ব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। সাইকেল এবং তার চাকার মধ্যেই মিশে থাকে 'গতি'র আবেশ। আর 'প্রগতি' কথার মধ্যেও এই 'গতি' শব্দটিকে আমরা পাই। মনে পড়ে *সপ্তপদী* ছবির পরিচিত দৃশ্যের সেই বিখ্যাত গান, "এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত তুমি বলোতো?"...পুরুষ সঙ্গীর স্কুটারের সওয়ারি রীনা ব্রাউন, তাকে সেখানে যেতে হবে, যেখানে তার সঙ্গী তাকে নিয়ে যাবেন। এ ছবি পরিচিত হলেও, বিজ্ঞাপনের ছবিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাইকেলের হাতলে নারীর হাত দৃঢ়ভাবে বসেছে, পা প্যাডেল করছে; এই বিজ্ঞাপনে নারীর ক্ষমতায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাইকেলে যখন মেয়েটি

চেপে বসলো, তখন তার নিয়ন্ত্রক সে নিজে। পথ চলার সিদ্ধান্ত মেয়েরা নিতে শুরু করলে, একদিন যে পালকি শুদ্ধু ডুবিয়ে মহিলাদের গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করা হত, তার থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগে সমাজ যে পরিবর্তিত, তার চিহ্ন বহন করে এই বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপনের পরে 'বোরোলীন' কোম্পানির দুটি বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

বিজ্ঞাপনের শিরোনাম, 'মালতী সিনেমা যাচ্ছে...'; গত শতাব্দীর পাঁচ-ছয়ের দশকে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখার চল ছিল। পরিবারের সঙ্গে অথবা স্কুল কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির মেয়েরাও যেতেন প্রায়শই। বাংলা ছবির সেই 'স্বর্ণযুগে' ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়াদেবী, মলিনা দেবী, উত্তম, সুচিত্রা, সৌমিত্র, সুপ্রিয়া, সাবিত্রী, লিলি, তনুজা, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, শুভেন্দু, সন্ধ্যা প্রভৃতি মহান অভিনেতা-অভিনেত্রী দ্বারা ভরপুর চমৎকার সব ছায়াছবির দর্শক ছিলেন মূলত মহিলারাই। পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের কাছে গিয়ে জানতে চাইলে তাঁরা আজকের ঘটনা গুছিয়ে না বলতে পারলেও, কিঞ্চিৎ এলোমেলো ভঙ্গিতে সেই সব দিন মুখের কথায় তুলে এনে দেন ছবির মতন। ফলে শাড়ি পরিহিতা, সুসজ্জিতা মালতী বিবাহিত বা

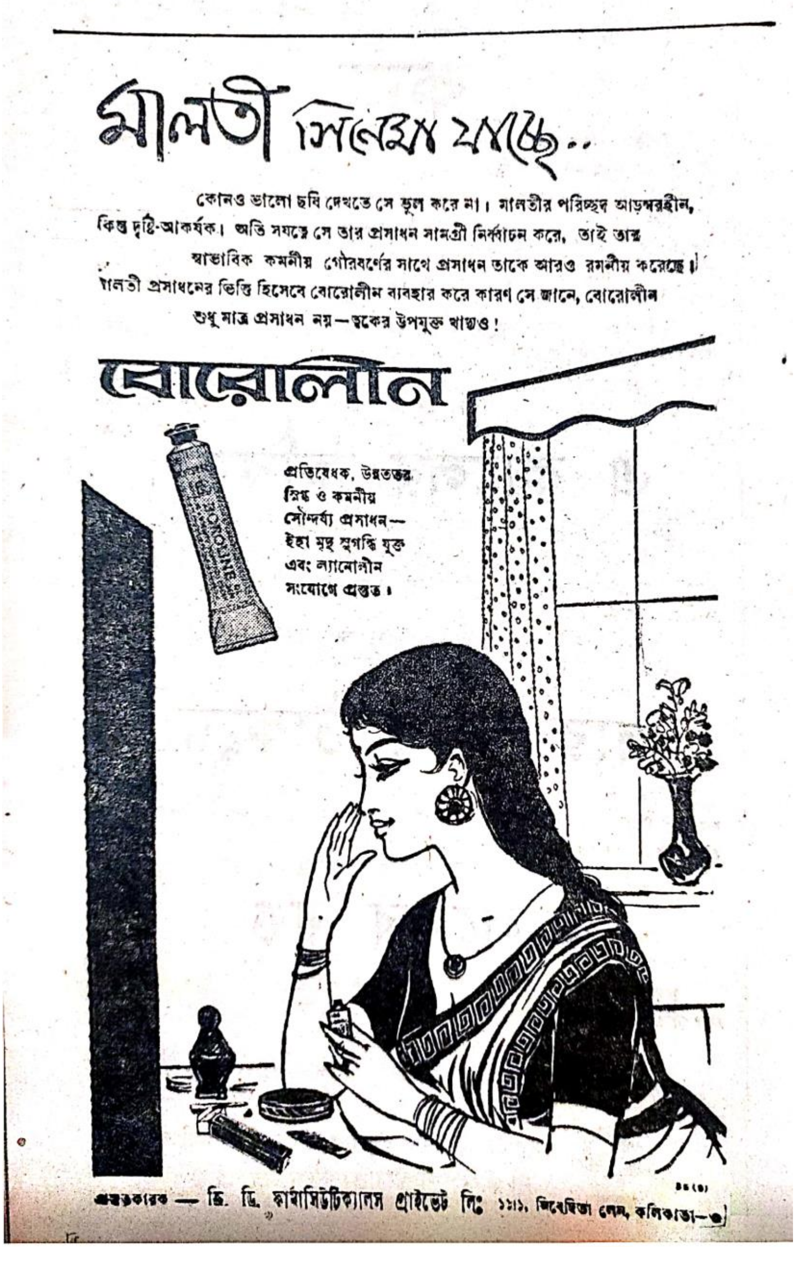

চিত্র ৫.১৬ দেশ, ৩০ বর্ষ, ১৪-২৬ সংখ্যা, ১৩৬৯

অবিবাহিত, যাই হন না কেন, সিনেমা যাওয়া তাঁর পক্ষে খুব অসম্ভব বিষয় ছিল না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তার ঠিক পরের বাক্যটিকে, মূল কপিতে ছোট করে যে কথাগুলি লেখা থাকে, সেখানো জানানো হয়, "কোনও ভালো ছবি দেখতে সে ভুল করে না", এই বাক্যটি এই মালতী নাম্নী মেয়েটির নিজস্ব সাংস্কৃতিক রুচির চিহ্ন। সে যার সঙ্গেই সিনেমা দেখতে যাক না কেন, সে যে ভালো ছবি হাতছাড়া করে না, এটি তার পুরুষ-নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত। এবং তারপরে জানানো হয়, তার সাজগোজ সাধাসিধা হলেও সে যে প্রসাধনী নির্বাচন করেছে, তা কেবলমাত্র 'প্রসাধনী' নয়, "তার ত্বকের উপযুক্ত খাদ্যও"। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে বিজ্ঞাপনের মেয়েটি তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনন্যা হয়ে উঠেছেন। এই বিজ্ঞাপনটি একান্তভাবেই পুরুষ-নিরপেক্ষ; অন্যান্য অনেক প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনের মতন এখানে কোথাও উচ্চকণ্ঠে সেই ঘোষণা নেই যে মেয়েটি কোনও পুরুষকে মুগ্ধ করতে তার এই সাজ করেছে, সে তার নিজস্ব রুচিকে গুরুত্ব দেয়। অনুচ্চকিত কিন্তু উজ্জ্বল ঘোষণা চোখে পড়ে এই বিজ্ঞাপনে।

পরের বিজ্ঞাপনটিও 'বোরোলীন'-এরই। এই বিজ্ঞাপনটি পূর্বের বিজ্ঞাপনের প্রায় দেড় দশক পরের। পূর্বোক্ত 'মালতী'র পোশাকের সঙ্গে এই মেয়েটির পোশাকের বিস্তর ফারাক। ফুল হাতা, উঁচু গলা টি শার্ট এবং বেল বটম্‌স্‌ পরিহিতা এই মেয়েটির কোমরে সুদৃশ্য বেল্ট, তার চুল যত্নে কাটা এবং চুলের দৈর্ঘ্যও কাঁধ অবধি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পাশে ট্রানজিস্টার এবং সর্বোপরি হাতে 'পপ্‌ রক্‌' নামক রেকর্ড। গত শতাব্দীর ছয়-সাতের দশকে আমেরিকায় যে পরিবর্তিত সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, মূলত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে; এই মেয়েটির পোশাকেও তারই ছাপ।

চিত্র ৫.১৭ এক্ষণ, দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮৩

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পায় ‘হরে রাম হরে কৃষ্ণ’ ছবিটি, তাতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন দেব আনন্দ্‌ (১৯২৩-২০১১), জিনাত আমান্‌ (১৯৫১-)। সেই ছবিতে জিনাত আমানের বেশভূষার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায় এই মেয়েটির ছবি। বিজ্ঞাপনটিও সাতের দশকের মধ্যভাগের। সেই সময়ের এ দেশীয় তরুণ-তরুণীরাও আমেরিকার এই সংস্কৃতি দ্বারা, মূলত এই ছবিটি জনপ্রিয় হবার পরে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তৈরি হয় ‘আধুনিকা’র নতুন এক সংজ্ঞা। তবে এই যে বিজ্ঞাপনে ‘আধুনিকা’র নতুন পরিচয় তৈরি হচ্ছে, তাতে কিছু সমস্যা থেকে যায়। যে মেয়েটির ফিল্মি-স্টাইলে চুল কাটা নেই, অথবা যে শাড়ি পরে কিংবা ‘পপ্‌ রক্‌’ এ তেমন রুচি নেই, তারও অধুনিকা হতে বাধা থাকে না। এই ‘আধুনিকা’ এবং ‘আধুনিক’-এর মধ্যে কিছু তফাৎ আছে বলে মনে হয়। মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগৎ এবং বিজ্ঞাপনের দুনিয়ার এই ‘আধুনিকা’ বিষয়টিও কিছু স্টিরি ওটাইপের উপরেই নির্ভর করে, কিছু বাহ্যিক আচরণে একটি মেয়ে কম বা বেশি ‘আধুনিকা’ হয়ে ওঠেন। তাতে মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি বা বোধের আধুনিকতা যেন কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে আসে। এই ‘বোরোলীন’ এর বিজ্ঞাপনগুলির একটা সিরিজ প্রকাশিত হয় সেই সময়ে। বলা ভালো ‘বোরোলীন’ এর বিজ্ঞাপনের বহু সিরিজ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্র ৫.১৮ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৩৮০

আগের বিজ্ঞাপনটির প্রায় সমসময়ের আরেকটি বিজ্ঞাপনকে আধুনিকতার প্রসঙ্গেই একবার পড়ে নেওয়া যাক। ১৩৮০ বঙ্গাব্দের আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীতে ‘প্রিয়গোপালের শাড়ী’র বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। তবে বিজ্ঞাপনটি এর পূর্বেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ছবিটি অতি চমৎকার। দীর্ঘ কপি নেই; বা বলা উচিত কোনও কপিই নেই। বড় বড় করে উপর এবং তলায় লেখা ‘প্রিয়গোপালের শাড়ী সবারি প্রিয়’। কপির জায়গায় মাঝখানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন পাঁচজন

মহিলা। তাদের প্রত্যেকের শাড়ি পরবার ধরন ভিন্ন। স্কুল কলেজ, পার্টী, বিবাহবাসর, বাহিরের কাজ, ঘরের কাজ প্রতিটির উপযোগী শাড়ি তাকে হাতে তুলে দিতে পারে 'প্রিয় গোপাল বিষয়ী'। বিজ্ঞাপন থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ঘরে বাইরে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে মেয়েরা এখন অংশ নেন। পার্টী থেকে বাইরের কাজ, কোথাও তাঁরা আর পিছিয়ে নেই। শুধু একটিই কথা এখানে উল্লেখ্য, যদি এই বিজ্ঞাপন বহুবিধ ছেলেদের পোশাককে প্রদর্শন করতো, তাহলে তাঁদের ক্ষেত্রেও স্কুল কলেজ, পার্টী, বাহিরের কাজ এই তিন রকম পোশাক পরিহিত'র ছবি থাকলেও সম্ভবত 'বিবাহবাসর' এবং 'ঘরের কাজ' এর পোশাক পরা পুরুষেদের স্কেচ অনুপস্থিত থাকতো। বিবাহ অনুষ্ঠানে পুরুষদের উপস্থিতি থাকলেও 'বিবাহবাসর' জিনিসটি কিছু অধিকমাত্রায় নারীকেন্দ্রিক বিষয়। আর বাইরের কাজ করে আসা পুরুষকে ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরে গৃহকর্মে লিপ্ত হতে হয়নি সেকালে, অবস্থা খানিক পরিবর্তিত হলেও একালের ছবিটিতেও তেমন পরিবর্তন আসেনি। বরঞ্চ পুরুষদের পোশাকের বিজ্ঞাপন হলে 'বিবাহবাসর', 'ঘরের কাজ' এর পরিবর্তে সেখানে বসতে পারতো 'সান্ধ্য আড্ডা'র ছবি।

মেয়েদের স্কুল-কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজবের কিছু সুযোগ থাকলেও, বিবাহিত মহিলাদের সংসার সামলে স্বামী-সন্তান রেখে ঠিক সান্ধ্য-আড্ডা দিতে যাওয়ার পরিস্থিতি কখনোই ছিল না। একবিংশ শতাব্দীতেও সেই চিত্র দুর্লভ। স্বামীর বন্ধুদের চা-চক্রে তাঁরা স্বামীর অনুগামিনী হয়েছেন বটে, অন্দরমহলে ঘরে বসে তাস খেলেছেন, পান মুখে আড্ডা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এগুলি ঠিক পুরুষদের আড্ডার সঙ্গে তুলনীয় নয়, যে আড্ডায় গৃহকর্ত্রী হেঁসেল থেকে বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দিতেন তেলেভাজা, কাঁচালঙ্কা, সর্ষের তেল সহযোগে মুড়ি। আর তাঁরা দেশ সমাজের নানান বিষয়ে আলোচনা করে যেতেন ঘন্টার পর ঘন্টা। দেশ, সমাজ, সাহিত্য কিছুই যে আলোচনায় বাদ যেত না। বুদ্ধদেব বসুও (১৯০৮-১৯৭৪) তাঁর 'আড্ডা' প্রবন্ধে পুরুষদের আড্ডায়, মোটের উপর স্ত্রীলোক যে পরিত্যাজ্য তা জানিয়েছেন। সে প্রবন্ধ-প্রসঙ্গ পূর্বের 'বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা বিজ্ঞাপন' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে।

মেয়েদের প্রসাধনীর ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছে। যেভাবে প্রসাধনীর বহিরঙ্গ আরও ঝাঁ-চকচকে হয়ে উঠেছে, সেই একইভাবে বিজ্ঞাপনের ভাষাতেও এসেছে বিস্তর ফারাক। ১৩৪২ সালের *বিচিত্রা* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় পাওয়া যায় 'সিলট্রেস' শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে জানানো হয়, " 'সিলট্রেস' ব্যবহারে চুলের আঠা, ময়লা খুস্‌কি মারামাস সমস্ত পরিষ্কার হয়ে মাথার চুল রেশমের মত চিকণ ও কোমল হ'য়ে ওঠে, যাবতীয় কেশ রোগ দূর হয়। বিশেষ ভাবে মাথা ঘষার জন্যই প্রস্তুত।"। বিজ্ঞাপনের পাশে একটু শ্যাম্পুর বোতলের ছবি। বাঙালী'র এই নিজস্ব 'মাথা ঘষা'র মত ভাষা একটা সময়ের পর থেকে ক্রমে ক্রমে প্রাচীন হয়ে পড়লো। আপাত চটকহীন এই ভাষার পরিবর্তে প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনের ভাষাতে পরিবর্তন এলো। পূর্ববর্তী 'সিলট্রেস' এর বিজ্ঞাপনে অল্প কথায় শুধু শ্যাম্পুর গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে আবার ব্যবহৃত হয়েছিল 'মাথা ঘষার' মতন অতি ঘরোয়া শব্দগুলি। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এই Lakme'র বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায়, প্রসাধনী ব্যবহার কেবলমাত্র কেশ, ত্বকের উন্নতিসাধনের জন্যই নয়, তার মধ্যে কাউকে আকর্ষিত করবার ঈঙ্গিত মিশে থাকে। এই বিজ্ঞাপনের মডেলের চোখে সেই অব্যক্ত কথাই যেন দুটে ওঠে। শিরোনামেও বলা হয়, "আমার মনের কথা যখন মেশে আমার ঠোঁটের ভাষায়"। ঘরোয়া ভাষার গন্ডি ছাড়িয়ে এই প্রসাধন অনেক দূর চলে যায়।

চিত্র ৫.১৯ শারদীয়া আনন্দমেলা, ১৪০৬

নেলপালিশের একটি পুরনো বিজ্ঞাপনের ভাষা আজকের দিনে বেশ মজার মনে হয়। নেল পালিশের নাম Cutex।

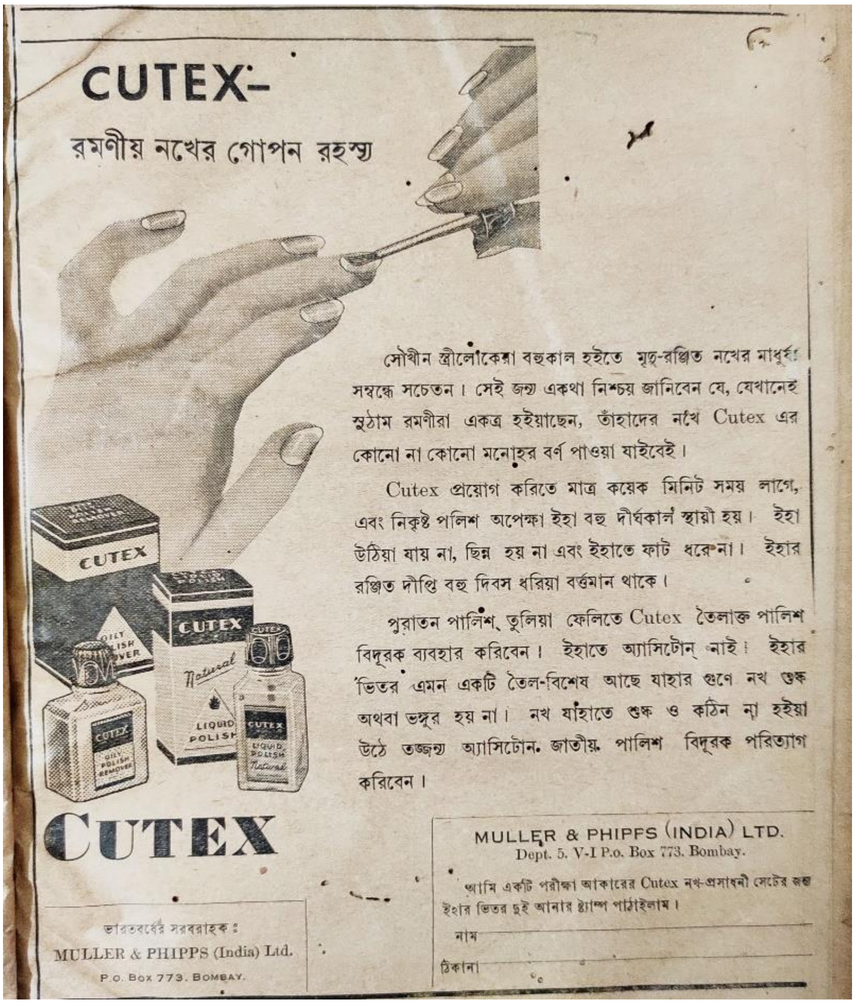

চিত্র ৫.২০ বিচিত্রা, কার্তিক, ১৩৪২

নেলপালিশ ব্যবহার মেয়েদের মধ্যে বেশ সার্বজনীন হয়ে উঠেছে অনেকদিনই। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনের কপি থেকে জানা যায় কেবলমাত্র 'সৌখিন' স্ত্রীলোকরাই তখনও পর্যন্ত এসব ব্যবহার করতেন। আর একটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ অনিবার্য হয়ে ওঠে, তা হল নেল পালিশ 'রিমুভার'-এর বাংলা করা হয়েছে 'বিদূরক'। এই বিজ্ঞাপনটিও ১৩৪২ বঙ্গাব্দের। বিজ্ঞাপনটি থেকে আন্দাজ পাওয়া যায়, কাজটিকে ঠিকভাবে চালানোর মতন বাংলা করে নেওয়ার দিকে কপি-রাইটারদের ঝোঁক ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার এক দশকেরও বেশি সময় পূর্বে অন্যভাষার বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। আজকের দিনে এমন বাংলা ভাষা বিশেষত মহিলাদের প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে ব্যবহার হলে, সেই পণ্যের গুণমান নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেওয়া খুব অসম্ভব নয়। বিদেশি ভাষার মুহুর্মুহু ব্যবহার যে প্রসাধনের গুণমানের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা উত্তর-ঔপনিবেশিক, মুক্ত-বাজার অর্থনীতির আমলে ক্রেতাদের মস্তিষ্কে গভীরভাবে ঢুকে গেছে।

এই সূত্র ধরেই এসে পড়ে স্নো-পাউডার-এর মতো প্রসাধনী সামগ্রীর কথা। সেই প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনেও যে বাঙালি লেখকদের সমর্থনসূচক উক্তির চাহিদা ছিল, তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

‘রেডিয়ম স্নো’, ‘রেডিয়ম অডিকোলন’ এর বিজ্ঞাপনে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, “রেডিয়ম ল্যাবরেটরীর প্রস্তুত রেডিয়ম স্নো এবং ও-ডি-কলোন ব্যবহার করে আমি তৃপ্তি লাভ করেছি। গন্ধের সুমিষ্টতায় ও স্নিগ্ধতায় মন

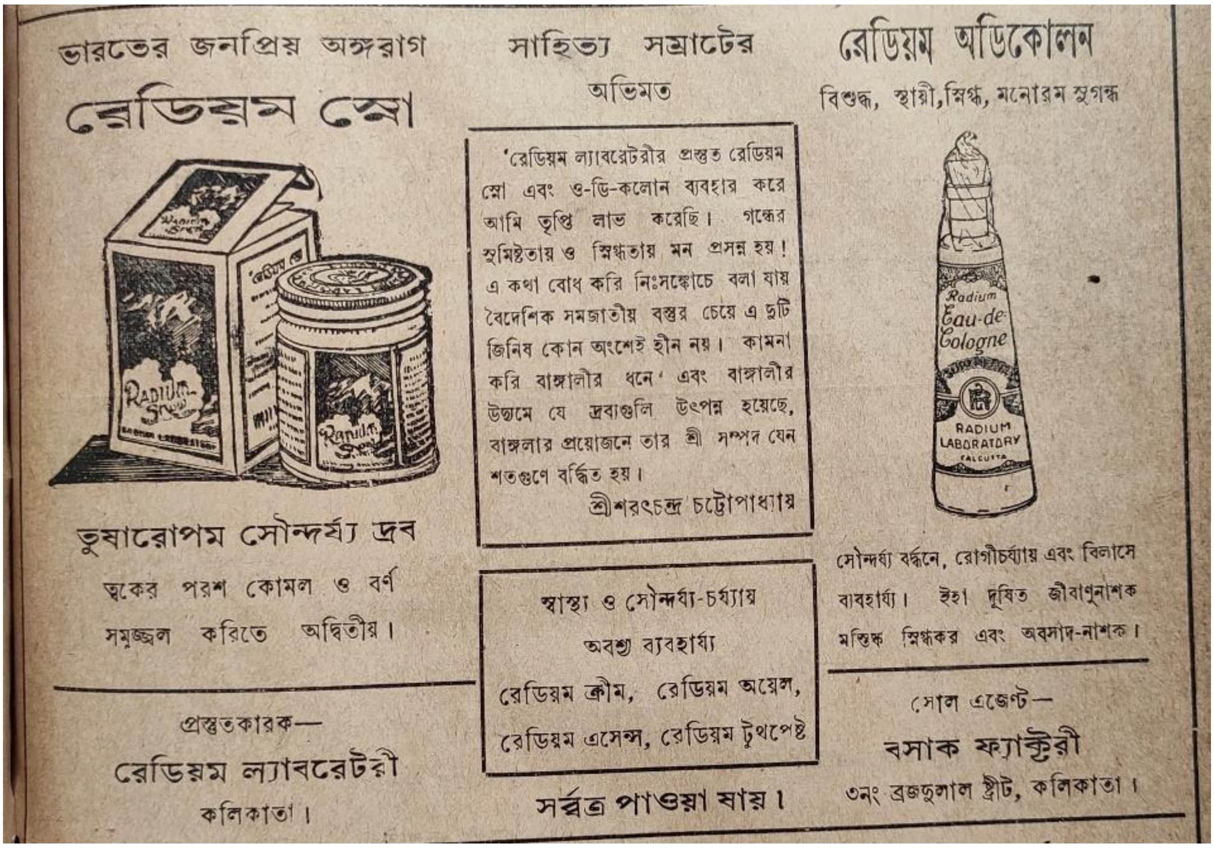

চিত্র ৫.২১ বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

প্রসন্ন হয়! এ কথা বোধ করি নিঃসংকোচে বলা যায় বৈদেশিক সমজাতীয় বস্তুর চেয়ে এ দুটি জিনিষ কোন অংশেই হীন নয়। কামনা করি বাঙ্গালীর ধনে এবং বাঙ্গালীর উদ্যমে যে দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হয়েছে, বাঙ্গলার প্রয়োজনে তার শ্রী সম্পদ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হয়।”

আজকের দিনে যদি এমন কোনও অতি প্রখ্যাত লেখক কোনও প্রসাধনীর, বিশেষ করে দেশে নির্মিত প্রসাধনীর এমন সুখ্যাতি করতেন, তা ক্রেতারা কেমনভাবে গ্রহণ করতেন বলা যায় না। তবে প্রসাধনীর ব্যাপারে তাঁরা বাঙ্গালী লেখকের তুলনায় বিশ্বমানের ‘ফ্যাশন স্টাইলিস্ট’, বা ‘মেক আপ আর্টিস্ট’ অথবা ‘মডেল’ এর মতামতকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করতেন, এ নিয়ে বোধহয় কোনও সংশয় থাকে না।

আর একটি প্রবণতা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞাপনগুলিতে ক্রমান্বয়ে দেখা গেছে, তা হল, মেয়েরা যেখানে 'মা' সেখানে তার শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সমাজ খুবই সচেতন, দায়িত্বশীল। কিন্তু মেয়েরা যেখানে 'প্রেয়সী', সেখানে তার মুখে সুগন্ধ না দুর্গন্ধ, তার ত্বকের কেমন সুবাস, তার এক ঢাল চুল আছে কি না, সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

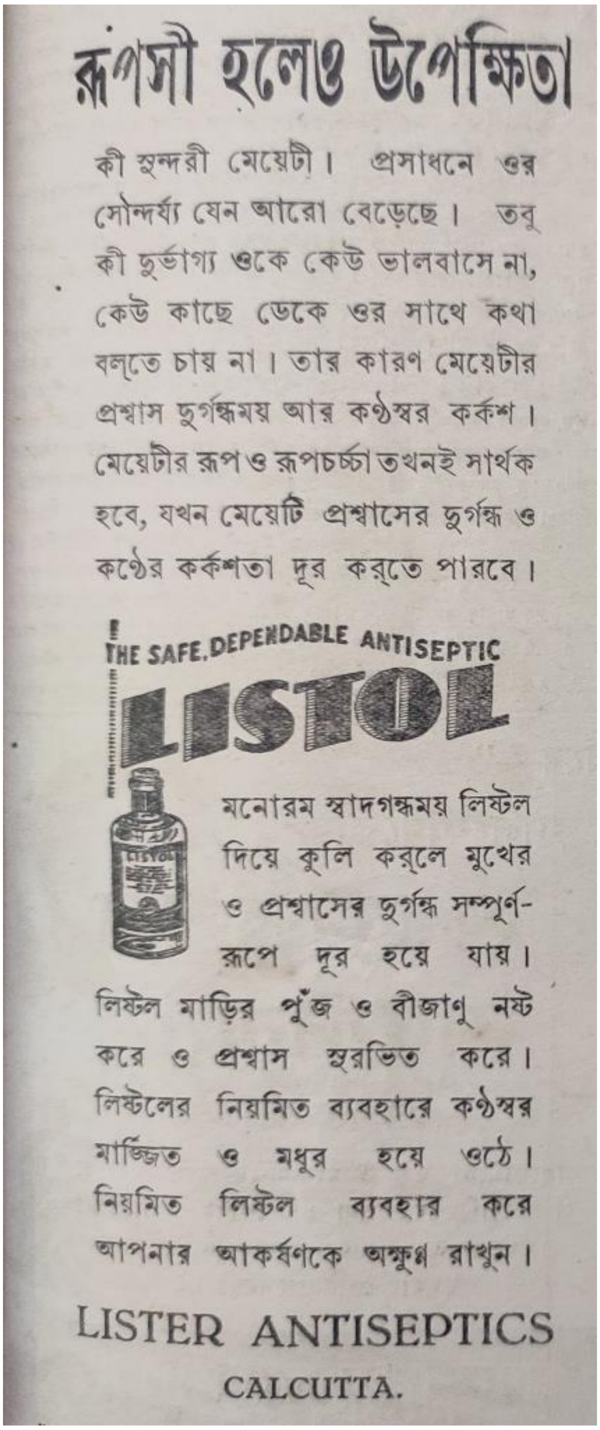

চিত্র ৫.২২ প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫২

বিজ্ঞাপনের শিরোনাম এই ক্ষেত্রেও বেশ আকর্ষণীয়। জানানো হয়, 'রূপসী হলেও উপেক্ষিতা', রূপসী হওয়া এই সমাজের এমন এক অনিবার্য গুণ, যাতে সেই মানুষটি যেমনই হন, তাঁর পক্ষে যেন উপেক্ষিতা হওয়া সম্ভব নয়। দেখতে 'রূপসী' হলে পৃথিবী যেন তাঁর প্রতি কিছু বেশি অনুকূল হয়ে আসে। বাস্তব চিত্রটি যদিও সবসময় তা নয়। তবুও এই রূপসী কেন উপেক্ষিতা, তা জানতে পাঠকদের যখন ইচ্ছে করবে, তখন তাঁরা Listol-নামক তরলের কথা জানতে পারবেন। যা দিয়ে মুখে কুলকুচি করলে মানুষের নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর হবে, এবং দাঁত ও মাড়ির অন্যান্য সমস্যাগুলিকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। বর্তমান সময়ে যা Mouth Wash হিসাবে পরিচিত, সেই জিনিসই এই 'লিস্টল'। এই বিজ্ঞাপনটি পড়ার শুরুতে শিরোনামেই অত্যন্ত আপত্তি তৈরি হয়। মেয়েটি রূপসী বলে তাকে উপেক্ষিত হতে দেওয়া যায় না, অর্থাৎ অসুন্দরের সঙ্গে ইচ্ছামত উপেক্ষার সম্পর্ক বেশ নিকটই বলা যায়। সুন্দরী মেয়ে আর তার সুন্দর প্রসাধনের পরেও কেবলমাত্র তার প্রশ্বাসের দুর্গন্ধের কারণে তাকে কেউ 'ভালোবাসে না'; এই কথাটিকেও শিরোনামের মতোই আপত্তিকর মনে হয়। ভালোবাসার মতন বিস্তৃত এবং বহুমাত্রিক বিষয়কে একটি

পণ্যের বিক্রয়ের সঙ্গে জুড়ে মেয়েটিকেই পণ্যে পরিণত করে এই বিজ্ঞাপন। মুখের দুর্গন্ধ দূর করার উপদেশ মন্দ নয়, কিন্তু তার থেকে তাকে কেউ ভালোবাসে না, এহেন সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া সমীচীন মনে হয় না।

পুরুষদের প্রসাধনে মহিলাদের প্রধানত দুই ধরনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি ভূমিকা হল বিজ্ঞাপনকে দেখতে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং দ্বিতীয় ভূমিকা হল পুরুষদের বিনোদন করা। অর্থাৎ সেই বিজ্ঞাপন মহিলাদের সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত না হলেও তাকে সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনই একটি বিজ্ঞাপন বেশ অবাক করা মনে হয়। সেই বিজ্ঞাপনে নারীর ভূমিকা সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলা অথবা পুরুষের মনোরঞ্জন ইত্যাদি দিকগুলি ছাড়িয়ে আরও কিছু বাড়তি মাত্রা যোগ করে।

চিত্র ৫.২৩ দেশ, ১৬ মাঘ, ১৩৭৭

বিজ্ঞাপনটি পানামা ব্লেডের। নিরীহ একটি ব্লেডের সঙ্গে 'মেয়ে জলদস্যু'র কী সম্পর্ক, তা প্রাথমিকভাবে বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু পরে ছবিটি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মেয়েটির হাতে একটি Cutlass। জলদস্যুদের ব্যবহৃত তরোয়ালসুলভ ধারালো একপ্রকার অস্ত্র। এবং তার সামনে রত্নপূর্ণ একটি সিন্দুক। অর্থাৎ মেয়ে জলদস্যুর একদিকে যেমন আছে তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতা এবং তাদের হাতেও নিপুণভাবে চলে অস্ত্র, তেমনই এই পানামা ব্লেড ব্যবহারের অনুভূতি একইসঙ্গে মসৃণ, ধারালো ও সূক্ষ্ম। সুন্দরী নারীর হাতে তরবারির এই ইমেজের মাধ্যমে ব্লেডের মসৃণ-ধারালো আবেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে তপন সিংহ পরিচালিত 'গল্প হলেও সত্যি' (১৯৬৬) ছবির একটি দৃশ্যের কথা। যে পরিবারটিকে ঘিরে এই ছবির গল্প, সেই পরিবারের বড় ছেলে চাকরি করে বিজ্ঞাপন সংস্থায়। সেই ছেলেটি একটি নগ্ন মেয়ের গলায় টাই জড়ানো দেখে বস্‌কে যখন প্রশ্ন করে, যে 'টাই' তো ছেলেদের ব্যবহারের জিনিস, সেখানে মেয়েদের ছবি ব্যবহৃত হচ্ছে কেন? বস্ তখন বলেন, পণ্য যদি পুরুষের ব্যবহার্যও হয়, তবু তার বিজ্ঞাপনেও ব্যবহার করতে হবে নারীদেহের ছবিই। কারণ

বর্তমান যুগ তৈরি হয়েছে তিনটি S এর সমন্বয়ে, Sex, Sadism এবং Shock। দৃশ্যত আজকের যুগ হচ্ছে "স্ত্রীদেহতত্ত্বের যুগ"।

বিজ্ঞাপনের ধরন পরিবর্তিত হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে বিজ্ঞাপনে, ধারাবাহিক আলোচনায় যে পরিবর্তন বুঝতে অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর যৌবনে লেখা 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে'তে নারীদের বিষয়ে যে মতামত পোষণ করেছিলেন, জীবনের আরও কয়েক দশক অতিক্রম করে তিনি তাঁর সেই পুরনো অবস্থান থেকে সরে আসেন। কিন্তু একটি অবস্থানে তিনি সেসময়েও অবিচলিত ছিলেন। তা হল, "বস্তু পরিচ্ছিন্ন (abstract) ভাবের সৃষ্টিতে, অব্যবহারিক সত্যের সন্ধানে, মেয়েদের যে বাধা সে বাহিরের নয়, সে অন্তরের"।

মেয়েরা তাঁদের অন্তরের বাধা অতিক্রম করতে পারেন না বলেই তাঁদের দ্বারা কোনও abstract সৃষ্টি সম্ভব হয় না, এই কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কিন্তু সমাজের প্রকৃত অবস্থা ঠিক কেমন ছিল? কোন ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে বহু মেয়েকে কাটিয়ে দিতে হয়েছে তাঁদের সম্পূর্ণ জীবন? এর পরেও তাঁদের দ্বারা একেবারে নতুন কিছু সৃষ্টি কেন সম্ভব হচ্ছে না, এ কথা হয়তো সেভাবে বলা যায় না।

কল্যাণী দত্ত'র *পিঞ্জরে বসিয়া* বইয়ের কয়েকটি উদাহরণে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের ছবিটি চমৎকার ধরা পড়ে। তিনি লিখছেন, কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিপরীতে লেডি অবলা বসুর নেতৃত্বে বিদ্যাসাগর বাণীভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিধবা মহিলাদের বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য। সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষিকা। বিবাহিত মহিলাদের জন্যও সেখানে নারী-শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপিন চন্দ্র পালের কন্যা অমিয়া দেব ছিলেন তার প্রধান শিক্ষিকা। দুই প্রতিষ্ঠানেই মেয়েদেরকে বোনা, সেলাই, ছাঁটকাট, বাটিকের কাজ, মূর্তি গড়া, ছবি আঁকা, নকশা তোলা, বই বাঁধানো, ইত্যাদি দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজের বাইরের কিছু কাজ শেখানো হত; ছোটখাটো শিল্পের চর্চার মাধ্যমে মহিলারা যাতে কিছুটা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন। সেই প্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্রীর জীবনের সামান্য কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া যাক।

> এখানকার ছাত্রী ছিলেন মুরলা, অনেকদিন শেখার পর একে একে লেডীব্রাবোর্ন ডিপ্লোমাগুলি পাস করে বোমা পড়ার সময়ে শিক্ষা-সমিতি যখন কৃষ্ণনগরে চলে যায় তখন তিনি তার শিক্ষিকাও হয়েছিলেন। এখানে কয়েকঘন্টা সময় মুরলার বড় আনন্দে কাটত। জীবনে প্রথম তিনি তাঁর স্বভাবের ও কাজের প্রশংসা শুনে নিশ্চয় আনন্দ পেয়েছিলেন। প্রথম থেকে ভয়ঙ্কর গোঁড়া পরিবেশে জর্জরিত হয়েও তিনি আশ্চর্য রকম সংস্কারমুক্ত ছিলেন, তাছাড়া

পিসিমা শিবমোহিনীর (নববিধান সমাজের প্রচারকের স্ত্রী) প্রভাবে তিনি নিজেই নিজেকে গড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বাবা প্রেসিডেন্সি কলেজের সে-যুগের একজন ইংরেজিনবিশ হয়েও পুরোপুরি সংসারজ্ঞান-বিবর্জিত ছিলেন। স্টেটস্‌ ম্যান কাগজে মেডিকেল কলেজ থেকে কোনো ছাত্র তিনটি বিষয়ে রেকর্ড নম্বর পেয়ে এম. বি. হয়েছে খবর দেখেই মনে মনে তার সঙ্গে মুরলার বিয়ে স্থির করেন তাঁর এক বন্ধু, উভয়পক্ষে যিনি পরিচিত, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

পাত্রের বাড়ি যশোর জেলার জঙ্গলবাধালে, তাঁর বাবা-মা, নিজস্ব ঘরবারি কিছুই ছিল না। মামাদের কিছু জমিদারি ছিল, পাত্রপক্ষ সেটি জানিয়ে বাকি সব কথাই গোপন করে যান। পাত্র নিজের জন্য হীরের আংটি, ভারী সোনার বোতাম ও চেনঘড়ি এবং নগদ আড়াই হাজার টাকা দাবি করেন, কিন্তু তা নেবার পরেও আরো পাঁচশো টাকার দাবি করে মুরলার জীবন অতিষ্ঠ করেন, অর্থাৎ, ক্রমাগত দাবি করতেই থাকেন। ছাত্রজীবনে ভদ্রলোক দু'বার অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন- একথাও কন্যাপক্ষ জানতে পারেননি। বিয়ের অল্পদিন পরেই মুরলা সন্দিগ্ধচরিত্র ভদ্রলোকের একটু একটু পরিচয় পান।[৩০]

মুরলার স্বামীর শিক্ষিত, ডাক্তার ইত্যাদি তথাকথিত ভদ্রলোকের পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত তাঁর স্ত্রীকে 'চরিত্রহীন' ইত্যাদি নানান বিশেষণে আপ্যায়িত করতেন। ঘর বন্ধ করে প্রহারেও পিছপা ছিলেন না। মুরলার বাবা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও কেবলমাত্র পরীক্ষায় ভালো ফলের ভিত্তিতে কন্যার জন্য পাত্র নির্বাচন করেন। ভদ্রলোকের 'সংসারজ্ঞান-বিবর্জিত' হওয়ার শাস্তি তাঁর কন্যাকে ভোগ করতে হয় সমস্ত জীবন ধরে। সংসার বিষয়টি যে বিশেষ এবং বিশেষ রূপেই পরিবারের মহিলাদেরই সামলানো কর্তব্য, পুরুষরা যে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য রকম উদাসীন থেকেছেন যুগের পর যুগ, তা যেন এই উদাহরণ থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

কল্যানী দত্তের এই বইতেই মেয়েদের যন্ত্রণাময়, বিপদক্লিষ্ট জীবনের নানান ছবি ফুটে উঠেছে। তবে সবাই হাল ছাড়েননি, বহু প্রতিকূলতাতেও হার মানেননি, বজায় রেখেছিলেন আত্মসম্মান। সব সময়ে পারিবারিক চাপে পুরুষরাও ছেড়ে দেননি স্ত্রী'র হাত। তেমনই এক সত্য কাহিনির ছবি রয়েছে এখানে। বাংলার অতি শিক্ষিত, উল্লেখযোগ্য পরিবারের মধ্যে এই পরিবারগুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উল্লেখযোগ্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র ছিলেন অশোককুমার। রমেশচন্দ্রের একাধিক কন্যাসন্তান থাকলেও পুত্র একটিই থাকার কারণে, এবং সেই পুত্র বিবাহিত এবং অপুত্রক হওয়ার কারণে পুত্রের মাতা অর্থাৎ রমেশচন্দ্র'র স্ত্রী প্রিয়বালা বংশরক্ষার জন্য আকুল হয়ে পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহের

জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু অশোককুমার এই অতি সামান্য কারণের জন্য নিজের বিবাহিত পত্নীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে রাজি ছিলেন না। তাঁকে অর্থলোভ দেখিয়ে লাভ হয় না। পিতার সম্পত্তির থেকে বঞ্চিত করবার হুমকিও তাঁকে কিছুতেই স্ত্রীর পাশ থেকে সরিয়ে আনতে পারে না। উল্লেখ্য, রমেশচন্দ্র এখানে তাঁর স্ত্রী'র এই আচরণের কোনও প্রতিবাদ করেননি। কল্যাণী দত্ত লিখছেন-

> রমেশ মজুমদারের মৃত্যুসংবাদ দৈনিক কাগজে এভাবে বেরোয় যে দেশমান্য পিতার শেষকৃত্য করতেও পুত্র আসেননি, তিনি নিভৃত অবসর জীবনযাপন করছেন। অশোক পিতার মৃত্যুর পরে বিনয়দাকে বলেন- 'বাবা তাঁর বাড়ি বা মা তাঁর অলঙ্কার মেয়েদের দেবেন এ তো জানাই ছিল, কিন্তু বাবা বইগুলো আমাকেই দিয়ে যেতে পারতেন- তাও দিলেন না।' একজন বিদগ্ধ পন্ডিত এবং দেশমান্য ঐতিহাসিক স্ত্রীর বশ হয়ে নিজের জেদ এবং অকারণে ছেলের অধিকার হরণের যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তাতে রাজা দশরথের বৃত্তান্ত আবার মনে পড়ে।[৩১]

কেবলমাত্র রমেশচন্দ্রের পরিবার নয়, শিবনাথ শাস্ত্রী বা রাহুল সাংকৃত্যায়নের পরিবারেও ঘটে মেয়েদের প্রতি এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। হয়তো তাঁরা সরাসরিভাবে নারীদের বঞ্চিত করেননি, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের নিজের স্ত্রী'র প্রতি নির্লিপ্তি, উপেক্ষা বা অসহযোগিতার এমন পরিচয় দিয়েছেন, যা জানতে পেরে বিস্মিত হতে হয়। পরিস্থিতিগতভাবে তাঁরাও খুব সুবিধায় ছিলেন না, পারিপার্শ্বিকের প্রতি অসন্তোষ ছিল তীব্র, কিন্তু তাঁদের স্ত্রীরা সেই বিতৃষ্ণার শিকার হন।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী পুরুষদের নানান বৈশিষ্ট্যের একটি ছবি এখানে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ও নির্লিপ্তি, যা কিছুটা স্বার্থপরতারই নামান্তর।

শিক্ষিত পরিবারের নারীদেরই অবস্থা ছিল এরকম, বাড়ির পুরুষদের অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে তাঁদের সারাজীবন। কেবল পুরুষরাই না, মহিলারাও নিপীড়ন করেছেন বহু মহিলাকে, সে উদাহরণও এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য নয়। আমৃত্যু এহেন প্রতিকূলতার মধ্যে পিছুটানহীন মুক্তির স্বাধীনতা তাঁরা পাননি, পুরুষদের মত দ্বিধাহীন সৃষ্টির সুযোগও তাঁদের হয়ে ওঠেনি, স্বামী-সন্তান-সংসারের পাকে-চক্রে। তবু তাঁর মধ্যেও তাঁরা লড়াই থামাননি। সমাজের নানান টানাপোড়েনে হার না মেনে এগিয়ে চলেছেন অবিরত। বিজ্ঞাপনও তাই একদিন নারীর উপর চাপানো লজ্জার ভার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'র‍্যালে সাইকেল'-এর প্যাডেলে পা দিয়ে পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে সমানতাল এগিয়েছে সে। পুরুষরাও হাত লাগিয়েছেন সংসারের কাজে। বিজ্ঞাপন সবসময় সেসব আড়াল করেনি।

স্ত্রী-পুরুষের যৌথ শ্রম আর ভালোবাসা ভরা সংসারের ছবিটিও তুলে এনেছে। তেমনই এক বিজ্ঞাপনের ছবি দেওয়া উচিত এইখানে।

বাড়িতে নতুন সন্তানের আগমন হলে, সেই সদ্যোজাতের দায়িত্ব কেবলমাত্র মা-এর নয়। যদিও বাঙালি পরিবারগুলিতে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে, সামান্য সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই সেই দায়িত্ব মা-এর উপর এসে পড়ে। শিশুটির খাওয়া, ঘুম, স্নান প্রতিটি ছোট-বড় দায়িত্বই মা'কে পালন করতে হয় মূলত। বাবারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দায়িত্ব পালনে কিঞ্চিৎ উদাসীন হয়ে থাকেন। কেবল সন্তানের দেখভাল করেই যদিও মা-এর দায়িত্ব শেষ হয় না, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ভালো-মন্দের প্রতি তাকেই যত্নবান হতে হয়। ফলে নতুন মা-এর অবস্থা বিভিন্ন সময়েই সঙ্গীন হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এই পরিচিত ছবির থেকে এতটাই আলাদা এবং মধুর যে এর উল্লেখ বিশেষভাবে করতে হয়। বিজ্ঞাপনটি 'জনসন্স বেবী পাউডার'-এর। 'মাতৃত্ব' নামক সুখানুভূতি এবং দায়িত্বের মোড়কে যখন সন্তানের সবকটি খুঁটিনাটি দায়িত্বই মা এর উপর নির্দ্বিধায় বছরের পর বছর চাপিয়ে দিয়ে আসছে সমাজ এবং পরিবার, এবং তাই দেখেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে চোখ, সেই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপনের শিরোনামটিই প্রথম দৃষ্টিতে মন ছুঁইয়ে যায়। সেখানে বড় বড় করে লেখা থাকে, 'বাবার সঙ্গে চানের মজা'। ছবিতে অবশ্য বাবা, মা দুজনকেই শিশুটিকে নিয়ে আহ্লাদের সঙ্গে স্নান করানোয় ব্যস্ত থাকতে

চিত্র ৫.২৪ মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৬২

দেখা যায়। মা-এর কোলে শোয়ানো থাকে ছোট্ট শিশু, বাবা তাকে ঘটিতে করে জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেয়। সন্তানকে দেখে দুজনের মুখই ভরে থাকে অনাবিল হাসিতে। বিজ্ঞাপনের কপিতেও, বাবা-মা এর সন্তানের প্রতি যত্নের এই যৌথ প্রয়াসকে অত্যন্ত স্বাভাবিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়, এই নিয়ে আলাদা করে কিছু উল্লেখ না করে, স্নানরত শিশুটির কেমন ফূর্তি হয়, সেই কথাই লেখা থাকে। আর সব শেষে বলা হয় 'জনসঙ্গ বেবী পাউডার' ব্যবহারে শিশুর ত্বক হতে পারে সুরক্ষিত।

সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব কেবলমাত্র মা-এর একার উপরে চাপিয়ে দেওয়ার থেকে, তা বাবা-মা দুজনে ভাগ করে নিলে সে কাজ উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে। পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের স্বাদ তখন হাজার পরিশ্রমেও আনন্দ গ্রহণের পথে আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এই ছবিতে অতিরিক্ত শব্দব্যয় না করেও যেন সেই কথা বলা হয়ে যায়।

গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে নারীত্ব, মাতৃত্ব, সংসার, ঘর ইত্যাদির স্টিরিওটাইপের মধ্যে এই বিজ্ঞাপনটি আক্ষরিক অর্থেই যেন প্রবল গ্রীষ্মের পরে বর্ষাদিনের আমেজ নিয়ে উপস্থিত হয়।

আগে দেখা গিয়েছিল, কীভাবে, 'ইম্পেরিয়াল ব্লু'-এর বিজ্ঞাপনে একটি মেয়ের উপস্থিতিতে দুজন পুরুষের নিজের নিজের উদর সংকুচিত করে রাখার দৃশ্য। স্ফীত উদর পুরুষদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন বাধা নেই

কিন্তু স্থূলাঙ্গী মেয়েদের বিজ্ঞাপনে সেই গতানুগতিক 'সুন্দর'-এর হিসাবে গরমিল হয় বলেই তা তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না।

'বোম্বে ডাইং' এর বিছানার চাদরের বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে রাতপোশাক পরিহিতা নারীকে, কিন্তু এই 'বম্বে ডাইং' ই তার তোয়ালের বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যবতী তরুণীকে মডেল হিসাবে ব্যবহার করেছে। অতি সম্প্রতি স্থূলাঙ্গী মহিলাদের 'প্লাস সাইজ' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই বিজ্ঞাপন যে সময়ের, সে সময়ে এই 'প্লাস সাইজ'এর ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। বিজ্ঞাপনের কন্যারা দেখতে 'সুন্দর' না হলে, তাদের দেহের মাপ সমাজের চোখে মনোমত না হলে, দর্শকদের চোখে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটা, তা নিয়ে একটা সংশয় থেকে যায়। কিন্তু 'বোম্বে ডাইং' তাদের প্রচারের স্বার্থেই ব্যবহার করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী একটি মেয়েকে। বিজ্ঞাপনটি কোনও ওজন কমানোর উপায়ের কথা বলে না, তবুও মেয়েটিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, তা উল্লেখের দাবি রাখে। ছবির মেয়েটিও এখানে তার আকার নিয়ে দুঃখিত না হয়ে, সহজভাবেই জানায় যে 'বোম্বে ডাইং' এর তোয়ালে ব্যবহার করতে তার সুবিধা হয়, কারণ তা সব সাইজেই পাওয়া যায়। এই বক্তব্য ছাড়া, কোনও অনুশোচনার কণ্ঠস্বর এই বিজ্ঞাপনটিতে পাওয়া যায় না।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর *স্ত্রী-লিঙ্গ নির্মাণ* বইতে লিখছেন-

নারী কে?

ধর্ম বলে : নারী থেকেই পাপের জন্ম, ধর্মাচরণে সে, পুরুষের সহকারিণী মাত্র।

আইন বলে : মা তার সন্তানের অভিভাবক নয়, ধাত্রী মাত্র। সন্তান পিতার।

শিল্প বলে : নারী সুন্দরী, যৌন উত্তেজনা সঞ্চারিণী, প্রেরণাদাত্রী। শিল্পসৃষ্টি তার কাজ নয়।

বিজ্ঞাপন বলে : নারী মা, নারী গৃহিণী, নারী এক অতিসুন্দরী অলীক মানবী।

সাহিত্য বলে : নারী প্রেরণা, নারী উর্বশী অর্থাৎ যৌনতার প্রতীক, নারী গৃহলক্ষ্মী। যে নারী সাহিত্য সৃষ্টি করে সে পুরুষের জগতে অনুপ্রবেশকারী 'মহিলা কবি' জাতীয়।

দর্শন বলে : মাতৃত্ব আর স্বামীসেবাই নারীর আসল দায়িত্ব যা তাকে মহিয়সী করে।

সমাজ বলে : নারী শ্রীমতী অমুক-পুরুষ বা মিসেস তমুক-পুরুষ, তার নিজস্ব কোন পরিচিতি নেই। নারী অনাম্নী, অনুগত, অন্তঃপুরচারিণী।

অর্থনীতি বলে : সাবধান, এখানে নয়, কাজের জগতটা পুরুষের। পুরুষ ভর্তা, নারীর ভরণপোষণের দায় তার। নারী নির্ভরশীল।

সুতরাং উপার্জন-উৎপাদন থেকে নির্বাসন এবং যৌনতা-মাতৃত্ব-গৃহিণীপনায় সাফল্যের ওপর গড়ে ওঠে নারীত্বের সংজ্ঞা। আঁতুড় থেকে চিতা পর্যন্ত, এই বোধ নিপুণভাবে আত্মস্থ করতে করতে, নির্ধারিত ভূমিকায় অভ্যস্ত হতে হতে সে সমাজের মনোমত 'নারী' হয়ে ওঠে। পিতৃতন্ত্রের লক্ষণরেখা নারীর চারপাশে গন্ডী কেটে দেয়।[৩২]

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর গদ্যাংশে বলছেন বিজ্ঞাপন জানায় নারী একইসঙ্গে মা, গৃহিনী, অতিসুন্দরী অলীক মানবী। ফলত নানাবিধ গুরুভার দায়িত্বের আড়ালে ভুলভ্রান্তিযুক্ত মানুষটি ঠিক কোথায় যান, সে খেয়াল কারুর থাকে না। বিজ্ঞাপনে তাই ধরাবাঁধা সংজ্ঞার বাইরের নারীদের স্থান সে ভাবে নেই। দশকের পর দশকে বিজ্ঞাপনের, নারীকেন্দ্রিক বিজ্ঞাপনের, নারীর ব্যবহার্য পণ্যের বিজ্ঞাপনের ধারাবাহিক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, এক দায়িত্ব থেকে আরেক দায়িত্বে এগোতে এগোতে বহুবিধ দায়িত্বে বাঁধা পড়েছেন বিজ্ঞাপনের নারীরাও। একদা ছিল কেবল ঘরের দায়িত্ব, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দায়িত্বটিও যুক্ত হয়েছে, কিন্তু তাই বলে ঘরের দায়িত্ব বিন্দুমাত্র লঘু হয়নি। "লজ্জা নারীর ভূষণ" শিরোনাম পালটে হয়েছে "দশভূজা", কিন্তু সেই যাত্রাপথকে আদৌ কি মুক্তির দিকে যাত্রা বলা যায়? যে মুক্তির সন্ধান পুরুষ পেয়ে এসেছেন বহু বছর ধরে। নারীর সঙ্গে

অবধারিতভাবে যুক্ত হয়েছে পিছুটানের ধারণা। যে কখনো মুক্তির উপযুক্ত পরিবেশ পায়নি, তাকে, স্বয়ং মূর্তিমান পিছুটানের জলজ্যান্ত বিশেষণকে অতিক্রম করে 'অপু' হিসাবে প্রত্যাশা করা বড় অন্যায্য মনে হয়।

কে বলতে পারে সুযোগ পেলে তারাও পিছুটান ফেলে পথকেই বেছে নিত না?

নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'দিনে দিনে আনন্দবাজার' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> নব্যতা আরও প্রবলভাবে দেখা যাইতেছে নারী-জাগরণে, সম্পূর্ণ নূতন মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাঙালি নারীর, প্রধানত যুবতীর আবির্ভাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও নব্য বাঙালি নারী দেখা দিয়াছিল, তবে তাহারা হইত নব্য বাঙালি পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী, অর্থাৎ যুবক গ্রহের যুবতী উপগ্রহ। বর্তমানে নব্যা বাঙালি যুবতীরা গ্রহত্ব লাভ করিয়াছে, বিবাহিতা হইলেও স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী না থাকিয়া শ্যামদেশীয় যমজের একটি হইয়া, কিন্তু প্রধানত অনূঢ়া থাকিয়া। অনেক যুবতীই বিবাহ না করিয়া স্বাধীন থাকাকে কাম্য মনে করিতেছে।
>
> এই মনোভাব পোষণ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ তাহাদের আছে। আমি বিদেশে থাকিয়াও অনুভব করিতেছি যে, এখনকার বাঙালি যুবতীরা মানসিক ধর্মে বাঙালি যুবকের ঊর্দ্ধে। কী শিক্ষায়, কী 'কালচারে', কী বৈদগ্ধ্যে, কী সুকুমার আচরণে, এমনকী কর্মদক্ষতায়ও বাঙালি যুবতীদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। আমার সহিত বাঙালি যুবক-যুবতী দেখা করিতে আসিলে আমি অনুভব করি, আমি যুবতীটির সহিতই সমানভাবে আলাপ করিতে পারি, যুবকটির সহিত নয়।[৩৩]

লেখক, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, কবি ইত্যাদি বহু মানুষের মধ্যে নারীদের ব্যাপারে, তাঁদের মেধা এবং বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে নানান মতামত বহু সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তারই অংশবিশেষের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে প্রয়োজনে।

বিজ্ঞাপনের জগতের সঙ্গে যারা কর্মসূত্রে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তাঁদের একজন রংগন চক্রবর্তী। তাঁর স্মৃতিকথা 'এক জীবন বিজ্ঞাপন' থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া যাক। মেয়েদের কয়েকটি আলোচিত বিজ্ঞাপনের জন্মকাহিনি বিজ্ঞাপনগুলিকে বুঝতে কিছু অধিক মাত্রা দিতে পারে।

চিত্র ৫.২৬ দেশ, ১০ জানুয়ারি, ১৯৮৭

এরপর আমাদের মধ্যে একটা উৎসাহের জোয়ার এল, নোটিস বোর্ডে নোটিস উঠল, 'বুক বেঁধে' নেমে পড়তে হবে। Belle ব্রা অ্যাকাউন্ট এইচ টি-এতে এল। আগেই বলেছি ব্রায়ের বিজ্ঞাপন নিয়ে ছোটোবেলাতেও আমার দারুণ উৎসাহ ছিল। তবে সেই সব 'জেব্রা', 'লিব্রা' এই সব নামকরণ করা গেল না। বেল চাইল যে মেয়েরা যৌবনে পা দিয়ে জীবনের প্রথম ব্রা পরতে চলেছে তাদের কাছে বেলকে পপুলার করতে হবে। আমাদের দেশে তখনও ব্রা, প্যান্টি সহজে উচ্চারণ করা যেত না। বাজারের দোকানিরা অধিকাংশ ছেলে হওয়ায় মেয়েরা অনেক সময় ভুল মাপের ব্রা কিনে চটপট চলে যেত, আলোচনা করতে পারত না। ব্রা-এর সাইজ, কাপ সাইজ এই সব নিয়ে কথা বলা মুশকিল ছিল। বেল ঠিক করল মেয়ে সেলস পারসন ঘরে ঘরে গিয়ে ব্রা বিক্রি করবেন। ব্রা-এর মাপ ইত্যাদি নিয়ে পরামর্শ দেবেন। আমরা একটা ক্যাম্পেন ভাবলাম। 'দরজায় বেল', বা 'কলিং বেল'। আজও আমার মতে লাইনটা খুব ভালো। তখন দূরদর্শনই একমাত্র বাংলা চ্যানেল ছিল। ঠিক হল একটা বিজ্ঞাপন হবে। ভাবা হল, একজন মহিলা দরজায় বেল দিচ্ছেন, বাড়ির গিন্নি খুলছেন, সেলস পারসন বলছেন, আমি বেল ব্রা নিয়ে কথা বলতে এসেছি। মায়ের পেছনে দরজায় একটি কিশোরী এসে দাঁড়াচ্ছে, গিন্নি বলছেন, ভেতরে আসুন। এর পর পর্দায় লেখা ফুটে উঠছে 'এবার আপনার দরজায় বেল'। ফ্রেমগুলোকে মোটামুটি এঁকে, (তাকে স্টোরি-বোর্ড বলে), পাঠানো হল। বাতিল হয়ে ফিরে এল। কারণ নাকি সেই আঁকা ছবিতে যে সেলস পার্সন প্রথম শটে ক্যামেরার দিকে পেছনে ফিরে আছেন, তাঁর ব্লাউজের ভেতর দিয়ে ব্রায়ের স্ট্র্যাপ বেশি স্পষ্ট উঠেছে। ভাবুন কী মানবিকতা। নানান কারণে, সেই ছবি তখন আর হয়নি। গোটা ব্যাপারটা বড়ো ঘিনঘিনে লেগেছিল।[৩৪]

যে অন্তবা র্সের বিজ্ঞাপনের জন্য এতকিছু, সেই বিজ্ঞাপনেই কোনও মহিলার পোশাকের অন্তরালে যদি তাঁর নিজের অন্তর্বাসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেই বিজ্ঞাপন তখনই বাতিল করতে হয়। ফলে দোকানে গিয়ে সেই আটের দশকের মধ্যভাগে, অথবা অনেকক্ষেত্রে একবিংশর দ্বিতীয় দশকেও মহিলাদের অস্বস্তির জায়গাটি অনুভব করতে খুব অসুবিধা হয় না।

এইখানে বেল ব্রায়ের একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক। বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ব্রা পরিহিতা মেয়েটি আসলে কোনও রক্ত মাংসের মানবী নয়। সেই গল্পও রংগন চক্রবর্তীর বই থেকে জানা যায়।

> তখন ব্রা-এর বিজ্ঞাপনের জন্য মডেল পাওয়া যেত না। এই নিয়ে এক কান্ড হল। কলকাতায় একটা স্টুডিও ছিল। তারা একটু দুষ্টু ছবিও তুলত। তারা এক মডেলের খোঁজ দিল, তিনি ব্রা পরে ছবি তুলতে রাজি আছেন। যথা সময়ে আমাদের আর্ট ডিরেক্টর স্টুডিওতে গিয়ে তাঁর ছবি তুলে আনল। বহু লোক জল এগোনো, আলো ধরা, নোট নেওয়া, কস্টিউমের দায়িত্ব নেওয়া ইত্যাদি নানান কাজের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেই শুটিং-এ যেতে চেয়েছিল, দেওয়া হয়নি। ছবি এল, গলার কাছ থেকে কাটা, মুখ দেখা যাচ্ছে না। সেই বিজ্ঞাপন বেরুল। এইচ টি এ-র রিসেপশন থেকে সেই আর্ট ডিরেক্টরকে রিসেপশনিস্ট ডেকে বলল তার সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে। আমি বোধ হয় তখন একটু সিনিয়র গোছের, আর্ট ডিরেক্টর এসে আমাকে জানাল যে সর্বনাশ হয়েছে, সেই মেয়েটি এসেছে, ছবি দেখে ওর মামা ওকে চিনতে পেরেছে। মামা এখন মেয়েটির কাছে টাকা চাইছে নইলে মেয়েটির বাবা-মা কে বলে দেবে বলে শাসাচ্ছে, বিপদে পড়ে মেয়েটি এখন বলছে ওকে আমাদের কিছু টাকা দিতে হবে, মামাকে দেবে। আমার একটু সন্দেহ হল, যে এটা খুব ঠিকঠাক ব্যাপার নয়। গন্ডগোল আছে। মেয়েটিকে ডাকলাম। সে এল। বললাম, দেখুন, আপনার মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু ব্রা পরা শরীর দেখে মামা আপনাকে চিনে ফেললেন? আপনি বলতে চান, এই কথা উনি বাড়িতে বলবেন? এই নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না। আপনি এখন যান। টাকা ফাকা হবে না। মডেলিং ফি আপনি পেয়ে গিয়েছেন, আবার টাকা কিসের? মেয়েটি খানিক তাকিয়ে চুপচাপ চলে গেল, আর কিছু হল না। আর্ট ডিরেক্টর আমাকে বলল, আরে তুমি কী করে ফট করে বলে দিলে? বললাম, বিজয়গড়ের ছেলে যে। ওরা বাজিয়ে দেখছিল, অস্বস্তি তৈরি করে কিছু বাগানো যায় কী না। একটু খারাপও লাগল। মেয়েটি সাধারণ পরিবারের নরম ধরনের মেয়ে, কেউ ওকে কিছু বুঝিয়ে পাঠিয়েছিল। তবে এরপর আর আমরা ব্রায়ের জন্যে জ্যান্ত মডেলের ঝামেলায় যাইনি, কালো রঙের একটি ম্যানিকুইন বাস্ট বানিয়ে তাই দিয়েই চালিয়েছিলাম। ম্যানিকুইনের মামা থাকে না।[৩৫]

অন্তর্বাস-পরিহিতা ম্যানিকুইনের গল্পটির সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্তমাংসের মানবীর সকরুণ কাহিনিরও ছায়া পড়ে এই গল্পে। কোন পারিবারিক চাপে তাকে টাকা চাইতে ছুটে আসতে হয়েছিল, এবং অকাট্য যুক্তির মুখে কিছু না বলতে পেরে কেনই বা সে ফিরে যায়, সেই কাহিনি পাঠকদের কাছে অজানা থাকে।

বোরোলিনের বৈচিত্রময় বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে এখানে কিছু কথা হয়েছে। রংগন চক্রবর্তী নিজে কিছু বোরোলিনের বিজ্ঞাপন তৈরি করেছিলেন। সেই ছয়ের দশকে নিয়মিত সিনেমা যাওয়া মালতী অথবা সাতের দশকের পপ্ সঙ্গীত শোনা মেয়েটির থেকে এই সমাজের মেয়েদের আরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে রংগন চক্রবর্তীর বই থেকে আবার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

> এইচ টি এতে অনেক বিজ্ঞাপন করেছিলাম। এই সময়ে বোরোলিনের বেশ কিছু বিজ্ঞাপন করি। একটা মজার বা দুঃখের গল্প বলি। বোরোলিন সাংঘাতিক জনপ্রিয় হলেও তাকে অনেক মেয়েরা ঠিক প্রসাধন হিসেবে দেখতেন না। ত্বকের সমস্যা হলে দরকার হবে এই ভেবে বাড়িতে রাখতেন। বোরোলিনকে তাক থেকে তুলে মেয়েদের হ্যান্ড ব্যাগে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা একটা সিরিজ তৈরি করেছিলাম। লাইনগুলো আজ আর মনে নেই, তবে ‘Happy Skin, Outdoor Skin’ এই রকমের ছিল। ছবিতে নানান মেয়েরা খুশি খুশি ভাবে ছিলেন। একটা ছিল ‘9-to-5 Skin’। তার ছবিটা ছিল অফিসে কজা করা একটি মেয়ের, হন্তদন্ত হয়ে অফিস যাচ্ছে- এই রকম। বক্তব্যটা ছিল, যে মেয়েরা অফিস-কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত, ত্বকের যত্নের জন্যে নানান কিছু করার সময় নেই, তাঁরা সব সময়ে সঙ্গে রাখেন বোরোলিন, একবার লাগিয়ে নিলেই হল। তার পর বাংলা করতে গিয়ে দেখা গেল ঠিক লিটারেল ট্রানস্লেশন করা যাচ্ছে না। ‘সুখী ত্বক’ যদিও বা হয়, ‘খোলা হাওয়ার ত্বক’ বা ‘নটা-পাঁচটার ত্বক’, কী রকম বিচ্ছিরি শোনাচ্ছে। তখন লেখা হল, তাও ঠিক মনে নেই, ‘খুশি দিনের সাথি’, ‘খোলা হাওয়ার সাথি’, এই রকম কিছু। তিন নম্বরটা মনে আছে, লিখেছিলাম, ‘অফিস পাড়ার সাথি’, এই রকম কিছু! বিজ্ঞাপন তো বেরুল। আমি আবার তখন এক নারীবাদী সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম। আমারই এক প্রাক্তন বস, তিনি এক সেমিনারে ‘বিজ্ঞাপনে মেয়েদের রূপায়ণ’ বলে একটা প্রেজেন্টেশন করবেন। বক্তব্যের সমর্থনে স্লাইড দেখাবেন। তা উনি তো বলবেন, স্লাইড প্রোজেক্টর চালাবে কে? আমার ডাক পড়ল। ও মা হঠাৎ দেখি আমার সেই ‘অফিস পাড়ার সাথি’ দেখিয়ে উনি বললেন, এই বিজ্ঞাপনে পরিষ্কার ভাবেই যৌন হেনস্থাকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের ‘অফিস পাড়ার সাথি’ হিসেবে দেখানো হচ্ছে, অর্থাৎ অফিসে কাজ করা মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গ দেওয়ার জন্যে সহজলভ্য। আপনারা বলতে পারবেন উনি ঠিক কী ভুল বলেছেন, আমি কিন্তু আজও কথাটা মেনে নিতে পারিনি। আমি নিজেকে নারীবাদী মনে করি। কিন্তু আমার মনে হয় অনেক কিছু নিয়ে প্যারানয়া এই আন্দোলনের ক্ষতি

করে, বাড়াবাড়ির ফলে, যারা মেয়েদের জরুরি দাবীগুলো বুঝতে পারতো, তারাও বিরক্ত হয়, বা খাঁটি সমালোচনাগুলোও তখন বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়।[৩৬]

চিত্র ৫.২৭ প্রতিক্ষণ, দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৪

রংগন চক্রবর্তীর বানানো সেই বিজ্ঞাপনটিকে পাশে রেখে বিজ্ঞাপনের লাইন এবং সেই সেমিনারের বক্তব্যকে মাথায় রাখলে, সেই সেমিনারে বলা 'যৌন হেনস্থাকে উস্কানি' দেওয়ার প্রসঙ্গটা কিছুটা কষ্টকল্পনা বলেই মনে হয়। বড় করে ব্যবহৃত শিরোনামের সঙ্গে যে মেয়েটির ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে তাকে কর্মক্ষেত্রে সুখী মনে হয়। গত শতাব্দীর আটের দশকের বিজ্ঞাপন এটি। মেয়েটির হাতে কলম, কাজের সামান্য অবসরে সম্ভবত তাঁর চশমা মাথার উপর তোলা রয়েছে। টেলিফোন, খাতা, কলমে কাজের ডেস্কটিকেও বেশ কর্মব্যস্ত মনে হয়। এবং বিজ্ঞাপনে দেখাই যায়, মেয়েটি শাড়ি পরে নেই। সালোয়ার কামিজ পরিহিতা মেয়েটি যে এমন সুবিধাজনক পোশাক পরে তাঁর কর্মক্ষেত্রে আসতে পেরেছেন, তাতে তিনি কর্মক্ষেত্র এবং সংসারের নানান প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে আজ বেশ সুখী, পরিপূর্ণ এবং আত্মনির্ভর বলেই মনে হয়।

বোরোলীন দীর্ঘ সময় ধরে সাবলম্বী নারীদের ছবি বিজ্ঞাপনে তুলে এনেছে, এই বিজ্ঞাপনটি সেই ধারারই একটি সুন্দর সংযোজন বলে বোধ হয়।

অফিসে কর্মরতা মেয়েটির প্রসঙ্গে বল্লরী সেনের একটি প্রবন্ধাংশের উল্লেখ এইখানে করা অবশ্যম্ভাবী মনে হয়।

ছয়ের দশকের শেষ থেকে শুরু হল একটির পর অন্যটির ধারাবদল। প্রথমে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রে একটি মেয়ের কাঁধে উঠে এল সমগ্র সংসার। পুরুষ অভিভাবকটির মৃত্যু, ছাঁটাই, পঙ্গুত্ব অথবা নিরুদ্দেশ ঠিকানা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তে তার বোন, কন্যা, স্ত্রী, প্রেমিকা বা প্রতিবেশিনী হিসেবে তাকে শিখিয়ে দিয়েছে সংসারের জোয়াল কীভাবে একক কাঁধের ওপর নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। সাংসারিক অনটন, দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারীতে সবচেয়ে বেশি দিয়েছে সেই সময়ের মেয়েটি, তার শরীর কাজে লেগেছে সৈনিকের সাময়িক সন্তুষ্টিতে অথবা স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাণ দেওয়ার বাইরে ও গ্রাম থেকে ছুটে আসা বহু মেয়ে এভাবে নিজেকে পণ করে সংসারের টাকা রোজগার করেছে। কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিনবত্ব ও প্রখরতা হল এই খানেই যে, ভবিষ্যতের প্রজন্মের সামনে তা শুধু ইতিহাসের রক্ত হয়ে থাকলেও নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও নারী-অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এর শক্তি অনেক বেশি। ঘর থেকে বাইরে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে আসা দপ্তরগামী মেয়েদের বিরাট একটা অংশ এইভাবে এ-সময়ে এগিয়ে এসেছিল। পুরুষদের হাতে-গড়া পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণার মধ্যেই তারা প্রবেশ করেছে, শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার পরেছে, কেউ-কেউ জিনস্, স্কার্ট। মহিলা সেক্রেটারি হয়ে তারা পুরুষ বসের বিনোদনের কথা ভেবেছে নানা ভাবে, নানা মাত্রায়। কোথাও বাধ্য হয়েছে, কোথাও খুশি হয়ে মেনে নিয়েছে। কোথাও বিদ্রোহ চলেছে। আজও অব্যাহতি নেই তাদের।[৩৭]

পূর্ববর্তী সেমিনারে বোরোলীনের বিজ্ঞাপনটির সাপেক্ষে সেই উক্তিকে যথাযথ না মনে হলেও, মহিলাদের উপর এই সমাজে অত্যাচার, নিপীড়নের ইতিহাসটি এত দীর্ঘ, এবং যে ধারায় প্রতিদিন নতুন সংযোজন ঘটে চলেছে। রাস্তা থেকে গৃহকোণ, স্কুল থেকে ভিড় বাস অথবা কর্মক্ষেত্রে, এত বিচিত্রধর্মী প্রতিকূলতায় মহিলাদের পড়তে হয়েছে যে মন বহুক্ষেত্রে অকারণ সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠাও খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না।

বিজ্ঞাপন আমাদের সমস্ত সমাজকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, বা বলা ভালো এই প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াটি উভয়পাক্ষিক। নারীদের কিছু স্টিরিওটাইপ বিজ্ঞাপনে দীর্ঘ সময় ধরে তৈরি হয়ে এসেছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অহনা বিশ্বাস তাঁর 'সুহাসিনীর পমেটম থেকে মডেলিনির মাস্‌কারা' প্রবন্ধে লিখেছেন,

আর আজকের সৌন্দর্যের ধারণা সৃষ্টিতে ব্যক্তির বা সমাজের অবদান কম। সেই ধারণা তৈরি করে দিচ্ছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী একটা বিরাট বাণিজ্যের জগৎ। ফলে প্রসাধনের কোনও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য থাকছে না। বাঙালির প্রসাধন বলে আলাদা করার মতো বৈশিষ্ট্য আজ খুব কমই আছে।

> আজ একটি দরিদ্র মেয়েও বিশেষ ব্র্যান্ড ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনের নারীর মতো সুন্দরী হতে চাইছে। সে বুঝতে পারছে না শুধু প্রসাধন ব্যবহার করে ঐ চেহারা পাওয়া যায় না। স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপন করতে হয়। উচ্চবিত্ত যে নিম্নবিত্তের থেকে সাজসজ্জায় সচেতন ফারাক রাখতে চায় তাকেই যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিম্নবিত্ত মেয়েরা একইরকম প্রসাধন করতে চাইছে। উচ্চবিত্তের সঙ্গে সমান হবার যে মানসিক চাপ নিম্নবিত্ত ভোগ করে, তাকেই ইন্ধন জোগাচ্ছে এইসব প্রসাধনী দ্রব্য। এ এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তন। গ্রামাঞ্চলের স্টেশনারি দোকান ভরে থাকে বিচিত্র ধরনের শস্তা, দামী ইমিটেশনে, কসমেটিকসে। যে গ্রামে উপযুক্ত পানীয় জল নেই, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, সে গ্রামের মেয়েরাও এসব কেনে বলেই তো এমন করে দোকান সাজানো।[৩৮]

বিজ্ঞাপন এই সমাজের মেয়েদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। বুঝিয়েছে তার ‘সুন্দর’ হওয়া বিশেষভাবে জরুরি, বয়সের ছাপ পড়লেই সে পুরুষের চোখে আর তেমন আকর্ষণীয় থাকবে না। বয়সে ছোট কেউ মাসিমা, কাকিমা ইত্যাদি সম্বোধন করলে তাও বিশেষভাবে লজ্জার, অর্থাৎ তার মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারীদেহের স্বাভাবিক পরিবর্তনকে করে তুলেছে আতঙ্কের বিষয়। বিজ্ঞাপিত পণ্যের ক্রেতা বৃদ্ধি করতে তারা অতি সাধারণ থেকে অত্যন্ত বিলাসী পণ্যকেও অবশ্যপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। অহনা বিশ্বাস একবিংশ শতাব্দীর একেবারে সূচনাকালে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পানীয় জল নেই, সেই গ্রামেও প্রসাধনী পণ্যের চাহিদা রয়েছে তীব্র। আজ তারও প্রায় দুই দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও গ্রামের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো খুব উন্নত না হলেও ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার এবং সুদূরপ্রসারিতায় বিজ্ঞাপিত পণ্যের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

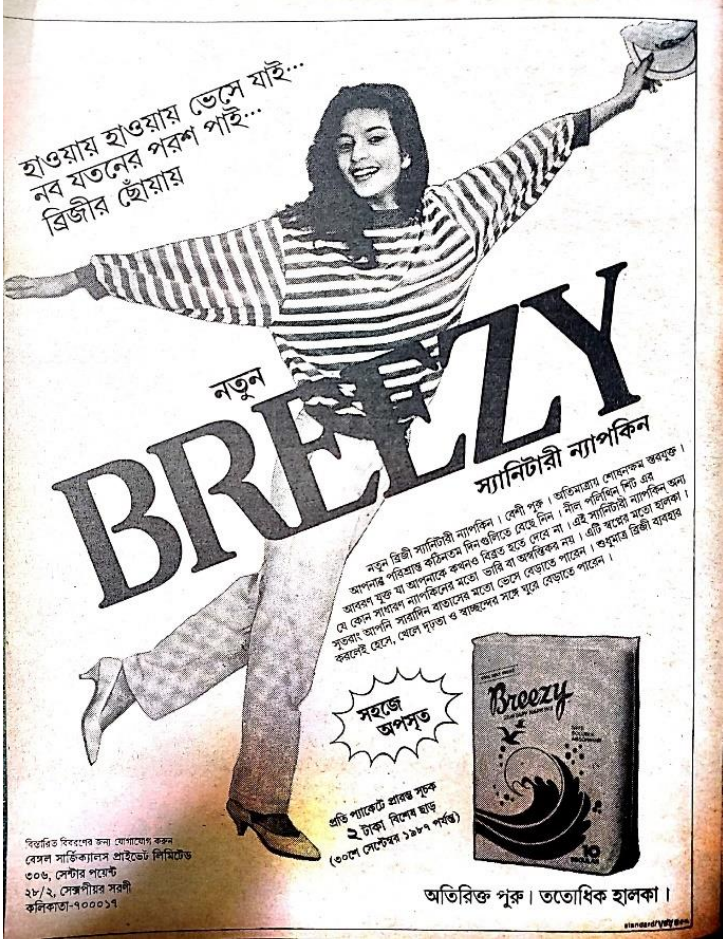

তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্টিরিওটাইপ থেকে বেরিয়ে অপর একটি স্টিরিওটাইপে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, 'অতি লজ্জাবতী' থেকে 'দশভূজা'-সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমে কিছু মুক্তির বার্তা এসেছে ঠিক।

একদা নারীদের শারীরবৃত্তীয় সমস্যাগুলিকে অতি সঙ্গোপনে রেখে, অজস্র সন্তানজন্মের আতঙ্ক আর যন্ত্রণাকে সামলে খুব চুপি চুপি বাতলানো হয়েছে কিছু সমাধান। লজ্জাকে অবলম্বন করে সংকোচের সঙ্গে একটু-আধটু টনিক খেলে পরিবারের দেখাশোনার একাকী কঠিন পথটি মেয়েদের কাছে যাতে সামান্য সুগম হতে পারে, সেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ৫.২৮ প্রতিক্ষণ, ১৭ মার্চ-১ এপ্রিল, ১৯৮৮

মনুসংহিতাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে মেয়েদের পালনীয় কর্তব্যগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে নানাভাবে। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে জেগে উঠেছে নারীদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর। একদা যে ঋতুচক্রকে ভয়াবহ গোপনীয় করে রাখা হত, সে গোপনীয়তা আজও বজায় আছে, কিন্তু বিজ্ঞাপনে আস্তে আস্তে স্যানিটারি ন্যাপকিনের সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও এই 'হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে যাই...' ইত্যাদি কথাগুলিকে ঠিক আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়, তবু একটি মেয়েকে সেই বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে বহুদিনের সামাজিক জড়তা ভাঙা হয়েছে।

একেবারে শেষপর্বে বর্তমান সময়ের কয়েকটি বিজ্ঞাপনকে রাখা যাক সামনে। তার পাশে রাখা যাক পুরনো একটি দুটি বিজ্ঞাপন।

সামাজিকভাবে নারীসমাজের অধিকাংশ ইতিহাসই নিপীড়নের, বঞ্চনার, লড়াইয়ের ইতিহাস, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এটাও ঠিক যে উনিশ শতক থেকে সেই ধারাবাহিকতাকে লক্ষ্য করলে, আজকে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এবং সেই পরিবর্তন প্রগতির দিকেই হয়েছে মূলত।

গত শতাব্দীর ছ'য়ের দশকে হরলিকস্ একটি বিজ্ঞাপন করে, বিজ্ঞাপনের কপিটি ছিল ইংরেজিতে। শিরোনামটি ছিল এরকম, 'It's her duty to help her husband', নারীদের ক্লান্তিনাশক পানীয় হিসাবে ডাক্তারবাবু হরলিকস্ পান করতে বলছেন। এবং মূল বক্তব্যটি ছিল এরকম যে তার শক্তি যদি এভাবে ক্ষয় হয়ে যায়, প্রতিমুহূর্তেই সে যদি ক্লান্তি বোধ করে, তাহলে তা স্বামীর পক্ষেও অসুবিধাজনক। মহিলাদের সুস্থ থাকা, স্বতঃস্ফূর্ত থাকা প্রয়োজন স্বামীকে সাহায্যের জন্যই। যাতে তার অসুস্থতা কোনওভাবে পরিবারের সুস্থতায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে।

চিত্র ৫.২৯ হরলিক্স ১

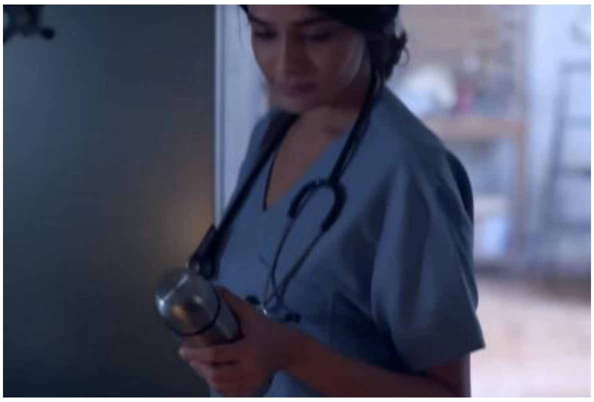

চিত্র ৫.৩০ হরলিক্স ২

সেই হরলিকসের কোম্পানিই আজ একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে দেখায় অন্যরকম কয়েকটি ছবি। বিজ্ঞাপনগুলি মুদ্রিত নয়। একটি চলমান বিজ্ঞাপনের কয়েকটি ছবি কেটে এখানে ব্যবহার করা হল। কেমন সেই ছবি গুলি?

বিজ্ঞাপনটিতে (চিত্র ৫.২৯ এবং ৫.৩০) দেখা যায় একটি মেয়ে ডাক্তার, তাঁর জন্য তাঁর স্বামী হরলিকস্ তৈরি করে দিচ্ছেন। স্বামীর হাতের ফ্লাস্ক পরিপূর্ণ গরম হরলিকসে, রান্নাঘরে তিনি গৃহকর্মে ব্যস্ত। স্ত্রী, স্বামীর প্রস্তুত পানীয়টি নিয়ে কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

আর একটি বিজ্ঞাপন দেখতে গিয়েও মনে পড়ে যায় সেই র‍্যালে সাইকেলের বিজ্ঞাপনটিরই কথা। যেখানে

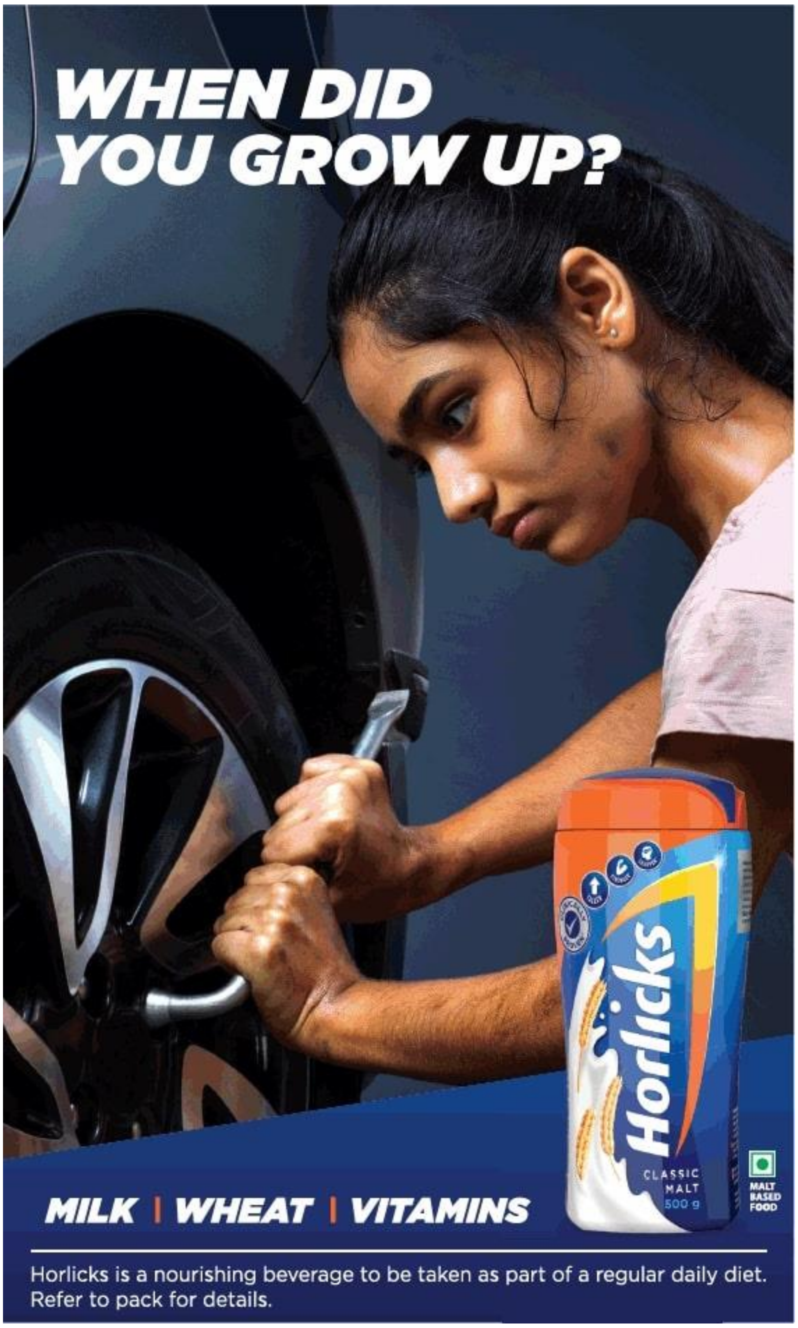

চিত্র ৫.৩১ হরলিক্স ৩

একটি মেয়েকে দেখা গিয়েছিল তাঁর পুরুষ বন্ধুটির সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে যেতে। পুরুষের সওয়ারী হয়ে নয়, গতির চাবিকাঠিটি সেই বিজ্ঞাপনে তারই হাতে দেখা গিয়েছিল।

একুশ শতকে সেই মেয়েটির হাতেই উঠে এসেছে গাড়ি সারানোর যন্ত্রপাতি। সে একটি খারাপ হওয়া গড়ি ঠিক করছে। তার হাত ধুলো ময়লায় কালো হয়ে আছে। বিজ্ঞাপনটি আরও ভালো লাগে তখন, যখন দেখা যায় মেয়েটির হাতদুটি ঠিক 'বিজ্ঞাপনের নারী'দের মতন 'কোমল' নয়। বরঞ্চ কিছু কঠোর এবং শক্তিশালী।

দুটি বিজ্ঞাপনেই নারীত্বের বা পুরুষত্বের পরিচিত ইমেজারিগুলো ভাঙাচোরা করা হয়েছে। শক্তি মানে পুরুষ, সেবা মানে নারী এই ধারণা ভেঙে ছেলেটির হাতে উঠে এসেছে রান্নাঘরের সরঞ্জাম, মেয়েটির হাতে যন্ত্রপাতি। কখনো নারীত্বের চিরকালীন ধারণাকেই প্রশ্ন তুলে বলা হয়েছে অন্য নারীত্বের গল্প। জানানো হয়েছে 'নারীত্ব', 'মাতৃত্ব' এইগুলি কেবলমাত্র কোনও লিঙ্গভিত্তিক পরিচয় নয়। এগুলো মনুষ্যত্বেরই এক একটি ধাপ, তা বহুক্ষেত্রেই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। দর্শকের প্রথম দর্শনে খানিক ধাক্কা লাগলেও, পরে তাঁরা সেইসব ভাবনাকে গ্রহণ করেছেন।

এই বিজ্ঞাপনের মেয়েটিকে গাড়ির চাকা ঠিক করতে দেখা যায় যখন, তখন এও বোঝা যায় যে পথে মেয়েটি একা, তার সঙ্গে কোনও পুরুষসঙ্গী আপাতত এই যাত্রাপথে সঙ্গে নেই। গাড়িটা সে চালাচ্ছে একা। সাইকেলের পথ অতিক্রম করে এখন তার গাড়ি চালানোর দিন। নারীর নিজস্ব ঘর বলতে তো কেবলমাত্র চারটি দেওয়াল নয়, তার নিজস্ব পরিসর, সমাজে তার ইচ্ছামতো বাঁচার পরিসরও বটে। যা ইচ্ছা করার অধিকার দীর্ঘকাল ধরে পুরুষ পেয়ে এলেও নারীর সেই অধিকার ছিল না। কিন্তু একটি মেয়ে যখন একা গাড়ি চালাচ্ছে তখন তার নিজস্ব একটি পরিসর, সমাজে তার একটি স্বীকৃতির পথ তৈরি হচ্ছে। সেই অধিকার অর্জনের পথটি দীর্ঘ, অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ, তবে সেই কাজটির অগ্রগতি হচ্ছে প্রতিদিন। বিজ্ঞাপনের মতন প্ল্যাটফর্ম, ব্যবসার কারণে জনরুচিকে, প্রচলিত ধারণাকে স্বীকৃতি দেওয়াই যার অন্যতম লক্ষ্য, পণ্য বিক্রয় করতে হবে যাকে, জনপ্রিয়তার বাইরে তার অন্য পথে যাওয়া কিছু মুশকিল। সেই বিজ্ঞাপনেও যখন এই দৃশ্য দেখানো হয়, তখন বোঝা যায় উনিশ শতকীয় মানসিকতা, ভাবনাস্তরকে পিছনে ফেলে আমরা কিছুটা অন্তত এগোতে পেরেছি এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি কিছু আশা করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে গোড়ায় বলা হয়েছিল মেয়ে যতদিন পর্যন্ত না তার নিজস্ব পরিসর পাবে ততদিন সে বড় স্রষ্টা হতে পারবে না, পারবে না ভ্যান গগ বা বেটোভেন হতে। রবীন্দ্রনাথ বলেন এটা নারীর অন্তরের সমস্যা, কিন্তু এটা আসলে সামাজিক সমস্যারই অংশ। মেয়েরা বেটোভেন হয়নি, এ কথা তথ্য হিসাবে ঠিক কিন্তু তিনি যা ব্যাখ্যা করেন, তা সবসময় গ্রহণীয় মনে হয় না। বর্তমানের এই বিজ্ঞাপনগুলি দেখে প্রত্যয় হয় যে সমাজ যদি এই জায়গায় পৌঁছতে পারে, নারী যদি তার স্বাধীনতার নিজস্ব পরিসরগুলি পায়, একদিন যদি সে পুরুষ-নিরপেক্ষভাবে সত্যিকারের স্বাধীন হয়ে ওঠে, তখন হয়তো সে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে একেবারে মৌলিক সৃষ্টি করতে পারবে। তখন হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলতে পারবেন না যে তার মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতা নেই।

নারীর প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা, তার একান্ত ব্যক্তিগত যে পরিসর, তা এখনও অর্জিত হয়নি। সমাজে আজও তাকে নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়ত। কিন্তু আমরা যে পথে এগোচ্ছি, সময়ের কাছে আমাদের কিছু প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে যখন দেখা যায় বিজ্ঞাপনের মত একটা পণ্যসংস্কৃতিও, আস্তে আস্তে স্বীকার করে নিচ্ছে নারীমুক্তির মতন বিষয়গুলিকে, তখন নৈরাশ্য কমে। তবে এই একবিংশ শতাব্দীতেও এমন বহু

বিজ্ঞাপন আছে, যা দেখলে বিরক্তির উদ্রেক হয়। তবু তারই মধ্যে একটি দুটি বিজ্ঞাপনেও যখন উল্লেখযোগ্য ভাঙা গড়া চোখে পড়ে, তখন আশা রাখা হয়তো খুব নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে না।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড-প্রবন্ধ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ১০৪।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০১।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০২।

৪. শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন দেব (সম্পাদক), *রবীন্দ্রবীক্ষা : রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন,* সংখ্যা ১৮, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ২২।

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২।

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩।

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "নষ্টনীড়", *গল্পগুচ্ছ,* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৮-৩৯৯।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদায়-অভিশাপ", *সঞ্চয়িতা,* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২১৩।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অতিথি", *গল্পগুচ্ছ,* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৯০।

১১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অপরাজিত,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৬৫।

১২. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুদিত), *মনুসংহিতা,* কলকাতা : আনন্দ, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৬২-২৫৭।

১৩. রামমোহন রায়, "সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ", *রামমোহন রচনাবলী,* প্রসাদরঞ্জন রায় (সম্পাদিত), কলকাতা : রামমোহন মিশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৯৮।

১৪. কৈলাশচন্দ্র সিংহ (সম্পাদিত), *আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর সংহিতা,* কলকাতা : সুরেশচন্দ্র সিংহ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ পৃ. ২৮।

১৫. উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, "নারীর আবশ্যকতা", *ভারতের নারী,* নূতন সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত), কলকাতা : আর, ক্যাম্ব্রে এন্ড কোং, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯-১০।

১৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, "আর্যশাস্ত্রে নারীধর্ম্ম", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০-১১।

১৭. স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী,* কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৪।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

১৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "দেবী", *প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প সমগ্র,* প্রফুল্ল কুমার পাত্র (সম্পাদিত), কলকাতা : পাত্র'জ পাবলিকেশন, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৮৫।

২০. নবনীতা দেবসেন, "পরভৃৎ", *সীতা থেকে শুরু,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫।

২১. নীতা সেন সমর্থ, "তিন শো বছরের কলকাতা : নারীদের ভূমিকা", *দেশ,* সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), ১৭ মার্চ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৮।

২২. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, "পুরুষবাদ", *দেশ,* সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), ১৫ জুলাই, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩৫।

২৩. সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ, "স্বাস্থ্য সহায় সৌন্দর্য", *মেয়েদের কথা,* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কল্যাণী সেন (সম্পাদিত), জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৬।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭২।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চতুরঙ্গ,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০।

২৬. https://www.investopedia.com/terms/t/thomas-malthus.asp. Accessed on 22.08.2021.

২৭. Bandyopadhyay, Aparna. *Desire and Defiance.* New Delhi : Orient BlackSwan. 2016.

২৮. শ্রীপান্থ, "কেয়াবৎ মেয়ে", *কেয়াবৎ মেয়ে,* কলকাতা : আনন্দ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২৪।

২৯. Woolf, Virginia. *A Room of One's Own.* Great Britain : Penguin. 1963. Page 5-6.

৩০. কল্যাণী দত্ত, "বিড়ম্বিতা", *পিঞ্জরে বসিয়া,* অভিজিৎ সেন (সম্পাদক), কলকাতা : স্ত্রী, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৫৪।

৩১. কল্যাণী দত্ত, "অধিকার হরণ", *পিঞ্জরে বসিয়া,* অভিজিৎ সেন (সম্পাদক), কলকাতা : স্ত্রী, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৫১।

৩২ মল্লিকা সেনগুপ্ত, "স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ", *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১৩-১৪।

৩৩. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, "দিনে দিনে আনন্দবাজার", *সাত দশক,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১১।

৩৪. রংগন চক্রবর্তী, *এক জীবন বিজ্ঞাপন,* কলকাতা : স্যাস পাবলিশার্স, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৭২।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।

৩৭. বল্লরী সেন, "নারীত্বের জীবনভাষ্য : ইতিহাস থেকে আগামী", *পরিকথা,* বাজার অর্থনীতির সকাল বিকেল-প্রসঙ্গ : মানবিক সম্পর্কের পালাবদল, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অষ্টম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, মে, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৭৩।

৩৮. অহনা বিশ্বাস, "সুহাসিনীর পমেটম থেকে মডেলিনির মাস্কারা", *দেশ,* অমিতাভ চৌধুরী (সম্পাদিত), ১৮ জানুয়ারি, ২০০২, পৃষ্ঠা ৩৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বাংলা বিজ্ঞাপন : একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২-১৯৩৯) সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* এর দ্বিতীয় ভাগে 'বিজ্ঞাপন' শব্দটির অর্থ পাই,

> বিশেষ বা বিস্তৃতভাবে জ্ঞাপন বা জানান; কোন বিষয়ের সংবাদ প্রচার করণ; সাধারণের অবগতির জন্য সংবাদ বা সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত বিবরণ; ইস্তাহার advertisement.[১]

অপরদিকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৭-১৯৫৯) *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এর দ্বিতীয় খন্ডে 'বিজ্ঞাপন' শব্দের প্রায় একই অর্থ পাই,

> ১ বিজ্ঞপ্তি, নিবেদন
>
> ২ সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত বিষয়বিশেষের লিখিত বা মুদ্রিত পরিচয়পত্র (advertisement, notice)।[২]

দুইটি অভিধান থেকেই একটি কথা স্পষ্ট হচ্ছে পাঠকের সামনে। দুটি ক্ষেত্রেই 'বিজ্ঞাপন'-এর সঙ্গে 'বিজ্ঞপ্তি'র তেমন তফাৎ নেই। সাধারণের অবগতির জন্য কিছু জানানোকে বলা হচ্ছে বিজ্ঞাপন। এটি বিজ্ঞাপনের একটি সাধারণ অর্থ, কিন্তু তার থেকে একটা বিশেষ অর্থের দিকে আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছি। ভাষাতত্ত্বের ভাষায় একে অর্থসংকোচ বলা যেতে পারে। রামেশ্বর শ তাঁর *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* গ্রন্থে বলছেন-

> প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাবকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে যদি তার অর্থ একাধিক বস্তু বা ব্যাপক ভাবকে না বুঝিয়ে তার মধ্যে একটিমাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থসংকোচ বলা যেতে পারে।[৩]

সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপনে কিছু জানানো হয় বটে, কিন্তু এর মূলে আছে একটি বিশেষ পণ্য। শেষপর্যন্ত শব্দটিতে মিশে থাকে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক, লাভ-ক্ষতির হিসাব। স্বাভাবিকভাবেই তা হওয়ার কথা। যত বেশি করে ধনতন্ত্র, পুঁজি-ব্যবসার বিকাশ ঘটেছে, তত বেশি করে এই বিশেষ অংশটির জন্য একটি আলাদা শব্দের প্রয়োজন পড়েছে এবং বিজ্ঞাপন কথাটি মূলত সেই অর্থে ব্যবহৃত হতে থেকেছে। ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'বিজ্ঞপ্তি' এবং 'বিজ্ঞাপন' শব্দদুটির মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু উনিশ শতক জুড়ে, এমনকি বিশ শতকেরও গোড়ার দিকে এই 'বিজ্ঞাপন' এবং 'বিজ্ঞপ্তি' শব্দদুটি একটি সাধারণ তাৎপর্য নিয়েই চলেছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের উপরেই একটি শব্দের তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার অধ্যায়টিতে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে 'বিজ্ঞাপন' শব্দটি কী তাৎপর্য নিয়ে এসেছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন পরিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্যিকরা বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে কেমনভাবে দেখেছেন, বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ সাহিত্যে কী ভাবে উঠে এসেছে অথবা তা সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছে কিনা, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নিয়ে কেমন আলোচনা হয়েছে, বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে অথবা একবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচকদের বিজ্ঞাপনকে দেখার দৃষ্টিতে কোনও পরিবর্তন এসেছে কিনা, সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের সংযোগ কতখানি; সেই বিষয়গুলিকে খুঁজে দেখাই হবে এই অধ্যায়ের কাজ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে রচিত তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞাপন', 'Advertisement' শব্দগুলিকে ব্যবহার করেছেন গ্রন্থটির সেই সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে। বাংলায় বর্তমান 'বিজ্ঞাপন' শব্দটির অর্থ আধুনিক তাৎপর্যে আসতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। বঙ্কিমের লেখার ভূমিকা অথবা গ্রন্থকারের নিবেদন অংশটি বেরোতো 'বিজ্ঞাপন' নাম দিয়ে। অজস্র উদাহরণের মধ্যে থেকে একটি বেছে নেওয়া যাক।

কমলাকান্ত

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

> কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে "চন্দ্রালোকে", "মশক" এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এই জন্য ঐ তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।
>
> বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নামকরণে "প্রথম খন্ড" লেখা হইল।
>
> শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[৪]

পত্রিকাপাঠ থেকে যখন গ্রন্থপাঠে রূপান্তরিত হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের নানান বই, সেই বইগুলির ভূমিকায় তিনি ‘বিজ্ঞাপন’ শিরোনামে গ্রন্থ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলি জানাচ্ছেন। এর সঙ্গে বইটি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে না।

উনিশ শতকের বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলিও ‘বিজ্ঞাপন’ শিরোনামে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বারেবারে।

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র [১৮৪৭-১৯০৫]* গ্রন্থের খন্ডগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে সেই সময়ের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের নমুনা। সেই সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল *সেবক* (১৮৯৬), *অঞ্জলি* (১৮৯৮), *ধূমকেতু* (১৯০৩-০৪), *ঢাকা প্রকাশ* ইত্যাদি।[৫]

এর মধ্যে *ঢাকা প্রকাশ*-এ প্রকাশিত একটি ‘বিজ্ঞাপন’ উদাহরণ হিসাবে তুলে দেওয়া যাক।

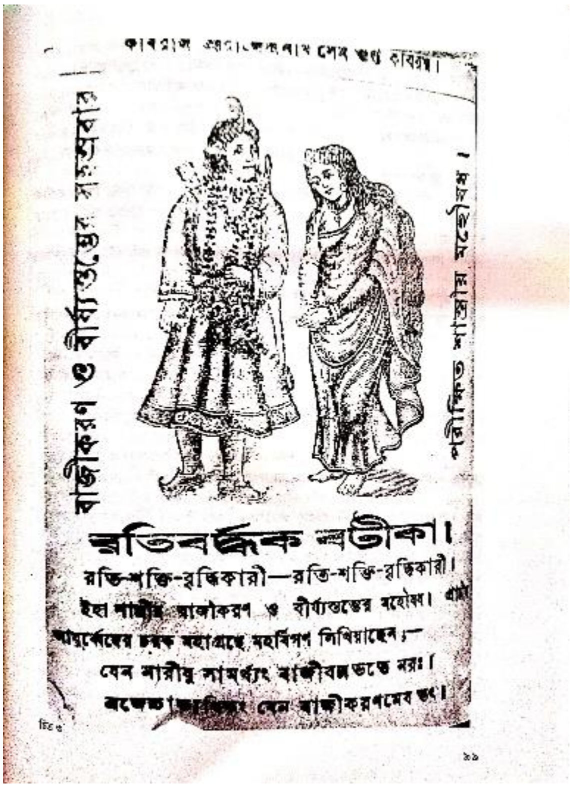

চিত্র ৬.১ এই ছবিটি ২০১৮ সালে সিগনেট প্রেস প্রকাশিত, অসিত পাল সম্পাদিত 'আদি পঞ্জিকা দর্পণ' থেকে গৃহীত

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ১৩ ই মে বাবুর বাজার লালবাগ সারকেলের অন্তর্গত একটি পাঠশালা খোলা হইয়াছে। এই স্কুলে বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য পুস্তক সকল পড়ান হইবে। দুই আনা হারে সকল বালককে বেতন দিতে হইবেক। এবার যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে আমি তাহাদিগের পাঁচ টাকা পুরস্কার দিতেও প্রস্তুত আছি।

শ্রী আব্দুল রহেল

৩০ জুন, ১৮৭২[৬]

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে কিছু বিক্রয়ের কথা তো নেই ই, পরিবর্তে ঘোষণা করা হয়েছে ছাত্ররা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পুরস্কারের কথা। তৎকালীন পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা মূলত ভরে থাকতো এই ধরনের ‘বিজ্ঞাপন’-এ। যেগুলিকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনের বদলে ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি বললে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। পণ্যের বিজ্ঞাপনের

প্রচলন সে সময়েও অবশ্যই ছিল, কিন্তু 'বিজ্ঞাপন' শব্দটির ব্যবহার ছিল বিস্তৃত। ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনটি 'রতিবর্দ্ধক বটীকা'র, বেণীমাধব দে অ্যান্ড কোং প্রকাশিত *নূতন পঞ্জিকা*-তে ১৯০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ এই ধরনের বিবিধ পণ্যের বহু বিজ্ঞাপন প্রকশিত হত। উদাহরণ হিসাবে এমন একটি বিজ্ঞাপনও তুলে ধরা হল। বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞপ্তি শব্দদুটি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে লগ্ন হয়েছিল দীর্ঘকাল। উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে এসেও সেই ছবির অভাব ঘটে না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের থেকে মাঝের কিছু বছর অতিক্রম করে, আলোচনার সুবিধার্থে চলে আসা যাক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)-এর সাহিত্য প্রসঙ্গে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম মুহূর্তে যে সাহিত্যিক জন্মাচ্ছেন, তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক অতিক্রম করে। তাঁর অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশ-কাহিনিগুলি নিজেদের অবয়বে ধরে রাখে সময়ের ছাপ। থাকে দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ প্রসঙ্গ। বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে একটি ব্যোমকেশ-কাহিনির কথা প্রায় অনিবার্যভাবে মনে পড়ে, তার নাম 'পথের কাঁটা'। কাহিনির একেবারে শুরুতেই ব্যোমকেশ অজিতকে একটি 'মজার বিজ্ঞাপন'-এর কথা বলে। কিছুদিন যাবৎ যা নিয়মিতভাবে খবরের কাগজে বেরোচ্ছে। এই বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে ব্যোমকেশের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ও এখানে মেলে। তবে সে কথা পরে উত্থাপন করা যাবে। আপাতত সেই মজার বিজ্ঞাপনের দিকে আলোকপাত করা যাক। বিজ্ঞাপনের শিরোনামটিই সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়, এ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কিছুতেই কোনও পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় নয়।

"পথের কাঁটা"

> "যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।"[৭]

এরপরে এই 'পথের কাঁটা'র রহস্যভেদ ব্যোমকেশ বক্সী কী ভাবে করে, হেঁয়ালী ভরা এই বিজ্ঞাপনের অর্থই বা কী, শহরে একের পর এক ঘটে যাওয়া হত্যাকান্ডের সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের সম্পর্কই বা ঠিক কোনখানে, তার জন্য অবশ্য সমগ্র উপন্যাস পড়তে হবে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কাহিনিটি আবর্তিত হয় এই বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করেই।

'অগ্নিবাণ' এবং 'উপসংহার'-এও যথাক্রমে আছে বীমা কোম্পানির বিজ্ঞাপনের কথা, এবং দ্বিতীয়টিতে পুনরায় একটি বিচিত্র বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যেখানে ব্যোমকেশ তার বন্ধু অজিতকে অকস্মাৎ প্রশ্ন করে এক লাখ টাকা দিয়ে অজিত এক বাক্স দেশলাই কিনবে কিনা। এহেন প্রশ্নে আজকের পাঠকও বলাবাহুল্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। সেখানে 'কালকেতু' কাগজে যে বিজ্ঞাপনটি বেরোয়, সেটি এরকম-

> এক বাক্স দিয়াশলাই বিক্রি আছে। দাম-এক লক্ষ টাকা। বাক্সে কুড়িটি কাঠি আছে; প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচ হাজার। খুচরা ক্রয় করা যাইতে পারে। ক্রয়ার্থী নিজ নাম ঠিকানা দিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। এই অমূল্য দ্রব্য মাত্র সাতদিন বাজারে থাকিবে, তারপর বিদেশে রপ্তানি হইবে। ক্রেতাগণ তৎপর হৌন।[৮]

এই বিজ্ঞাপনের অর্থ বিষয়ে বিশদে যাওয়া অবান্তর আপাতত। লক্ষ্যণীয় একটি বিষয়, বিজ্ঞাপনটি ঠিক সর্বসাধারণের উদ্দেশে প্রেরিত নয়। যদিও কোনও পণ্যই সর্বসাধারণের জন্য সৃষ্ট ও প্রচারিত হয় না, তবু একটি বড় সংখ্যক ক্রেতাগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখেই স্বাভাবিক বিজ্ঞাপন নির্মিত হয়। এই দেশলাইয়ের বিজ্ঞাপন যেহেতু অতি সামান্য ক্রেতার জন্যই বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে, তাই একেও বিজ্ঞপ্তির খাতেই ফেলা যেতে পারে।

আলোচনার পরবর্তী কিছু অংশে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যে কেমনভাবে বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ এসেছে তা দেখে নেওয়া যাবে। মূলত বর্ণনামূলক হবে সেই অংশটি।

বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সাহিত্যের সুমধুর যোগসূত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে একজন মানুষের কথা অবশ্যম্ভাবীভাবে মনে পড়ে। তিনি হলেন পদ্মলোচন বসুর পৌত্র হেমেন্দ্রমোহন বসু। কুন্তলীন পুরস্কার নামক এক আশ্চর্য পুরস্কারের প্রবর্ত্তক ছিলেন হেমেন্দ্রমোহন ওরফে এইচ বোস।

আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক মুদ্রিত *কুন্তলীন গল্প-শতক* (প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ, ১৩৬৯) গ্রন্থে সম্পাদকীয় অংশে এইচ বোসকে নিয়ে সুপাঠ্য জীবনীপ্রতিম ভূমিকা লেখেন সম্পাদক বারিদবরণ ঘোষ। সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে যে তথ্যগুলি আবশ্যক সেইগুলি এখানে সংক্ষেপে বলা যাক।

পড়াশোনায় উজ্জ্বল ছাত্র হেমেন্দ্রমোহন জগদীশচন্দ্র বসুর অধ্যাপনাকালে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসেন বোটানির গবেষণা করতে। রসায়নের ছাত্র হেমেন্দ্রমোহন বুঝতে পেরেছিলেন এই দেশে প্রসাধনী দ্রব্যের সুতীব্র চাহিদা রয়েছে। বিশেষত সুগন্ধী কেশতৈলের। তবে উৎকৃষ্ট প্রসাধনীসামগ্রী দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিই। হেমেন্দ্রমোহনের স্বদেশপ্রীতি তাঁকে প্ররোচিত করে কেশতৈল এবং সুগন্ধী আবিষ্কারে। পরবর্তীতে

তিনি মোটরের ব্যবসা বা গানের কলের মেশিন ও তৈরি করেন, সেই দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে আপাতত না গিয়ে এই সম্পাদকীয়ের একটি অংশে বারিদবরণ ঘোষ পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণের অংশ তুলে দেন, সেটুকু উদ্ধৃত করা যাক।

> ছোট পিসিমারা আমাদের কাছেই একটা বাড়িতে থাকতেন।... সে বাড়ির তিন-তলায় লম্বা একটি ঘরে পিসেমশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ বোস) তাঁর লেবরেটরি করেছিলেন; সেখানে বসে তিনি নানা রকম সুগন্ধী তৈরীর পরীক্ষা করতেন। ঘরটার দিকে গেলেই সুগন্ধ ভুরভুর করত। কত রকমের শিশি বোতল, রাশি রাশি ফুল, চোলাই করবার যন্ত্র, বড় বড় পাথরের খল ও হামানদিস্তা; এককোণে একটা সোডা তৈরীর কল, সে রকম আমরা আগের কখনও দেখিনি। হাতল টিপলেই ভুসভুস করে নল দিয়ে সোডা ওয়াটার বেরোত, সিরাপ মিশিয়ে আমাদের খেতে দিতেন, রুমালে জামায় সুগন্ধ এসেন্স দিয়ে দিতেন।[৯]

এই লেখাগুলি পড়লে আন্দাজ করা যায় হেমেন্দ্রমোহন ছিলেন জ্ঞানী এবং খেয়ালী মানুষ। কুন্তলীন কেশতৈলের কারখানা হেমেন্দ্রমোহন খোলেন ১২৮৭ বঙ্গাব্দে, তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়সে। তারপর কুন্তলীনের প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী ব্যবসায়িক সাফল্যের ইতিহাস রয়েছে। কুন্তলীন হল কেশতৈল, যার সুগন্ধের বহুবিধ রকমফের ছিল। সঙ্গে ছিল 'দেলখোশ' সুগন্ধী। 'কুন্তলীন', 'দেলখোশ'-এর বিজ্ঞাপনী ছড়ায় আমোদিত হয়ে থাকতো গত শতাব্দীর তিন, চার, পাঁচের দশকের পৃষ্ঠায়। তার মধ্যে একটি ছিল অতীব জনপ্রিয়, "কেশে মাখ 'কুন্তলীন'/ রুমালেতে 'দেলখোস'/ পানে খাও 'তাম্বুলীন'/ ধন্য হোক্ এইচ বোস।।" এছাড়া আরও বহু বিচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত কুন্তলীনের। বিলিতি ঢঙে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ধরন এইচ বসুই প্রথম আয়ত্ত করেন। সে কালে প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায় প্রত্যেকে নিয়মিত ব্যবহার করতেন কুন্তলীন। তাঁরা শংসাপত্র দিয়ে সে কথা জানান।

তবে এই প্রাথমিক ভূমিকাটুকুর পরে, কেবলমাত্র কুন্তলীনের বিজ্ঞাপন নয়, এইচ বোসের আবিষ্কার 'কুন্তলীন' কী ভাবে নিজেই একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হয়ে ওঠে, কী ভাবে সাহিত্যিক এবং তাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে, সেটুকুই এই অধ্যায়ে বলা কর্তব্য।

বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি অভিনব দিক আবিষ্কার করলেন এইচ বসু। কেবলমাত্র ব্যবসা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, এইটিই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগবশত তিনি 'কুন্তলীন পুরস্কার' নাম দিয়ে প্রতি বছর কয়েকখানি গল্প একত্রিত করে একটি পুস্তিকা ছাপাতেন। এবং সেই লেখকদের নগদ অর্থ

এবং গন্ধদ্রব্য উপহার দেওয়া হত। সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দানের এই অভিনব পদ্ধতি এই সময়কার পাঠকদেরও খুবই মোহিত করে তোলে। এই গল্পগুলি ছিল ফরমায়েসী রচনা। বারিদবরণ লিখছেন-

> বিজ্ঞাপন ছিল 'গল্পের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।' এটাই ছিল গল্প লেখার প্রধান শর্ত।[১০]

এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে এবং সেই বছরই গল্পগুলি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হতে থাকে 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামে। ১৩০৩-১৩৩৭ পর্যন্ত, মাঝে কয়েকটি ব্যতিক্রমী বছর বাদে, এই প্রকাশনার ধারা অব্যাহত ছিল। এবং এই প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে প্রথম পুরস্কার পান জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' গল্পের জন্য। এক জাহাজযাত্রীকে সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে তাঁর কন্যা কুন্তলীন কেশতৈল ব্যাগে ভরে দেন, যাতে তাঁর সম্পূর্ণ ইন্দ্রলুপ্তি রোধ করা যায়। খ্যাত-অখ্যাত বহু লেখক-লেখিকা এই গল্প লিখে পুরস্কৃত হয়েছেন।

শেষপর্যন্ত এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ছিল কুন্তলীনের বিপুল প্রচার, কেবলমাত্র এইটুকু বললে এর প্রতি সুবিচার করা হয় না। একবিংশ শতাব্দীর দুটি দশক অতিক্রম করে জেনে যাওয়া গেছে বিজ্ঞাপন কত বহুমাত্রিক হতে পারে, কত বিচিত্র উপায়ে ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু এই 'কুন্তলীন পুরস্কার' কেবল ব্যবসাবৃদ্ধির হাতিয়ার, এ কথা বললে তা সমীচীন হয় না। প্রতিষ্ঠিত অথবা অপরিচিত লেখক-লেখিকার রচনাকে চিরকালের মত স্মরণীয় করে রেখেছে এই কুন্তলীন। এই মাধ্যমটি না পেলে তাঁদের কেউ কেউ হয়তো কখনোই তাঁদের লেখা সর্বসমক্ষে আনার সুযোগ পেতেন না। হেমেন্দ্রমোহন বসুর ব্যবসা যেমন এতে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞাপনের এই মনোরঞ্জক উপায়ের কাছে বাংলা সাহিত্য ঋণী হয়ে আছে। সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বন্ধুত্বের সূত্রপাত ঘটিয়ে দিয়ে গেছে 'কুন্তলীন'।

গল্পগুলি প্রতিটিই আলাদা আলাদা করে এক অর্থে কুন্তলীন-দেলখোসের বিজ্ঞাপন হয়ে উঠলেও, অতি অল্প গল্পেই সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তাও তা তেল বা সুগন্ধীর বিজ্ঞাপন নয়। '৮নং বিন্দু পালিতের গলি, জোড়াসাঁকো কলিকাতা' নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত'র 'আমার চাকরী' গল্পটি 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর পঞ্চম বৎসরে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে এক চাকুরীপ্রার্থী যুবকের চাকরী পাওয়ার ঘটনা। চাকরীর সন্ধানে যে লাইব্রেরীতে গিয়ে প্রতিদিন 'কর্ম্মখালী'-র বিজ্ঞাপন দেখতো।

এই রকমে দুই বৎসর চলিয়া গেল। আমিও নিষ্ফলতার পেষণে দিন দিন পিষ্ট হইতে লাগিলাম। কিন্তু তবুও চাকরীর আশা ছাড়িতে পারিলাম কই? পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ সংবাদ পত্রের অপেক্ষায় অতি প্রত্যুষে লাইব্রেরীর চিরপরিচিত বেঞ্চে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। তাহার পরে কাগজ আসিলে অগ্রে কর্ম্মখালীর বিজ্ঞাপনটী (wanted) আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতাম। সৌভাগ্য বশতঃ যদি কোনও উপযুক্ত চাকরী খালীর বিজ্ঞাপন থাকিত তাহা হইলে তীক্ষ্ণধার ছুরির সাহায্যে তৎক্ষণাৎ সেইটিকে হস্তগত করিতাম।[১১]

খবরের কাগজে কেবলমাত্র খবর জানার আগ্রহে নয়, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপনের অন্বেষণে মানুষ দ্বারস্থ হয়েছেন।

ব্যোমকেশ উপন্যাসে বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ আলোচনাকালে একটি বিষয় বাদ রাখা হয়েছিল, তা এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'পথের কাঁটা' উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে একটি অত্যাশ্চর্য বিজ্ঞাপন। 'অগ্নিবাণ', 'উপসংহার'-এও বিজ্ঞাপনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

'পথের কাঁটা' তে ব্যোমকেশ-অজিতের কথোপকথনে ব্যোমকেশ অজিতকে মজার বিজ্ঞাপন বেরোবার কথা বললে অজিত জানায় সে তা লক্ষ্য করেনি কারণ সে বিজ্ঞাপন পড়ে না। ব্যোমকেশ অজিতের কথায় বিস্মিত হয়ে জানতে চায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন না পড়লে আর ঠিক কী পড়বার থাকতে পারে। অজিত খবরের কাগজে খবর পড়ার কথা সবিনয়ে ব্যক্ত করলে ব্যোমকেশ নানা শ্লেষপূর্ণ উক্তি করে এবং খবরগুলি যে আসলে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্যে ছাপা হয় না এবং "আসল কাজের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে"[১২]-এই কথা বলে। ব্যোমকেশের এহেন মতামতের সূত্র ধরেই অজিত 'অগ্নিবাণ' উপন্যাসে খানিক কটাক্ষ ফিরিয়ে দেয়। ব্যোমকেশ যখন খবরের কাগজে উল্লেখযোগ্য কিছু না পেয়ে হাল ছেড়ে দেয় এবং খবরেরকাগজওয়ালাদের প্রতি খাপ্পা হয়ে ওঠে, তখন অজিত বলে, "বিজ্ঞাপনেও কিছু পেলে না? বল কি? তোমার মতে তো দুনিয়ার যত খবর সব ঐ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের মধ্যেই ঠাসা আছে।"[১৩]

শিক্ষিত, রুচিসম্মত, বুদ্ধিদীপ্ত বাঙালির আইকন যে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে কখনও হেলাফেলা, উপেক্ষার নজরে দেখেনি। সংবাদপত্রে সংবাদের তুলনায় বিজ্ঞাপন তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞাপনের সমালোচনা করা সম্ভব, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা যেতে পারে; কিন্তু আধুনিক সমাজে তাকে কি উপেক্ষা করা সম্ভব আদৌ? এই বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)-এর সাহিত্যে ঘুরে-ফিরে বিজ্ঞাপনের নানা প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। তবে সেইসব প্রসঙ্গ গুরুত্বের দিক থেকে খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের তিনটি উপন্যাস থেকে বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রায় একইরকম তিনটি বাক্য উঠে এসেছে। হয়তো কাকতালীয়ভাবেই। তবে এই সমাপতন প্রসঙ্গ এখানে অবতারণা করা জরুরি।

রবীন্দ্রনাথের সেই তিনটি উপন্যাস হল 'চোখের বালি', 'গোরা' এবং 'যোগাযোগ'। তাদের প্রকাশনা সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যটুকু দেওয়া হল।[১৪]

'চোখের বালি' উপন্যাসটি ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে কার্তিক, ১৩০৯ পর্যন্ত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঘটেও সেই বছরই। 'গোরা' *প্রবাসী* পত্রিকায় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকশিত হয়ে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে সমাপ্ত হয় এবং সেই বছরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'যোগাযোগ' উপন্যাস প্রকাশিত হয় এর প্রায় দুই দশক পরে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে।

'চোখের বালি'র ১৭ নম্বর অধ্যায় জুড়ে আছে দমদমের বাগানে চড়ুইভাতি করতে যাওয়ার কথা। সেই চড়ুইভাতির দিনটি ঠিক কী কারণে গুরুত্বপূর্ণ অথবা উপন্যাসের চরিত্রদের ব্যক্তিগত সমীকরণে কোন ধরনের বদল এসেছিল সেই বিশেষ দিনটিতে, তার বর্ণনা এখানে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কেবল যে মনোভাব নিয়ে মহেন্দ্র এই দিন বিনোদিনীকে নিয়ে চড়ুইভাতিতে আসার প্রস্তাব দেয়, তা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনই পরিস্থিতিতে স্নানের পরে দুই সখী আশালতা এবং বিনোদিনী স্নান সেরে আসে, সে সময়ে দেখা যায়-

> মহেন্দ্র বাড়ির বারান্দায় চৌকি লইয়া অত্যন্ত শুষ্কমুখে একটা বিলাতী দোকানের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে।[১৫]

দ্রুত চলে যাওয়া যাক 'গোরা' উপন্যাসে। গোরা এবং বিনয়ের গভীর বন্ধুত্ব সত্ত্বেও মতপার্থক্য, দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক মান-অভিমানের মধ্যে, ১২ নম্বর অধ্যায়ের একেবারে শেষাংশে গোরা অবিনাশের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে,

> গোরার ঘরে বিনয় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে খবরের কাগজ হাতে লইয়া শূন্যমনে বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।[১৬]

মহেন্দ্র এবং বিনয়, যথাক্রমে "শুষ্কমুখে" এবং "শূন্যমনে" বিজ্ঞাপন দেখে, শব্দদুটি প্রয়োগ হয় দুটি ভিন্ন উপন্যাসের ভিন্ন চরিত্রের প্রায় একইরকম পরিস্থিতিতে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের উদাহরণটি বাহ্যিকভাবে এর থেকে কিছুটা আলাদা।

কুমুদিনীকে একেবারে নিজের হস্তগত করবার গভীর অভিপ্রায় থাকলেও, তার ইচ্ছামতো কুমু মধুসূদনের বাহুবন্ধনে ধরা দিতে প্রস্তুত ছিল না। একদা বিবাহের ব্যাপারে যে মধুসূদনের অনীহা ছিল, কিছু বেশি বয়সে কুমুকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করেও ঠিক করায়ত্ত করতে না পেরে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সে। কর্মোন্মাদ মধুসূদনের এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল কাজের সময়। তেমনই এক অস্থিরতার মুহূর্তে, ৩৪ নম্বর অধ্যায়ে-

> সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই মধুসূদন চমকে উঠে বসল। হাতের কাছে আর-কিছু না পেয়ে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতাটা নিয়ে এমনভাবে সেটাকে দেখতে লাগল যেন তার আপিসেরই কাজের অঙ্গ। এমন-কি, পকেট থেকে একটা মোটা নীল পেন্সিল বের করে দুটো-একটা দাগও টেনে দিলে।[১৭]

উল্লেখ্য, তিনটি উপন্যাসের অন্তবর্তী সময়ের ব্যবধান যাই হোক, কাজের অভাবেই কেবলমাত্র তিনটি চরিত্র বিজ্ঞাপন দেখে। তাদের শূন্য চোখে, মনে সেই বিজ্ঞাপনের অর্থ ধরা পড়ে না। কখনও আবার নিজের দুর্বলতা আড়াল করে কাজের অভিনয় করতেও ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।

উপন্যাস তিনটিতে প্রায় একইরকম পরিস্থিতিতে চরিত্ররা কর্মহীন হস্ত আর উন্মুখ মনকে চাপা দেওয়ার অভিনয় করার সময়ে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন বিজ্ঞাপনকে। এ ছাড়া আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকে না সেইসব বিজ্ঞাপনদের।

রবীন্দ্রনাট্য 'মুক্তির উপায়' *অলকা* পত্রে প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে এবং গ্রন্থাকারে আবিভূর্ত হয় ১৩৫৫ তে। নাটকের চরিত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফকির, তার স্ত্রী হৈমবতী এবং হৈমবতীর দিদি পুষ্পমালা। এই পুষ্পমালা শিক্ষিতা, সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, এবং রসিক প্রকৃতির মহিলা। এই পরিবারটির পাশের পাড়ায় ষষ্ঠীচরণ মোড়লের বাস। তার নাতি মাখনলাল। সেই মাখন দুই স্ত্রী'র অত্যাচারে দেশছাড়া হয়। এই হল নাটকের পটভূমি। ষষ্ঠীচরণ খবর পায় পুষ্প অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানে, তার মাধ্যমে যাতে সে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে পারে। পুষ্প

তখন নিজে থেকে বুদ্ধি করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। দুই বোনের কথোপকথনের একটি অংশ তুলে ধরা হল-

হৈম : আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দেখলুম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।

পুষ্প : হ্যাঁ, সেটা আমারই কীর্তি।

হৈম : তাতে লিখেছ, প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের জন্যে লোক চাই, হনুমানের পার্ট অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়।

পুষ্প : এই তো চার দিকেই চলচ্ছবির নাট্যশালা, তোমাদের সবাইকে নিয়েই।[১৮]

হনুমানের অভাব মেটাতেই কৌশলে বিজ্ঞাপনের সহায়তায় ডাক দেওয়া হয় মাখনকে। মাখন সেই বিজ্ঞাপনের ডাকে ফিরে আসে। এদিক সেদিক ঘুরে সে তখন জেলেদের সঙ্গে চলেছিল। এমতাবস্থায়,

মাখন : চলেছিলুম নাজিরপুরে ইলিষ মাছ ধরার দলে। ইস্টেশনে দেখি বিজ্ঞাপন, হনুমানের দরকার। রইল পড়ে জেলেগিরি। জেলেরা ছাড়তে চায় না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বললুম, ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পয়সা বেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই- আর দ্বিতীয় মানুষ নেই যার এত বড়ো যোগ্যতা। এ তো আর ত্রেতাযুগ নয়![১৯]

হাসির নাটকের হাস্যোজ্জ্বল সমাপ্তিতে বিজ্ঞাপনের ভূমিকাটিও বেশ মজার।

'একরাত্রি' 'স্বর্ণমৃগ' ইত্যাদি গল্পে ছোট ছোট করে বিজ্ঞাপনের কথা এলেও তা কাহিনির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি কখনোই।

জীবনস্মৃতি-র 'জাহাজের খোল' অধ্যায়ের বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গটি সত্য ঘটনা হওয়ার কারণেই সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ।

কাগজে কী একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।[২০]

রবীন্দ্রনাথের 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধটি কার্তিক, ১৩০৯-এর *বঙ্গদর্শন* (নব পর্যায়)-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এইটি সহ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে *ভারতবর্ষ* প্রকাশিত হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দে।

'অত্যুক্তি' প্রবন্ধ প্রকাশকালে জানানো হয়েছিল 'দিল্লি-দরবারের উদ্‌যোগ কালে লিখিত'। রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লিতে ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি এক 'দরবার' অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন লর্ড কার্জন, ১৯০২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। পরদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, তার মধ্যে এই কটি কথা ছিল-

> If I were asked to sum up in a single word the most notable characteristic of the East- physical, intellectual and moral- as compared with the West, the word exaggeration or extravagance is the one that I should employ. It is particularly patent on the surface of the Native Press.[২১]

এই 'exaggeration or extravagance'-এর প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে। প্রবন্ধের শুরুতে তিনি বলেন ইংরেজরা বলে থাকে প্রাচ্যদেশীয় লোকেরা অত্যুক্তিপ্রবণ। আবার আমরাও দেখি যে ইওরোপ অত্যুক্তিপ্রবণ, কেউই নিজের দোষ বিষয়ে সচেতন হতে পারে না। এই যে রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা নিজেদের রাজভক্ত বলে জাহির করে থাকে, ইংরেজ ভারতীয়দের দিয়ে এই অত্যুক্তি করিয়ে থাকে। ইংরেজরা আড়ম্বর করতে গিয়ে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে চলেছে এই দেশে, সে তুলনায় ভারতবর্ষে তাদের শাসনের যে প্রকৃত প্রজা-হিতৈষণা, তা প্রায় অনুপস্থিতই বলা চলে। তাদের এই বিশাল সভ্যতা-গর্বের পিছনে যে ঢক্কানিনাদ, তা সম্পূর্ণতই অত্যুক্তি। এই অত্যুক্তি বিষয়টা ইওরোপকেও পীড়িত করেছে, প্রবেশ করেছে মিথ্যাচার। এইখানে রবীন্দ্রনাথ বলেন-

> বিলাতে বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে চিত্রে নানা অক্ষরে দেশে বিদেশে নিজেকে কিরূপ ঘোষণা করে তাহা আমরা জানি-এবং আজকাল আমরাও ভদ্রাভদ্রে মিলিয়া নির্লজ্জভাবে এই অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছি।[২২]

বিশেষত এই প্রবন্ধে বিজ্ঞাপনকে একটি অতিরঞ্জিত বিষয় হিসাবে সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিজ্ঞাপন যে অধিকাংশ সময়েই একধরনের অত্যুক্তিকে তার অবয়বে বহন করে, সে কথাও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে।

পলাতকা কাব্যগ্রন্থের (১৯১৮) 'আসল' কবিতাটিতেও একটি ছোট্ট জায়গায় এসেছে বিজ্ঞাপনের কথা।

> পাড়ার মধ্যে ওই জমিটাই কোনো কাজের নয়;
>
> সবার যাতে নাই প্রয়োজন লক্ষ্মীছাড়ার তাই ছিল সঞ্চয়;

তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা, টুকরো হাঁড়ির কানা,

অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা,

ফুটো এনামেলের গেলাস, থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন

মরচে-পড়া টিনের লণ্ঠন,

সিগারেটের শূন্য বাক্স, খোলা চিঠির খাম,

অদরকারের মুক্তি হেথায়, অনাদরের অমর স্বর্গধাম।[২৩]

বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গের এমন বহু উল্লেখ সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অতি অল্প কয়েকটি উদাহরণ বেছে নেওয়া গেল। তবে অল্প হলেও উদাহরণগুলি থেকে বিজ্ঞাপন বিষয়ে তাঁর কয়েকটি সাধারণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া খুব কঠিন হয় না।

মহেন্দ্র, বিনয় অথবা মধুসূদন নিতান্ত কর্মহীন অবস্থায় অথবা নিজেকে ব্যস্ত প্রমাণ করবার তাগিদে বিজ্ঞাপনে চোখ বোলায়, গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দিতে না পারায় বিজ্ঞাপন পড়ে। অপরদিকে ব্যোমকেশ ঠিক এইখানেই আলাদা, সে সংবাদপত্রের 'সংবাদ' অংশটি বাদ দিয়ে বিজ্ঞাপনেই মন দেয়। তাতেই বিশেষভাবে সংবাদ খুঁজে বেড়ায়।

তাত্ত্বিকভাবে তিনি বিজ্ঞাপনকে যখন দেখেছেন, তখন তিনি তার সমালোচনা করেছেন, আত্মপ্রচারের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। কিন্তু বিশ্বভারতী পর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন বিজ্ঞাপনের কথা ভাবেন, তখন তিনি বিজ্ঞাপনের নন্দনতত্ত্ব, নীতি তাই নিয়ে যথেষ্ট ভাবেন। তখনকার বিজ্ঞাপন আজকের মতন প্রতীকধর্মী হয়ে ওঠেনি। বিজ্ঞাপন মানে ছিল কথা। ছবির ব্যবহার ছিল কম। ফলে বিজ্ঞাপনে কী কথা লেখা হবে তা তিনি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন। এবং বিজ্ঞাপন ব্যাপারটাকে খুব জরুরি একটা জিনিস বলেই মনে করছেন। এটা একধরনের স্ববিরোধ ও বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানের বই প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। নাম *রবিচ্ছায়া*। যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এই বই প্রকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বই বিক্রিত না হওয়ায়, এবং ব্যক্তিগত অর্থে বই প্রকাশ করার কারণে, প্রকাশের কয়েকমাসের মধ্যে তার মূল্য হ্রাস করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বইটির (প্রকাশ ২ জুন ১৮৮৫, বৈশাখ,

১২৯২, মুদ্রণ এক হাজার, পৃষ্ঠা ১৯০) দাম ছিল বারো আনা। প্রকাশের সাত মাস পরে সঞ্জীবনী পত্রের কয়েক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়-

মূল্য কমিল রবিচ্ছায়া মূল্য কমিল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুগ্ধ হন নাই এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিরল। তিনি কবিতা লিখিয়া বঙ্গভাষায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি একত্র মুদ্রিত হইয়া 'রবিচ্ছায়া' নামে এত দিন বিক্রি হইতেছিল।...

এতকাল বারো আনা করিয়া 'রবিচ্ছায়া' বিক্রয় হইতেছিল। অতঃপর আট আনা মূল্য নির্ধারিত হইল।[২৪]

এই বিজ্ঞাপন থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেসময় রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজারে খুবই মন্দা ছিল।

১৯০১ সালের জুলাই মাসে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয়। এই মজুমদার লাইব্রেরি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্থায়ী প্রকাশনা সংস্থা। মজুমদার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের গদ্য গ্রন্থাবলী। ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের একান্ত সচিব যতীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা চিঠি (৩ রা বৈশাখ, ১৩১৪) থেকে জানা যায়, এই গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম সংখ্যা ছাপা হওয়ার পরে তিনি এই বইয়ের স্বত্ব বোলপুরে দেন। বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার (১৯০২) পর থেকে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক অর্থের প্রয়োজন ছিল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য। এই চিঠিতেই তিনি লেখেন, মহারাজকে দিয়ে যদি এই প্রথম সংখ্যা কয়েক কপি কেনানো যায়, তাহলে তাঁর কিছু সুবিধা হয়।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'প্রবাসী' তে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য গ্রন্থাবলী।

গদ্য গ্রন্থের প্রতি খন্ডের মূল্য পুস্তকের আকার অনুসারে ধার্য হইবে ও প্রতি খন্ড ধার্যমূল্যে পৃথক পৃথক বিক্রয় হইবে, তবে যাঁহারা এক্ষণে সমগ্র গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইবেন তাঁহারা পুস্তক প্রকাশিত হইলে প্রতি খন্ডের ধার্য মূল্যের বারো আনা মূল্যে সেই খন্ড পাইবেন। কিন্তু প্রতি টাকায় তাঁহারা যে চারি আনা হিসাবে বাদ পাইবেন এজন্য তাঁহাদিগকে আপাততঃ একটি টাকা অগ্রিম দিতে হইবে, এবং এ টাকা শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন জোড়াসাঁকোয় পাঠাইতে হইবে। গ্রাহকগণ এই টাকার রসিদ পাইবেন।... রবীন্দ্রবাবু এই গদ্যগ্রন্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন।[২৫]

লক্ষণীয়, ‘গ্রাহকগণ’ টাকা পাঠাচ্ছেন জোড়াসাঁকোর ঠিকানায়। অর্থাৎ মজুমদার লাইব্রেরি পর্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজের বইয়ের বিপণনের অংশটি অনেক ক্ষেত্রেই নিজেই দেখাশোনা করতেন।

তবু এরই মাঝে দুই একজন প্রকাশক বেশি মূল্যে তাঁর কয়েকটি বইয়ের কপিরাইট কিনে নিয়ে যান। ‘বসুমতী সাহিত্য মন্দির’ ছিল তারই মধ্যে একটি প্রকাশনা সংস্থা। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে তাঁর *নৌকাডুবি* (১৩১৩) উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৬] বসুমতী থেকে *নৌকাডুবি*-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬-এ। বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বত্বাধিকারী ছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। *চোখের বালি* উপন্যাস এবং *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থ প্রাথমিকভাবে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হলেও, পরবর্তী কালে বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ তা বিক্রয়ের অধিকার লাভ করেন। *নৌকাডুবি*-র শেষে সংলগ্ন উভয়পৃষ্ঠাব্যাপী এই দুই গ্রন্থের অলংকারবহুল ভাষায় ছাপা বিজ্ঞাপন থেকে সেই তথ্য জানা যায়। *নৈবেদ্য* এবং *চোখের বালি* উভয় গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থেকেই কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়[২৭],

> শিক্ষিত নরনারীর চির-আদরের সুপ্রতিষ্ঠিত সুকবি অধুনা বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন লিখিত সুচারু কাব্যগ্রন্থ।
>
> রাজ সংস্করণ-গ্লেস তাসের ন্যায় কাগজে, মুক্তার ন্যায় অক্ষরে, রেশমের ন্যায় কাগজের আভরণে এই কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত; ২০০ দুই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। যিনি প্রেমিক, যিনি ভাবুক, যিনি সুধার রসাস্বাদে অভ্যস্ত, তিনিই এই সুন্দর, প্রেমময়-প্রাণময়-ভাবময়-সুধাময়- গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন...
>
> উপহার প্রদানে- উপহার গ্রহণে- বিবাহ-বাসরে- ফুলশয্যায়- শুভকার্য্যে- সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে একমাত্র আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইয়াছে। তাহা ভাবুকেরা বুঝিবেন, এই ফুলের হার গলায় পরিলে- সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইবে, পঙ্কিল দুর্গন্ধময় পল্লীও “নৈবেদ্য”র পবিত্র সৌরভে সুরভিত হইবে। জীবনের অপকার্য্যের অবসাদ যাইবে, জীয়ন্তে স্বর্গের সুষমা প্রাপ্ত হইবেন। কবির ভাব বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব; আমাদের সবিনয় অনুরোধ- একবার পাঠ করুন।

এবং,

> অতি শীঘ্র এই উপন্যাস পাঠ করুন। নরনারী, যুবক-যুবতী, বিবাহিত-অবিবাহিত, যাঁহারা নূতন বিবাহ করিয়াছেন, যাঁহাদের বিবাহ পুরাতন হইয়াছে, যাঁহাদের প্রেমে ভাঁটা পড়িতেছে, যাঁহারা স্ত্রীকে মনের মত করিয়া চাহেন, যাঁহারা সুখের দাম্পত্যপ্রেম চাহেন, তাঁহারা “চোখের বালি” নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন।

বিজ্ঞাপনের বক্তব্য এবং ভাষা এই উভয়ের মেলবন্ধনের ফলাফল হয় ভারি বিচিত্র। বিজ্ঞাপনের এই ভাষা এবং ভাব রবীন্দ্রনাথ অনুমোদিত বলে মনে হয় না। কিন্তু এই ভাষার মধ্যে এমন এক ধরনের আকর্ষণী ক্ষমতা আছে, যা পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে সহজে। বই বিক্রির স্বার্থে রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞাপনের এই মুখরোচক পরিবেশন ভঙ্গিকেই স্বীকার করে নিতে হয়।

১৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯০৩- এর 'ক্যাশবহি'র হিসাব থেকে প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন "উপহার দিবার জন্য পুস্তক ছাপিবার অনুমতি দেওয়ার জন্য" ১৫০০ টাকা হিতবাদী কর্তৃপক্ষ দেন রবীন্দ্রনাথকে।[২৮]

এই বিপুল টাকার বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রায় যাবতীয় গল্প-উপন্যাস-নাটক ও প্রবন্ধ ছাপানোর অধিকার প্রাপ্ত হন এঁরা। '৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে' ১৯০৪-এর ২৯ আগস্ট 'হিতবাদীর উপহার/রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' নাম দিয়ে ১২৯০ পৃষ্ঠার বৃহৎ বইটি প্রকাশিত হয়। মুদ্রণ সংখ্যা দশ হাজার। কিন্তু এই সুবৃহৎ বইটির দাম রাখা হয় মাত্রা ১ টাকা ২ আনা। এই হিতবাদী কর্তৃপক্ষের প্রকাশনার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক-

১৮৯২-এর ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *গোড়ায় গলদ* নাটকটি, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে। সেই প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় একটি ভ্রম-সংশোধন নির্দেশ দেওয়া ছিল, "গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভ্রমক্রমে "বিনোদ" ও "বিনু" নামের পরিবর্ত্তে "নীরদ" ও "নীরু" বসিয়াছে। পাঠকেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।" বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮৯৯ তে। তাতে এই ভুলটি সংশোধিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য হল, হিতবাদী'র *রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী* তে এই ভুল পুনরায় ফিরে আসে! প্রথম সংস্করণ দেখে তাঁরা বইটি ছেপেছেন, ভ্রমসংশোধনের নির্দেশটি আর খেয়াল করেননি!

সেই বইয়ের একেবারে শেষে ছিল দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন নামে দুই কবিরাজের বানানো বিভিন্ন ওষুধের বিজ্ঞাপন। সেইসব বিজ্ঞাপনের মারফৎ জানা যাচ্ছে যে, কোনো বিশেষ তেল 'ব্যবহারে গেঁটে বাত শীঘ্র নিবারিত হয়', কোনো 'ক্ষতান্তক ঘৃত' লাগালে 'অর্শঃক্ষত, নালী-ঘা ও ঘুরঘুরে ঘা প্রভৃতি দুরারোগ্য ক্ষতরোগ সকল অচিরে দূরীভূত হয়', কিংবা কোনো 'মকরধ্বজ'- এর ব্যবহারে নাশ হয় 'অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, ক্রিমি প্রভৃতি সর্ব্বরোগ'!

এইবার সহজেই বোঝা যায় ‘হিতবাদী’ কর্তৃপক্ষ কিভাবে অত কম মূল্যে এই সুবৃহৎ বইটি পাঠকদের ‘উপহার’ দিতে পেরেছিলেন। পূর্বোদ্ধৃত বিচিত্র বিজ্ঞাপনগুলি তাঁরা ছেপেছিলেন এই বইটিতে। রবীন্দ্রনাথকে টাকার বিনিময়ে এই সমস্ত বিসদৃশ বিজ্ঞাপনও মেনে নিতে হয়েছিল।

১৯০৯ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় *চয়নিকা*। তার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ভারতী* পত্রিকায়।

চয়নিকা

> কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসমুদ্র হইতে রত্নরাজি বাছিয়া বঙ্গবাণীর অপরূপ কণ্ঠমালা রচিত হইয়াছে। কবিবরের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ পাঠে যাঁহাদের সময় বা সুবিধা নাই, তাঁহাদের পক্ষে চয়নিকা (Selection) বিশেষ উপযোগী। ইহার মধ্যে কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিই স্থান পাইয়াছে। ইহাতে আটখানি মৌলিক বহুবর্ণে মুদ্রিত পরিকল্পনা চিত্র ও কবিবরের একখানি আধুনিক চিত্র আছে। আর্ট কাগজে ছাপা সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণের মূল্য চারি টাকা, সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা।[২৯]

পূর্বোক্ত বিজ্ঞাপন দেখে অনেকে *চয়নিকা* কিনতে এসে অনেকে ফিরে যান, রবীন্দ্রনাথের চারুচন্দ্রকে লেখা অপর একটি চিঠি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়।

> তোমাদের বইগুলি এখনো ছাপাখানার জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না দেখে সকলেই বিস্মিত। কিন্তু প্রকাশক নামক প্রাণীর চালচলন আমি জানি বলেই আমি বিস্ময় বোধ করছি নে। আজ সত্যেন্দ্র এসেছিলেন- তিনি চয়নিকার জন্যে উৎসুক। শৈলেশ বলছিল তোমাদের বিজ্ঞাপন পড়ে অনেকে বই কিন্‌তে এসে ফিরে যাচ্ছে- সেটা ক্ষতিজনক। শুনচি তোমরা মণিলালের কাছে, বিতরণের জন্য, কতকগুলি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছ- কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞাপন বিলি করা আমি শ্রেয় বোধ করি নে।[৩০]

কোনও গ্রন্থ লিখে সেই সদ্যোজাতকে প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়ে সেইখানেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। মুদ্রণ, বিপণন ইত্যাদির সঙ্গে বহুদিন একাগ্রতার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে প্রকাশক এবং পাঠক- উভয়েরই কীভাবে সর্বোচ্চ সুবিধা হতে পারে, তা তিনি জানতেন।

বই বিক্রয়ে মন্দা, অর্ধেক দামে বিক্রয়, অর্থের বিনিময়ে বইয়ের স্বত্ব বিক্রয়, মুখরোচক-অতি আবেগপ্রবণ-বিশেষণবহুল বিজ্ঞাপনের ভাষা, বইয়ের পৃষ্ঠায় নানান বিচিত্র স্রোত অতিক্রম করে, বহুক্ষেত্রে নানান আপোষ করে

শেষপর্যন্ত তৈরি হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। এটি ছিল একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রকাশনা। এই প্রথম তাঁর গ্রন্থনির্মাণের ক্ষেত্রে সমস্ত মর্জির মালিক ছিলেন তিনি নিজে। আর তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশের তৎপরতায় ও বিশেষজ্ঞতায় ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, রাজশেখর বসু, কিশোরীমোহন সাঁতরা, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, পুলিনবিহারী সেন, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন কী ভাবে বইয়ের নির্মাণকে আধুনিক, সুন্দর করে তোলা যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের জন্মলগ্ন থেকে একটু একটু করে রবীন্দ্রগ্রন্থের বিপণন, বিজ্ঞাপনে এসেছে গভীর পরিবর্তন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১/ ১৯২৪ সালে *প্রবাসী* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরোল,

> বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের পুরস্কার।
>
> রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে দুইশত শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় পাঁচটি পুরস্কার দিবেন। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনের পাতায় ছাপা হইয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সমুদয় কবিতা পড়িয়াছেন, এবং কবিতার উৎকর্ষ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের নির্বাচনই উৎকৃষ্ট হইবে। যাঁহারা সমস্ত কবিতা পড়েন নাই, তাঁহাদের পক্ষেও পড়িয়া নির্বাচন করিবার যথেষ্ট সময় আছে। যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাও আর একবার পড়িলে ঠিক্ নির্বাচন করিতে পারিবেন।...
>
> পুরস্কার পাওয়া অপেক্ষা বেশী লাভ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ লাভ। অধ্যয়ন-অভ্যাসের গুণই এই, যে, আমাদের সুবিধা মত অল্প বা অধিক সময়ের জন্য আমরা ঘরে বসিয়া যে-কোন মহৎ লোকের সঙ্গলাভ করিতে পারি। মহৎ লোকদিগকে চাক্ষুষ দেখা ও তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহার আনন্দ লোভের জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ আরও আনন্দের ও লাভের বিষয়। কারণ, তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের- ভাবচিন্তা আদর্শ রসিকতা আদির- শ্রেষ্ঠ অংশ আমরা নিবদ্ধ দেখিতে পাই, যাহার পরিচয় কোন এক সময়ে, তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া আমরা না পাইতেও পারি। এই জন্য মনে হইতেছিল, যে, রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য থাকিলেও, যদি অবসর পাইতাম তাহা হইলে পুরস্কার লিপ্সা ব্যপদেশে তাঁহার সমুদয় কাব্য পড়িয়া ফেলিতাম; রবীন্দ্রনাথ এক নহেন, অনেক; তন্মধ্যে বরেণ্যতম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভে আনন্দিত হইতাম, উন্নত হইতাম, অনুপ্রাণিত হইতাম, মনের ময়লা কাটিত, প্রাণে নূতন প্রেরণা নূতন শক্তি আসিত। কিন্তু কর্মফল ও কর্মবন্ধ বশতঃ কোন মহদ্ব্যক্তির এইরূপ নিভৃত সঙ্গ-লাভ ইহ জীবনে আর ঘটিবে কিনা, সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। যাঁহারা অধিক সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা হৃদয়মনের এই ভোজের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবেন না।[৩১]

এই বিজ্ঞপ্তি এবং পুরস্কার ঘোষণা একধরনের প্রচার কৌশলের অঙ্গ। কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গিতে মিশে আছে এমন একধরনের মার্জিত সদর্থকতা, যে পাঠককে তা আকৃষ্ট না করে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের থেকে তাঁর গ্রন্থপাঠ করে যে একান্ত সান্নিধ্যলাভ সম্ভব, তা অধিকতর মূল্যবান, এই কথাই বলা হয় বিজ্ঞপ্তিতে। পূর্বে তাঁর গ্রন্থের প্রচারভঙ্গির সঙ্গে এর ভাষা এবং উৎকর্ষের পার্থক্য ছিল চোখে পড়ার মতন।

১৯২৬ সালে পাঠকদের নির্বাচিত কবিতাগুলি নিয়ে *চয়নিকা*-র নতুন বিশ্বভারতী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, 'সোনার তরী' কবিতাটি সবচেয়ে বেশি পাঠকের প্রথম পছন্দ হয়।

বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে লেখক এবং তাঁর প্রকাশনার সরাসরি সংযোগের আরেকটি উদাহরণ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৩৩১ এর ই অগ্রহায়ণের *প্রবাসী*-তেই পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়-

গল্প নির্বাচনের জন্য পুরস্কার

> "বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়" বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, রবিবাবুর ছোট গল্পের বই গুলি হইতে ১৫ টি ছোটগল্প নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য তিনটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। রবিবাবু নিজে একটি তালিকা করিয়া দিয়াছেন। সেই তালিকাভুক্ত গল্পগুলির নামের সঙ্গে যাঁহাদের তালিকার নামগুলি ঠিক মিলিয়া যাইবে, কিম্বা অনেকটা মিলিবে, তাঁহারা মিলের পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার পাইবেন।...[৩২]

মোট ৫০০ জন প্রতিযোগী নাম পাঠান, এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে-

ইন্দুলেখা দাসী, মন্মথনাথ সিংহ এবং নির্মলকুমারী মহালনবিশ।

আর একটি চমৎকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাক। বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ থেকে শুরু হয়েছিল একধরনের শুভেচ্ছা সংস্কৃতি। পাঠকদের পক্ষে যা মনোগ্রাহী এবং বিপণনের দিকটিও যাতে সমৃদ্ধ হতে পারে।

১৯৩৬ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বর 'বিবিধ সংবাদ' শিরোনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি খবর ছাপা হয় :

বিবিধ সংবাদ

> শান্তিনিকেতন সংবাদ- বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগ এবার নানারূপ সুন্দর সুন্দর নমুনার বিজয়া-অভিনন্দন কার্ড বাহির করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐ সকল কার্ডে কবিবর রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও

শান্তিনিকেতনের অন্যান্য চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত চিত্র থাকিবে। শিল্পের দিক হইতে কার্ডগুলিকে যতদূর সম্ভব চিত্তাকর্ষক করার চেষ্টা হইতেছে। উহার মূল্যও যাহাতে বেশী না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।[৩৩]

এই উদ্যোগ অভাবনীয়, দাম পাঠকের আয়ত্তাধীন হওয়ার কারণে এ ছিল এক নতুন, সুন্দর বিপণন কৌশল। আজ সেসময়ের পাঠকদের ঈর্ষা না করে থাকা যায় না।

পূর্বোক্ত প্রতিটি উদাহরণ থেকে, রবীন্দ্রনাথের তাঁর পাঠকের প্রতি যে দায়বদ্ধতার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেই দায়বদ্ধতাই তাঁর বিশ্বভারতীকে অন্য প্রকাশনা সংস্থার থেকে আলাদা করেছিল। তিনি এই প্রকাশনা সংস্থার বিজ্ঞাপন থেকে দ্রব্যমূল্য সবকিছুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। বইয়ের বস্তুরূপ অর্থাৎ পাতা, হরফ, মুদ্রণ সংস্কৃতি, বিজ্ঞাপন, বিপণন সব সম্পর্কে এক ধারাবাহিক স্বচ্ছতা বজায় রেখেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা সব মানুষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের ধারণাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগী বন্ধুরা এমন আধুনিকতায় নিয়ে যান যা পাঠকের মননে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের ভাবনাকেই পরিবর্তন করে স্থায়ীভাবে। সেই পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক হিসাবেই নয়, একজন অসামান্য গ্রন্থনির্মাতা হিসাবেও পাঠকের মনে স্থান দেয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ছোট ছোট উদাহরণে বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ যেভাবেই ধরা পড়ুক না কেন, বাস্তবে তিনি যে বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ ও ব্যবহার করেছিলেন, সে উদাহরণ পাওয়া গেল।

সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)-এর কর্মজীবনের সূত্রপাতে বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে তাঁর গাঢ় সম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে সত্যজিৎ ডি জে কীমার (D.J.Keymar) বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন জুনিয়র ভিজ্যুয়ালাইজার হিসাবে।[৩৪]

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'Satyajit Ray and Advertising' প্রবন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞাপনী শিল্প ভারতবর্ষে অতি নবীন পেশা। এখন তা কিছুটা হলেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। কিন্তু বিশ্বায়নের এই লগ্নে, বিজ্ঞাপনী নক্সা এবং বক্তব্যও ক্রমশঃ একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানী, বিজ্ঞাপনী পেশাদাররা ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপনের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আর তেমন আগ্রহ দেখান না দুঃখজনকভাবে। ভারতে বিজ্ঞাপনের সেই যুগে, চারের দশকের সূত্রপাতে, পাশ্চাত্য ধারার অনুকরণ না করে

একটি আনকোরা দেশজ ধারার সূত্রপাত হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়, অন্নদা মুন্সী, ও সি গাঙ্গুলীরা ছিলেন সেই নতুন ধারার প্রতিষ্ঠাতা।

Modern advertising is a very young profession in India. It has really begun to come into its own now but in an environment of globalization, which also means homogenization of advertising design and messages. In such a situation, it is unfortunate that social scientists and even advertising professionals have not felt the need for in-depth research on the development of advertising in India in all its diverse aspects, including an Indian approach as distinct from an imitation of, or a derivation from, the western. It is only when such an attempt is made will it be possible to assess the contribution of Satyajit and his contemporaries, such as Annada Munshi, O .C. Gangoly and others, to Indian advertising. This is also true of those who developed an approach to advertising in the Indian market, in terms of messages and even the use of media, based on a profound understanding, however instinctive, of the psychology of the Indian consumer. What is more remarkable is that this process took place when there were none of the sophisticated tools that are available today.[৩৫]

বিজ্ঞাপনী শিল্পকর্মে সত্যজিৎ রায়ের বিশেষত্ব হল এই যে তিনি দেশীয় শিল্পের পুনরাবিষ্কার এবং দৃশ্যগত যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে আধুনিক সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের চাহিদার যোগাযোগ তৈরি করেন।

রঘুনাথ গোস্বামী লিখছেন-

In commercial art, I remember, we used to impart what we used to call *banglar chanda* (rhythm of Bengal). And there is ample scope, I feel, for modern commercial art to have a base of Indian art, a base of the Bengal school. My training at Kala Bhavan has stood by my commercial art.[৩৬]

এই প্রেক্ষিতে শিল্পী পরিতোষ সেনের বক্তব্য,

Together with two of his contemporaries O C Ganguli and Annada Munshi, Ray was trying to evolve certain concepts not only in illustrations but also in typography which would give their design an overall Indian look. One recalls those highly distinctive newspaper and magazine ads, the magnificent calendars, posters, cinema slides and what not of the late forties and fifties not without certain nostalgia...

The freshness and vigour displayed in their approach was readily appreciated both by their employers and their clients. Ray was particularly strong in the difficult area of figure drawing, an area in which many graphic designers are found singularly wanting.[৩৭]

চিত্র ৬.২ সত্যজিৎকৃত সিগনেট বুকশপের বিজ্ঞাপন, ছবি ঋণ বিভাব টুকরো কথা সংকলন, ২০০২

ও সি গাঙ্গুলী উল্লেখ করেছেন ডি জে কীমারে কর্মরত অবস্থায় তৎকালীন বৃহৎ সংস্থাগুলির বিজ্ঞাপন করবার সময়ে সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য বজায় রেখে বিজ্ঞাপন শিল্পকে চারুকলার পর্যায়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনী চিত্র থেকে অবাঞ্ছিত রেখা বাদ দিয়ে এবং ছবির চারপাশে প্রয়োজনীয় সাদা অংশ ছেড়ে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাধারণের বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করা হত। সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্য ছিল,

White space is like white lettering.[৩৮]

ডানলপ, লিপটন চা, বার্মা শেল, টি বোর্ড প্রভৃতি বৃহৎ সংস্থাগুলির বিজ্ঞাপন করার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের ভুমিকা দর্শনীয়। ম্যালেরিয়া নিবারক ওযুধ প্যালুড্রিনের জন্য বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনের ছবি তিনি প্রস্তুত

করেছিলেন। বাঙালি এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের পরিবারের স্বাভাবিক মুহূর্তগুলি আশ্চর্য দক্ষতা এবং সুনিপুণ খুঁটিনাটি নিয়ে ফুটে উঠেছিল তাতে। এই বিজ্ঞাপনগুলি সাড়ে সাত দশক পরেও স্মৃতিধার্য এবং প্রবাদপ্রতিম হয়ে রয়েছে।

সিগনেট প্রেসের মুখপত্র *টুকরো কথা*-র অলংকরণ এবং লেখক-শিল্পীদের প্রতিকৃতি অঙ্কনে সত্যজিতের ভূমিকা ছিল প্রধান। সিগনেট প্রেসের নিজস্ব বিজ্ঞাপনও, যা বিবিধ পত্র-পত্রিকা এবং *টুকরো কথা*-য় প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের উদ্ভাবনী অক্ষরশিল্প এবং নানা প্রকরণের ছবি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হত। একদা বিনামূল্যে বিতরিত এই মুখপত্র এখন সংগ্রাহকের আনন্দ এবং সমাজভাবনার আকর হিসাবে চিহ্নিত হয়।

চিত্র ৬.৩ এই ছবি ঋণ বিভাব টুকরো কথা সংকলন, ‘পদিপিসীর বর্মিবাক্স’ বিষয়ে রাজশেখর বসু’র বক্তব্য একদা প্রকাশিত হয় ‘টুকরো কথা’য়

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, *টুকরো কথা* তে কেবলমাত্র যে সিগনেট প্রেসেরই গ্রন্থ-পরিচয় অথবা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত এমন নয়, বাংলা সাহিত্যের সমসাময়িক এবং চিরকালীন বহু বইয়েরই বিজ্ঞাপন অথবা পরিচিতি, প্রকাশক নির্বিশেষে সেখানে সমাদর পেতো।

বিভব পত্রিকার ‘দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যায় নরেশ গুহ লিখছেন-

> বলা দরকার যে তালিকাভুক্ত এবং আলোচিত অধিকাংশ বই সিগনেট-প্রকাশিতই ছিলো না। বিনি পয়সায় এবং অযাচিতভাবে তাঁদের কোম্পানীর ছাপানো বইকে এভাবে বিজ্ঞাপিত হতে দেখে প্রকাশকরা, শোনা যায়, বিমল কৌতূক উপভোগ করতেন, হাসাহাসিও করতেন। ডি.কে-র ব্যবসাবুদ্ধির ঘাটতি দেখে। ডি.কে অবশ্যই তাতে দমেননি, কেননা তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে বাঙালি পাঠকদের দিয়ে বাছাই করা ভালো বই পড়াতে পারলে, আখেরে তাতে সিগনেট প্রেসেরও লাভ।[৩৯]

একদা যখন 'কুন্তলীন' সাহিত্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তাতে সি কে সেন কোম্পানির বাণিজ্যিক লাভ যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে লাভ হয় অপরিসীম। সিগনেট প্রেসের অন্যতম কর্তৃপক্ষ এবং বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কীমারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত (১৯১৮-১৯৭৭)। *টুকরো কথা* দিলীপকুমার গুপ্ত'র মানসপ্রসূত। এর কপি লিখতেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক নরেশ গুহ। বহু প্রকাশনার বহু বইয়ের কথা পাঠকের কাছে এর মাধ্যমে পৌঁছোত। একে কি কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনী কৌশল বলা যায়, নাকি সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, তা আজকের পাঠককে ভাবিয়ে তোলে।

বিজ্ঞাপন বিষয়টির প্রতি সত্যজিৎ রায়ের যত্ন, পরিশ্রম ইত্যাদির বিষয়ে ইতিমধ্যে মোটামুটিভাবে ধারণা করা গেছে। ফেলুদার উপন্যাসগুলির কয়েকটিতেও কখনও এসেছে বিজ্ঞাপনের কথা। খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না থাকলেও, সাধারণ কথোপকথনের মধ্যে সত্যজিৎ ছুঁয়ে গেছেন বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ।

'ডাঃ মুনসীর ডায়রি'তে লালমোহনবাবু ফেলুদার বাড়িতে আসার পরে পরস্পরের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় স্বভাবতই লালমোহনবাবু অকৃতকার্য হন। ফেলুদা কিন্তু সফলভাবে লালমোহনবাবুর মধ্যে ঘটে যাওয়া 'চেঞ্জ'-এর কথা তাঁকে জানায়। তার প্রথমটি হল, লালমোহনবাবুর নিয়মিত ব্যবহৃত সাবানের গন্ধে অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটা।

> ফেলুদা চায়ের খালি কাপটা টেবিলে রেখে চারমিনারের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বলল, 'নাম্বার ওয়ান, আপনি কাল অবধি লাক্স টয়লেট সোপ ব্যবহার করেছেন; আজ সিন্থলের গন্ধ পাচ্ছি। খুব সম্ভবত টি ভি-র বিজ্ঞাপনের চটকের ফলে।'[৪০]

লালমোহনবাবু লেখক, কিন্তু বিজ্ঞাপনী চটক তাঁকেও মোহিত করতে পারে, এ মায়াজাল প্রায় সকলকেই বশীভূত করতে সক্ষম, তা ফেলুদার কথাতেই সুস্পষ্ট। উল্লেখ্য, 'ডাঃ মুনসীর ডায়রি' লেখা হয় আটের দশকের একেবারে শেষদিকে, ১৯৮৯ সালে। ভারতবর্ষের অর্থনীতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই সময়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফেলুদা সম্ভবত খানিক শ্লেষের সুরেই কথাটি বলে। কিন্তু সত্যজিৎ তাঁর ব্যক্তিগতজীবনে বিজ্ঞাপনকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন, এমনকি তিনি এবং তাঁর মত কিছু শিল্পীর কারণেই ভারতীয় বিজ্ঞাপনের জগতে অসামান্য কিছু পরিবর্তন আসে, তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই ফেলুদারই অন্য একটি কাহিনি 'হত্যাপুরী' (রচনাকাল ১৯৭৯)-তে ডি. জি. সেন এর বাড়ি দেখে ফেলুদার মনে পড়ে এই দুর্গাগতি সেন-এর পিতা এস. এন. সেন-এর

প্রসাধনীর ব্যবসা ছিল, আর সেই প্রসঙ্গেই ফেলুদা একটি বিজ্ঞাপনী কপিও স্মরণ করতে পারে, “এস. এন. সেন’স সেনসেশন্যাল এসেনসেজ”[৪১]

বলা বাহুল্য এই বিশেষ নামের প্রোডাক্টটির মতোই তার কপিও সত্যজিৎ রায়ের কল্পনাপ্রসূত। বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে দীর্ঘাকালীন ঘনিষ্ঠতার ছাপ এই একটি লাইনের বলিষ্ঠ কপিতে পাওয়া যায়।

ফেলুদা সিরিজের প্রথম কাহিনি ‘ফেলুদা’র গোয়েন্দাগিরি’-তে রাজেনবাবুকে আততায়ী ছাপা হরফ কেটে কেটে শাসিয়ে যে চিঠি লেখে, তাতে লেখা ছিল ‘তোমার অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত হও’। ফেলুদা সেই চিঠি লক্ষ্য করে বলে চিঠির “শাস্তি” আর “প্রস্তুত” শব্দদুটি খবরের কাগজ থেকে নেওয়া। তিনকড়িবাবু সংযোজন করেন, *আনন্দবাজার* থেকে কেটে বসানো হয়েছে দুটি শব্দ। কারণ এই বিশেষ টাইপটা *আনন্দবাজার*-এই ব্যবহার করা হয়। অন্য কোনও বাংলা কাগজে নয়।[৪২]

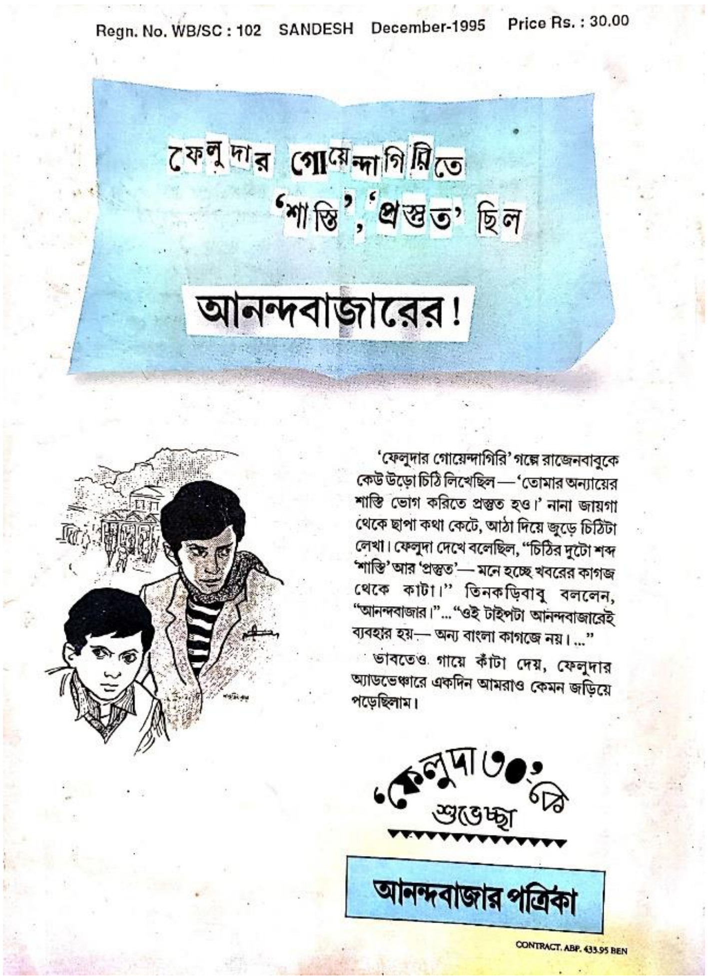

চিত্র ৬.৪ সন্দেশ, 'ফেলুদা ৩০' সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৪০২

সেই ‘ফেলুদা’র গোয়েন্দাগিরি’(১৯৬৫)-র ৩০ বছর পরে *সন্দেশ* পত্রিকা’র ‘ফেলুদা ৩০’ সংখ্যায় ফেলুদাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা একটি বিজ্ঞাপন করে। যেখানে উল্লেখ থাকে সেই রোমহর্ষক চিঠি’র। এবং শেষে লেখা থাকে, “ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়, ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারে একদিন আমরাও কেমন জড়িয়ে পড়েছিলাম।”

সোনার কেল্লা (১৯৭৪) ছবিতে মন্দার বোসের পায়ের জুতো জোড়া দেখে, সেটি 'বাটা' থেকে কেনা, এবং যে লোক দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়েছে তার পায়ে এমন পুরনো 'বাটা'-র জুতো কোত্থেকে এলো; ফেলুদার সেই সংশয়ের কথা মনে পড়ে।

বিজ্ঞাপন, সাহিত্য এইভাবে নানা সুত্রে জড়িয়ে পড়েছে একে অপরের সঙ্গে।

মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-) লেখা *সীমাবদ্ধ* উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় *সীমাবদ্ধ* ছবি বানালেন ১৯৭১ সালে। সেই ছবিতে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জীর ভূমিকায় অভিনয় করেন বরুণ চন্দ। এই শ্যামলেন্দু 'পিটার্স' ফ্যানের বিদেশী কোম্পানির অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সেই ফ্যানের একটি 'বিজ্ঞাপনী-চলচ্চিত্র' সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে ব্যবহার করেন। বলা বাহুল্য বিজ্ঞাপনটিও ছিল সত্যজিৎ নির্মিত।

চিত্র ৬.৫ ছবি ঋণ : http://images.app.goo.gl/kLaEEhNKQ9bJ4jv57

বিজ্ঞাপনের শুরুতে পর্দায় বড়ো বড়ো হরফে ফুটে ওঠে 'HOT' শব্দটি, সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ আবহ সঙ্গীত। সেই উষ্ণ গোলকের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে ঘর্মাক্ত রমণীর মুখ। আগুনের ছবি। এরপরে ঘর্মাক্ত পুরুষ। ফের আগুন। এবার একটি অ্যালসেশিয়ান কুকুর, সেও গরমে বিব্রত, জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। একটি বাচ্চা ছেলে, তারও হাঁসফাঁস অবস্থা। প্রবল তাপপ্রবাহে যেন চারদিকে আগুন লেগে গেছে। এই দৃশ্যগুলির ছবি এবং আবহ সঙ্গীতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যবহার করা হয় কমলা-লাল রঙ।

তবে বেশিক্ষণ না, অবস্থার পরিবর্তন হয়। আগুন বদলে যায় সুশীতল নীল জলে। উত্তেজক বাজনার বদলে বাজতে থাকে স্বস্তিদায়ক সুর। লালের মধ্যে নীলের আলপনা শুরু হয়ে একসময়ে পর্দায় দেখা যায় সরোবরের

ছবি। বাজারে এসেছে ‘পিটার্স’ ফ্যান। অতঃপর মুক্তি। নারী, পুরুষ, শিশুটি বা তাদের সারমেয়টিরও মুক্তি মেলে। ‘পিটার্স’ ফ্যান কোম্পানির লোগোটি ফুটে ওঠে ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে। বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে যে গভীরভাবে আত্মীকরণ করেছেন নির্মাতা, তা এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিদেশী পণ্যের ক্রেতাগণ যে উচ্চবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত, এই বিজ্ঞাপনে তার চিহ্ন থেকে যায়। বিশেষত অ্যালসেশিয়ান কুকুরটিকে দেখানোর মাধ্যমে সে কথা যেন আরও পরিস্ফূট হয়। গত শতাব্দীর সাত, আট, নয়ের দশকে ধনী পরিবারের ‘স্টেটাস সিম্বল’ হয়ে ওঠে বাড়িতে পোষ্য হিসাবে অ্যালসেশিয়ান প্রতিপালন।

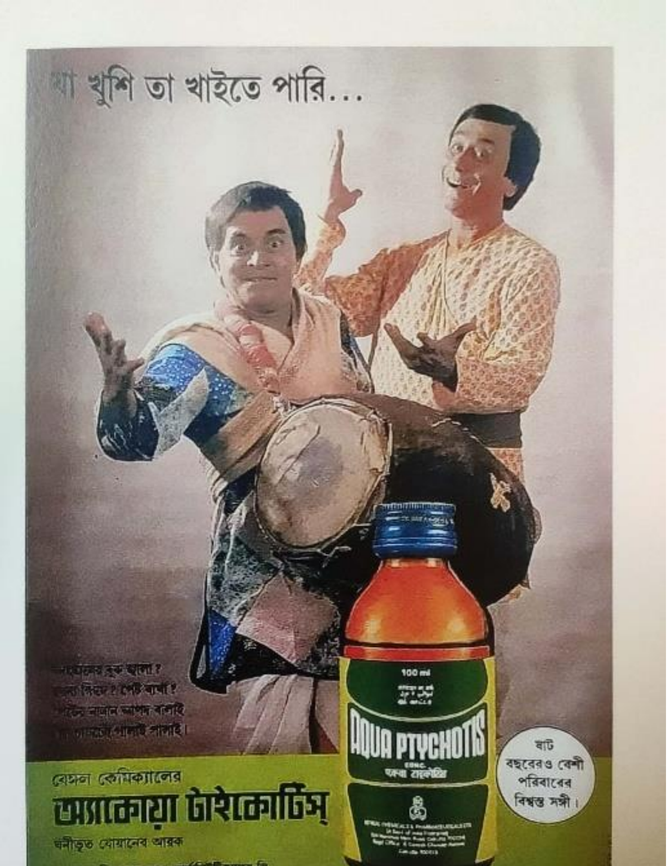

চিত্র ৬.৬ ছবি ঋণ : অসিত পোদ্দারের "ইউনিট সত্যজিৎ" গ্রন্থ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) প্রণীত *গুপী গাইন ও বাঘা বাইন* অবলম্বনে পৌত্র সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত ছায়াছবি নির্মিত হয় ১৯৬৯ সালে। এর পরে পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। বাঙালি দর্শক আজও গুপী, বাঘার ভূমিকায় তপেন চট্টোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষকে মনে রেখেছেন, ভালোবাসা দিয়ে চলেছেন অনবরত। অ্যাকোয়া টাইকোটিস্-এর বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হল “ভূতের রাজা দিল বর” গানের চিরস্মরণীয় পংক্তিটিকে একটু পরিবর্তন করে, “যা খুশি তা খাইতে পারি”। ভূতের রাজার দেওয়া বরে খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই যখন, তবে আর হজমের ওষুধের অভাব থাকে কেন।

অসিত পোদ্দার তাঁর “গুপী-বাঘা আমার স্টুডিয়োতে”[৪৩] প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, আশির দশকের মাঝামাঝি কলকাতার এক বিজ্ঞাপন সংস্থার শিল্পনির্দেশক অর্ধেন্দু দত্ত গুপী বাঘার ছবি তুলতে চান তাঁদের বিখ্যাত পোশাকে। গুপী অর্থাৎ তপেন চট্টোপাধ্যায় নিজে ছিলেন বিজ্ঞাপন জগতের লোক। ফলে ব্যবস্থা করতে অসুবিধা হয়নি। সেই বিজ্ঞাপনের শুটিং হয় প্রাবন্ধিকের স্টুডিও তে। উপেন্দ্রকিশোরের কাহিনি অবলম্বনে যে ছবি তৈরি হয়, তা একদিন

বিজ্ঞাপনের বিষয় হিসাবে উঠে আসছে। এইভাবে বাংলা সাহিত্য, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপনের পারস্পরিক আদানপ্রদানের দিকটি স্পষ্ট হয়ে এসেছে দর্শকের কাছে।

১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় *সন্দেশ*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় *হ য ব র ল*। সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)-এর মৃত্যুর বছর খানেক পরে রায় পরিবারের প্রকাশনা সংস্থা ইউ. রায় এন্ড সন্স থেকে বইটি মুদ্রিত হয়। প্রকাশকাল ২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।[৪৪]

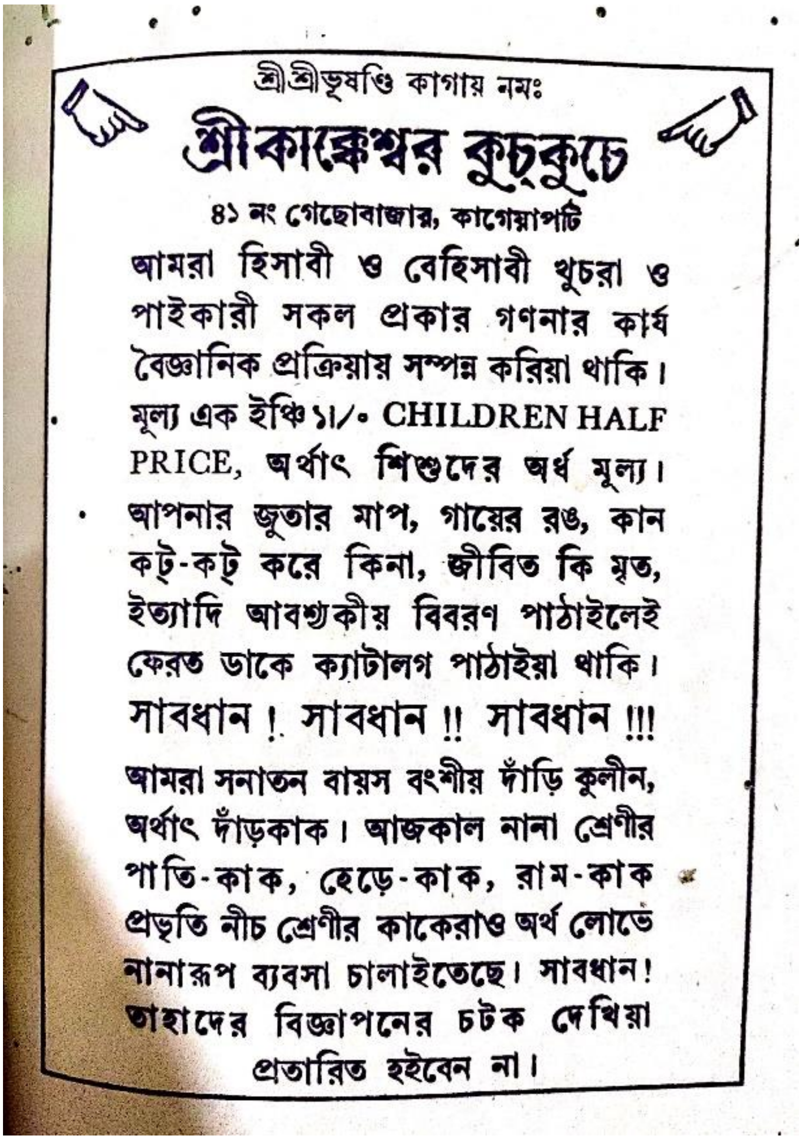

চিত্র ৬.৭ হ য ব র ল, সুকুমার রায়, নব সংস্করণ ১৩৫২, সিগনেট প্রেস, অলংকরণ সত্যজিৎ রায়

পাঠকমাত্রেরই মনে পড়বে এই বইয়ে কাক্কেশ্বর কুচকুচে প্রদত্ত এক পৃষ্ঠার সেই বিজ্ঞাপন বা হ্যান্ডবিলটির কথা।

হ য ব র ল-র সিগনেট সংস্করণে সেই হ্যান্ডবিলের ছবি আঁকেন সত্যজিৎ রায়।

এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি বিজ্ঞাপন নিঃসন্দেহে। নানান উদ্ভট কথায় পরিপূর্ণ এই অসামান্য বিজ্ঞাপনটিতেও এমনকি সতর্ক করে দেওয়া হয় নকল “নীচ শ্রেণীর” কাকদের দেওয়া “বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া” প্রতারিত হওয়ার হাত থেকে সতর্ক হওয়ার কথা।

বিজ্ঞাপন মাধ্যমটি যে একেবারে সন্দেহের ঊর্দ্ধে নয়, এর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বিপুল, তবুও একে উপেক্ষাও করা যায় না, তা কিন্তু এই অবশ্যপাঠ্য হ্যান্ডবিল পড়ে রাখলে পাঠক ভুলতে পারেন না।

এই আলোচনা লেখক, শিল্পীদের জীবন পরিসরের কালানুক্রম মেনে চলছে না। আলোচনা যে পথে এগিয়ে চলেছে, সেভাবেই কিছুটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের প্রসঙ্গ এসে পড়ছে।

কিছুটা পিছনে ফিরে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)-এর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুকে বিজ্ঞাপন কেমন প্রভাবিত করেছিল দেখা যাক।

গল্পের নাম 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' (বৈশাখ, ১৩১১)। গল্পের সূচনা হয় গাজীপুরের জনৈক বাইশ বছর বয়সী যুবক রাম অওতারকে দিয়ে। চাল-চলনে তাকে বেশ অবস্থাপন্ন বলে বোধ হয়। পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্যের বায়নায় 'গুলাবছড়ি' নামক খাদ্যদ্রব্য কিনতে গিয়ে একটুকরো খবরের কাগজ তার হাতে আসে। খাবারটি তাতেই জড়ানো ছিল এবং বলাবাহুল্য সেই সংবাদপত্রের টুকরোটি থেকে সেটি কোন দিন বা বৎসরের খবর তা আন্দাজ করা সম্ভব হয়নি। রাম অওতারেরও সেই ছেঁড়া টুকরো চোখে পড়তো না, যদি না তার শিশু ভাইটি মিষ্টি খেয়ে অত্যুৎসাহী হয়ে তাকে এনে সেই কাগজে ছাপা হাতির 'তসবীর' দেখাতো। সেইখান থেকেই রাম অওতারের উত্থানপতনহীন জীবনে খানিক 'মজা' করার সুযোগ ঘটে গেল।

> রাম অওতার কাগজখানি হাতে ল্ইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে-"বিবাহের বিজ্ঞাপন।"
>
> বামহস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল :-
>
> বিবাহের বিজ্ঞাপন
>
> প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটির শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাইতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।
>
> লালা মুরলীধর লাল
>
> মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট, বেনারস সিটি।[৪৫]

রাম অওতার বাল্যকালেই বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এই আমোদের লোভ সামলাতে পারলো না। এবং এই বিবাহে সে ইচ্ছুক, এমন একটি চিঠি দিলো। ঘটনাক্রমে এই চিঠি গিয়ে পৌঁছোয় কাশীর কেদারঘাটের প্রসিদ্ধ গুন্ডাদের

হাতে, এবং তাদের কথোপকথনেই জানতে পারা যায় সেই মেয়েটির অনেককাল আগেই বিবাহ হয়ে গেছে। রাম অওতার জানতো না যে তার আমোদের প্রত্যুত্তরে অধিকতর আমোদ তার শিয়রে অপেক্ষমান। যথাসময়ে রাম অওতারের কাছে আহ্বান জানিয়ে চিঠি এসে যায়, এবং মূল্যবান পোশাক, ঘড়ি, আংটি পরিহিত রাম অওতারের পরবর্তী পরিণতি তেমন সুবিধার হয়নি। কৌপীন পরিহিত সন্ন্যাসীবেশে কাশীর রাস্তায় তাকে পাওয়া যায়। এই ঘটনার পরে 'ধার্ম্মিক ব্যক্তি' বলে রাম অওতারের খ্যাতি হয়।

উনিশ শতক পেরিয়ে, বিশ শতকেও বিজ্ঞাপন বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি অর্থেই এসে পৌঁছোয় বহুক্ষেত্রে। গল্পের নামটি তারই পরিচায়ক। এবং সেই 'বিজ্ঞাপন'-এর আবেশে ভুললে তার পরিণতি বিবাহিত লোককে সন্ন্যাসীতেও পরিণত করতে পারে, এমন এক ঈঙ্গিত পাওয়া যায় সে গল্পে।

উক্ত গল্পটির মত, এখানে আলোচ্য, লেখকের দ্বিতীয় গল্পটিরও কেন্দ্রে থাকে একটি বিজ্ঞাপন। তবে উল্লেখ্য, দুটি গল্পকেই ঠিক নিছক হাসির গল্প বলা যায় না তাদের বিষয়গত জটিলতার কারণে। দ্বিতীয় গল্প 'বাজীকর'-এর মধ্যে হাস্যরসের মধ্যে অন্ধকারের ছায়া পড়ে।

বরিশাল জেলার রামরতন বসু ওরফে প্রোফেসর বোস রঙ্গপুরে আসেন ম্যাজিক দেখাতে। যৌবনকালে বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি ম্যাজিক শেখেন। পরবর্তীকালে বিবাহ করেন এবং কন্যাসন্তানদের পিতা হন। তাদের প্রত্যেকের এখনো বিবাহ সম্পন্ন হয়নি। আয়ের উৎস দুর্বল হয়ে পড়েছে। সব মিলে বেশ জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে থাকেন রামরতন। ইদানীংকালে আর ম্যাজিকেও তেমন দর্শক হয় না। সারা এলাকায় সেই ম্যাজিক খেলার বিজ্ঞাপন বিলি করা হলেও ফল হয় না। কেবলমাত্র 'অদ্যকার অত্যাশ্চর্য' ম্যাজিক দেখতে উৎসাহ পায় না কেউ আর। ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে ছোট মেয়েটির অসুস্থতার খবর আসে। অতঃপর, দর্শকসংখ্যা বাড়াবার জন্য এক অত্যাশ্চর্য বিজ্ঞাপন দেন রামরতন বাবু। যা দেখে তাঁর দলের লোকেরাও এমনকি স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিজ্ঞাপনটি এইরকম-

শেষ রজনী শেষ রজনী

অদ্য নিতান্তই শেষ রজনী

বিপরীতে ব্যাপার- লোমহর্ষণ কান্ড

অদ্য সর্ব্বজন সমক্ষে, প্রোফেসার বসু

একটা জীবন্ত মানুষ ধরিয়া

ভক্ষণ করিবেন

আবার ইন্দ্রজালের প্রভাবে সর্ব্বজনসমক্ষে

তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিবেন

ইত্যাদি[৪৬]

এহেন বিজ্ঞাপনে আকর্ষণ না বোধ করার মানুষ ভূ-ভারতে কম। টিকিট বিক্রি হয়ে যায় দ্রুতগতিতে। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনের ভাষার মধ্যে যে মারপ্যাঁচ লুকিয়ে আছে তা দর্শক আগে বুঝতে পারেন না। একটি ছোট ছেলে প্রভূত সাহসে ভর করে রামরতন বাবুর ডাকে সাড়া দেয় এবং তিনি তার কাঁধে সজোরে কামড় বসান। এবং জনতার ক্ষোভের সামনে রামরতন সবিনয়ে জানান যে তিনি তো ইন্দ্রজালের প্রভাবে খাবেন বলেননি, বলেছিলেন ইন্দ্রজালের প্রভাবে পুনরুজ্জীবিত করবেন। সে যাত্রায় নানা কৌশলে তাঁর প্রাণরক্ষা হয় এবং যথেষ্ট অর্থ রোজগার করে ঘরে ফেরার পরে দেখতে পান মেয়েটির পীড়ার ও উপশম হয়েছে। গল্পটির প্রধান রন্ধন-উপকরণ হিসাবে হাস্যরস থাকলেও রামরতন বাবুর অর্থনৈতিক অবস্থা, অসহায়তা, এবং শেষপর্যন্ত বুদ্ধি খাটিয়ে এই বিচিত্র দর্শক আকর্ষণের পন্থা পাঠককে হাসির সঙ্গে খানিক অস্বস্তিরও ঈঙ্গিত দিয়ে যায়। বিজ্ঞাপনের বা প্রচারের ভাষা কখনও কখনও মানুষকে বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট দক্ষ, সেই কথাটি বুঝতে বাকি থাকে না। তথাপি, শেষপর্যন্ত পাঠকের প্রশ্রয় রামরতন বসু'র প্রতিই অটুট থাকে।

অপু, শ্রী অপূর্ব কুমার রায় যখন প্রথমবার পড়তে আসে কলকাতায়, তখন ট্রামের গাড়িই হোক বা পাখাবাতি, নানান চোখ ধাঁধানো কান্ড দেখে তার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। উপন্যাসের নাম *অপরাজিত* (১৯৩২), লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। এ উপন্যাসেও বিজ্ঞাপনের ছোট ছোট উল্লেখ এসেছে কয়েকবার।

মেধাবী, পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহী অপুকে কলকাতায় আসার পর থেকে বারংবার পড়তে হয়েছে তীব্র অর্থকষ্টে। বস্তুত তার সমস্ত জীবনই প্রধান সঙ্গী হয়ে থেকেছে অভাব, যদিও তা তার জীবনানন্দকে অবদমিত করতে পারেনি, বরং বাড়িয়ে তুলেছে। তবে অন্নের অভাব হলে সেই অপুও সময়ে সময়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছাতু খেয়ে, অথবা কখনও কেবল জল খেয়ে পেট ভরিয়ে আর দিন চলছে না। তেমনই তীব্র অভাবের মুহূর্তে, অপু নিয়মিত বিজ্ঞাপন পড়তো। উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, সে নিয়মিত বিজ্ঞাপন খোঁজে।

> সে রোজ সকালে উঠিয়া নিকটবর্তী এক লাইব্রেরীতে গিয়া দৈনিক ইংরেজী-বাংলা কাগজে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া দেখে। গ্যাসপোস্টের গায়েও অনেক সময় এই ধরনের বিজ্ঞাপন মারা থাকে- চলিতে চলিতে গ্যাসপোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়ানো বাতিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রায়ই বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন- আলো ও হাওয়াযুক্ত ভদ্র-পরিবারের থাকিবার উপযোগী দুইখানি কামরা ও রান্নাঘর, ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালেভদ্রে এক-আধটা ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তার ঠিকানাটি আগে কেহ ছিঁড়িয়া দিয়াছে।[৪৭]

যুগে যুগে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির প্রত্যাশা করে এসেছে মানুষ। সংবাদপত্র হাতে নিয়ে প্রথমেই খুলতে হয়েছে বিজ্ঞাপন অথবা বিজ্ঞপ্তির পাতাটি। অপুর ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাই ঘটেছে।

এই উপন্যাসেরই চতুর্দশ পরিচ্ছেদে স্বদেশী দেশলাইয়ের জাঁকালো বিজ্ঞাপনের কথা পাওয়া যায়।[৪৮]

এরও বেশ কিছু বছর পরে দিল্লী স্টেশনের আলোকিত প্ল্যাটফর্মে অপুর পিয়ার্স সোপ, কিটিংস পাউডার, হল্‌স্‌ ডিস্‌টেম্পার, লিপটনের চা, আবদুল আজিজ হাকিমের রৌশনেসেকাৎ, উৎকৃষ্ট দাদের মলক ইত্যাদির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে।[৪৯]

উপন্যাসের চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে, চব্বিশ বছর পরে অপু যখন বালক কাজলকে নিয়ে প্রথমবারের জন্য নিশ্চিন্দিপুর চলেছে যখন, তখন তার আজন্মের পরিচিত নিশ্চিন্দিপুর যাওয়ার পথটিকে ভারি নতুন বলে মনে হয়। নামগুলি তার কানে অতীতের সুখস্মৃতির মত বাজলেও, দৃষ্টিপথে কত নতুন ছবি ধরা পড়ে। বেত্রবতী নদীর উপরে ভিডোল ডানলপ টায়ারের বিজ্ঞাপনওয়ালা পেট্রোলের দোকান চোখে পড়ে অপুর। সর্বত্রগামী বিজ্ঞাপন শহর ছেড়ে প্রসারিত হয় বাংলার গ্রামে গ্রামে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *আচার্য্য কৃপালনী কলোনি* বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। এই বইয়ের নাম গল্পটিতে আছে দেশভাগকেন্দ্রিক এক যন্ত্রণার আখ্যান। তবে লেখকের কথন-কৌশলে তা যেন এক নির্লিপ্ততার আবরণে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। কাহিনির কথক ও তাঁর স্ত্রীর বাড়ি পূর্ববঙ্গে। তখনও ভারত পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে 'র‍্যাডক্লিফ' বিভাজিকা চলে যায়নি। কিন্তু স্বাধীনতা এবং দেশভাগের সম্ভাবনায় দুই বঙ্গের মানুষই বুঝতে পারছিলেন এবার তাঁদের ঠাঁইনাড়া হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে। অতঃপর মানুষের মধ্যে শুরু হয় নতুন বাসা খোঁজবার অস্থিরতা। একতি নিভৃত আবাস, সামান্য হলেও জমি, গাছপালা ঘেরা শান্তির জীবন হঠাৎই পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনায় আতঙ্ক আর অনুসন্ধানে কাটতে থাকে দিন। গৃহস্থ থেকে গৃহহারা

হওয়ার ব্যবধান যে অতীব ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সে কথা বুঝতে বাকি থাকে না কারুর। এমতাবস্থায়, কথকের স্ত্রী প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে খুঁজে আনেন একটি কাগজ। যাতে রয়েছে লোভনীয় এক বিজ্ঞাপন। কোনও জিনিসের নয়, তবে এই বাজারে দুর্মূল্য এক বস্তুর। জমি।

‘আচার্য্য কৃপালনী কলোনি।’

আজই আসুন! দেখুন!! নাম রেজিস্ট্রি করুন!!!

> কলিকাতার মাত্র কয়েক মাইল দূরে ‘অমুক স্টেশনের সংলগ্ন সুবিস্তৃত ভূখন্ডে এই বিরাট্ নগরটি গড়িয়া উঠিতেছে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কলোনির পাদদেশ ধৌত করিয়া স্বচ্ছ-সলিলা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যাইতেছেন। পঞ্চাশ ফুট চওড়া , ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, স্কুল, মেয়েদের স্কুল, গ্রন্থাগার, নাগরিক জীবনের সমস্ত সুখ-সুবিধাই এখানে পাওয়া যাইবে। আপাততঃ পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইলেই নাম রেজিস্ট্রি করিয়া রাখা হইবে।[৫০]

এই বিজ্ঞাপনের ভাষার মধ্যে এক ধরনের আহ্বান ছিল, যা উপেক্ষা করা কঠিন। মোটামুটি স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনে যে উপাদানগুলি প্রয়োজন, এখানে তার প্রতিটির উল্লেখই ছিল। সঙ্গে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল “স্বচ্ছ-সলিলা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী”। কলকাতার কাছে অবস্থিত হওয়ায় যাতায়াতের সমস্যাতেও না পড়ারই কথা।

কিন্তু সেই জায়গা নিজের চোখে দেখতে গিয়ে সেই মোহাবরণ ছিন্ন হয়। বিজ্ঞাপনের প্রতিটি কথাতেই যে মিশে আছে বিস্তর ফাঁকি, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শেষপর্যন্ত যখন এই দম্পতি কিছুটা ব্যর্থমনোরথ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে, পূর্ববঙ্গেই তারা রয়ে যাবেন; ঠিক তার পরদিনই র‍্যাডক্লিফের রায় বেরোয়। এবং তাদের ‘দেশ’ পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। বিজ্ঞাপনের মধ্যেকার লাভজনক সম্ভাবনাগুলির ভেতর যে বহুক্ষেত্রেই অন্তঃসারশূন্যতা লুকিয়ে থাকে, তা বুঝতে বাকি থাকে না। এই ‘দেশ’-এর সংজ্ঞাটিও বিজ্ঞাপনের মতোই ফাঁকি আর হেঁয়ালীভরা হয়ে ওঠে বহু মানুষের কাছে। গত রাত্রে যা ছিল নিজের দেশ, রাত পোহাতে তা বিদেশ-এ পরিণত হয়।

ভূমিকা সবসময়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, দেখা যাচ্ছে বড় লেখকরা কেউই প্রায় বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেতে পারছেন না।

অপুর মতই, মন দিয়ে বিজ্ঞাপন পড়ার কথায় মনে পড়ে যায় একটি ছোট মেয়ের কথা। বাংলা সাহিত্যে সে এক আশ্চর্য উদাহরণ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর *কঙ্কাবতী* উপন্যাসটি লেখেন ১৮৯২ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে *সাধনা* পত্রিকায় এই বইয়ের সমালোচনা লেখেন। এই বইয়ের নবম পরিচ্ছেদের একেবারে শেষ অংশে কঙ্কাবতীর অধ্যয়নপর্বে দেখা যায় ছেলেমানুষ কঙ্কাবতী পড়াশোনায় ক্রমে দক্ষ হয়ে উঠছে। পড়াশোনায় তার বিশেষ প্রীতি জন্ম নিচ্ছে এবং তার সেই পড়ার ক্ষুধা কেবল বই বা সংবাদপত্র পড়েই মিটছে না।

> কঙ্কাবতী পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন। কলিকাতা হইতে খেতু তাঁহাকে নানারূপ পুস্তক ও সংবাদ-পত্র পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন গুলি পর্য্যন্ত কঙ্কাবতী পড়িতেন।[৫১]

কঙ্কাবতী লেখা হয় প্রায় একশো তিরিশ বছর আগে। সেসময়কার এক সদ্য-কিশোরীর পুস্তক-আগ্রহ দেখে আজকের পাঠককেও বিস্মিত হতে হয়। উল্লেখ্য, যে সময়ে “কঙ্কাবতী” লেখা হচ্ছে, সেই সময়ে একদিকে যেমন থাকতো বিজ্ঞপ্তিধর্মী বিজ্ঞাপন, অপরদিকে কোনও পণ্যের বিজ্ঞাপন হলেও, অধিকাংশ সময়ে তার কপিগুলি হত দীর্ঘ। একটিই কপি কয়েকপাতা ধরে চলছে, এমন উদাহরণ অপ্রতুল নয়। ফলে তা বেশ পাঠযোগ্য বস্তু ছিল, এ নিয়ে সন্দেহ থাকে না।

রসসাহিত্য এবং বিজ্ঞাপন, এই দুই বিষয়কে অন্তরঙ্গভাবে উপস্থাপন করার একটা প্রবণতা বাঙালি লেখকদের মধ্যে বারেবারে পাওয়া যাচ্ছে।

সুকুমার রায়-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবিনয় রায় (১৮৯০-১৯৪৭)-এর ‘উন্মাদ-রহস্য’ গল্পটি সেই ধারার একটি চমৎকার সংযোজন। খামখাপুরের জমিদার দ্বৈতারী চৌধুরীর একমাত্র সন্তান সাত বছরের খোকাটিকে নিয়ে এই গল্প। তবে গল্প যে একান্তভাবে তাকেই কেন্দ্র করে এমন কথাও বলা যায় না। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে একটি রোমহর্ষক বিজ্ঞাপন। তবে সে বিজ্ঞাপনের অর্থোদ্ধার করতে গিয়ে গল্পের চরিত্রদের সঙ্গে পাঠককেও নাজেহাল অবস্থা হয়। আদরে বাঁদর এই খোকাটি যখন যে মুহূর্তে যা চায়, তাকে তখনই তা না দিলে আরম্ভ হয় তার বায়না। নেহাত শিশুসুলভ বায়নায় তা সীমাবদ্ধ হয় না। ক্রমে ক্রমে তার মেজাজের পারদ চড়তে থাকে এবং সরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে শান্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না। এসব বায়নাগুলিও ঠিক যে সে বায়না নয়। শীতকালে, এই মুহূর্তে কাঁঠাল চাই বলে সে বায়না ধরে। আবদারের তালিকা প্রতিদিনই দীর্ঘায়িত হয়।

জমিদারবাবুর কর্মচারীদের তাতে কালঘাম ছুটে যায়। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দেন, যেহেতু জমিদার মশাইয়ের অর্থাভাব নেই, তাই তার মাথা ঠান্ডা রাখতে এবং মনিহারি জিনিসে ভুলিয়ে রাখতে তাকে নিয়ে কলকাতা যাওয়াই শ্রেয়। অতএব দ্রুত গতিতে কলকাতায় নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়ে নানান বিলাসী সামগ্রীতে ভরিয়ে ফেলা হয় ঘর। খোকাবাবু, মামা হাস্যবিকাশ রায়ের সঙ্গে কিছুদিন বেশ নেচে-গেয়ে কাটিয়েও ফেলল। আইসক্রিমের, চকোলেটের বন্যা ছুটলো। তবে সবচাইতে তার পছন্দ হল মাখন চিনি মাখানো পাঁউরুটি আর কেক। এমনই এক দিনে হল বিনা মেঘে বজ্রপাত। খোকাবাবু একটি আশ্চর্য খাবার খাওয়ার বায়না জুড়লো। নামটিও তার দিব্য বদখদ। 'ফোন্নং'। টাকা পয়সা অঢেল, কিন্তু কাকে যে 'ফোন্নং' বলে, তা আবিষ্কার করতে পারলো না কেউ। বহু চেষ্টার পরে শেষপর্যন্ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোলো, শিরোনাম বার হল 'পাগল-রহস্য'। 'সরস সমাচার' কাগজের সম্পাদক রসিকরাজ রায়চৌধুরী শেষপর্যন্ত এই দুরন্ত ধাঁধার সমাধান করে ফেললেন। খোকাবাবুর চোখে একদা পড়ে গিয়েছিল সূর্য বেকারি'র একটি বিজ্ঞাপন। ইতিপূর্বে খোকাবাবুর পছন্দের তালিকায় ছিল পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক। আর সূর্য বেকারির বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল-

সূর্য বেকারি

পাঁউরুটি বিস্কুট কেক

ফোন নং

২৯৯৫, ছোটবাজার।[৫২]

'ফোন নং' উন্মাদ খোকার উচ্চারণে হয়ে গিয়েছিল 'ফোন্নং'। পাঁউরুটি থেকে বিস্কুট হয়ে কেকের যাত্রাপথের ইতিহাসটি কেবল উত্তরণের। এসব সুখাদ্যের স্বাদ পাওয়ায়, উত্তরণের সূত্র মেনে খোকাবাবুর ধারণা হয়েছিল 'ফোন্নং' বস্তুটিই স্বর্গের প্রবেশপথ। জটিল ধাঁধার সমাধান হওয়ার আহ্লাদে মাখন, বাদাম, নারকেল ইত্যাদি দিয়ে একটি নতুন খাদ্য প্রস্তুত হয়।

গল্পটি অবশ্যই হাস্যরসের। তবে খোকাবাবুর উন্মাদনায় নাস্তানাবুদ হওয়া লোকেদের কথা ভেবে খানিক করুণ রসেরও উদ্রেক হয় বইকি। এই নজিরবিহীন খোকাটির উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে এক অতীব সাধারণ বিজ্ঞাপন। এ কথাও স্মরণে রাখা উচিত।

‘উন্মাদ রহস্য’-কে কিশোর পাঠ্য গল্পের মধ্যে ফেলা যায়। পরপর আরও কয়েকটি এমন কিশোরপাঠ্য গল্পের কথা বলে নেওয়া যাক।

গল্পের নাম ‘চোর ধরলো গোবর্ধন!’, লেখক শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০)।

গল্পের শুরুতেই থাকে সেই মোক্ষম বাক্যটি-

> ‘নাঃ, বিজ্ঞাপনে কাজ হয় সত্যিই!’[৫৩]

দুশো টাকা অর্থমূল্যের বিনিময়ে সংবাদপত্রে দু-ইঞ্চি বিজ্ঞাপন দিয়ে হর্ষ এবং গোবর, বর্ধন ভ্রাতৃদয় তাঁদের কাঠের কারখানায় রাত্তিরে ক্যাশ সামলানোর জন্য সুদক্ষ প্রহরী চেয়েছিলেন। সেই রাত্তিরেই সেই বিজ্ঞাপন পড়ে উৎসাহী চোর, কারখানার সিঁধ কেটে আশি হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়। গোবর্ধন আরেকটি বিজ্ঞাপন দেয় তাদের দোতলায় ‘তৈজসপত্র’ সামলানোর জন্য, তলায় জলের পাইপ বেয়ে কেউ যেন সেখানে হাজির হয়ে তৈজসপত্রটি লোপাট না করে সেদিকে নজর রাখার জন্য প্রাইভেট ডিটেকটিভ চেয়ে। সে রাতেই আবার ‘তৈজসপত্র’ উধাও, এবং পরেরদিন চোর গ্রেপ্তার হয়। পাঠক কিন্তু ‘তৈজসপত্র’-কে বাসনপত্র ভেবে ভুল করবেন না। এখানে ‘তৈজসপত্র’ হল তেজপাতা। শিবরামসুলভ কথার মারপ্যাঁচে গল্পটি কিঞ্চিৎ উদ্ভটভাবে জমে উঠেছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চুরি এবং চোর পাকড়াও উভয় কাজই সুসম্পন্ন হয়।

শিবরাম চক্রবর্তীর আরেকটি গল্পেও বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব অবিস্মরণীয়। গল্পের নাম ‘পাগলামির মহৌষধ’। কিশোরপাঠ্য হলেও এই গল্পের সুরটি ধারালো ব্যঙ্গে বাঁধা আছে। যে গল্পের সূত্রপাতই ঘটে একখানি বিজ্ঞাপনের কপি দিয়ে, যেখানে লেখা থাকে বিখ্যাত লেখক অমুক চন্দ্র অমুক অত নম্বর ঠিকানা থেকে জানাচ্ছেন যে অমুক কোম্পানির এক শিশি ‘মোক্ষম রসায়ন’ সেবন করে তাঁর পাগলামি সম্পূর্ণরূপে সেরে গেছে। পাঠককে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে এই রকম বিজ্ঞাপন তোমরাও নিশ্চয় ট্রামে, বাসে, খবরের কাগজে অথবা গুপ্তপ্রেসের পাঁজিতে, সিনেমা-স্লাইডে কিংবা রেলের গাইডে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখে থাকবে।

এরপরেই কথক সগর্বে জানান, বলাই বাহুল্য উক্ত অমুক চন্দ্র অমুক আর কেউ নন, কথক নিজেই।

নিজেকে তিনি বিজ্ঞাপনের কপিটিতে যতই বিখ্যাত লেখক বলে ঘোষণা করুন না কেন, আদপেই তিনি বিখ্যাত ছিলেন না, অন্তত ওই বিজ্ঞাপনের আগে তো নয়ই। বই পড়বার লোক সামান্য হাতে গোনা হলেও, বিজ্ঞাপনটি কিন্তু হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষের চোখে পড়েছিল। তার দৌলতেই ‘বিখ্যাত’ লেখক অমুক চন্দ্র অমুক

সত্যিই 'বিখ্যাত' হয়ে উঠেছেন। তবে কিনা নিজেই নিজের পাগলামি সেরে যাবার কথা হস্ত উজাড় করে পাঁচকান করেছেন, তারপরে খ্যাতি জুটেছে।

বিজ্ঞাপনের কপি যতই উদ্ভট হোক, তাতে পাগলামি সেরে যাওয়ার অভাবনীয় দাবি করা থাকলেও, তার সর্বত্রগামিতা যে অজানা, নিতান্ত নামহীন লেখককেও জনপ্রিয় করে তুলতে পারে, তাই বলেছেন কথক। ক্রমে ক্রমে জানা যায় যুদ্ধের (বলাবাহুল্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাই বলছেন কথক) কিছু বছর আগে থেকেই তিনি বিজ্ঞাপনের কপি লিখতেন। ঘি-তেল, সন্দেশ, ওষুধ, বিস্কুট-বার্লি, লোহা-লকড় সব কিছুর বিজ্ঞাপনই তাঁকে লিখতে হয়েছে। এ বিষয় বাছ-বিচার করলে পেট চলবে না। তবে, সারাদিনে লেখক হয়ে একঘেয়ে কলম চালাবার পরে, বিজ্ঞাপনের কপি লেখা ছিল অন্য পথে মস্তিষ্ক চর্চা। দস্তুরমত মাথার ব্যায়াম।

এইখানে একটি অংশ কথকের মুখেই শোনা প্রয়োজন,

> প্রথম বিজ্ঞাপন লেখার কাজ আমার হাতে এল ওই মোক্ষম রসায়নের মারফতে। অতএব ওকেই প্রথম এক হাত নিলুম। প্রচারের সবচেয়ে বড়ো আর্ট হচ্ছে আত্মপ্রচার, কাজেই ওষুধের সঙ্গে নিজেকেও জাহির করতে লাগলাম। বিনা পয়সায় নিজেকে বিখ্যাত করার এই মোক্ষম পথ বেছে নিলাম আমি।[৫৪]

দেখা যায় বিজ্ঞাপনের প্রাণের কথাটিকে আত্মসাৎ করেছেন কথক। নিজেকে জাহির করার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকেননি।

কিন্তু এই বিজ্ঞাপন থেকেই পরবর্তী যাবতীয় গোলমালের সূত্রপাত হয়।

পনেরো বছর ধরে শয্যাগত, প্রবল প্রাচীনপন্থী মাসিমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার পথে কথকের নিজের হাতে লেখা বিজ্ঞাপনটিই হয়ে ওঠে বাধাস্বরূপ। তাঁকে বছরের পর বছর ধরাশায়ী করে রাখবার জন্য ডাক্তারটিই নাকি দায়ী। প্রাচীনা জরাজীর্ণ মাসিমা পাঁজির পাতায় পাগলামির মহৌষধের বিজ্ঞাপন দেখে পরীক্ষা করে ফেলেন নিজের উপরেই। গঙ্গারাম ডাক্তারের চিকিৎসা সংক্রান্ত পাগলামি বা পাগলামির কুফলে যদি কাজ দেয়।

অতঃপর বছর সত্তরের মাসিমা হয়ে ওঠেন যুবতীসুলভ চঞ্চল এবং রোমাঞ্চকর রকমের আধুনিকা। এবং কথকের সাধের সম্পত্তিলাভের আশা মাঠে মারা যায়।

যে মহৌষধ সেবনে এহেন ফল হয়, সেইসব আশাঘাতী বিজ্ঞাপন থেকে দূরে থাকার সতর্কীকরণ এই গল্পটি।

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩)-এর *নীল সায়রের অচিন্‌পুরে*-তেও প্রায় সমধর্মী একখানি ঘটনার উল্লেখ আছে। উপন্যাসের কাহিনি কিশোরপাঠ্য এবং অ্যাডভেঞ্চারধর্মী। এর চরিত্রদের মধ্যে প্রধান চারজন হলেন বিমল, কুমার, তাদের চাকর রামহরি এবং সারমেয় বাঘা। তবে এই অ্যাডভেঞ্চারে তাদের সঙ্গী ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ বিনয়বাবু এবং কমল।

অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে দিকভ্রষ্ট এক জাহাজ এমন একখানি দ্বীপে নোঙর করে যেখানে জনমানবের কোনও চিহ্ন নেই, কেবল অতিকায় সমস্ত মূর্তি পাথরের গা খোদাই করে বার করা। সেই দ্বীপে দেখা যায় গভীর রাতে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কারা যেন মশাল জ্বেলে ঘোরাঘুরি করে। লন্ডনে ফিরে আসার পরে সেই জাহাজের কর্তাব্যক্তিরা একে একে আশ্চর্যজনকভাবে 'ব্ল্যাক স্নেক'-এর দংশনে প্রাণ হারায়। বিমল-কুমার সদলবলে অ্যাডভেঞ্চারের আশায় ইউরোপে হাজির হয়। স্থানীয় কাগজে বিমলের দেওয়া বিজ্ঞাপনের উত্তরেই, তার কাছে আবিভূর্ত হয় অপরাধী বার্তোলোমিও গোমেজ, যে একদা সেই দিকভ্রষ্ট জাহাজ এস, এস, বোহিমিয়ায় কোয়ার্টার মাস্টারের কাজ করতো। বিমল সন্দেহ করে সেই বোহিমিয়া জাহাজের কোনও লোকই হত্যাকান্ডগুলির জন্য দায়ী। অনুমানের ভিত্তিতেই অজানা দ্বীপে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞাপন দেয় বিমল, একেও অপরাধী ধরবার টোপই বলা যেতে পারে। প্রখরবুদ্ধি বিমলের অনুমান ছিল এই লোভনীয় প্রস্তাব প্রকৃত অপরাধী কিছুতেই উপেক্ষা করে যেতে পারবে না।

বিমলের অনুমান সত্যি হয়, বিজ্ঞাপন দেওয়ার কিছুকালের মধ্যেই আবির্ভাব হয় তার।

> একটু পরেই যে-লোকটি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল, সত্যসত্যই তার গায়ের রং শ্যামল। লোকটি মাথায় লম্বা নয় বটে, কিন্তু চওড়ায় তার দেহ অসাধারণ-এত চওড়া লোক অসম্ভব বললেও চলে। দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে অসুরের শক্তি আছে। লোকটির মাথায় একগাছা চুলও নেই, ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ, থ্যাব্ড়া নাক, ঠোঁটের উপরে প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ।
>
> ঘরে ঢুকেই সে বললে, "কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে আমি এখানে এসেছি।"
>
> বিমল আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি সেই অজানা দ্বীপে যেতে চান?"
>
> -"হ্যাঁ।"

-"আপনার নাম?"

-"বার্ত্তোলোমিও গোমেজ। আমি এস, এস, বোহিমিয়ায় 'কোয়ার্টার মাষ্টারের কাজ করতুম।"

বিমল, কুমার ও বিনয়বাবুর দৃষ্টি চম্‌কে উঠল![৫৫]

শরদিন্দুর ব্যোমকেশ-কাহিনিতে অপরাধীরাই কখনও বিচিত্র বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত দুটি গল্পেই বিজ্ঞাপনের ফাঁদ পেতে অপরাধীদের আকর্ষণ করে আনা হয়েছে। যদিও দুটি গল্পের ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র'র গল্প 'নিরুদ্দেশ' ঠিক অপরাধী ধরবার কাহিনি নয়, তবে এও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জব্দ করারই ভিন্নস্বাদের আরেক কিশোরপাঠ্য আখ্যান।

কৃপণ ব্রজেন বাবু খবরের কাগজে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন পড়েন। ব্যোমকেশও খবরের কাগজে অতীব গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞাপনী অংশ পাঠ করতো, তবে বলাইবাহুল্য তার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু ব্রজেন বাবুর মতলব ছিল একেবারেই বিপরীত। ফাঁকতালে লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু লাভ করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে টাকে চুল গজানোর এবং না পারলে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তাঁকে উৎসাহিত করে। সেই কাগজেই তাঁর হাতে আসে সেই পরম লোভনীয় বিজ্ঞাপন। দেওয়া হয় এক হারিয়ে যাওয়া যুবকের ছবি এবং খুঁজে দিলে কড়কড়ে পাঁচটি হাজার টাকা প্রাপ্তি।

পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার! পাঁচশো সাতশো নয় একেবারে পাঁচ হাজার! ব্রজবিনোদবাবুর চোখে আর ঘুম নেই। ঘুম যদি আসে তাহলে পাঁচ হাজার করকরে ঝকঝকে টাকা ছাড়া আর কিছুর স্বপ্ন নেই। কখন সে পাঁচ হাজার টাকা ঝনঝন করে তাঁর সিন্ধুকে পড়ে রূপোর ঝরণার মত, কখনও বা খসখসে খাস্তা নোট হয়ে রাশি রাশি তাঁর বিছানাময় ছড়িয়ে পড়ে চৈতী হাওয়ার বনে ঝরা পাতার মত।[৫৬]

এই সংবাদে প্রলুব্ধ বোধ করবেন না, তেমন মানুষ ব্রজেনবাবু নন। এবং 'ঘটনাচক্রে' সেই যুবককে তিনি পেয়ে যান এবং নিজের বাড়িতে এনে তোলেন। তার নানান আবদার মেটান মুখ বুঁজে। মনে মনে ক্ষেপে উঠলেও অর্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কিছু সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আসলে তিনি ফেঁসেছেন বেজায় রকম। ছেলেটি নিজেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তাঁকে জব্দ করার জন্য। মানুষকে জব্দ করার এ এক অনন্য কৌশল, তাতে সন্দেহ নেই।

সাধু কালাচাঁদের কারবার ছিল অন্যরকম। যাকে বলে ফলাও কারবার। এই চরিত্রের স্রষ্টা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১)। ক্লাস সেভেনে পড়া সাধু কালাচাঁদকে ক্লাস টেনের ছেলেরাও সমীহ করে চলত। সে এক ভয়ংকর ছোকরা। স্টুডেন্টরা তাকে কিছু বিশেষ কাজের জন্য ভক্তি-শ্রদ্ধা করে চলে। আর কাজের বিনিময়ে তার হাতে পয়সা-কড়ি দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। আর কালাচাঁদ তাকে ফি না-বলে ভিজিট বলে। এতেই বোঝা যায় কেমন ওজনদার সে কাজ। এমনকি অন্যান্য স্কুলের মক্কেলদের কাছ থেকেও 'কল' পায় সাধু। কাজগুলি চমৎকার। অভিভাবকের সই জাল করা থেকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট আপাদমস্তক বদল, সব জালিয়াতি কারবারে সাধু সিদ্ধহস্ত। পয়সা হাতে এলেই তা খরচ করার জন্য মন আনচান করে। হাতের কাছে নানা বাহারি সামগ্রীর বিপুল সম্ভার একমাত্র পাওয়া যেতে পারে পঞ্জিকাতে।

> কালাচাঁদ নিজেও পঞ্জিকা দেখে মানি অর্ডার করে। কখনো অমৃতসর থেকে ঘড়ি আসে। লুধিয়ানা থেকে মাছ ধরার ছিপ। জম্মু থেকে ছুরি ভরে রাখার জন্যে ভেড়ার শিঙের খাপ।[৫৭]

কালাচাঁদ যেসব জিনিস আনায়, তার বিপুল বৈচিত্র্য দেখলে বোঝা যায় পাঁজিতে কী বিচিত্র সব পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত সে সময়ে। উল্লেখ্য, পাঁজিতে আজও বিজ্ঞাপনের ধরন খুব যে পরিবর্তিত হয়েছে এমনটা নয়।

শেষপর্যন্ত কালাচাঁদের কারবারে তার বাবা ধ্বংসলীলা চালান এবং এই জালিয়াতি কারবারের অবসান হয়।

সত্যজিৎ রায়ের লেখা তারিণীখুড়োর কাহিনিগুলির মধ্যে দুটি কাহিনিতে বিজ্ঞাপনের বড় ভূমিকা রয়েছে। বেশ জোরদার এবং বিচিত্র ভাবে প্রসঙ্গগুলি এসেছে। বস্তুত বিজ্ঞাপনগুলিই আশ্চর্যজনক এবং এদেরকে বিজ্ঞপ্তি বলাই বাঞ্ছনীয়। গল্পদুটি হল 'তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ' এবং 'তারিণীখুড়ো ও বেতাল'। তারিণীখুড়োর অভিজ্ঞতার ভান্ডারটি অফুরন্ত। তাঁকে নাকি একবার মহারাজের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। তারিণীখুড়োর মুখেই শোনা যাক বিষয়টা।

> তখন আমি ব্যাঙ্গালোরে। মাদ্রাজে দুবছর একটা হোটেলের ম্যানেজারি করে আবার ভবঘুরে। সেই সময় একদিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। অদ্ভুত বিজ্ঞাপন; ঠিক তেমনটি আর কখনো চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। বিজ্ঞাপনের মাথায় একজন লোকের ছবি। তার নিচে বড় হরফে লেখা '১০,০০০ টাকা পুরস্কার!' তারপর ছোট হরফে লিখছে যে ছবির চেহারার সঙ্গে আদল আছে এমন লোক যদি কেউ থাকে, সে যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় অ্যাপ্লাই করে তার নিজের ছবি সমেত।[৫৮]

মন্দোর স্টেট, মাইসোরের দেওয়ান ভার্গব রায় এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এই রাজ্যের মহারাজা গুলাব সিং-এর মস্তিষ্কবিকার দেখা দেওয়ায়, তার অনুপস্থিতিতে অল্প কয়েকদিনের একটি গুরুদায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয় তারিণীখুড়োকে। এই আশ্চর্য চাহিদার একটি বিজ্ঞপ্তি দেখে এবং সর্বোপরি রাজা এবং খুড়োর চেহারাগত সাদৃশ্য বুঝতে পেরে তারিণীখুড়ো যথারীতি এই অ্যাডভেঞ্চার হাতছাড়া হতে দিলেন না।

'তারিণীখুড়ো ও বেতাল' গল্পের এক শিল্পী বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর ছবি আঁকার মডেল খোঁজ করেন। সেখানেও উপস্থিত হন খুড়োই।

দুই ক্ষেত্রেই কাহিনির সূত্রপাত এবং বিস্তার ঘটে দুটি বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে।

কিশোর-সাহিত্যে বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার শেষের দিকে কিশোরপাঠ্য একটি উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। উপন্যাসটির নাম *যে-পুতুল পালিয়ে গেলো,* লেখক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই উপন্যাসের কাহিনি কতকটা এরকম, কলকাতা নিবাসী অশোক রুদ্র প্রখ্যাত কবি। একই বছরে রবীন্দ্র এবং অ্যাকাডেমি পুরস্কার তিনি যুগপৎ পেয়েছেন। তাঁর বইয়ের অন্যতম প্রকাশক সংস্থার মালিক দস্তিদার মশাইয়ের থেকে আগামী কবিতার বইয়ের জন্য, দরাদরি করে এক হাজার টাকার চেক নিয়ে অশোক পাড়ি দেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেই বইটি লিখবেন। কবি হলেও রুদ্র বাবু পিস্তল চালাতে পারেন এবং মাঝেমধ্যে টার্গেট প্র্যাকটিশ ও করেন।

বোলপুর যাবার ট্রেনে বিভ্রাট ঘটায় বর্ধমানে নেমে অগত্যা একটি লরি ড্রাইভারকে ধরে তিনি বোলপুর পৌঁছোন রাতের বেলায়। তখনো ভোর হতে তিন ঘন্টা বাকি। অধ্যাপক বন্ধু ডঃ বীরেন রায়ের বাড়িতে যাবার পরিকল্পনা অশোকের। এমতাবস্থায় পথের ধারে একটি আধখোলা দোকানের দরজা দেখে কৌতূহলবশত ভেতরে ঢুকে অশোক ঘটনাচক্রে মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মৃতদেহ সেখানে আবিষ্কার করেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞাত আততায়ী রুদ্রকে মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করে দেয়। দোকানটি ছিল পুতুল ও নানা শিল্পদ্রব্যের বিপণি।

জ্ঞান ফিরতে তিনি দেখলেন ছোট একটি ঘরে তিনি বন্দী, তবে ঘরটির জানলা খোলা। সেই জানলা টপকে থানায় গিয়ে তিনি কোনওমতে পুলিশদের বুঝিয়ে অকুস্থলে এসে দেখলেন সেখানে আর ওই নামের কোনও দোকানই নেই। রয়েছে একটি মনোহারি দোকানের সাইনবোর্ড।

বন্ধু বীরেন রায়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে সব জানানোর পরে অশোকের মনে পড়ে, লাশের পাশ থেকে এক টুকরো কাগজ তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন যাতে ফোন নম্বর লেখা ছিল। ফোন করে জানা যায় সেটি বিনয় বসুর নম্বর। এরপর দুই বন্ধু মিলে সেই পুতুল ওরফে মনোহারি দোকানে গিয়ে কর্মচারীর কাছে জানতে পারেন দোকানের মালিকের নাম বিনয় বসু।

অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে পাশের ঘরে লুকিয়ে ঢুকতে গিয়ে এরপরে দুই বন্ধু প্রায় হাতেনাতে ধরা পড়ে যেতে যেতে কোনওমতে বেঁচে গাড়ি চেপে পালান। তাঁরা এরপরে বোলপুরে বিনয় বসুর বাড়িতে আসেন। বীরেন গাড়িতে বসে থাকেন আর অশোক বিনয় বসুর বাড়িতে ঢোকেন। বীরেন গাড়িতে বসে কৌতূহলজনক কোনও খবর না পেয়ে শেষে,

> গাড়িতে ব'সে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মনোনিবেশ করলে; সব বড়ো হরফের শিরোনামা চট ক'রে সাবাড় ক'রে ফেললো, এমন-একটি খবর দেখলো না যা তাকে কৌতূহলী ক'রে তুলতে পারে। বাধ্য হ'য়ে সে বিজ্ঞাপন পড়তে শুরু ক'রে দিলে। বিজ্ঞাপনের কলমে অনেক মজার-মজার খবর বেরোয়।[৫৯]

আশোকের সঙ্গে বিনয় বসুর কথাবার্তায় প্রকাশ হয় মৃত ব্যক্তির নাম রমেন সেন। তিনি বিনয়ের বাল্যবন্ধু। বিনয় অবশ্য তখনো মৃত্যু সংবাদ জানেন না। অশোক জানালেন যে তিনি রমেনের স্বল্প পরিচিত এবং তাঁর কাছেই ছ'মাস আগে বিনয়ের কথা শুনেছেন, তাই শান্তিনিকেতনে এসে একবার সৌজন্য সাক্ষাৎকার করছেন। কথাসূত্রে জানা গেল রমেনের দেশভ্রমণের সখ আর আত্মীয় বলতে এক বাতিকগ্রস্থ ধনী জ্যাঠামশাই, যিনি অল্পদিন আগে মারা গেছেন। জ্যাঠার নাম হরেন সেনগুপ্ত। জ্যাঠার সলিসিটার সারদা মৌলিকের কাছেও বিনয় বসু গিয়েছিলেন হরেনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। যদি রমেনের নামে কিছু থাকে, কিন্তু সারদা বাবু কিছু খোঁজ দিতে পারেননি।

এরপরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পরে বীরেনের অন্যসূত্রে মনে পড়ে যে এই সারদা মৌলিক নামটি তাঁর চেনা। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে গত কয়েকদিন ধরে আনন্দবাজারে একটি মজার বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছিল, তাতেই এই নামটি তিনি দেখেছেন। বিজ্ঞাপনটি এইরকম-

> আশোক জোরে-জোরে পড়লো, "ট্যাঁশগোরু, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, রামগরুড়ের ছানা, হাতুড়িচালক ডাক্তার ও কুমড়োপটাশ-আপনারা সকলে সলিসিটর সারদা মৌলিকের সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ করুন। বিশেষ জরুরি প্রয়োজন।- সারদা মৌলিক, সলিসিটর, - নং, - স্ট্রিট, বোলপুর।"[৬০]

দুই বন্ধু সারদা মৌলিকের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে জ্যাঠামশাই বলে গিয়েছিলেন, মারা যাবার ছ'মাস পর পর্যন্ত বাংলাদেশের সব কাগজে ভাইপো রমেনের উদ্দেশে বিজ্ঞাপন দিতে, যদি রমেন সাড়া না দেয় তবে ওই উদ্ভট বিজ্ঞাপন দিতে- যে বিজ্ঞাপনের বর্ণিত লোকেদের/প্রাণীদের সঙ্গে সাদৃশ্যসূচক কয়েকজনকে তিনি অতঃপর সম্পত্তি দিয়ে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। এই বিজ্ঞাপন যেন হেঁয়ালি করে তাদের ডেকেছে। যাদের ডাকা হল তারা কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের ঘনিষ্ঠ বা তেমন পূর্ব-পরিচিত নন। হঠাৎ পছন্দ হওয়া লোক। তাঁদের জ্যাঠামশাই মনে মনে এইসব নাম দিয়েছিলেন এবং আলাদা করে বলে এসেছিলেন যাতে ঐ বিজ্ঞাপন দেখলেই তাঁরা সলিসিটারের কাছে যান। তিনি নিজে হাসির বই আর এইসব হাসির গল্প পড়তে ভালোবাসতেন।

গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার জট খুলতে থাকে এবং বোঝা যায়, রমেন সেন ছ'মাস পূর্ণ হবার ঠিক আগের মুহূর্তেই আসছেন খবর পেয়ে সলিসিটর সারদা, বাকি ক'জনকে নিয়ে রমেনকে হত্যার চক্রান্ত করে এবং দোকান ঘরটিকে পুতুল দিয়ে সাজিয়ে অন্যরকম দেখতে করে তোলে যাতে জায়গাটি সনাক্ত করা না যায়।

সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'র কাক্কেশ্বর কুচকুচের হ্যান্ডবিল পেরিয়ে যখন তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররাই কাহিনির কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায় এবং বিজ্ঞাপনের অংশ হয়, তখন সে বিস্মিত হতে হয়।

খবরের কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কতগুলি উদাহরণ এইভাবে পাওয়া গেল। কখনও কিশোরসাহিত্যে, কখনও বা প্রাপ্তমনস্ক সাহিত্যে।

বাঙালি পুরুষরা তাঁদের স্ত্রীদের যারপরনাই ভয় পান, বাংলা সাহিত্যে, মূলত রসসাহিত্যে এই উদাহরণ বিরল নয়। স্ত্রীদের তাঁরা সহ্যও করতে পারেন না, মনে মনে গালমন্দ করে থাকেন, আবার সেই স্ত্রী'র সান্নিধ্য না পেলে মন হাঁপিয়ে ওঠে, এ উদাহরণ অহরহ মিলছে।

বিবাহজনিত বিজ্ঞাপনের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা হল। আপাতত দাম্পত্য, দাম্পত্যে বিতস্পৃহতা, স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য, সর্বোপরি গভীর স্ত্রী-ভীতি কীভাবে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তা সংক্ষেপে দেখা যাক।

দুটি গল্প নিয়ে আলোচনা করা হবে। একটি হল রাজশেখর বসু'র 'ধুস্তুরী মায়া (দুই বুড়োর রূপকথা)' গল্পটি, অপরটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্ন্যাস'।

'ধুস্তুরী মায়া' গল্পে পঁয়ষট্টি বছরের অবসরপ্রাপ্ত দুই বৃদ্ধ উদ্বব পাল এবং জগবন্ধু গাঙ্গুলী ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর কথোপকথন অনুসরণ করে ধুস্তুরী ছোলা খেয়ে ফেলেন দিনক্ষণ দেখে। এই ছোলা খেলে বয়স কমে যায়, এই কথাই রূপকথার পাখিদ্বয় বলছিল নিজেদের মধ্যে। ঠিক যেমন বলা থাকে স্বাস্থ্য ও যৌবন ধরে রাখার বিজ্ঞাপনে। তাঁদের কথোপকথনকে ঠিক তেমন বিজ্ঞাপনের মতই শুনতে লাগে। এবং তাতে কাজও দেয়। বৃদ্ধরা এই কথায় প্রভাবিত হন। ছোলা খেয়ে বয়স তিরিশ বছর কমে হয় পঁয়ত্রিশ। যাকে বলে ঘোর যৌবন। অতঃপর, নতুন করে বিবাহ করার বাসনায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন উদ্ধব পাল। বিজ্ঞাপনে তাঁদের আর্থিক সঙ্গতির কথারও উল্লেখ থাকে।

> পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক উদারপ্রকৃতি সদ্‌বংশীয় বাঙালী বহু-লক্ষপতি ব্যবসায়ী। কোনও আত্মীয় নাই, বিবাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরী মহিলার সহিত আলাপ করিতে চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। উভয়পক্ষের মনের মিল হইলেই শীঘ্রই বিবাহ। বক্স নম্বর অমুক।[৬১]

সেই বিজ্ঞাপনের জবাবে রাজকুমারী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরাণী যে চিঠি দেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে কৌতূহলপ্রদ একটি সাক্ষাৎকার হয়। শেষে বিতৃষ্ণ বৃদ্ধদ্বয় ফের তাঁদের আগের বয়সে ফিরে যান সেই মায়াবী কৌশলে। দুই বড়োর রূপকথা তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যে স্ত্রী'র প্রতি অভাব-অভিযোগের অন্ত নেই, তাঁরই জন্য মন কেমন করে ওঠে।

পরের গল্প 'সন্ন্যাস'। বাংলা সাহিত্যের নানান দুষ্টু গল্পের মধ্যে এই গল্পটি অন্যতম।

> সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত স্তম্ভে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম-
>
> বাবা, মা মারা গিয়াছেন। আপনি এবার ফিরিয়া আসুন।
>
> শ্রীরামধন ঘোষ। ফুলগ্রাম। বাঁকুড়া।[৬২]

বাঁকুড়ার ফুলগ্রাম নিবাসী জনৈক রামধন ঘোষের নামে প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপন দেখে লেখকের মনের দুরন্ত কল্পনায় যে ছবি ফুটে উঠল, তা এই রকম-

হিমালয়ের সানুদেশে গিরিগুহার সামনে উপবিষ্ট পাঁচজন সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন গাঁজার মোড়কের কাগজের টুকরোটি খুলে এই বিজ্ঞাপন দেখেন, যা আসলে তাঁরই পূর্বাশ্রমের নামে মুদ্রিত। উল্লসিত সন্ন্যাসী বাকিদের বিষণ্ণতায় নিমজ্জিত করে, দুর্ধর্ষ স্ত্রী'র মৃত্যুসংবাদে আহ্লাদিত হয়ে গৃহে ফিরে যান। এরপরে বোঝা যায় এই

সন্ন্যাসীদের প্রকৃত স্বরূপ। গাঁজার প্রত্যাশ্যায় তাঁরা যত না প্রত্যাশী, তার চাইতে ঢের বেশি অপেক্ষা করে থাকেন গাঁজার মোড়কটির অপেক্ষায়। খবরের কাগজের সেই টুকরোটি থেকে দৈবাৎ মিলে যেতে পারে কোনও 'সুসংবাদ'। এরা প্রত্যেকেই দায়ে পড়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন, স্ত্রী'র ঝগড়া, অশান্তি, অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে এ ছাড়া উপায় ছিল না। অতঃপর, একজন বন্ধু চলে গেলে মলিন মুখে দিন গণনা ছাড়া বাকিদের আর কিছু করার থাকে না। বিজ্ঞাপনী পৃষ্ঠার সামান্য সেই স্বপ্নবৎ সংবাদের অপেক্ষায় তাঁদের জীবন কাটতে থাকে।

বিশ শতকের সাত-আটের দশক থেকে যখন ভারতবর্ষে খোলা বাজার অর্থনীতির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। খুব অল্প হলেও বিদেশি সংস্থাগুলি দেশীয় সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতবর্ষে তাদের পুঁজির বিনিয়োগ করছে। সাদা অ্যাম্বাসডরের বদলে রাস্তায় প্রথমবার দেখা যাচ্ছে মারুতি সুজুকি'র নতুন গাড়ি মারুতি ৮০০। এই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের জগতে বহুজাতিক পুঁজি, পণ্য এবং বিজ্ঞাপনের কথাগুলি আরও প্রত্যক্ষতায় এসে হাজির হচ্ছে। যেমন, দিব্যেন্দু পালিত নিজে বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। তিনি ছিলেন Statesman কাগজের Advertisement Manager।[৬৩] ফলত, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পেশাগত কারণে যে সব মানুষ যুক্ত থাকেন, তাঁদের লেখা পড়লে; বিজ্ঞাপন জগতের অন্দরমহলের খবর খানিক পাওয়া যায়। যদিও এর কোনও সাধারণীকৃত তত্ত্ব হয় না, তবু কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

দিব্যেন্দু পালিতের *সম্পর্ক* উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের জুন মাসে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামতনু সোম বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থার উচ্চপদে কর্মরত। তাঁরই জীবনকে আবর্তন করে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপন সংস্থার গভীর টানাপোড়েনের বর্ণনা পাওয়া যায়। 'হুইটনার', 'ইউরেকা' এবং 'স্টারলেট হিউম' এই তিনটি বিজ্ঞাপন সংস্থার নাম এখানে পাওয়া যায়, যার মধ্যে তৃতীয়টিতে রামতনু কর্মরত।

লেখকের আরেকটি উপন্যাস, *বিনিদ্র* প্রকাশিত হয় আগের উপন্যাসটির মোটামুটিভাবে চার বছর পরে, ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রায় রামতনু-চরিত্রের অবিকল প্রতিফলন দেখা যায় এই উপন্যাসের চরিত্র প্রদীপ্ত'র মধ্যে, যিনি 'হিন্দুস্থান ফস্টার'-এ কর্মরত।

দুটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন সংস্থার উচ্চপদে কর্মরত মানুষদের কিছু বৈশিষ্ট্য মিলে যাচ্ছে।

ক্রমান্বয়ে শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমে এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের স্ত্রী-সন্তানকে সময় দিতে অক্ষম। ফলে পারিবারিক জীবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কাছের মানুষদের সঙ্গে তৈরি হয় অসীম দূরত্ব। পরিবারের কাউকে

কথা দিয়ে কথা রাখা হয় না। এর উপরে দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত থাকে পার্টি, মদ্যপান, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর মতন বিষয়গুলি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রতিটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে যায়। বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি ক্লায়েন্টকে আকর্ষিত, প্রভাবিত করবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে সুন্দরী মহিলাদের। সুন্দরীর সংজ্ঞার মধ্যে এখানে অবশ্য ঢুকে যায় বুদ্ধিদীপ্ত, বাকপটু, ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি। কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা, অশান্তি, দ্বন্দ্ব ইত্যাদির সঙ্গে পারিবারিক জীবনের গভীর অসুখী পরিবেশের টানাপোড়েনে দিনের শেষে মানুষগুলি হয়ে পড়েন ক্লান্ত। গভীর একাকীত্ব, ক্লান্তি, গ্লানিবোধ, বিরক্তি, মানসিক দোলাচলের জন্ম দেয়। শুধু কর্মরতা সুন্দরী মহিলাই নন, প্রয়োজনে তাঁরা বড় কোনও লাভজনক ব্যবসার স্বার্থে তাঁদের স্ত্রীকে ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেন না। প্রতিদিনের ঘটনাপ্রবাহে মনের মধ্যে জমতে থাকা ক্লেদ গভীর একাকীত্বের দিকে ঠেলে দেয়। বাহ্যিকভাবে অবশ্য বজায় থাকে সাহেবী আবরণ। পোশাক-আচার আচরণের জৌলুসের নীচে, খুব ভিতরে ভিতরে, তাঁরা রাতের অন্ধকারে যখন ফিরে দেখেন তাঁদের অতীতের দিকে, তখন দেখা যায় বহুপথ পেরিয়ে এসেছেন। নিজের 'আমি'টিকে তখন আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর রামতনু অথবা প্রদীপ্ত; নিজেদের পেশাকে 'বেশ্যাবৃত্তি' মনে করে ঘৃণা বোধ হয় তাঁদের। এমনকি কখন কখন এও মনে হয় যে 'বেশ্যাবৃত্তি'তেও ছুটি মেলে একসময়ের পরে। কিন্তু, এই পেশায় সেই মুক্তিটুকুও নেই। বিজ্ঞাপনের জগৎ এমনই এক পৃথিবী, যেখানে অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হতে গেলে বহু ক্ষেত্রেই বিসর্জন দিতে হয় আত্মসম্মান।

যারা এই পেশার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত নন, তাঁরা কেমনভাবে বিজ্ঞাপন জগৎ-কে দেখছেন তারও উল্লেখ আছে উপন্যাসে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিও যে সত্য নয়, তা সহজেই অনুমেয়। রামতনু সোমের পুত্রবধূ নিভা'র বাপের বাড়িতে একদিন আমন্ত্রিত হয়ে গেলে, নিভার বাবার সঙ্গে আলাপচারিতায় কয়েকটি প্রসঙ্গ উঠে আসে। নিভার বাবা সেই গতানুগতিক ধারণায় আবদ্ধ মানুষ, তিনি মনে করেন চাকরি করতে গেলে সরকারি চাকরিই শ্রেষ্ঠ। তিনি সরকারি চাকরি আর জনহিত, দুটিকে একই বিষয় বলে ভাবেন। কিন্তু অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হয় তখন, যখন সেই ভদ্রলোক বিজ্ঞাপনকে নৈতিকতার সঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্ন তোলেন। কথোপকথন হয় এরকম-

> ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশে-যেখানে অধিকাংশ লোকেরই জীবনধারণ হাতেমুখে; শতকরা প্রায় নব্বুইজন লোকের অসুখে নিত্য চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, সেখানে বিজ্ঞাপন করে জনসাধারণকে বিলাসিতায় প্রলুব্ধ করা এক রকমের নৈতিক অপরাধ নয় কি! 'ইট্স্ বাই অ্যাণ্ড লার্জ এ ক্যাপিটালিস্ট ফেনোমেনান', আমাদের উচিত ন্যূনতম প্রয়োজনগুলির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি ফেরানো, ইত্যাদি। রামতনুর কাছে এটা একেবারেই যুক্তিহীন বলে মনে

হয়। অনুন্নত দেশে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কিছু কাল আগে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি, ইচ্ছে হলো সেই তত্ত্বগুলিকেই আবার টেনে আনেন এখানে। প্রলুব্ধ? হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন তা করে, কিন্তু, তা কি আরো সমৃদ্ধ জীবনযাপনের প্রতি মানুষকে সচেতন করে তোলে না! আকর্ষণ কি শুধুই হতাশার সৃষ্টি করে, নাকি উন্নততর জীবনযাপনের জন্যে মানুষকে আরো পরিশ্রমমুখী ও উপার্জনক্ষম করে তোলার ব্যাপারেও তার, বিজ্ঞাপনের, কোনো ভূমিকা আছে! সবই বলতে পারতেন, তবু এসব তত্ত্ব-আলোচনায় গেলেন না রামতনু।[৬৪]

সম্পর্কের টানাপোড়েনে পরাস্ত হতে হতে বিনিদ্র রাত্রিযাপনের গল্প লেখা থাকে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে আমরা মূলত পেয়েছি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিজ্ঞাপন জগতের বিবিধ পরিস্থিতিকে দেখবার ছবি। তাঁদের আত্মকথন দেখিয়েছেন লেখক। সন্তোষকুমার দে'র *বিউটি ট্রিট্* উপন্যাসটিতে, একজন শিক্ষিত, সুন্দরী, বুদ্ধিদীপ্ত নারীকে আমরা পাই কাহিনির কেন্দ্রে। তাঁর নাম বনলতা সেন। বনলতা যে বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ, সে কথাও কাহিনি এগোবার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়।

কাহিনির সূত্রপাতে বিজ্ঞাপন জগতের একটি সামগ্রিক ছবি উপন্যাসে বর্ণিত হয়। কেমন তাদের আদবকায়দা, কী তাদের পরস্পরকে সম্বোধনের পদ্ধতি সবই বলা হয়। আর জানা যায় বিজ্ঞাপনের কপি লেখার কিছু কৌশলের কথা। কোনও একটি পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, সেই দ্রব্যের গুণাগুণ বর্ণনার সময়ে কপির মধ্যে যদি সুচারুভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কিছু শব্দ, যেগুলি শুনতে বেশ ভারি তাহলে তা ক্রেতাকে আকর্ষণ করতে পারে। ধরা যাক, একটি প্রসাধনী সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে যদি দ্রব্যটি নির্মাণে ব্যবহৃত পদার্থের মধ্যে কিছু তথাকথিত অজানা এবং জটিল উপাদানের নাম ঢুকিয়ে বলা হয় এই ক্ষতিকর উপাদান থেকে তাদের বিজ্ঞাপিত পণ্যটি মুক্ত অথবা অমুক অতীব স্বাস্থ্যকর উপাদান এই পণ্যে ভরপুর; তবে পাঠক বা ক্রেতা তার প্রতি আকৃষ্ট হবেই। কেউই আর তার সত্যতা যাচাই করে দেখবার চেষ্টা করবেন না। এই কৌশল আজকের বিজ্ঞাপনেও প্রযুক্ত হয়, অথবা বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। *বিউটি ট্রিট্* উপন্যাসে বিজ্ঞাপন নির্মাণকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মীদের মধ্যেকার কথোপকথনেও এই বিষয়টি ধরা পড়ে। যে ক্লায়েন্ট বিজ্ঞাপন নির্মাণের বরাত দিচ্ছেন সংস্থাগুলিকে, তাঁদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই তৈরি করতে হবে বিজ্ঞাপন, এ হল বিজ্ঞাপন নির্মাণের প্রথম শর্ত। একজন 'সাকসেস্ ফুল অ্যাড্‌ম্যান্' হতে গেলে ক্লায়েন্ট-এর সমস্যা বা প্রয়োজনের কথা জাগরণে তো বটেই, স্বপনে-শয়নেও খেয়াল রাখতে হবে। উপন্যাসের কিছু চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথন এখানে উদ্ধৃত করা যাক-

কপি লেআউট শুধু নয়, ক্লায়েনটের প্রবলেম সম্বন্ধে দিনরাত চোখ কান খুলে চলতে হবে। শয়নে স্বপনেও সে বিষয় চিন্তা করতে হবে।– তবেই সাকসেস্‌ফুল অ্যাড্‌ম্যান্‌ হতে পারা যাবে।

ফরচুনেটলি আওয়ারস ইজ দ্য মোষ্ট ব্রিলিয়ান্ট টিম অব একসিকিউটিভস ইন ক্যালকাটা, ইফ নট ইন ইনডিয়া। আমরা যে কেশ তৈলের ক্যাম্পেনটি তৈরী করেছি, আমার মনে হয়- ইট গিভস এ ভেরি ইমপ্রেসিভ শো, নট ওনলি টু দি ক্লায়েন্ট্‌, বাট অলসো টু দেয়ার প্রোডাক্ট্‌ অ্যাজ ওয়েল।

তবু কাল রাতে শুয়ে শুয়ে একটা ব্রেন ওয়েভ এসে গেল। কপিতে একটা লাইন অ্যাড করলে কেমন হয়-তোমরা বিবেচনা করে দেখতে পারো।

বলুন বলুন-বলে উঠল সবাই।

এই তেলের কি কি গুণ থাকবে তা আমরা বলেছি, অর্থাৎ এতে কি হয় তাই বলা হয়েছে, অল অ্যাফারমেশন। দু একটা নিগেশন দিলে কেমন হয়?

যেমন- মিস সেন উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেন।

যেমন ধরো যদি বলি, এই তৈল নাইট্রো-ট্রিলা-পেট্রোলয়েড প্রসেসে বিশুদ্ধ করা, তাই এতে কোনও ধাতব বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

মিস্টার গ্যাংলি (অর্থাৎ গাঙ্গুলীত অপভ্রংশ) পাইপ কামড়ে বললেন- অন্য কোনও কেশ তৈলে কি ধাতব বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে?

সান্যাল বললেন-না, তা থাকে না, আমাদের তেলেও নেউ।

মিস্টার গোয়েল বললেন-আর পিউরিফাইং প্রসেসটা কি?

ওটা একটা জাগলারি অব সাউন্ড, সিগনিফাইং নাথিং। তবে পাঠক ওতে ভোলে। মিস সেন, তুমি পরশুরামের 'চিকিৎসা সঙ্কট' পড়েছ? তাতে যেমন আছে, ডাক্তার বললে-যদি বলি তোমার মাথায় ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস হয়েছে, কি বুঝবে? রোগীদের মত অধিকাংশ পাঠকই ওসব হাই সাউনডিং ওয়ার্ড পড়লে খুশী হয়, তার অর্থ থাক বা না থাক।[৬৫]

অর্থাৎ, 'হাই সাউনডিং ওয়ার্ড' পড়লে পাঠক 'খুশী' হয়, নাই বা জানুক তার অর্থ। তবে এর জন্য বিজ্ঞাপনের নান্দনিক দিকটি ব্যহত হয়, এমন নয়। নান্দনিক সৌন্দর্য্য ও পাঠককে আকর্ষণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আগের দুটি উপন্যাসে দেখা যায় এই পেশায় নারীদের যতটা না ব্যবহার করা হয় তাদের বুদ্ধিমত্তার কারণে, তার চাইতে বেশি তাদের প্রয়োজনীয়তা এই পেশায় নান্দনিক। ক্লায়েন্টকে মোহিত করার হাতিয়ার হল সুন্দরী, স্মার্ট নারী। বনলতা সেন কিন্তু কেবলই দৃষ্টিনন্দন ভূমিকায় থাকেন না এখানে, বরঞ্চ দেখা যায় তিনি নারী-শরীরকে এইভাবে পণ্যায়ন করবার বিরোধী। বনলতা এক জায়গায় ভাবেন-

> বিজ্ঞাপনে যৌন আবেদনটা সবার ওপরে স্থান পায়। কিন্তু তা কি কেবল মেয়েদের নিয়ে? সমাজে ক্রেতা, দর্শক, পাঠক কি কেবল পুরুষ? মেয়েরা কি কিছুই নয়?
>
> মনে হল মিস সেনের- বিজ্ঞাপনে নারীর চিত্র এত পরিমাণে ব্যবহার করাও নিতান্ত অযৌক্তিক। কবে হয়ত দেখা যাবে, ব্লেড-এর বিজ্ঞাপনেও নারীর মুখ এঁকে বলা হচ্ছে, এই ব্লেডে কামালে রমণীসুলভ কমনীয় মুখকান্তির অধিকারী হবেন।[৬৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বনলতা যে আশঙ্কা মনে মনে করছেন, ব্লেডের বিজ্ঞাপনে নারীর মুখের ছবি ব্যবহার হতে পারে যে কোনও দিন; সেই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন এর আগেই হয়েছে। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পত্রিকায় 'পানামা ব্লেড' এর বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয় একটি 'মেয়ে জলদস্যু'র ছবি। 'বাংলা বিজ্ঞাপন ও মেয়েদের কথা' অধ্যায়টিতে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৮০ বঙ্গাব্দে। দুটি সময়ের নৈকট্য এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়।

বিজ্ঞাপনের সংস্থার উচ্চতম পদগুলি নারীদের দ্বারা অধিকৃত হলে হয়তো বিজ্ঞাপন দৃশ্যত কিছুটা অন্যরকম হতে পারতো। বনলতা'র নিজস্ব ভাবনায় সেই সম্ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞাপনের জগৎটিকে বেশ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে আলোচিত তিনটি উপন্যাস। তবে শেষপর্যন্ত কাহিনি পৌঁছেছে সামগ্রিক থেকে বিশেষের দিকে। একটি, দুটি মানুষের যন্ত্রণা, আনন্দ, মানসিক টানাপোড়েনের আখ্যান হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রায় ধারাবাহিকভাবে তৈরি হয়েছে নানান রসসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ থেকে শিবরাম, প্রভাতকুমার থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র অথবা সুকুমার, সত্যজিৎ; বিখ্যাত লেখকরা বিজ্ঞাপনকে কখনও কেন্দ্রে রেখে, কখনও বা বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন বিবিধ গল্প, উপন্যাস, নাটক। তারই কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে এখনো পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

সাত-আটের দশক থেকে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায় বদল আসতে শুরু করে। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল শহরগুলির চরিত্র পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিজ্ঞাপনে বদল আসতে থাকে। এই সময় থেকেই কলকাতা শহর দৃশ্যত ও বদলে যেতে থাকে। কলকাতারই পার্শ্ববর্তী এলাকায়, যেখানে ছিল দরিদ্র মানুষের বাস, সেই জায়গাগুলি বেশি দামে বিক্রয় হতে থাকে। বড় রাস্তা তৈরি হয়, সেই রাস্তা দিয়ে দামি গাড়ির নিত্য যাতায়াত শুরু হয়। শহরের তথাকথিত সৌন্দর্যায়নের সূত্রপাতের দিনগুলিতে পরিচিত মহানগরীতে গভীর কিছু পরিবর্তন আসে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)-এর 'মহাপৃথিবী' গল্পটি জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকায় ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কলকাতারই কেষ্টপুর এলাকার ঝুপড়িতে সুবল ও তার পরিবারের গল্প এই 'মহাপৃথিবী'। অভাবের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য তো দূরের কথা, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্য নেই। রয়েছে ক্ষুধা, ক্রোধ, সন্তানদের উপর উগরে দেওয়া প্রহার, বে-আব্রু যৌনতা এবং স্বেচ্ছাচার। সুবলের বিনোদন বলতে কোনও কোনও সন্ধ্যায় চোলাই পান। এই পরিবারে সে, তার বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং অতি অনাকাঙ্ক্ষিত কয়েকটি সন্তান প্রতিনিয়তই কোনওমতে বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ চালাচ্ছে। এই যুদ্ধে নিজের আত্মজ-আত্মজাই যেন প্রতিপক্ষ। মা বগলার নির্বন্ধাতিশয্যে সে বসতবাটি বেচে না বটে, তবে প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করে, কবে জীবনাবসান হবে মায়ের। এই এলাকার জমির দর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ঘর-জমি বেচে কিছু লাভের অপেক্ষা তার। সুবল আর তার স্ত্রী'র সব অসুস্থ দুর্বল সন্তানদের মধ্যে সেজ মেয়ে কুসী অভাবের সংসারেও কিছুটা স্বাস্থ্যবতী। সদ্য ষোড়শী। বয়সের বৈশিষ্ট্যেই পেটে তার আগ্রাসী খিদে। বলা বাহুল্য ক্ষুধা মেটানোর ক্ষমতা বা মানসিকতা তার অভিভাবকের নেই।

এমনই গতানুগতিক শ্বাসরোধী জীবনে অকস্মাৎ দখিনা বাতাসের মতন ভেসে আসে যেন বাইরের পৃথিবীর ডাক। সুবলের হাতে তিরিশ টা কাঁচা টাকা আসে। অর্থের জোগান থাকলে সব সমস্যাকেই কিছুটা কম বলে মনে হয়। সুবলের সংকীর্ণ মন সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা যেন দিলদরিয়া হয়ে ওঠে। তবে কেবল তারই নয়, সমস্ত পরিবারের ধূসর, মলিন জীবন আলো ঝলমলে হয়ে আসে একটি বিশাল হোর্ডিং এর দৌলতে। বিমান কোম্পানির বিজ্ঞাপন। অবশ্য এ পরিবারের কেউই জানে না 'বিগ্ কাপন' বস্তুটি আসলে কী। তারা শুধু ছবি দেখে। দেখে মাদক নীল রঙের একটি ছবি। ডানদিকের কোণে একটি উড়ন্ত বিমান। বাঁদিকে যে শহরটি দেখা যাচ্ছে তা যেন

এই কাদা-মাটির নোংরা শহর নয়, যেন এক টুকরো স্বর্গ। নীচে হাত ধরাধরি করে ছুটে যাচ্ছে দুই যুবক-যুবতী, দুজনেই শ্বেতাঙ্গ। মেয়েটির শরীর ঈর্ষণীয় সুন্দর। ছবিটির মাঝে বড় বড় করে লেখা,

> FLY QUANTAS TO THE WORLD.[৬৭]

সুবলের বাড়ির গভীর সৌন্দর্য্যহীনতা ঢাকা পড়ে যায় এই বিজ্ঞাপনের ছবির সৌন্দর্য্যে। শুধু বাড়ির ছেলেমেয়েরা নয়, সুবলও কাজ ভুলে তাকিয়ে থাকে ছবিটির দিকে। সুবলের সন্তানদের মধ্যে একজন, হারাণ, সে কেবল স্কুলে যায়। পরিবারের একমাত্র অক্ষরপরিচয় হয়েছে তারই। সে এফ এল ওয়াই, ফ্লাই শব্দের অর্থ নির্ণয় করে মাছি। উড়োজাহাজ, দূর দেশের সফর আর একটা সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি অভাবের সংসারে 'মাছি'তে পরিণত হয়। ঘুরে-ফিরে আবর্জনাতে উড়ে বসা ছাড়া যার আর গত্যন্তর নেই।

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া যায় কুসীর এক প্রেমিকের, নাম টাবু। কিন্তু কয়েকটি লাইন পড়া এগোলেই, তাকে আর 'প্রেমিক' ভাবা সম্ভব হয় না পাঠকের পক্ষে। অর্ধাহারে জর্জরিত মেয়েটিকে তেলেভাজা খাদ্যের বিনিময়ে টাবু ব্যবহার করে। কিশোরী হলেও কুসী সবকিছু বোঝে না, সে খাদ্যের লোভে ব্যবহৃত হয়। বোঝা যায় এ ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন দিনের ঘটনা নয়, প্রায়ই হাইওয়ের নীচের রাস্তায় সকলের চোখের অলক্ষ্যে এ ঘটনা ঘটে। কিন্তু ছবি লাগানোর দিনটা সব দিনের থেকে আলাদা হয়ে যায়, বিজ্ঞাপন বা 'অ্যাডভার্টাইজ'-এর নিজস্ব আকর্ষণীয় ভাষায়। টাবুর শরীর কুসীর অর্ধ-পরিণত শরীরকে গ্রাস করতে থাকে। কিন্তু কুসীর সেদিকে খেয়াল থাকে না, যেন খাবারের দিকেও না। অন্যমনস্ক হয়ে সেই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে সে, যে পৃথিবীর স্বর্গীয় আস্বাদ পাওয়ার অধিকারী সে নয়, কিন্তু ঠিক সেই তারই চোখের সামনে জেগে থাকে এক অসহ্য হাতছানি। টাবু তাকে কোনওদিন ওই যুবকের মত হাত ধরে নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দেবে না। তার ভবিষ্যতে কেবল কুৎসিত দিনের ঈঙ্গিত। তবু রাতের অন্ধকারে রাস্তায় শুয়ে কুসী মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকে। তাদের এলাকাতে ঘোর অন্ধকার, তবু-

> এক-একটা গাড়ির আলো পড়ছে- আর আলোতে ছবিটা দেখার জন্য কুসী প্রত্যেকবার উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। টাবুর ব্যস্ত হাত তার শরীরের নানা জায়গায় ঘুরছে-সে আর বাধা দিচ্ছে না। টাবু তার মুখের কাছে মুখ আনতেই তড়বড়ানিতে দাঁতে লেগে ঠোঁট কেটে যায়। জিভ দিয়ে নোন্‌তা রক্ত চুষতে চুষতে কুসী বলে, টাবুদা, ঐ ছেলেটা-মেয়েটা ছুটছে কেন?
>
> -এরোপ্লেনে উঠবে ব'লে। তুই একটু পাশ ফের্‌, এই, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

-এরোপ্লেনে উঠে ওরা বুঝি ঐ বাড়িগুলো যেখানে-সেখানে যাবে?

-হ্যাঁ। উম্-ম্-ম্-

-ঐ জায়গাটা কোথায়?

-কে জানে? লন্ডন হবে বোধহয়-মানে বিলেত।

-ও-ছবিটা আমাদের বাড়িতে টাঙালো কেন?

-চুপ্ কর না, উঃ, তোকে কত ভালোবাসি আমি মাইরি, সত্যি, উম্-ম্, সোনা সোনা, কাল তোকে মাংসের কাটলেট খাওয়াবো।

-ওদের দু'জনের মুখ দুটো কি সুন্দর, না? বলো? শরীরময় অনির্বচনীয় পুলক নিয়েও কুসী বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারে হঠাৎ-হঠাৎ ঝলসে-ওঠা সেই ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে।[৬৮]

কেবলমাত্র শারীরিক ঘনিষ্ঠতাই কুসীর দেহময় পুলকের উৎস না, পাঠক সে কথা বুঝতে পারেন। এক নিতান্ত অপ্রাপণীয় জীবন তাকে এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে অসহায়ভাবে পুলকিত করে যায়।

বিজ্ঞাপন পণ্যমোহ তৈরি করে। জিনিসটি আদৌ প্রয়োজন, নাকি প্রয়োজনীয় নয়, সে কথা ভুলেই আগুনের টানে ছুটে যাওয়া উদ্‌ভ্রান্ত পোকার মতই ঝাঁপ দিতে হয় সেই প্রহেলিকায়। তার পরবর্তী অংশ নিতান্ত করুণ। সময়বিশেষে হতাশাজনক, বীভৎস।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে *পরিকথা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১-)-র গল্প 'যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল'।

আমাদের সমাজ মানুষের, বিশেষত মেয়েদের 'মোহময়ী' হয়ে ওঠার কিছু নির্দিষ্ট মাপকাঠি তৈরি করে রাখে। সেই মাপকাঠির এদিক-ওদিক সে মোটেই বরদাস্ত করে না। তার ফলস্বরূপ মেয়েটিকে শুনতে হয় টিটকিরি, ব্যঙ্গ, নানান অপমানজনক বাক্য। এই কাহিনির মেয়েটিও তাদের মধ্যেই একজন। নাম সোনালি গড়াই। বয়স কুড়ি। কলেজে পড়ে, টিউশন পড়ায় বাচ্চাদের। বাড়িতে সৎ মা মেয়েটির তুচ্ছতম সখের দিকেও লক্ষ্য রাখেন না। কিন্তু পাড়ার ছেলেদের দৃষ্টি এড়ায় না, তারা ওকে 'নিমাই' বলে ডাকে। এই শব্দটির মধ্যে গভীর কুৎসিত ব্যঞ্জনা লুকিয়ে থাকে। ওকে শুনিয়ে ছেলেরা 'ম্যানচেস্টার' শব্দের অশ্লীল ব্যাসবাক্য করে, যে নারীর 'চেস্ট'

‘ম্যান’-এর মতো, সেই কিনা এই তকমায় ভূষিত হতে পারে। সোনালীর মন কেবল অপমানিতই নয়, বেদনার্তও হয়ে ওঠে। কারণ-

> কলেজের দু-একটি মেয়ে মেয়েদের পত্রিকা রাখে। ওগুলোতে মাঝে মাঝে মোহময়ী হয়ে ওঠার কথা পড়েছে সোনালি। ‘পুরুষের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠুন’ পড়েছে। পুরুষের চোখে নারীদেহ নামে একটা লেখায় যতসব মান্যগণ্য বিখ্যাত মানুষেরা তাদের মনের কথা বলে দিয়েছে। কিছুদিন পরে আর একটা সংখ্যা বেরোয়, স্তন সংখ্যা। সোনালি কিনে নেয়।
>
> সোনালি টিউশনি করে। ক্লাস ফোরের দুটো মেয়ে। ওদের অঙ্ক করতে দিয়ে বইটা খোলে। লুকিয়ে লুকিয়ে একটু একটু পড়ে। কান লাল হয়, তেষ্টা পায়। চোখে পড়ে খাজুরাহোর পাথরমূর্তির ছবির তলায় লেখা স্তনই নারীর সম্পদ। তারপর একটা বিজ্ঞাপন। স্তন সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গ্লান্ডিনার।[৬৯]

এর আগে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েছে সোনালি। তাতে ফল হয়নি। অতঃপর কেউ কেউ জ্ঞান দিয়ে গেছে, বিয়ে করলে এই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু সমাজের নিরিখে সে আদৌ ‘বিবাহযোগ্য’ নয়; তার বিবাহ কল্পনা বিলাসিতামাত্র। শেষপর্যন্ত বিজ্ঞাপনের প্রতি আস্থা রেখে স্মরণাপন্ন হতে হয় ‘গ্লান্ডিনার’-এর। নিজেকেই নিজের সামান্য টিউশনির পয়সা বাঁচিয়ে কিনে নিতে হয় ‘মোহময়ী’ হওয়ার চাবিকাঠিটিকে। ওষুধের দোকানের অনাথ ছেলে কাশীনাথকে হয়তো সে ভালোবেসে ফেলে, হয়তো ছেলেটিও সোনালিকে। কিন্তু কিছু কথা আমৃত্যু অনুক্ত থেকে যায়। মোহময়ী তৈরি করার টোপ ফেলে ওষুধের দোকানের মালিক আত্মসাৎ করে মেয়েটিকে। পরের গল্পটি আর তেমন অচেনা থাকে না পাঠকের কাছে। হাতুড়ে ডাক্তারকে দিয়ে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির গর্ভপাত করতে গিয়ে প্রবল রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় মেয়েটির। কেউ এই মৃত্যুর দায় নিতে রাজি হয় না। দায়ী হয়ে থাকে মেয়েটির মোহময়ী হতে চাওয়ার উচ্চাশা।

> গণপতি মন্ডল মেয়েটির নাড়িতে আঙুল রাখে। চোখ বোঁজে। মেয়েটার জড়ানো কথা শোনা যায়, আমাকে বাঁচান, আর কখনও চাইব না। একটা মাছি গরিব স্তনবৃন্তের উপরে চুপচাপ বসে যায়, গণপতি মন্ডল বলে-এখন এই অবস্থায় হাসপাতালে যাওয়া যায় না। সবার হাতকড়া পড়বে।[৭০]

ঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা হলে হয়তো মেয়েটিকে বাঁচানো যেত, জরায়ুতে ছিদ্র হয়ে এমন বীভৎস মৃত্যু হত না তার। কিন্তু সেই ‘গরিব’ স্তনের অধিকারিণী মেয়েটির সেই সৌভাগ্য হয় না। তার কোনওদিন না হতে পারা প্রেমিক কাশীনাথকে তার সমগ্র দেহ খন্ড খন্ড করে বাক্সে ভরে জলে ফেলে আসার নির্দেশ দেয় তার মালিক।

সারাজীবন বাধ্য কৃতদাসের মত সব আদেশ পালন করলেও শেষমুহূর্তে সে থানায় পৌঁছোয় সেই মোহময়ী হতে চাওয়া মেয়েটির দেহখন্ড গুলি নিয়ে।

> পরদিন খবরের কাগজে বেরুল অস্বাভাবিক যৌন মানসিকতার শিকার হল একটি তরুণী। মানবদরদী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলি বলল অপরাধীর শাস্তি চাই। আর রমনীয় পত্রিকাটি বিজ্ঞাপনে জানাল পরবর্তী সংখ্যার কভার স্টোরি-'অস্বাভাবিক যৌন মনোস্তত্ত্ব।'[৭১]

ওষুধের দোকানের মালিকের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারবে না, সারাজীবন মালিকের সন্তানের 'বাবা' ডাক যাতে শুনতে না হয়, তাই অন্তঃসত্ত্বা সোনালিকে বিবাহের আদেশ এলে সে নাকচ করে দেয়। সেই অপরাধবোধবশত থানায় যায় রামনাথ, আত্মসমর্পণ করে। তবে তাতে মেয়েটির কোনও লাভ হয় না। তার গরিব শরীরকে মোহময় করে তুলতে একটা গোটা জীবন ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

নারীর স্তন থেকে যৌনতা, এই বিশেষ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সবকিছুই বিক্রয়যোগ্য। অতএব, মাসিক পত্রিকা গুলিও লক্ষ্য রাখে কী ধরনের লেখা বেশি ছাপা হলে তা পাঠক বেশি 'খাবে'। বিজ্ঞাপনের বিসদৃশ দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই গল্পে।

সুবিমল মিশ্র (১৯৪৩-)'র গল্প 'আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর কোল্ড ক্রিম তখন আপনার ত্বকের গভীরে কাজ করে' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের অগাস্ট মাসে। পরবর্তীকালে গল্পটি সুবিমল মিশ্র'র *শ্রেষ্ঠ গল্প* সংকলনে প্রকাশিত হয়। গল্পের নামই বিষয়বস্তুকে বুঝতে সাহায্য করে। প্রায় বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত একটি কপির মত নামটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলিও মূলত জনপ্রিয়তা পেয়েছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই। 'চামড়া' পরিবর্তে আমরা বলতে শুরু করেছি 'ত্বক'। দেড় পাতার গল্পটিতে একটিই বাক্য। 'ধেই ধেই নাচুন' এই শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে একাধিকবার। বিজ্ঞাপন এবং পণ্য সংস্কৃতি মানুষকে নাচিয়ে চলেছে নিয়তই। মানুষ সেখানে নাকে দড়ি বাঁধা ক্রীড়নক মাত্র। গোটা গল্পটাই কয়েকটি বিজ্ঞাপনের ট্যাগ লাইন জুড়ে তৈরি হয়। কোথাও কোথাও ঢুকে পড়ে "ও আমার দেশের মাটি" অথবা "কৃষকের জীবনের শরিক যে জন" ইত্যাদি মহৎ কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কিছু শব্দ। এবং চারিপাশে প্রতিনিয়ত প্রবহমান বিজ্ঞাপন মালার বাণী-সমৃদ্ধ ঢক্কানিনাদে যেভাবে দিশাহারা হয়ে পড়েন ক্রেতা, যতিচিহ্নহীন শব্দের প্রবাহে ঠিক তেমনই হয় এই গল্পের পাঠকদের অবস্থা। তারই একটি ছোট অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।

ও-আমার দেশের মাটি তোমায় সোনায় মুইড়্যা দিমু চালিয়ে যান বহুৎ আচ্ছা চালিয়ে যান ধনে-ধান্যে পুষ্পেভরা চালিয়ে যান বহুৎ আচ্ছা চালিয়ে যান সারিয়ে নিন দাদ-এগজিমা সারিয়ে নিন খুঁত-খুঁতানি সারিয়ে নিন রোগবীজাণু সারিয়ে নিন ফুলের সুরভি শ্বাসে-প্রশ্বাসে মধুর পুলক ভেসে ভেসে আসে নাচুন নাচুন ধেই ধেই নাচুন আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর কোল্ড ক্রিম তখন আপনার ত্বকের গভীরে কাজ করে[৭২]

বিজ্ঞাপনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে একটা অতিকথন এবং অনৃতকথনের সম্ভাবনা যে থেকে যায়, সেই দিকটাকে মাথায় রেখে অনেক রস-রচনা লেখা হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত গল্পগুলিতেও তার নানান চিহ্ন আমরা দেখতে পেয়েছি। ফলে এই বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে খানিক ব্যঙ্গ, টিপ্পনী, অল্পবিস্তর কৌতুক; এগুলি স্বভাবতই বিজ্ঞাপন কেন্দ্রিক সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

১৩৩১ বঙ্গাব্দে সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকা *শনিবারের চিঠি*-তে ‘বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য’ নামের একটি ছোট লেখা প্রকাশিত হয়। ঠিক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের আওতায় যে একে ফেলা যায় না, তা লেখকের নাম থেকেই অনুমান করা যায়। নাম তাঁর মৌলা দোপেঁয়াজি। এই ছদ্মনামের আড়ালে লেখকের আসল নাম হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। লেখাটি প্রকাশিত হয় আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে। কিন্তু বিজ্ঞাপন বিষয়টির রমরমা যে সেই সময়েও যথেষ্ট ছিল, সে কথা লেখক জানাচ্ছেন। এবং এও জানাচ্ছেন যে বিজ্ঞাপনের অগ্রগতির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞাপনী সাহিত্য। এই বিজ্ঞাপনী সাহিত্য পাঠকদের কেবল প্রলুব্ধ নয়, মুগ্ধ করারও ক্ষমতা রাখে, এ কথাও বলেন তিনি। তাঁর আলোচনার মধ্যে আরেকটি বাক্য প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়-

বিলাতী বিজ্ঞাপন বহরে এবং রঙচঙে বড় কিন্তু আমাদের দেশী বিজ্ঞাপনের মতো মনোহরণ ও চমকপ্রদ হয় না। বিলাতী কাগজের বিজ্ঞাপন, সাধারণত লোকে বিজ্ঞাপন ছাড়া কাগজের অন্যান্য লেখা পড়িয়া , পড়ে, কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনের ভাষা এমনই চমকদার যে বিজ্ঞাপনই সম্পূর্ণভাবে পাঠকের মনোহরণ করে। অন্য লেখা পড়িতে মন যেন আর চায় না।[৭৩]

বিজ্ঞাপন মাধ্যমটি পাঠকের চিত্তজয়ে সফল হয় তার চমৎকার, বুদ্ধিদীপ্ত কপির গুণে; সে কথাই বলছেন। বাংলার উৎসাহী পাঠক যে সংবাদপত্রে কেবল সংবাদেরই অন্বেষণ করেন, এ কথা অমূলক, ফলে আকর্ষণীয় হলে তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা এ দেশের পাঠকের নেই।

ছোট এই প্রবন্ধটিতে লেখক বেশ কয়েকটি চমৎকার তৎকালীন বিজ্ঞাপনের উদাহরণ দিয়েছেন। বিজ্ঞাপন গুলির মধ্যে মশকরা করার উপাদান যে স্পষ্ট, তা পড়ে বোঝা যায়। একটি উদ্ধৃত করা যাক।

যাহারা বিজ্ঞাপন দেয়, তাহারা লোক ঠকায়। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু আমাদের ঔষধালয়ের দামোদর বটিকা সেবনে বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, এসিয়া, ইয়োরোপ, এক কথায় সমগ্র পৃথিবীর লোক শত শত ব্যাধি হইতে ত্রাণ পাইয়াছে। পায়ের হাজা হইতে আরম্ভ করিয়া কালাজ্বর, প্লীহা, যকৃত, যক্ষ্মা, নালি ঘা, কুষ্ঠ, চুল ওঠা, কার্যে অনিচ্ছা, পেট বেদনা, মাথাধরা, এমন কি দাদ, চুলকানি, হেঁটোয় বাত, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি সব রকম ব্যাধিই আরোগ্য হয়। আমরা বিজ্ঞাপনের ভড়ং দেখাইতে চাই না, আত্মপ্রশংসাও চাহি না, তাহা হইলে এতদিনে ঘরে ঘরে আমাদের নাম উচ্চারিত হইত। কেবলমাত্র নিজেদের সম্বন্ধে নিখুঁত সত্যটুকু বলিতে চাই। ১৩ ঘন্টা সেবনে ফল পাইবেন। কোন রোগ না থাকিলেও খাইতে পারেন, রোগ হইতে বেশীক্ষণ লাগে না। এক ঝটিকার মূল্য মাত্র নয় পয়সা। ভজহরি ভৈষজ্যালয়। নয়নতলা।[৭৪]

এই বিজ্ঞাপনের কপিতে যেমন একদিকে থাকে বিজ্ঞাপনের ভড়ং-এ না ভোলবার সতর্কবার্তা, অপরদিকে সেই সতর্কবার্তার মোড়কে, হাস্যরসের মিশ্রণে এক চমৎকার কৌশলে নিজস্ব পণ্যটিরও যথাযথ বিজ্ঞাপন সম্পন্ন হয়।

১৯৬৫ সালে সুনন্দ ওরফে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)-এর 'বিজ্ঞাপন-বিচিত্রা' শিরোনামে লিখিত লঘু-ধাঁচের ব্যঙ্গধর্মী প্রবন্ধটি লেখেন। উক্ত প্রবন্ধটি সহ আরও নানাবিধ এই ধাঁচের প্রবন্ধ পরবর্তী কালে *সুনন্দর জার্নাল* গ্রন্থে সংকলিত হয়। গ্রন্থটির অন্তর্গত প্রতিটি প্রবন্ধই *দেশ* পত্রিকায় ১৯৬৫ সাল থেকে তাঁর মৃত্যুকাল, ১৯৭০ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধের একেবারে শুরুর বাক্যেই সুনন্দ ঘোষণা করেন, প্রেমে এবং রাজনীতিতে যেমন মিথ্যা ভাষণে অপরাধ নেই, এবং তা যেমন সর্বজনবিদিত, চিরকালীন সত্য; ঠিক তেমনই, এই দুইটি বিষয়ের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হতে পারে তৃতীয় একটি নাম। সেটি হল বিজ্ঞাপন। এই যুগ যতটা না বিজ্ঞানের, তার চাইতে বেশি বিজ্ঞাপনের। বিজ্ঞাপনের কাছে বিজ্ঞান পরাস্তও হচ্ছে। তা যদি না হত, তাহলে মানুষ টাকের অব্যর্থ মহৌষধে অথবা প্রতি সপ্তাহে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হওয়ার বিজ্ঞাপনে এমন আবেগতাড়িত হয়ে পড়তো না। এরকম অজস্র হাস্যকর রকম আজগুবি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করে সুনন্দ বলেন।

আলোয়, ব্যানারে, হেডিং-এ, পোস্টারে, সিনেমার স্লাইডে ছোট ছোট ফিল্মে পুরস্কারে, প্রতিযোগিতায়, বারো ফুট রেডিয়াসের ছাতা মাথায় দিয়ে আট ফুট লম্বা লোকের নগর পরিক্রমায়- এই বিজ্ঞাপনেরই বিশ্বরূপ। বিজ্ঞাপন অসাধ্য সাধন করিতে পারে, ঝোলা গুড়ের সঙ্গে তেঁতুল গোলা মিশিয়ে 'সুধাধারা' বলে চালিয়ে দিতে পারে,

‘চুইংগামের’ রবার চিবুনোর বিশুদ্ধ অনাবশ্যকতাকে প্রতিটি অ্যাথলিটের পক্ষে আবশ্যিক বলে প্রমাণ করতে পারে। আসল কথা হল, দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। বিজ্ঞাপনীয় প্রচার যদি নিরুত্তাপ হয়, তাহলে বিজ্ঞাপনীয় বস্তুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাকে হয় থ্রীলিং নয় শকিং হতে হবে- তৃতীয় পন্থা নৈব নৈব চ। আর থ্রীলিং হওয়া তো গত যুগের ব্যাপার। শকিং হওয়াটাই একালের চরিত্ররীতি- জনৈক বিদেশী ‘বিট’ কবি প্রমুখাৎ এই রকম বাণী যেন শোনা গিয়েছিল।[৭৫]

বিজ্ঞাপনের সার্থকতার অন্যতম চাকিকাঠি যে আসলে ‘শকিং’ বিকৃত ভাষার প্রয়োগ, সে কথাও বলছেন তিনি। সমগ্র প্রবন্ধ জুড়েই সমকালীন বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের ভয়াবহ ভাষা সমস্যার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। পরিশেষে এই সিদ্ধান্তেই সুনন্দ উপনীত হন, বাংলা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, যে বিজ্ঞাপন যত ত্রুটিপূর্ণ, তা বর্তমানকালে ততই জনপ্রিয়, বহুল-প্রচারিত এবং সফল। সমস্ত লেখার মধ্যে শ্লেষের সুরটিই প্রধান হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞাপনের ভাষা নিয়ে প্রায় সমধর্মী মতামত *অচলপত্র* তেও পাওয়া যায়।

দিলীপকুমার গুপ্ত’র প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে এই অধ্যায়ের অন্য একটি অংশে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে, তথাপি আরেকবার তাঁর একটি প্রবন্ধের কথা এখানে অবশ্য-উল্লেখ্য।

সুনন্দ’র ‘বিজ্ঞাপন বিচিত্রা’-য় বিজ্ঞাপনের প্রতি প্রাবন্ধিকের কটাক্ষর ভঙ্গি, দিলীপকুমার গুপ্ত’র ‘বিজ্ঞাপন : শাস্ত্র ও শিল্প’ নামের ছোট্ট প্রবন্ধটিতে একেবারেই বদলে যায়। ডি.কে বিজ্ঞাপনকে একেবারেই সমালোচনা বা শ্লেষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেননি। বরং মানুষের মধ্যে কোনও পণ্যের চাহিদা তৈরিতে যার গুরুত্ব সর্বাধিক, সেই বিজ্ঞাপনের ভূমিকা সাবলীল, সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

সুনন্দ’র জার্নালে একবার চুইংগাম প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন প্রাবন্ধিক। ঘটনাচক্রে এখানে ডি.কে তাঁর কথা শুরুই করেন অতি উৎকৃষ্ট চুইংগাম নির্মানকারী সংস্থা জেমস রিগ্‌লি’র প্রসঙ্গ দিয়ে। এই Wrigley Company হল আমেরিকার একটি বিখ্যাত বহুজাতিক চুইংগাম কোম্পানি (Wrigley’s gum)। সেই কোম্পানির জেমস রিগ্‌লিকে যখন জিজ্ঞেস করা হত হাত বাড়ালেই যে চুইংগামের সরবরাহের বিরাম নেই এবং যার বিক্রিও প্রচুর, তার জন্য এতো বিজ্ঞাপনের কী দরকার আর; তখন রিগ্‌লি সবিনয় উত্তর দিতেন যে কোনও ব্যবসাকে সচল রাখতে বিজ্ঞাপনই একমাত্র জ্বালানি। তাই তাঁর সুচিন্তিত বিজ্ঞাপনগুলির প্রয়োজন আছে ঠিক ততটাই, যতটা গাড়ি চলতে ইঞ্জিনের প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন ব্যবসাকে চালু রাখে, পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বজায় রাখে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে পণ্য-দ্রব্যের চাহিদাকে বজায় রাখাই বিজ্ঞাপনের কাজ। একটি পণ্য যখন বাজারে আসছে, তখন সেই দ্রব্যের প্রচারের পিছনে অনেক পরিশ্রম এবং বহু ধাপ থাকে, তারপর এসে পৌঁছোয় ক্রেতার হাতে। প্রচার ক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চালু না রাখলে চাহিদা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অতএব বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধা থাকে না। ভালো বিজ্ঞাপন ক্রেতার মস্তিষ্কে এই ক্রমান্বয়ে জানান দেওয়ার কাজটি চালিয়ে যায়।

এর পরে ডি.কে ভালো বিজ্ঞাপনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর সহজ অথচ দৃঢ় লিখনভঙ্গীতে জানিয়ে দেন।

> কাকে বলবো ভালো বিজ্ঞাপন? খুঁটিনাটিতে না গিয়ে সহজে বলবো, সেই বিজ্ঞাপন ভালো যা নিজেকে জাহির না ক'রে বিজ্ঞাপিত বস্তুটিকেই আমাদের মনে ধরিয়ে রাখে। চিত্রে, সজ্জায়, অক্ষরে, অলংকরণে-এমন বিজ্ঞাপন চাই না যে শুধু নিজের প্রশংসা কুড়োতেই ব্যস্ত। এমন বিজ্ঞাপন চাই যা বিজ্ঞাপিত বস্তুটিকেই বসিয়েছে তার সমস্ত উদ্যমের সিংহাসনে। এমন সরল নিপুণভাবে বলেছে তার কথা, যে-কথা বেশ কিছুদিন আমাদের মনে থাকবে।
>
> কেন মনে থাকবে? কারণ, জিনিশটি আমাদের কাজে লাগবে, আমরা জিনিশটির কাজ লাগবো ব'লে নয়। এই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার যে বিজ্ঞাপন লোকে দ্যাখে, পড়ে, বিশ্বাস করে, এবং তাড়াতাড়ি সাড়াও দেয়-যেহেতু জিনিশটি তাদের কাজে লাগবে, তারা বিজ্ঞাপনদাতার কাজে লাগবে ব'লে নয়। লোকে চায় না তাদের কোনো জিনিশ গছানো হোক, তারা চায় জিনিশটি তাদের কোনও অভাব পূরণ করুক। তারা চায় না উপদেশ শুনতে, তারা চায় খবর জানতে। তারা চায় না হুকুম তামিল করতে, তারা নিজেদের মন নিজেরাই ঠিক করতে চায়। জোর ক'রে টেনে আনা তারা অপছন্দ করে, তারা চায় আমন্ত্রিত হ'য়ে আসতে। বিজ্ঞাপনের এই আসল কথাটি পরিষ্কার বুঝলেই বিজ্ঞাপনের সফলতা অবশ্যম্ভাবী। বুঝতে হবে, যে-পণ্যদ্রব্য মানুষের কোনো অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে না, হাজার বিজ্ঞাপনেও সে-পণ্যদ্রব্য চলবে না। বিজ্ঞাপনের ক্ষমতা কতোখানি বুঝতে হ'লে বুঝতে হবে যে বিজ্ঞাপন একটি পরিণতি ঘটানোর পন্থা মাত্র, কোনও বাস্তব অস্তিত্বের কারণ নয়।[৭৬]

এই কয়েকটি বাক্যে ডি.কে তুলে ধরেছেন বিজ্ঞাপনের একেবারে প্রাণের কথাটি।

বাঙালি বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সম্পাদকদের অনেকের মধ্যেই সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞাপন বিষয়টির প্রতিই এক ধরনের বিরূপতা চোখে পড়েছে। আগে এবং পরে তার উল্লেখ পাওয়াও যাবে। তাঁদের লেখায় শ্লেষের ভাবটিই পাঠকের চোখে পড়েছে। কখনও ছদ্ম হাস্য, কৌতূকের আড়ালে মূল কথাটি ধরতে খানিক অসুবিধাও হয়েছে। উদাহরণে উদাহরণে দীর্ণ হয়ে কখনো যেন মূল বক্তব্যটি হারিয়েও গেছে।

কিন্তু এ সবের পরেও লেখক থেকে পাঠক সকলেই জানেন বিজ্ঞাপন জিনিসটি আদৌ হেয় করার বিষয় নয়। তার মধ্যে সমালোচনার উপাদানের ঘাটতি নেই, অনেক সময়েই বিজ্ঞাপনের ভাষা অতীব অপকৃষ্ট মানের, তথাপি বিজ্ঞাপন মাধ্যমটিকে সর্বকালে কখনোই ফেলে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (সুনন্দ) সমালোচনা করেছেন বিজ্ঞাপনের চটক, তার 'থ্রীলিং', 'শকিং' দিক নিয়ে। বলেছেন দর্শক পাঠক এই 'থ্রীল'-এর প্রত্যাশী।

ডি.কে'র মত ছিল এই মতের চাইতে ভিন্ন। তিনি সরাসরিভাবে এই জগতের মানুষ ছিলেন বলেই হয়তো তিনি বিজ্ঞাপন মাধ্যমটিকে গভীরভাবে আত্মীকরণ করেছিলেন। বুঝেছিলেন ক্রেতা ঠিক কী চান, ঠিক কোন পথে চললে জয় করা যাবে ক্রেতার মন, অথচ তাকে ঠকানো হবে না। ক্রেতা যে নির্বোধ নয়, এ কথা বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির মাথায় সর্বাগ্রে রাখা উচিত, তাও তিনি জানিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর মতো কিছু মানুষ এই বিষয়টিকে অতীব যত্নে বিবেচনা করেছিলেন, সেই ভাবনার প্রতিফলন এই ছোট প্রবন্ধটিতেও ধরা আছে।

বিজ্ঞাপনের ভালোমন্দ দুটি দিককেই রম্য গদ্যে তুলে ধরেছেন পরিমল রায় (১৯০৯-১৯৫১) তাঁর *ইদানীং* বইয়ের 'বিকিকিনি' নামক ছোট ফিচারধর্মী লেখাটিতে। পরিমল রায়ের লেখা ছড়াগুলিকে একত্রিত করে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)'র কন্যা দময়ন্তী বসু সিং এর তত্ত্বাবধানে বিকল্প প্রকাশনী থেকে বেরোয় *ছড়ার বই*। সেই বইয়ের শুরুতে দময়ন্তীর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা থেকে জানতে পারা যায় বুদ্ধদেব বসুর আবাল্য সুহৃদ ছিলেন পরিমল রায়। অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ার কারণে তাঁর লেখার পরিমাণ খুব বেশি নয়। বিশ্ববিদ্যালয় তিনি ধনবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। *ইদানীং* বইটির 'বিকল্প' সংস্করণের শুরুতে, ১৯৬০ সালে বুদ্ধদেব বসু'র লেখা একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু আত্মিক স্মৃতিচারণে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তরে পড়বার জন্য তিনি যে বিষয়ই বেছে নিন, সব বিষয়েই তাঁর চূড়ান্ত দক্ষতা এবং আগ্রহ ছিল। সব পেশাতেই তিনি হতে পারতেন সফল। ফলে ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও লেখক হিসাবে তিনি যে সার্থক হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'বিকিকিনি' লেখাটিতে তিনি মজার ভঙ্গিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেন।

পরিমল রায় লিখছেন-

> কিছুই বলা যায় না, হয়তো পুনরায় দোকানে ঢুকিয়া ফ্ল্যাট ফাইলের পরিবর্তে একখানি অভিধান লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

এরূপ হামেশাই ঘটিতেছে, এবং আমার মনে হয়, এই ধরনের দোকানীদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেনাকাটায় বাহির হইয়া প্রয়োজনগুলি প্রায়ই মনে থাকে না। ফলে তিন মাইল পথ দুইবার দৌড়াইতে হয়। ইঁহারা সেই পথশ্রান্তি দূর করেন বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। অনেকে কিন্তু বিরক্ত হন। সেটা ঠিক নহে। প্রথমটায় একটু বিরক্তি ঘটিবারই কথা। এক ঘটি জলের পরিবর্ত্তে তৃষ্ণার্ত্তের নিকট একটি বিল্বফল আনিয়া হাজির করিলে ক্রোধ অনিবার্য্য। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে বুঝিবেন, অভিধানখানি আনা হইয়াছে নিতান্তই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, সেই মুহূর্ত্তে আপনার রাগ পড়িয়া যাইবে। অবশ্য ফ্ল্যাট ফাইলের প্রশ্নটি নিষ্পত্তি হইয়া যাইবার পরই অভিধানের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা উচিত। কিন্তু দোকানীর দিক হইতে যদি বিষয়টি বিবেচনা করেন তাহা হইলে আর ও কথা বলিবেন না। “ফ্ল্যাট ফাইল নাই” বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তো আপনি চলিয়া যাইবেন, অভিধান সন্দর্শন কখন ঘটিবে? সুতরাং ঐ পথ অবলম্বন ব্যতীত দোকানীর গত্যন্তর নাই।[৭৭]

বিজ্ঞাপন যে শুধুমাত্র ক্রেতাদের প্রলুব্ধ ক’রে অকারণ প্রয়োজন সৃজন পূর্বক পথভ্রষ্ট করে, এটাই তার একমাত্র দিক নয়; বিজ্ঞাপন অনেক সময়েই ক্রেতার অন্যমনস্কতাকে সরিয়ে প্রয়োজনের বিষয়টি সম্পর্কেও তাকে সচেতন করে তোলে এবং সেক্ষেত্রে তার উপকারই করে, এমনটা বললেও অত্যুক্তি হবে না, এমনটাই মত প্রাবন্ধিকের।

লেখাটির শুরুতেই তিনি বলেন আজকাল পুস্তকের দোকানগুলিতে পুস্তক ব্যতীত আরো নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। সেইরকমই একখানি দোকানে গিয়ে একটি ‘ফ্ল্যাট ফাইল’ খোঁজ করলে তাঁরা অবধারিতভাবে নিয়ে আসেন একখানি ডিক্‌শনারি। এরপর অভিধান নিতে নানাভাবে প্ররোচিত করে শেষে জানান তাঁর দোকানে ফ্ল্যাট ফাইল নেই। দোকানের যেন কাজই হল এই, যে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে দ্রব্যের তেমন প্রয়োজন নেই, তারও এক ছদ্ম প্রয়োজনীয়তা তৈরি করা। ক্রেতার এক জিনিস কেনার অভিপ্রায়, অজস্র জিনিসের প্রদর্শন দেখে হয়তো ভ্রান্তি আসে, মনে হয় আরও নানান জিনিস তার প্রয়োজন। ফলস্বরূপ খরচ বাড়ে।

কিন্তু অন্যদিকে, কখনো বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কাজের হয়ে ওঠে, সে কথাও বলতে ভোলেন না পরিমল রায়। বিজ্ঞাপনের গোলমেলে দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের দিকও সুললিত গদ্যে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

ডি.কে’র মতই তিনিও বিজ্ঞাপনের প্রতি কেবলই শ্লেষ আর বিতৃষ্ণা নিক্ষেপ করেননি। বিষয়টির গুরুত্ব অনুসারে যোগ্য সমাদর করেছেন।

অচলপত্র-এ প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞাপন এরপরে দেখে নিতে হবে।

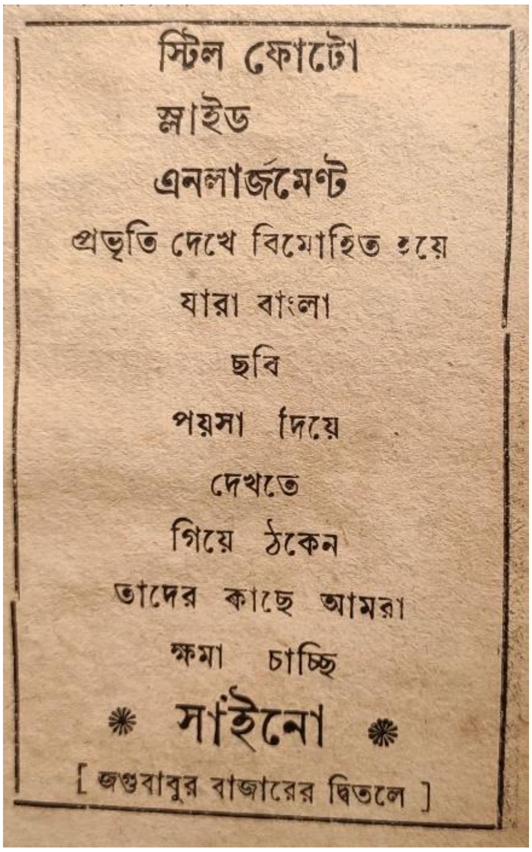

চিত্র ৬.৮ অচলপত্র, কার্ত্তিক, ১৩৬২

বিজ্ঞাপন দেখে আন্দাজ করা যায় 'সাইনো' হল স্টিল ছবির স্লাইড তৈরি, এনলার্জমেন্ট-এর দোকান। এও বোঝা যায়, এই সাইনো তৎকালীন বাংলা ছায়াছবির বড় বড় বিজ্ঞাপনী ছবি তৈরি করতো। এই বিজ্ঞাপনে রাখঢাক ছাড়াই বলা হয় বিজ্ঞাপনের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে, সুদৃশ্য ফোটো দেখে যারা পয়সা খরচ করে ছবি দেখতে গিয়ে ঠকছেন, তাঁদের কাছে এই সংস্থা ক্ষমাপ্রার্থী। বিজ্ঞাপনটি অভিনব এবং সাহসী নিঃসন্দেহে। অপরদিকে ছাপার অক্ষরে না লিখলেও, এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়, যা আকর্ষণীয়, সুন্দর বাহ্যিকভাবে; তা প্রকৃতই যে ভালো মানের হবে, এমন নাও হতে পারে। বিজ্ঞাপনের কাজই হল বিজ্ঞাপিত বিষয়টির প্রকৃত মান নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা না রেখে দর্শকের সামনে তাকে শ্রেষ্ঠ বলে উপস্থাপন করা।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি দীপেন্দ্রকুমার সান্যালের একটি বইয়ের। বইটির নাম *এলেবেলে*। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দীপেন্দ্রকুমারই ছিলেন *অচলপত্র*-র সম্পাদক। পূর্বের বিজ্ঞাপনটি যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সেই সংখ্যাতেই এই বিজ্ঞাপনটিও ছিল। মূল নামের উপরে ছোট করে লেখা থাকে, "গল্পের বাবা, উপন্যাসের ঠাকুরদা, লঘু-রচনার মিছিল"।[৭৮]

বিজ্ঞাপনের এই কৌতূকের ধরনটি নিঃসন্দেহে পাঠকপ্রিয় ছিল। এবং বইয়ের নামটির ক্যালিগ্রাফির নীচে লেখা থাকে এই বইটির প্রথমেই যে সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, তা হল পঞ্চম সংস্করণ। বলা হয় চতুর্থ, তৃতীয়, প্রথম সংস্করণ পরে বেরোবে।

অচলপত্র-এর এই কার্তিক, ১৩৬২ সংখ্যাতেই 'পথের পাঁচালী'র সমালোচনা' নামের ছোট একটি লেখা বেরোয়। সত্যজিৎ রায়কে বিদ্রুপ করে, কড়া ভাষায় কয়েকটি বাক্য প্রকাশিত হয়।

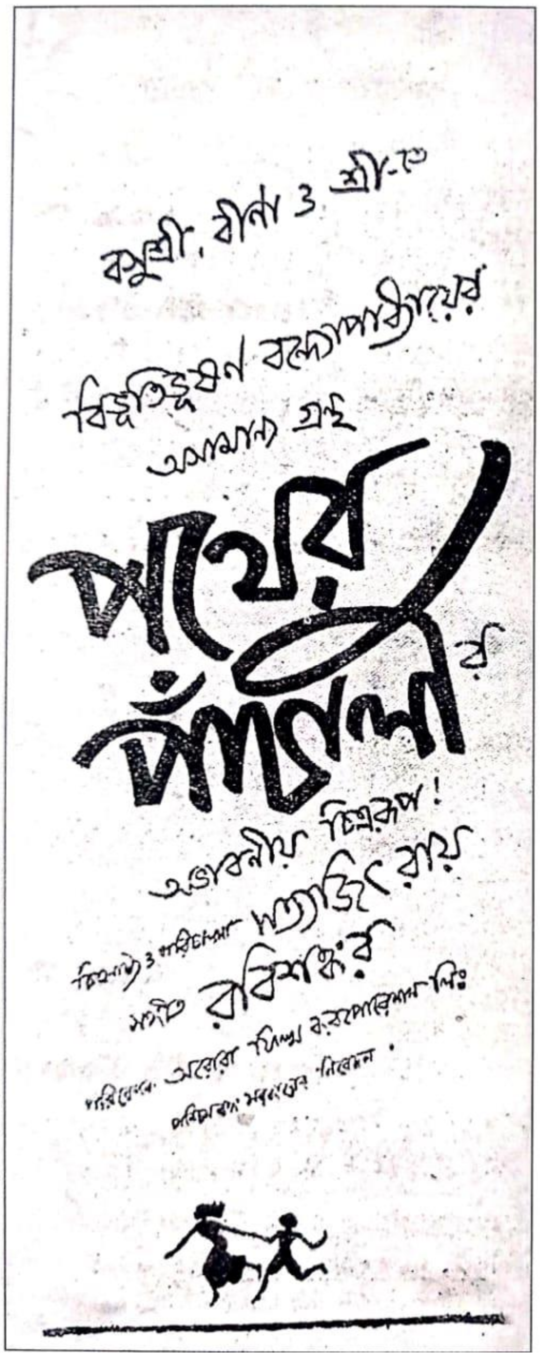

চিত্র ৬.৯ *Ray, Parimal (Edited), The Vision of Ray : Cineposters and Beyond, Pratikshan, 2005*

পথের পাঁচালী ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৫৫ সালে। আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে তারই কয়েক মাসের ব্যবধানে এই সমালোচনা লেখা হচ্ছে। তার বিষয়বস্তু মোটামুটিভাবে এইরকম, যে, সত্যজিতের এইবার অন্তত *পথের পাঁচালী* বইটি পড়া উচিত। তবে ঠিক কেন এই কথা সমালোচক বলছেন তা স্পষ্টভাবে আন্দাজ করা যায় না। কিন্তু তার পরেই তিনি ছবির বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং প্রসঙ্গে চলে যান, যেখানে লেখা ছিল "অসামান্য গ্রন্থের অভাবনীয় চিত্র রূপ"[৭৯]

এই ধরনের শব্দ ব্যবহারই "মহৎ বিজ্ঞাপনের প্রধানতম ফাংশন", তা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য এখানে 'মহৎ' শব্দটি বক্রোক্তি হিসাবে ব্যবহৃত। বিজ্ঞাপনের কপিতে কিছু কঠিন শব্দ যোগ করে যত তাকে দুরূহ করে তোলা হবে, ততই সেই বিজ্ঞাপনের আকর্ষক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, এই হল মোদ্দা বক্তব্য। যদিও সত্যজিৎ রায়ের ছবি এবং তাঁর তৈরি বিজ্ঞাপন বিষয়ে এই মতামত দেওয়া যায় কিনা তা অন্য তর্কের বিষয়। এই কটি কথা বলে সমালোচনার পরের অংশে একটি গল্প বলা হয়।

> এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। সত্যি। এক পাবলিসিটি অফিসার তাঁর boss কে আগামী ছবির বিজ্ঞাপন মারফৎ কি ভাবে পথে বসিয়েছিলেন- এই সম্পর্কে! বিজ্ঞাপনে বড় বড় দাঁত ভাঙা শব্দ বসাতে ভালবাসতেন ভদ্রলোক, কেননা ওটা নাকি খুব পেয়িং! যাই হোক, ডিরেক্টর বাইরে গেছেন কাজে, আর অমনি ডিরেক্টর প্রচার

> সচিব ডিরেক্ট করলেন সহকারীকে, হবু ছবির ক্যাপসন-'অমুক চিত্র প্রতিষ্ঠানের আর একটি যুগান্তকারী অবিমৃষ্যকারিতা!'[৮০]

এই সমালোচনা পড়ে একটি কথাই মনে হয়, *পথের পাঁচালী* ছবিটির সমালোচনা করা যেতেই পারে। সে সমালোচনা যদি তাত্ত্বিক হয়, অথবা যদি তাতে দর্শকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের মতামত মিশে থাকে, তা নিয়ে কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু এ যেন কেবল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের জন্যই প্রসঙ্গের অবতারণা।

ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপন-কেন্দ্রিক কিছু রম্যরচনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *অচলপত্র*-এর ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬০ বঙ্গাব্দের সংখ্যাটিতে বিমল রায়-এর একটি অনুগল্প প্রকাশিত হয়। নাম 'ওভার ডোজ'। নাম শুনে এবং এতক্ষণের আলোচনার সাপেক্ষে এই ব্যঙ্গ-গল্পটির বিষয়বস্তু ও আলোচনা কোন দিকে যেতে পারে, তার একটা অনুমান করা খুব কঠিন হয় না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সুবিনয় রায় ইত্যাদি সাহিত্যিকদের গল্পে যেভাবে বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ এসেছে, সেগুলি অতীব উপভোগ্য সাহিত্য হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। তবে বিমল রায়ের লেখাটির ধরন সম্পূর্ণ আলাদা, যার মধ্যে আগাগোড়া একপ্রকার কটাক্ষ মিশে থাকে।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক পত্রিকাগুলিতে নিত্যদিন বহু রকমের ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কোনটি লম্বা হবার, কোনটি আবার মেদহ্রাসের। হৃত যৌবন পুনরুদ্ধারের বিজ্ঞাপনও আকছার চোখে পড়ে। এমনই এক পরিবার-লাঞ্ছিত, বিগত-যৌবন দম্পতি, একটি বিজ্ঞাপন দেখে যারপরনাই আকুল হয়ে ওঠেন। এবং তাদের যৌবন ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মরিয়া হয়ে পাড়ি দেন ইউরোপে। সেখানে মাসখানিক কাটিয়ে, নিয়মিত যৌবন পুনরুদ্ধারের ওষুধ সেবন করে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু ফিরে দেখা যায় আরেক বিপত্তি।

> বাড়ীর কেহই তাঁহাদের চিনতে পারেন না। প্রথমে বৃদ্ধা (অধুনাযুবতী) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, "খোকন আমায় চিনতে পারছনা আমি যে তোমার মা।" খোকন তো অবাক তা তোমার চেহারা এত সুন্দর হলো কি করে" ? মা তখন সব কথা খুলিয়া বলিলেন। খোকন গম্ভীর মুখে সব শোনার পর মা কে প্রশ্ন করিলেন "তা তোমার কোলে ওটি কে? ওই বাচ্চাটিকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।" মা বলিলেন, "আরে একে চিনতে পারলি না, আমার পোড়া কপাল!" আজকালকার ছেলেদের এই তো ধরণ ধারণ নিজের আপনার জনকে চেনে না।" "এ যে তোর বাবা রে।" "আমার বাবা? তা ওনার এ রকম অবস্থা হলো কেন"? মা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওভার ডোজ হয়ে গেছে কিনা তাই বয়সটা একটু বেশিরকম কমে গেছে"।[৮১]

এই গল্পটির মধ্যে বিজ্ঞাপনের কিছু প্রচলিত ভয়ানক দিকের কথা ঈঙ্গিতে মিশে রয়েছে। সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞার সঙ্গে শারীরিক গঠন প্রায় অবশ্যম্ভাবীভাবে এক হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনে আলোকিত করে তোলা হয় সেই প্রচলিত, বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের দিকগুলিকে। সে কথাও লেখা হয় গল্পে। আর যে কোনও উজ্জ্বল বস্তুই যে আশানরূপ ফল দেয় না, তার অদক্ষ ব্যবহারে হতে পারে বিপদজনক পরিণতি; কিছু আড়াল রেখে, কিছু বা পরিহাসের মোড়কে সেইসব কথা দিয়ে সাজানো হয় 'ওভারডোজ' গল্পটিকে। কাহিনির প্রয়োজনে এখানে বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় না, বরং বিজ্ঞাপনের গল্প বলতে গিয়ে বোনা হয় এক শ্লেষমিশ্রিত আখ্যান। পড়ে আপাতভাবে যদিও আমোদ হয় পাঠকের।

ইতিমধ্যে আলোচিত বেশ কয়েকটি উদাহরণ থেকে এটুকু মোটামুটিভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে নিয়ে *অচলপত্র*-এর একটি পরিহাসের ধারা বজায় ছিল ধারাবাহিকভাবে। দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের 'বিজ্ঞাপনে বলো' প্রবন্ধটিতে। তাঁর বিজ্ঞাপন বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র পরিহাস বা ব্যঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এখানে। বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনী সাহিত্য, বিজ্ঞাপনের বহুবিধ ধরন, ইত্যাদি বিষয়গুলিকে নানা উদাহরণে অভিযুক্ত করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্রতারকা, রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড়রা বিজ্ঞাপনের মুখ হয়ে এসেছেন বহু দশক ধরে। শুধুমাত্র তাঁরাই নন, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সৃষ্ট চরিত্ররাও বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু হয়েছেন। বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা বিজ্ঞাপন অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে কোয়ালিটি আইসক্রিমের বিজ্ঞাপনে ভীম ভবানী বা চুণী গোস্বামীকে নিয়ে ছড়া ছবির সঙ্গে ঘনাদা, টেনিদা, ফেলুদারাও জায়গা করে নিয়েছেন। বহুক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে অতীব মনোগ্রাহী কপি। বিজ্ঞাপনে পণ্যের প্রচার মুখ্য এবং অবধারিত হলেও, কিছু কিছু বিজ্ঞাপন প্রায় সু-সাহিত্যের স্তরে পৌঁছেছে। বিবিধ প্রসাধনী দ্রব্য থেকে খাদ্যদ্রব্য, লেখার পাতা, কাগজ-বিবিধ সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে বিখ্যাত চরিত্রদের।

দীপ্তেন্দ্রকুমার তাঁর লেখা শুরু করছেন বিশ্বকবি বন্দিত কোনও এক দধির বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ দিয়ে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে কবি দইয়ের সঙ্গে কোন শব্দের মিল হতে পারে, তা ভালো বলতে পারেন বটে, তা বলে তাঁর রসনাটিও যে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য; সে কথা বলা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞাপন সংস্থা তাঁকে ব্যবহার করছে তাঁর কবিখ্যাতির জন্য,

আর দর্শকও সেই দিক থেকেই পণ্যটির প্রতি সবেগে ধাবিত হচ্ছে। এইখানেই মানবজাতি বিজ্ঞাপনের কাছে বিক্রীত। বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত চারুকলা ধ্বংসের পিছনে এই বিজ্ঞাপনের আর্টের ভূমিকাই প্রধান।

বলছেন-

> নিজেকে সকলের চেয়ে আড়ালে রেখে, সকলের চেয়ে বেশী করে জাহির করার যে আর্ট তারই নাম বিজ্ঞাপন। এ যুগের একটি মাত্র বাণীই আছে, একটি মাত্র কথাতেই এ-শতাব্দীর সব কথা শেষ। সে কেবলই বলছে : দিকে এবং বিদিকে, দিগ্বিদিকে নিজের বিজ্ঞাপন দিন, আপনার দিগ্বিজয়ের সচিত্র বিজ্ঞাপন।[৮২]

আত্মপ্রচার মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন আঙ্গিকে তার প্রকাশ ঘটেছে। নিজেকে জাহির করবার এই প্রয়াস নতুন কিছু নয়। সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলিও পাঠক-দর্শকপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই নিজেদের পরিবেশন করেছে। নানা ধরনের মুচমুচে খাস্তা সাহিত্যে ভরে গেছে বাজার। সে কথা সর্বকালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু দীপ্তেন্দ্রকুমারের সমস্ত বিদ্বেষ নিক্ষিপ্ত হয়েছে বিজ্ঞাপনের প্রতি। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই বিজ্ঞাপন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রচার মাধ্যমগুলির সক্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি আরও ওতোপ্রতভাবে লিপ্ত হচ্ছে জীবনের সঙ্গে। বহু সময়েই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করা হচ্ছে এক ধরনের কৃত্রিম চাহিদাবোধ, যার বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণবর্ণ মানুষও গৌরাঙ্গ হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছেন। তবে এসব কথা নতুন কিছু নয়, এ কথা জেনেও বিজ্ঞাপনের নানন্দিক দিকটিকে অস্বীকার করে যাওয়া সঙ্গত কিনা সে প্রশ্ন থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ; কবিদের মহৎ পংক্তিগুলি ক্রেতা আকর্ষণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। প্রাবন্ধিক বলছেন-

> কিন্তু বিজ্ঞাপন সবচেয়ে নির্ম্মম কবিদের ওপর। রবীন্দ্রনাথের হাল্কা চালে লেখা "এসো চাতকদল-চা-স্পৃহ চঞ্চল" চায়ের বিজ্ঞাপনে চমৎকার চলে। কিন্তু মনে করুন : "বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে" এটি পড়ে আপনার মনে যখন সবেমাত্র একটি অনুরণন আরম্ভ হয়েছে তখনই যদি জানতে হয় যে অতএব : "আষাঢ় আসার আগেই সাবধান হন। ওয়াটার-প্রুফ কিনুন।" তখন কী মনে হয় আপনার? কেমন লাগে? রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করবার জন্যে এর চেয়ে ভীষণ অস্ত্র আর কি আছে?
>
> "বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল" এ-কবিতা আর পড়তে ইচ্ছে হয় না যখন এই জ্ঞান পরিপক্ক হয় যে বেলা পড়ে এলেও ভয় নেই-অমুক পাম্প তৈরীই আছে-যখন খুসী জল নিতে পারেন।[৮৩]

দীপ্তেন্দ্রকুমারের এই মত কিছু অধিক সরলীকৃত বলে বোধ হয়। শুধুমাত্র যে জিনিসটির প্রচার করা হচ্ছে, সামান্য আভরণ ছাড়া তাকে বে-আব্রু উপস্থাপন করার চাইতে সুললিত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হলে, সেটি খুব অন্যায় প্রয়োগ, তাতে হত্যা করা হচ্ছে সাহিত্য-শিল্পের মত মহৎ সৃষ্টিকে; তা মনে করতে খানিক দ্বিধাবোধ হয়।

প্রাবন্ধিক বলেন, এমন কি যুদ্ধের বাজারে অধিক খরচ করে কাপড় না কেনার আবেদনের মধ্যেও মিশে থাকে বিজ্ঞাপন। যাতে আজ না হোক কাল, সেই কাপড় কেনার আগে, সেই সংস্থাটির নামই ক্রেতার মাথায় আসে সর্বাগ্রে। আপাত সততা আসলে বিজ্ঞাপনী কৌশলমাত্র, তাই এই প্রাবন্ধিকের মত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে, মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিমিটেড একটি সিরিজ বিজ্ঞাপন তৈরি করে। ধুতি, শাড়ির পাড় ইত্যাদি সামলে চলতে অনুরোধ করে পরিবারের সমস্ত সদস্যদের। এই বিজ্ঞাপনগুলি নিয়ে 'জাতীয়তাবাদ ও বাংলা বিজ্ঞাপন' অধ্যায়টিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে; তবু এখানে আরেকবার বলতেই হয়, এই বিজ্ঞাপনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্যম্ভাবীভাবেই তাঁদের পণ্যের কাটতি বাড়ানো হলেও, প্রতিটি বিজ্ঞাপনের সুন্দর, পরিমিত ভাব আজকের পাঠককেও মুগ্ধ করে। কপি ও ছবির সমাহারে, তা যথেষ্ট সময়োপযোগী মনে হয়।

দীপ্তেন্দ্রকুমারের সঙ্গে মতপাথর্ক্য ঘটে সমগ্র প্রবন্ধটি জুড়েই।

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১)-এর 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'র পংক্তিগুলি প্রায় 'বিজ্ঞাপন' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কানে ধ্বনিত হতে শুরু করে। এই কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত পাঠকদের সত্ত্বার সঙ্গে যুক্ত আছে দীর্ঘদিন ধরে। কবিতার বইটি প্রকশিত হয় ১৯৮৪ সালে। ভারতের অর্থনীতিতে গুরুতর পরিবর্তনের সেই সূচনার দশকগুলিতে, মধ্যবিত্ত বাঙালি ইতিপূর্বে যে জীবন যাপন করেছেন দীর্ঘদিন, তা পরিবর্তিত হতে শুরু করে, পরিবর্তমান পৃথিবীতে, পরিবর্তিত যাপনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কখনো কঠিন কাজ হয়ে ওঠে।

শঙ্খ ঘোষ লিখছেন,

একটা দুটো সহজ কথা

বলব ভাবি চোখের আড়ে

জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে

বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।[৮৪]

কেবলমাত্র পণ্যের বিজ্ঞাপনই নয়, পরিবর্তমান সমাজের সার্বিক বিজ্ঞাপনের বাহ্যিক জৌলুসে কখনও কখনও ব্যক্তি 'আমি'টি নিতান্ত মলিন, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, এ কথা অনস্বীকার্য।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে আরম্ভ করে, সমাপ্তি পর্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সূচনাকাল; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞাপনকে একসঙ্গে রেখে কয়েকটি বিশেষ ধারার পরিচয় পাওয়া গেল এই অধ্যায়ে।

বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গ একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার কাজ। এই একটি অধ্যায়ে সেই কাজ করা স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বাঙালি সাহিত্যিকরা বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে কী ভাবে দেখছেন, তার একটা রূপরেখা তৈরির চেষ্টা এখানে করা হয়েছে মাত্র, সেই প্রচেষ্টায় উঠে এসেছে সাহিত্যে বিজ্ঞাপনের প্রয়োগের কয়েকটি বিশেষ দিক। তার সামগ্রিক চেহারাটি তুলে ধরা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নয়।

শেষ পর্বে একখানি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সমাপ্তিতে পৌঁছোনো যাক।

'সুবর্ণরেখা', পুরনো বইয়ের বিক্রেতা ও প্রকাশক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন গ্রন্থপ্রেমিক। পুরনো বই

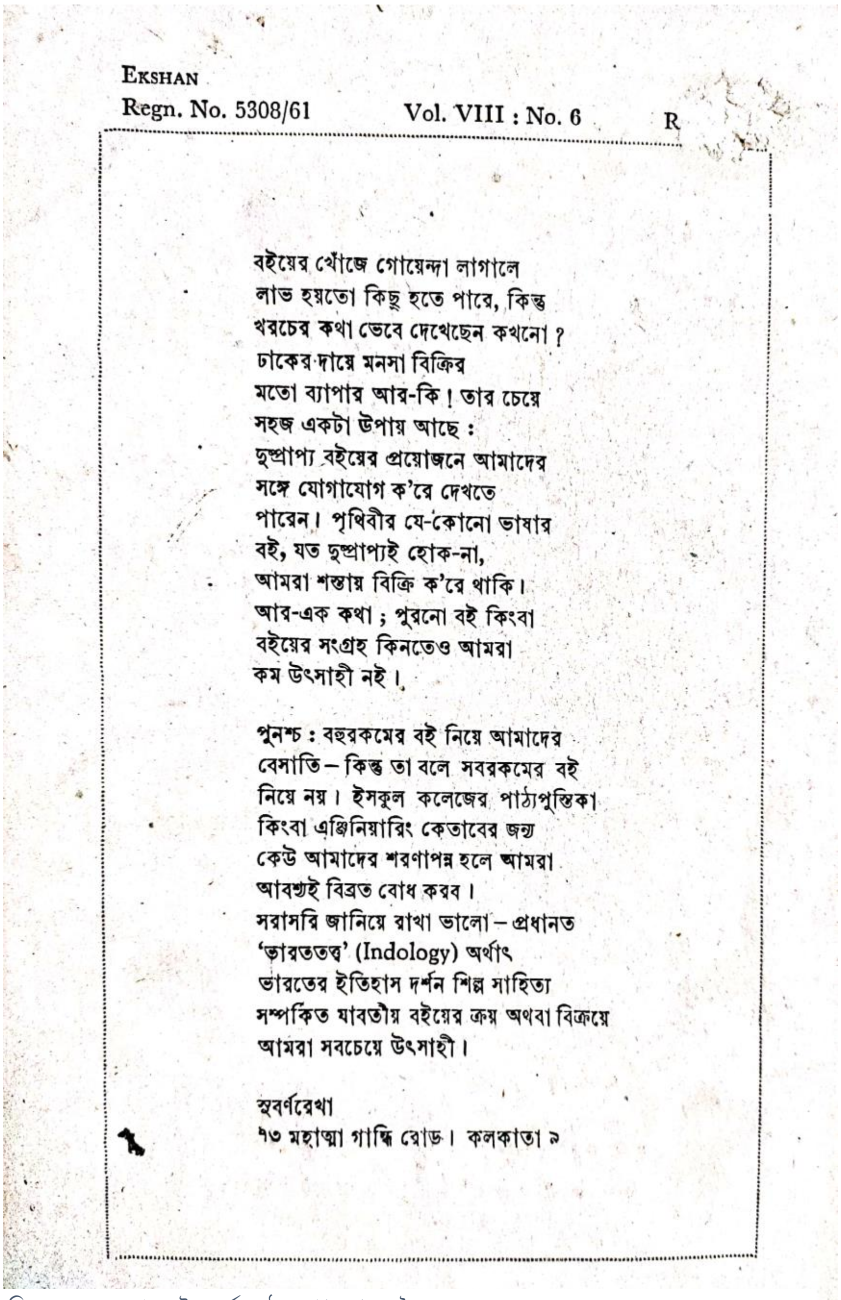

চিত্র ৬.১০ এক্ষণ, অষ্টম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭৭

বিষয়ে অগাধ জ্ঞান তাঁর। পূর্ববঙ্গের যশোরে জন্মগ্রহণের পরে দেশভাগের সময়ে এই দেশে আসেন।[৮৫] পুরনো বইয়ের নেশায় ঘুরেছেন ফুটপাথে ফুটপাথে। পরবর্তীকালে সেই সুবাদেই পুরনো বইয়ের ব্যবসায় আসেন। কোনও পুরনো বই ঠিক কতটা মূল্যবান, সেই অনুযায়ী তার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ শেখেন ধীরে ধীরে। পুরনো বইয়ের সঙ্গে 'সুবর্ণরেখা'র সম্পর্ক বাংলা গ্রন্থ ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন হয়ে থাকবে।

এক্ষণ পত্রিকার ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় 'সুবর্ণরেখা' এই বিজ্ঞাপন (চিত্র ৬.১০) বের করে। গ্রন্থ-প্রেমিকরা বই সংগ্রহের জন্য যে কোনও পন্থা অবলম্বন করতে পারেন, এ কথা সর্বজনবিদিত। এ জন্য তাঁরা প্রয়োজনে গোয়েন্দা লাগাতেও পিছপা হবেন না। কিন্তু 'সুবর্ণরেখা' সবিনয়ে জানাচ্ছে, আজ থেকে আর পুরনো বই সংগ্রহের জন্য অত জটিল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা নেই। 'সুবর্ণরেখা' দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহের পথটি সুগম করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। কেবলমাত্র বই বিক্রয়েই নয়, পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই কিনতেও তারা সমান আগ্রহী।

বাংলা সাহিত্যে বাংলা বিজ্ঞাপন বিষয়ক আলোচনায় এই নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনটি তাই প্রাসঙ্গিক মনে হয়। এইটি দিয়েই তাই অধ্যায় সমাপ্ত করা গেল।

তথ্যসূত্র :

১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ১৫৭০।

২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ১৫৩৪।

৩. রামেশ্বর শ, "শব্দার্থতত্ত্ব ও অর্থপরিবর্তনের ধারা", *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫২৭-৫২৮।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী,* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০২৯।

৫. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র [১৮৪৭-১৯০৫],* নবম খন্ড, কলকাতা : ভারবি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা আট-নয়।

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৪।

৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *শরদিন্দু অমনিবাস,* প্রথম খন্ড, ব্যোমকেশ, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৪।

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৩।

৯. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), *কুন্তলীন গল্প-শতক,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০।

১১. সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, "আমার চাকরী", *কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম,* এইচ বসু, পারফিউমার (প্রকাশিত), কলকাতা : দেলখোস হাউস, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৯।

১২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, "পথের কাঁটা", *শরদিন্দু অমনিবাস,* প্রথম খন্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৩৪।

১৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, "অগ্নিবাণ", *শরদিন্দু অমনিবাস,* প্রথম খন্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১৬২।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* ষোড়শ খন্ড, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ এবং অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চোখের বালি,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬২।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৮৮।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *যোগাযোগ,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০১।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মুক্তির উপায়,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৪।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "জাহাজের খোল", *জীবনস্মৃতি,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫০।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ষোড়শ খন্ড, গ্রন্থপরিচয়, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃষ্ঠা ১১৯৫-১১৯৭।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* চতুর্থ খন্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠ ১৫৫।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আসল", *কবিতাসমগ্র,* তৃতীয় খন্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০, পৃষ্ঠা ৯১।

২৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, "উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার", *প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, পৃষ্ঠা ৫৯৩-৬০৪।

২৫. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিজ্ঞাপন : তাঁর কালে", *প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, পৃষ্ঠা ৬১৮।

২৬. প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও অভীককুমার দে (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : মাসিক বসুমতী,* কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ নেই।

২৭. হিরন্ময় মাইতি, *রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন ও সেইসময়,* কলকাতা : দে বুক স্টোর, ২০১১, পৃষ্ঠা ৮০।

২৮. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খন্ড (১৩০৮-১৩১৪), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫১।

২৯. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিজ্ঞাপন : তাঁর কালে", *প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, পৃষ্ঠা ৬২০।

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* চতুর্দশ খন্ড, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলী, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭।

৩১. সোমেন্দ্রনাথ বসু, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ-প্রবাসী (১৩০৮-১৩৪৮ আষাঢ়),* কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮১।

৩৩. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ,* আনন্দবাজার পত্রিকা (২২ মার্চ ১৯৩২-৩১ ডিসেম্বর ১৯৪১), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৮৯।

৩৪. Banerjee, Subrata. "Satyajit Ray and Advertising". *Satyajit Ray : An Intimate Master.* Das, Santi (Edited). Kolkata : Allied Publishers. 1998. Page 31.

৩৫. প্রাগুক্ত, Page 30.

৩৬. Goswami, Raghunath. "Ten Years as a Graphic Artist". *The Art of Satyajit Ray.* Sen, Jayanti (Edited). Kolkata : Oxford Book Store. 1995. Page 24.

৩৭. Sen, Paritosh. "Satyajit Ray : Film-maker as artist". *The India Magazine.* Singh, Malvika (Edited). Bombay. Volume 10. No. 12. November. 1990. Page 22.

৩৮. ও সি গাঙ্গুলী, "সত্যজিৎ রায়", *আজকাল,* শারদীয় সংখ্যা, অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৫৩।

৩৯. নরেশ গুহ, "টুকরো কথার প্রসঙ্গ", *বিভাব,* দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যা, নরেশ গুহ, অরুণ কুমার সরকার (সম্পাদিত), শীত, ১৩৮৬, পৃষ্ঠা ৯৬।

৪০. সত্যজিৎ রায়, "ডাঃ মুনসীর ডায়রি", *ফেলুদা সমগ্র,* ২, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৫০৩।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭।

৪২. সত্যজিৎ রায়, "ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি", *ফেলুদা সমগ্র*, ১, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৮।

৪৩. অসিত পোদ্দার, "গুপী-বাঘা আমার স্টুডিয়োতে", *ইউনিট সত্যজিৎ*, কলকাতা : লা স্ত্রাদা, ২০২২, পৃষ্ঠা ১০২।

৪৪. সিদ্ধার্থ ঘোষ, "প্রসঙ্গ : হ য ব র ল", *হ য ব র ল*, সুকুমার রায়, ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১-৩।

৪৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "বিবাহের বিজ্ঞাপন", *প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প সমগ্র*, অখন্ড সংস্করণ, প্রফুল্লকুমার পাত্র (সম্পাদিত), কলকাতা : পাত্র'জ পাবলিকেশন, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ২২৯-২৩০।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১।

৪৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮১।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৬।

৫০. বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "আচার্য্য কৃপালনী কলোনি", *আচার্য্য কৃপালনী কলোনি*, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২।

৫১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, *কঙ্কাবতী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৯।

৫২. সুবিনয় রায়, "উন্মাদ-রহস্য", *হাল্‌কা হাসির গল্প*, অমিয়কুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলকাতা : অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ৯২।

৫৩. শিবরাম চক্রবর্তী, "চোর ধরলো গোবর্ধন!", *হাসির ফোয়ারা*, কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২০১।

৫৪. শিবরাম চক্রবর্তী, "পাগলামির মহৌষধ", *হাসির টেক্কা*, কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১২৬।

৫৫. হেমেন্দ্রকুমার রায়, *নীলসায়রের অচিন্ পুরে*, কলকাতা : এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

৫৬. প্রেমেন্দ্র মিত্র, "নিরুদ্দেশ", *রূপরেখা,* নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা : দেব-সাহিত্য-কুটীর, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩।

৫৭. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, "সাধু কালাচাঁদের ফলাও কারবার", *সাধু কালাচাঁদ সমগ্র,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃষ্ঠা ৪২।

৫৮. সত্যজিৎ রায়, "মহারাজা তারিণীখুড়ো", *তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩-৪।

৫৯. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *যে-পুতুল পালিয়ে গেলো,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫০।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০।

৬১. রাজশেখর বসু, "ধুস্তুরী মায়া (দুই বুড়োর রূপকথা)", *পরশুরাম গ্রন্থাবলী,* প্রথম খন্ড, কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩৩।

৬২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, "সন্ন্যাস", *গল্পসংগ্রহ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৫৪৩।

৬৩. অভিরূপ গুহঠাকুরতা, "দিব্যেন্দুদা", *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, প্রদীপ্ত রায় (সম্পাদিত), কলকাতা, মার্চ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৯৯-১০০।

৬৪. দিব্যেন্দু পালিত, "সম্পর্ক", *দশটি* উপন্যাস, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮।

৬৫. সন্তোষ কুমার দে, *বিউটি ষ্ট্রিট,* কলকাতা : অভী প্রকাশন, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

৬৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "মহাপৃথিবী", *কলকাতা,* চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা, জ্যোতির্ময় দত্ত (সম্পাদিত), সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১০।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৪।

৬৯. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, "যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল", *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২, পৃষ্ঠা ২০৭।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১১।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৩।

৭২. সুবিমল মিশ্র, "আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর কোল্ড ক্রিম তখন আপনার ত্বকের গভীরে কাজ করে", *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৩৫।

৭৩. মৌলা দোপেঁয়াজি, "বিজ্ঞাপনী সাহিত্য", *শনিবারের চিঠি ব্যঙ্গ-সংকলন,* রঞ্জনকুমার দাস (সম্পাদিত), কলকাতা : নাথ পাবলিশং, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২৪৩।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৪।

৭৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সুনন্দর জার্নাল,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০২, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮।

৭৬. নরেশ গুহ (সম্পাদিত), *বিভাব,* দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যা, কলকাতা, শীত, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

৭৭. পরিমল রায়, "বিকিকিনি", *ইদানীং,* কলকাতা : বিকল্প প্রকাশনী, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২০।

৭৮. দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল (সম্পাদিত), *অচলপত্র,* কলকাতা, কার্তিক, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

৭৯. ক. চৌ, "পথের পাঁচালী'র সমালোচনা... (১)", *অচলপত্র,* দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল (সম্পাদিত), কলকাতা, কার্তিক, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

৮১. বিমল রায়, "ওভার ডোজ", *অচলপত্র,* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫-৬ সংখ্যা, দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল (সম্পাদিত), কলকাতা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯০।

৮২. দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যাল, "বিজ্ঞাপনে বলো", *অচলপত্র,* দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল (সম্পাদিত), সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৬১, পৃষ্ঠা ১৮।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯-২০।

৮৪. শঙ্খ ঘোষ, "মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে", *মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৪৯।

৮৫. ইন্দ্রনাথ মজুমদার, "ঘটিগরম", *ঘটিগরম,* কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১১-১৫।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

অধ্যায়ের পর অধ্যায় পেরিয়ে, ক্রমে ক্রমে গবেষণাপত্রের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছোনো গেছে। বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়-বিভাজন নিয়ে মুখবন্ধ অংশে আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহার অংশে কয়েকটি কথা বলার আছে।

এই গবেষণাপত্রের শিরোনাম, 'বাংলা পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে বাঙালি (১৯৩৯-২০০০)। কেন বিশেষ করে ১৯৩৯ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর বছরটিকে ধরেই এই গবেষণার কাজ শুরু করা হল, তা মুখবন্ধ অধ্যায়ে অল্প কথায় জানানো হয়েছে। উপসংহারে পৌঁছেও পুনর্বার সেই প্রসঙ্গের অবতারণা প্রয়োজন।

এইখানে দুটি বই, দুটি স্মৃতিকথা থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হবে, যার মধ্যে একটি উদ্ধৃতির আলোচিত সময়কাল প্রায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক, অপরটিতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎসংলগ্ন সময়ের কথা। বক্তব্যের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করতে অন্য কিছু সহযোগী উদাহরণও ব্যবহার করা হবে এখানে।

প্রথম বইটির নাম *চলমান জীবন*। লেখক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪)। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৯৫২ সালে। বইয়ের কৈফিয়ৎ অংশ এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলি থেকে পাঠকরা জানতে পারেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সমসময়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় আসেন পূর্ববঙ্গ থেকে। সমস্ত স্মৃতিকথা জুড়েই লেখা হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের কথা। কলকাতায় আসার পরে তাঁর নতুন শহর বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত মতামত এখানে উদ্ধৃত করা হল-

> কলকাতা শহর আমাকে নিরাশ করল। পরাধীন জাতির মনে যে জ্বালা, আত্মভোলা জাতির চকিত জাগরণে যে প্রচন্ড আলোড়ন, কৈশোরে তা প্রত্যক্ষ করেছি নিজের গ্রামে। ঢাকায় দেখেছি বুড়িবালামের সংগ্রাম কি উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কলকাতার যে প্রাণস্রোত আমাকে টেনে এনেছে, এসে দেখলাম সেখানে ভাঁটা পড়েছে। ঊর্ধ্বতন সমাজের মানুষ যাঁরা, তাঁরা জাতীয় সংস্কৃতির গজদন্ত-মিনার রচনা করে সেখানে নিজেদের বন্ধ করে রেখেছেন। মধ্যবিত্ত তাঁদেরই শেখানো বুলি পাখির মত আউড়ে চলেছে। আর যারা সাধারণ-মানুষ, জীবিকার্জনের দৈনন্দিন রুটিন-মাফিক কাজটুকু সেরে নিয়ে বাকি সময়টুকু অর্থহীন গুলতানিতে অপচয় করছে। জাতি উঠছে কি ডুবছে, সংস্কৃতি বাড়ছে কি মরছে-সে নিয়ে মাথা ব্যথা খুব কম লোকেরই রয়েছে। বাজার কর, অফিস যাও,

> ফিরে এসে তাস-পাশার আড্ডায় বসো, সময় মত ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিও, আর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি বারোমাসে যে তত্ত্ব পাঠাবে, তাও সুদসুদ্ধ উসুল করে নিয়ো ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে।[১]

পূর্ববঙ্গে শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে, যৌবনে যে স্বপ্ন নিয়ে লেখক কলকাতা আসেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে কলকাতা এসে তাঁর সেই স্বপ্ন কিছুটা ধাক্কা খায়। একদা বুড়িবালামের যুদ্ধ এবং তাঁর বীর শহিদদের স্মৃতিতে কেন্দ্র করে যে আবেগ তিনি ঢাকা শহরের দেখে এসেছিলেন, কলকাতায় এসে সে আবেগের নামমাত্র খুঁজে পেলেন না। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে তিনি কলকাতায় আসেননি।

এর কিছু পরে আবার তিনি বলছেন,

> যুদ্ধ তখনও চলছে, চালের দাম বাড়তে বাড়তে সাত-আট টাকায় চড়েছে, কাপড়ের জোড়া প্রায় তার কাছাকাছি। যুদ্ধের ব্যাপারে এইটুকুর বেশী মাথা ব্যথা নেই লোকের। রকবাজীর আড্ডায় অবশ্য জার্মানীর নিশ্চিত জয়লাভ সম্বন্ধে গলাবাজী করে ভবিষ্যতবাণী করা হয়। বীরপ্রশান্তি চলে কাইজার ও 'রাবণ-পুত্র মেঘনাদ' ক্রাউন প্রিন্সের। কিন্তু ওই পর্যন্ত। যুদ্ধ কোন্ দিকে চলেছে, দেশ-বিদেশে তার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ কি, ভারতের কর্তব্য কি-এসম্বন্ধে ভাবাও কেউ প্রয়োজন মনে করে না। ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধ আর সোরাব-রুস্তমের যুদ্ধ-দু-ই যেন এক পর্যায়ের মুখরোচক গল্প মাত্র।[২]

দেশ, সমাজ, রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সচেতনতা বা আবেগ তো দূরের কথা, এ শহরের মানুষকে যেন বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক মনে হয় তাঁর।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আরেকটি উপন্যাসের কথা। নাম *অপরাজিত*। এ গবেষণাপত্রে বারবারই *পথের পাঁচালী, অপরাজিত*'র অমোঘ উদাহরণ উপস্থিত হয়েছে। এখানেও তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। অপু যখন কলকাতায় এসে রিপন কলেজে পাঠরত, সে সময়ে ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধার কথা উপন্যাসে রয়েছে। এমনকি অপু একবার যুদ্ধে যাবার পরিকল্পনাও করে।

তারই কয়েক বছরের ব্যবধানে, স্ত্রী বিয়োগের পরে, আন্দাজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলকাতা ছেড়ে, তারই নিকটবর্তী হুগলি জেলার চাঁপদানীতে একটি গ্রাম্য স্কুলে মাস্টারির চাকরি নিয়ে বাস করতে যায়। ভবঘুরে অপুর সেখানে গিয়ে এক আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। অপুর যে জীবনযাত্রার সঙ্গে পাঠক অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে এই অধ্যায়টি একটি ধাক্কা-বিশেষ।

বড়দিনের ছুটিতে ঢাকা থেকে প্রণব কলকাতায় অপুর সঙ্গে দেখা করতে এসে খুঁজে চাঁপদানীর ঠিকানা পায় এবং অপুর বাসার সন্ধান করে যে অপুকে পায়, সে অপু যেন অন্য মানুষ। বাজারের একপাশে একটা ছোট্ট ঘর, তার অর্ধেকটা একটা ডাক্তারখানা, বাকি অর্ধেকটায় অপুর তক্তপোশ, আধময়লা বিছানা, খানকতন বই, একখানি বাঁশের আলনায় খানকতক কাপড়। সব মিলে পরিস্থিতি তেমন সন্তোষজনক নয়। দারিদ্র অপুর আজন্মের সঙ্গী। তবু তারই মধ্যে ক্ষুদ্র বাসা সে বারেবারে ছিমছাম করে সাজিয়ে নিয়েছে খুব অসুবিধার পরিস্থিতিতেও। কিন্তু প্রণব দেখে, চাঁপদানীতে তাকে যেন প্রকৃত মালিন্য স্পর্শ করেছে। সে মালিন্য যত না বাইরের, তার চাইতে বেশি অন্তরের। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের একটি নির্দিষ্ট অংশ এখানে তুলে দেওয়া যাক-

> পাশেই একটা বাঁকুড়ানিবাসী বামুনের তেলেভাজা পরোটার দোকান। রাত্রে তাহারই দোকানে অতি অপকৃষ্ট খাদ্য কলঙ্ক-ধরা পিতলের থালায় আনীত হইতে দেখিয়া প্রণব অবাক হইয়া গেল-অপুর রুচি অন্ততঃ মার্জিত ছিল চিরদিন, হয়ত তাহা সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু অমার্জিত ছিল না। সেই অপুর এ কি অবনতি! এ-রকম একদিন নয়, রোজই রাত্রে নাকি এই তেলেভাজা পরোটাই অপুর প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। এত অপরিষ্কারও তো সে অপুকে কস্মিন্‌কালে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।
>
> কিন্তু প্রণবের সব-চেয়ে বুকে বাজিল যখন পরদিন বৈকালে অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পাশের এক স্যাকরার দোকানে নীচ-শ্রেণীর তাসের আড্ডায় অতি ইতর ও স্থূল ধরনের হাস্য-পরিহাসের মধ্যে বসিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া মহানন্দে তাস খেলিতে লাগিল।[৩]

যে মার্জিত-রুচির অপুকে প্রণব চিনতো, তার সঙ্গে এই অপুর এমন গভীর পার্থক্য প্রণবকে মনে মনে ব্যথিত করে তোলে। অপুর চারিত্রিক স্থূলতা পাঠককেও একধরনের অস্বস্তি দেয়। অনেকদিন পরে প্রণবের অপুকে দেখে যে গভীর আশাভঙ্গ হয়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাতেও যেন তারই সুর ধ্বনিত হয়। প্রথম-বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কলকাতার কাছে যে প্রত্যাশা তাঁর ছিল, তা অনেকাংশেই আহত হয় নতুন শহরে এসে। তাস-পাশা খেলে জীবন কাটানোর কথাটি যে নিছক কথার কথা নয়, তারই যেন প্রমাণ *অপরাজিত* উপন্যাসে অপুর চাঁপদানী পর্বটি। গতানুগতিক, ঢিলেঢালা, প্রায় নিষ্কর্মা জীবনের প্রায় সমসময়ের দুটি একইরকম ছবি ধরা পড়েছে দুটি ভিন্ন লেখায়।

প্রথম স্মৃতিকথাটিকে একপাশে রেখে এবার আসা যাক দ্বিতীয় বইটির কথায়।

বইয়ের নাম *দ্বিতীয় স্মৃতি*। লেখক পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬)। ভূমিকা অংশে পরিমল গোস্বামী জানাচ্ছেন সাহিত্যিক মনোজ বসুর আগ্রহে মাসিক *বসুমতী*-তে ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে *দ্বিতীয় স্মৃতি* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে। এই মাসিক *বসুমতী*-তেই *স্মৃতিচিত্রণ* প্রকাশিত হয় আঠারো মাস (১৯৫৬, ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৮, মে পর্যন্ত) ধরে। সেই স্মৃতির বিস্তার সীমা ছিল ১৯৪৫ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত। এই ১৯৪৫ সাল ছিল বিশ্ব-ইতিহাসের একটি বিরাট ক্রান্তি মুহূর্ত। পৃথিবীর ইতিহাসের কঠিনতম সর্বগ্রাসী যুদ্ধের অবসান-বছর সেটি। *দ্বিতীয় স্মৃতি*-তে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন এই ৪৫ সালের পরের স্মৃতি। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলার ছবি ধরা আছে এই গ্রন্থে।

পূর্বে আলোচিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কলকাতার কথা স্মরণে রেখে পরিমল গোস্বামী লিখিত, এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করা হল। দুটি লেখা পাশাপাশি রাখলে দুই দশকের ব্যবধানে একই বাংলার দুই ভিন্ন রূপের অপার বৈপরীত্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

> যুদ্ধের ভিতর হঠাৎ বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে বই পড়ার ইচ্ছাটা খুব বেড়ে যায়। আজ ১৯৫১ সালের সংবাদ-বাংলাদেশে নভেল পাঠক সবচেয়ে বেশি, এবং যদিও এ হিসাব নতুন কোনো আবিষ্কার নয়, কেন না আমার মতে গল্প-উপন্যাসের পাঠক সব দেশেই (ভারতের সব রাজ্যের কথা বলছি না) বেশি, তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে গত যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের পাঠকদের মধ্যে নানা বিষয়ে জানবার আগ্রহ হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পরিণাম, মানুষের ভবিষ্যৎ, আধুনিক যুদ্ধের প্রকৃতি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, সমরশক্তি প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত সাধারণ লোকের মধ্যেও জিজ্ঞাসা জেগেছিল। যে-কোনো লোক যে-কোনো বই কিনছে, আরও পড়বে আরও জানবে, এ রকম একটা উন্মাদনা জেগেছিল বাংলাদেশে। তথ্য সম্বলিত অনেক প্রবন্ধের বইয়ের একাধিক মুদ্রণ হয়েছে এ সময়। ঠিক এর আগে এ জিনিস বাংলাদেশে প্রায় অসম্ভব ছিল।
>
> ...
>
> যুদ্ধের গুরুত্ব যে এতখানি তা আগে বোঝা যায়নি এবং এ যুদ্ধ যখন মাথার উপরে এসে পড়ল, তখন দেখা গেল এর চরিত্র বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা চলে না। তাই যুদ্ধ সম্পর্কিত বইয়ের চাহিদাও খুব বেড়ে গেল।
>
> রাত্রে শহর অন্ধকার থাকলেও মন অন্ধকারে থাকতে আর রাজি নয়। তার জ্ঞানের আলো চাই। রাত্রে যে বোমাটা মাথার উপর পড়বে, তা কি কি উপাদানে তৈরি তা দিনের আলো থাকতে থাকতে জানা দরকার, যুদ্ধের কারণটা জানা দরকার। এই ভাবে একটার পর একটা প্রশ্ন জাগছে মনে আর উত্তর খোঁজা হচ্ছে বইয়ের মধ্যে।

এইভাবে মনে পাঠের আগ্রহ জাগিয়ে দিয়ে যুদ্ধ বিদায় নিল, কিন্তু পাঠের আগ্রহটা সঙ্গে নিয়ে গেল না।[৪]

দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়কে পাশাপাশি রাখলে সময়ের বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মানুষ সচেতন হয়ে উঠছে, তার মধ্যে একটা ইতিহাসবোধ জন্ম নিচ্ছে। কারণ একটা নতুন ইতিহাস তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এই সময়ে। বিশ শতকের চারের দশক থেকে বাঙালি পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। এতো কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাই নয়, যুদ্ধকালীন অথবা তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়কাল ভারতবর্ষের ইতিহাসেও ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। একের পর এক ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, ভয়াবহ দাঙ্গা পেরিয়ে স্বাধীনতার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে এই সময়েই। অপরদিকে উপনিবেশগুলিও স্বাধীন হতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে এই সময়ে পড়ার ইচ্ছে বেড়ে যাওয়ার ঘটনা এ কথাই বোঝায় যে এই সময়ে সমাজ হিসাবে তার বোঝাপড়া তৈরি হচ্ছে নতুন করে। তার জানার আগ্রহ বৃদ্ধির বিষয়টিকে কেন্দ্রে রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কেন পত্র-পত্রিকার বিক্রি এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রচার বাড়তে শুরু করে। প্রযুক্তিগত উন্নতিও এ সময়ে দ্রুত হচ্ছিলো।

দুই বিশ্বযুদ্ধাকালীন সময়ের তফাৎ আছে বলেই, আলোচনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু বিজ্ঞাপনের মধ্যেও সময়ের স্পষ্ট প্রতিফলন এসে পড়ে। জনমানসে চারপাশের সময় সম্পর্কে সচেতনতা, কৌতূহল, আগ্রহ যত বাড়তে থাকে; জনমানসের প্রতিনিধি বলেই বিজ্ঞাপনের মধ্যেও সেই জনমানসের চিহ্ন জোরালো হয়ে ওঠে।

মুদ্রিতমাধ্যমের অগ্রগতি যত বাড়তে থাকে, তত বেশি করে বাড়ে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের পরিমাণ। এবং সেই বিজ্ঞাপনগুলিতে এসে লাগে সময়ের ছাপ। কারণ শেষপর্যন্ত মানুষের মনে, গড় জনমানসে সমাজ ও সময় সম্পর্কে সচেতনতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। এই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুত্রপাতের বছরটি বিজ্ঞাপনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ বিজ্ঞাপন বিষয়টিকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেখেছেন একধরনের তীর্যক দৃষ্টিতে। সেই আলোচনা পূর্ববর্তী কিছু অধ্যায়ে উঠেও এসেছে। এই দেখার মধ্যে শেষপর্যন্ত জনপ্রিয় সংস্কৃতি বা ‘পপুলার কালচার’-এর প্রতি একধরনের বিরূপতা মিশে থেকেছে। ‘পপুলার কালচার’-এর মধ্যে বিশেষ করে বিজ্ঞাপনের বিষয়ে যে কয়েকজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেন, তাঁরা হলেন Theodor W. Adorno (১৯০৩-১৯৬৯) এবং Max Horkheimer (১৮৯৫-১৯৭৩)। ‘Culture Industry’ এই বিশেষ শব্দবন্ধের সঙ্গে আমার Adorno,

Horkheimer-এর মাধ্যমেই পরিচিত হই। এঁরা দুজনেই ছিলেন জন্মগতভাবে জার্মান ইহুদী এবং 'ফ্রাঙ্কফুর্টের স্কুল'-এর উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকেই জার্মানীতে 'নাৎসি'-স্বৈরাচারের সম্ভাবনায় তাঁরা জার্মানী ত্যাগ করে অন্য দেশে যান। ১৯৪৪ সালে 'ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল'-এর এই দুই জার্মান তাত্ত্বিকের সামাজিক-দার্শনিক সমালোচনামূলক গ্রন্থ *Dialectic of Enlightenment* প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের একটি অধ্যায়ের নাম 'The Culture Industry : Enlightenment as Mass Deception'। 'পপুলার কালচার' বিষয়ক আলোচনার একেবারে সূত্রপাত এই অধ্যায়ের হাত ধরে। জনপ্রিয় সংস্কৃতির প্রতি তীর্যক মনোভাবেরও সূচনা এ সময় থেকেই। 'পপুলার কালচার'কে এই তাত্ত্বিকরা ঘোরতরভাবে বিরোধিতা করে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দেন এই অধ্যায়ে।

এই বইতে বলা হচ্ছে, আমরা যারা সংস্কৃতি বা 'কালচার'-এর উপভোক্তা, সেই 'কালচার' সিনেমা, গান ইত্যাদিও হতে পারে, অথবা হতে পারে কোনও পণ্য, ভেবে থাকি আমরা স্বাধীন, আমরা আমাদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েই আমাদের পছন্দের বিষয় বা বস্তু নির্বাচন করছি। আমরা আমাদের প্রিয় ছবিটি দেখার জন্য অথবা প্রিয় গানটি শোনার জন্য অথবা প্রিয় পোশাকটি পরার জন্য স্বাধীনভাবে বেছে নিচ্ছি এমনটা প্রাথমিকভাবে মনে হলেও আসলে আমরা স্বাধীন নই। শেষপর্যন্ত 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'ই আমাদের রুচি, আমাদের দেখবার চোখ, আমাদের শোনবার কানকে নির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রণ করছে প্রায় অদৃশ্য 'নাৎসি' বাহিনীর মতই। এই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'র একটা ঘুরিয়ে ধরা, ছদ্ম গণতান্ত্রিক আবরণ থাকলেও সে প্রকৃতপক্ষে গভীরভাবে একনায়ক।

দ্বিতীয়ত, এঁরা আরও বলেন, যে আমরা ভাবছি আমাদের সামনে অনেক 'চয়েজ' বা নির্বাচনের উপাদান রয়েছে এবং আমরা স্বাধীনভাবে তারই কোনও একটিকে বেছে নিচ্ছি কিন্তু আসলে এই নির্বাচনের পদ্ধতিটিও ভ্রান্ত। সবকিছুই যেন একই মুদ্রার দুটি দিক, গতানুগতিক এবং একঘেয়ে। আন্তরিকভাবে তারা অতীব একইরকম। দুটি মানুষ আপাতভাবে দুটি সিনেমা পছন্দ করছেন মনে হলেও বাহ্যিক আবরণ বাদে দুইই এক, দুইই গতানুগতিক, দুইই রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলে, কখনো তাকে প্রশ্ন করতে শেখায় না। কখনোই এই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি' উৎপাদিত পণ্য কোনও গতানুগতিকতাকে ভাঙার কথা বলে না। শেষপর্যন্ত তাই 'stereotype', 'cliché'-র বাইরে 'Culture Industry' বেরোতে পারে না। এবং এই বিশাল প্রক্রিয়াটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার হল বিজ্ঞাপন।

Dialectic of Enlightenment : Philosophical Fragments বইয়ের 'The Culture Industry : Enlightenment as Mass Deception' অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন,

> Advertising is its elixir of life. But because its product ceaselessly reduces the pleasure it promises as a commodity to that mere promise, it finally coincides with the advertisement it needs on account of its own inability to please. In the competitive society advertising performed a social service in orienting the buyer in the market, facilitating choice and helping the more efficient but unknown supplier to find customers. It did not merely cost labor time, but saved it. Today, when the free market is coming to an end, those in control of the system are entrenching themselves in advertising. It strengthens the bond which shackles consumers to the big combines. Only those who can keep paying the exorbitant fees charged by the advertising agencies, and most of all by radio itself, that is, those who are already part of the system or are co-opted into it by the decisions of banks and industrial capital, can enter the pseudomarket as sellers.[৫]

পণ্য নিজে যেহেতু ক্রেতাকে কোনও 'প্লেজার' দিতে অক্ষম, সেই কারণে তার এই অক্ষমতাকে ঢাকতে সে বিজ্ঞাপনকে বেছে নেয়। এই বক্তব্যের মধ্যেও সেই সরলরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই বিপুল প্রতিযোগিতার জগতে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে পণ্যের সমস্ত অক্ষমতা আদৌ ঢেকে ফেলা সম্ভব কিনা, সে প্রশ্ন রয়েই যায়।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই শেষপর্যন্ত মানুষের মগজধোলাই করা হয়, এই ছিল 'ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল'-এর তাত্ত্বিকদের মোদ্দা কথা। বিজ্ঞাপনে নানাবিধ পণ্যকে চোখের সামনে রেখে নির্বাচন করার সুযোগ দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু আসলে দুটি দ্রব্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

বিনোদন প্রসঙ্গে এই অধ্যায়েই অন্য একটি অংশে বলা হচ্ছে,

> Amusement always means putting things out of mind, forgetting suffering, even when it is on display. At its root is powerlessness. It is indeed escape, but not, as it claims, escape

from bad reality but from the last thought of resisting the reality. The liberation which amusement promises is from thinking as nrgation.[৬]

মেধা বা মননের সঙ্গে বিনোদনের সম্পর্ক নেই। বিনোদন বা 'Amusement' আমাদের দৈনন্দিন বাধা, অসুবিধা, যন্ত্রণার দিকগুলি থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি' মানুষের কাছ থেকে অবসর সময়কে কেড়ে নেয়। অবসর যাপনের মুহূর্তগুলিকে ভরে দেয় সস্তা বিনোদনের মাধ্যমে। আপতভাবে যে বিনোদন লুকিয়ে থাকে ছদ্ম-বুদ্ধিমত্তার আড়ালে, যাতে মনে হয় এই বিনোদনই অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক বিষয়। যে কারণে বহু প্রতিষ্ঠাম-বিরোধী বোদ্ধাও সেই ফাঁদে পড়ে যান। মেধা-মননহীন এই বিনোদন এক ধরনের বিশেষ সমাজব্যবস্থার প্রকল্প, যা আমাদের প্রকৃত সমস্যাকে ভুলিয়ে রাখছে, করে তুলছে নেশাগ্রস্থ, এই ছিল তাঁদের মত।

Theodor W. Adorno'র *The Culture Industry: Selected Essays on mass culture* বইয়ের 'The Schema of Mass Culture' অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক লিখছেন-

Mass culture treats conflicts but in fact proceeds without conflict. The representation of living reality becomes a technique for suspending its development and thus comes to occupy that static realm which revealed the very essence of variete.[৭]

সৃষ্টিশীলতার যে বৈচিত্র্যের জগৎ, 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি' তাকে 'static' করে দেয়। 'mass culture'-এর প্রভাবে একধরনের গতানুগতিকতার জগৎ নির্মিত হয়। এর প্রভাবে দর্শকরা ক্রমশ ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা এবং দেখার চোখ হারিয়ে ফেলে।

The viewer os supposed to be as incapable of looking suffering in the eye as he is of exercising thought.[৮]

'পপুলার কালচার' সম্বন্ধে Adorno, Horkheimer-এর এই যে মত, উপসংহার অংশে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরেকবার বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। তাঁদের মতামতকে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কতটা গ্রহণযোগ্য, তা কি যথেষ্ট একপেশে বা একমাত্রিক, এই বিষয়গুলি নিয়ে একটু কথা বলা প্রয়োজন।

দুটি সিনেমার মধ্যে আসলে কোনও তফাৎ নেই, দুটিই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'র দুটি সমধর্মী পণ্য, এ কথার সঙ্গে সহমত হওয়া সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষ শেষপর্যন্ত তার সমস্ত 'চয়েজ' বা নির্বাচনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিন্তু তবুও সে ভাবে যে সে নিজেই নির্বাচন করে নিচ্ছে, মানুষকে এতটা বিবেচনাহীন ভাবাও সঠিক কাজ নয়। 'ইন্ডাস্ট্রি' তাকে যা গলধঃকরণ করাতে চাইবে, সে ঠিক সেটিই গ্রহণ করবে আবহমান কাল ধরে এমনটা ভাবার কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না। বস্তুত, এই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি' এবং সমাজের যে চলমানতা, এই দুইয়ের সম্পর্ক খুবই বহুমাত্রিক এবং জটিল। 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি' মানুষের মনন, রুচিকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, বিষয়টি এমন একরৈখিক নয়। সমাজের ভাঙাগড়া, অদলবদল, প্রবহমানতাও যে এই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'কে শেষপর্যন্ত তার মত করে অদলবদল করে, সেই বিষয়টিও মাথায় রাখার। উভয়েই উভয়কে প্রভাবিত করে, এই জটিল, বহুরৈখিক সম্পর্ককে কোনও একমাত্রিক তত্ত্বে বেঁধে ফেলা কার্যত অসম্ভব। সমাজের কোনও একটি ধারণা, প্রথা অথবা সামগ্রিক সমাজ-কাঠামো নিয়তই অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হয়, ভাঙে, সমাজ তার নিজের নিয়মে ক্রমাগত ভাঙচুরের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলে। সমাজের ভিতরকার সেই নানাবিধ ভাঙচুর, অন্তর্ঘাত, বদল স্বভাবতই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'কে প্রভাবিত করে। পূর্বের তাত্ত্বিকরা বলেছিলেন যে এই ' কালচার ইন্ডাস্ট্রি' মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে চলে, বিষয়টা তেমন সহজ নয়। উভয়েই উভয়ের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকে।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি জুড়ে এই গবেষণাপত্র এটিই দেখেছে। অর্থনীতি প্রশ্নে, জাতীয়তা অথবা নারীদের প্রশ্নে সমাজ যেভাবে এগিয়েছে, বিজ্ঞাপনও সেভাবেই অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞাপনই সমাজের নিয়ন্ত্রক, এমন একমাত্রিক উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপন দাতারা সর্বকালেই চেয়েছেন সমাজের উল্লেখযোগ্য কোনও বদল না হোক, তাতে একটা স্থিতাবস্থা বিরাজ করুক, তাতে তাঁদের সুবিধা, কিন্তু সমাজ স্থিতাবস্থায় থাকে না। নানাসূত্রে, নানা প্রশ্নে তার মধ্যে গভীর ভাঙচুর চলতে থাকে। এবং সেই ভাঙচুর শিল্প, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিকে প্রভাবিত করতে থাকে। সে সময়ে 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি' নিজের মত করে সমাজের এই ভাঙচুর মেনে নিতে বাধ্য হয়। সেই সমাজের শীর্ষে অবস্থান করে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, এমনটা ঘটে না। স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'কে সমাজ কখনো বাধ্য করে অস্থিতিশীলতার পক্ষ নিতে।

সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)-এর পরিচিতি দেওয়া এখানে অবান্তর। বহু পরিচয়ে তিনি সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত। এই গবেষণাপত্রেও নানা প্রসঙ্গে তাঁর কথা উঠে এসেছে। কখনো বিজ্ঞাপন-জগতের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত শিল্পী হিসাবে, কখনো তাঁর সাহিত্যের প্রসঙ্গে, আবার কখনো বা চলচ্চিত্র-নির্মাতা হিসাবে। চলচ্চিত্র নির্মাতা

সত্যজিতের কয়েকটি সাক্ষাৎকার এবং প্রবন্ধাংশ আলোচনার সুবিধার্থে এখানে উদ্ধৃত করতে হবে। চলচ্চিত্র বিষয়টিকে তিনি কী ভাবে দেখতেন, পূর্ববর্তী তাত্ত্বিকদের মতামতের প্রেক্ষিতে সেগুলিকে একটু পড়ে নেওয়া যাক।

বিষয় চলচ্চিত্র বইয়ের 'বাংলা চলচ্চিত্রের আর্টের দিক' প্রবন্ধটি *বেতার জগৎ* পত্রিকার ১৯৬০ সালের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর উপন্যাস *পথের পাঁচালী* অবলম্বনে মুক্তি পায় *পথের পাঁচালী ছবি*। পরবর্তী চার বছরে বিভূতিভূষণেরই *অপরাজিত* অবলম্বনে সত্যজিৎ তৈরি করেন দুটি ছবি *অপরাজিত* (১৯৫৬) এবং *অপুর সংসার* (১৯৫৯)। অর্থাৎ সত্যজিতের ছবি তৈরির একেবারে প্রথম যুগেই লিখিত হয় এই প্রবন্ধ।

এখানে সত্যজিৎ বলছেন চলচ্চিত্রের আর্টের দিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার ব্যবসার দিকটিকেও বাদ রাখা যায় না। টাকার অভাবে চলচ্চিত্র যে ভূমিষ্ঠ হতে পারবে না, তা না বললেও সকলেই জানেন। প্রাবন্ধিক লিখছেন-

> যন্ত্রযুগের অবদান এই যান্ত্রিক শিল্পটি সিনেমা ব্যবসার আওতায় এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে প্রচুর অর্থ-ব্যয় না করে ছবি করা একেবারে অসম্ভব। ছবি করতে গেলে তার প্রাথমিক উপকরণ অর্থাৎ ক্যামেরা এবং ফিল্ম-এরই মূল্য অনেক। তার উপর অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন, কলা-কুশলীদের পারিশ্রমিক আছে, স্টুডিও ভাড়া আছে, পোষাক-আষাক, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি যাবতীয় খরচ আছে। ছবি শেষ হলেও রেহাই নেই। কারণ বিজ্ঞাপনের খরচ আছে। সব মিলিয়ে একটা সহজ অনাড়ম্বর ছবির খরচের অঙ্কও লাখের কোঠা পেরিয়ে যায়, তেমন জাঁকালো ছবি হলে তো কথাই নেই। এই ব্যয়সাপেক্ষতা সিনেমা ব্যবসাকে ব্যবসায়ীর সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য করেছে।[৯]

ছবি তৈরির জন্য অথবা বৃহত্তর অর্থে বলতে গেলে যে কোনও শিল্পের প্রকাশের প্রধান অবলম্বন বর্তমান যুগে হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। একমাত্র অর্থই তাকে শিল্পীর কাছ থেকে পৌঁছে দিতে পারে শ্রোতা, পাঠকের কাছে। শিল্পী এবং ব্যবসায়ীর সম্পর্কটিও তাই অনিবার্য। দুজনের পারস্পরিক নির্ভর দুজনের কাছেই অনস্বীকার্য। সত্যজিৎ বলছেন, প্রযোজক শিল্পীর তৈরি ছবি পৌঁছে দেন প্রেক্ষাগৃহে। এবং জনসাধারণ প্রেক্ষাগৃহের মাধ্যমেই তাকে উপভোগ করতে পারেন। জনসাধারণ সেই ছবি সাদরে গ্রহণ করলে, যথেষ্ট সংখ্যায় টিকিট কেটে ছবি দেখলে

তবে ছবিটির আর্থিক সাফল্য। ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে শিল্পগত সাফল্যের সমন্বয় ঘটলে তা অত্যন্ত আনন্দের ঘটনা। এ কথাও তিনি উল্লেখ করেন যে জনপ্রিয়তা শিল্পে উৎকর্ষের সংজ্ঞা নয়।

> কেবলমাত্র আপন খেয়াল-খুশিকে চরিতার্থ করবার জন্য শিল্প সৃষ্টি- এ সুযোগ কবির আছে সঙ্গীতকার বা যন্ত্রশিল্পীর আছে; কিন্তু চলচ্চিত্র পরিচালকের নেই। তাঁকে যেমন দেখতে হবে শিল্পের দিক, তেমনি দেখতে হবে ব্যবসার প্রয়োজনটা, জনসাধারণের চাহিদাটা। এই চাহিদাটা মেটাতে গিয়ে যদি আর্টকে বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে অবশ্য আক্ষেপের কারণ ঘটে। কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে শিল্পের সঙ্গে জনপ্রিয়তার একটা চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ চার্লি চ্যাপলিনের ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এই সমন্বয় সহজ নয় এবং এর কোন ফর্মূলাও নেই। কিন্তু অতীতে দৃষ্টান্ত আছে বলেই ভবিষ্যতে সম্ভাবনাও আছে।
>
> যাঁরা এই ব্যবসার গন্ডির মধ্যে শিল্পসম্মত ছবি করার প্রয়াস করেন, এই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাই তাঁদের প্রেরণা জোগায়। চলচ্চিত্রের যেগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তার সবই এই গন্ডির মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে।[১০]

কোন ছবি ঠিক কোন কারণে দর্শকদের দ্বারা আদৃত হবে, কোন মাহেন্দ্রক্ষণে শিল্পের সঙ্গে জনপ্রিয়তার সমন্বয় ঘটবে, তার কোনও নির্দিষ্ট ‘ফর্মূলা’ হয় না, এ কথা সত্যজিৎ রায়ের মতন বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার তাঁর প্রবন্ধে জানাচ্ছেন। ফলে Adorno’র মত তাত্ত্বিকরা যখন জনরুচির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারান, দর্শক-পাঠককে মনে করেন একই ছাঁচে তৈরি যন্ত্র এবং ‘কালচার ইন্ডাস্ট্রি’ সমস্ত উৎপাদনই শেষপংক্তিতে অভিন্ন, একঘেয়ে এবং গতানুগতিক বলেন, তখন তাঁদের মতামতকেই বরঞ্চ কিছু অতিরিক্ত একপেশে ও সরল বলে বোধ হয়। জনরুচি বিষয়টিকে অতি সরলীকরণ করে ফেললে হয়তো ঠিক হবে না। সত্যজিতের মতে বিশ্ব-চলচ্চিত্রের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি প্রত্যেকটিই ব্যবসার গন্ডির মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৮৭’র ১৮ এপ্রিলের *দেশ* পত্রিকায় সত্যজিতের একটি সাক্ষাৎকার নেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। *এখন সত্যজিৎ* পত্রিকার দশম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা (২০১৫)-তে এই সাক্ষাৎকারটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এই আলাপচারিতার একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল-

> সঞ্জীব : ... আপনি নিজের মর্জি অনুযায়ী ছবি করতে পেরেছেন বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে পেরেছেন। পরবর্তীকালে যাঁরা আসছেন তাঁদের ওপর তো নানা ধরনের চাপ আসতেই পারে। একদিকে ধরুন

কমার্শিয়াল ওয়ার্লড। কমার্শিয়াল লোকের কাছ থেকে টাকা নিলে তাঁরা চাইবেন ছবির কমার্শিয়াল দিকটা বড় হোক, সরকারী টাকায় ছবি করলে তাঁরা চাইবেন তাঁদের মতবাদের দিকটা বড় হোক...।

সত্যজিৎ : এখন কমার্শিয়াল দিকটা বড় হোক বলতে কি বোঝায়, আমার পরিষ্কার কোনও ধারণা নেই, কেন না যে ছবি পয়সা দেবে সেইটাই তো কমার্শিয়াল। সেটা আগে থেকে কি করে বলা যাবে কোনটা কমার্শিয়াল হচ্ছে না হচ্ছে। বহু কমার্শিয়াল বম্বের ছবি, কলকাতার ছবি, যারা তথাকথিত কমার্শিয়াল ছবি করছে, তাদের বহু ছবি মার খাচ্ছে। বহু ছবি চলছে না, সেটা কমার্শিয়াল ছবি হচ্ছে না; কিন্তু আবার যাকে আর্ট ফিল্ম বলা হয়, তার মধ্যে বহু ছবি আছে যেমন আমি উদাহরণ স্বরূপ বলছি, আমার চারুলতা খুব ভালো পয়সা দিয়েছিল। ভালো চলেছিল।[১১]

প্রবন্ধ থেকে আলাপচারিতা, পরিচালক জীবনের একেবারে সূচনা-অধ্যায়ে অথবা মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে, ছবি সম্বন্ধে, জনরুচি সম্বন্ধে, ছবির কমার্শিয়াল দিক সম্বন্ধে সত্যজিতের এমন কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় যেগুলি বহু বছরের ব্যবধানেও অপরিবর্তিত। তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে শিল্প, বাণিজ্য এবং শিল্পের উপভোক্তার সমীকরণ বারেবারেই বহুমাত্রিকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। চারের দশকের তাত্ত্বিকদের তত্ত্ব দিয়ে কিছুতেই যে সমীকরণকে বোঝা সম্ভব নয়।

একেবারে শেষের সাক্ষাৎকারটি সত্যজিতকে নিয়েছিলেন Bert Cardullo (১৯৪৮-) ১৯৮৯ সালে। Bert Cardullo সম্পাদিত *Satyajit Ray Interviews* বইতে 'Master of Art : An Interview with Satyajit Ray' নামে সংকলিত হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে Bert Cardullo সত্যজিৎ-কে প্রশ্ন করছেন, "One final question, Mr. Ray. What do you feel are the main fears or crises confronting filmmakers today-I mean contemporary, serious filmmakers?"[১২]

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ঠিক কোন ধরনের ভীতি বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এ প্রশ্ন সত্যজিৎ রায়কে করা হলে সত্যজিৎ এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত এবং অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেন চলচ্চিত্র নির্মাতার অর্থনৈতিক সংগ্রামের দিকটিকে। এমন পরিচালক নিশ্চয়ই রয়েছেন যাঁরা ছবির মাধ্যমে প্রযোজকের অর্থ পরিশোধের দিকটি নিয়ে ভাবিত নন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাঁদের মধ্যে পড়েন না, সে কথা তিনি নিজেই স্পষ্ট করে জানান। তিনি বলছেন-

There possibly are directors who are not really concerned whether the producer gets his money back or not. But I put myself among those directors who are extremely aware of the fact that somebody else is making it possible for you to be creative. Without somebody else's help you are helpless, and you can never be creative in films. Making even the simplest of pictures costs money, and you don't always have that kind of money yourself. So you have to depend on others. Thus the need for communication, particularly of the economic kind.[১৩]

এতগুলি উদ্ধৃতি পরপর এখানে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্য এই যে বাণিজ্যের সঙ্গে শিল্পের, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের পারস্পরিক আদান-প্রদানের, নির্ভরতার সম্পর্কটি সত্যজিৎ রায় কখনো অস্বীকার করেননি। বরঞ্চ বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক দিকটির গুরুত্ব তিনি স্পষ্টভাবে বারেবারে উচ্চারণ করেছেন। প্রযোজকের অর্থকে অবলম্বন করে ছবি বানাতে গেলে, সেই ছবির বাণিজ্যিক সফলতার কথা গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণে রাখা যে পরিচালকের কর্তব্য, সে কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। বাণিজ্যিক সফলতা, জনরুচি, জনপ্রিয়তা ইত্যাদির সাধারণ সংজ্ঞার প্রতি কোনও সরল নেতিবাচকতা তাঁর মতামতে উঠে আসেনি। বরঞ্চ সমীকরণগুলি যে আদৌ সরল নয়, বা আদৌ তাদের কোনও সমীকরণবদ্ধ করা যায় না, এ কথাই নানাভাবে তিনি জানিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে আটের দশকের 'কুলি' (১৯৮৩) ছবিতে অমিতাভ বচ্চনকে দেখা যায় কাস্তে-হাতুড়ি হাতে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকতে। জনপ্রিয় মূল ধারার ছবিতে এই দৃশ্য অবিশ্বাস্য হলেও এ ছিল সময়ের দাবি। সাতের দশকে দেশ জুড়ে ঘটা উত্তাল নকশালবাড়ি আন্দোলনকে বলিউডের 'মেইন্সট্রিম' ছবিও উপেক্ষা করে যেতে পারেনি। 'পপুলার ইন্ডাস্ট্রি'র 'পপুলার' নায়কের হাতে কাস্তে-হাতুড়ি ধরা পড়ছে।

চিত্র ৭.১ কুলি, ১৯৮৩

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য। কয়েকটি বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গ, যেগুলি নিয়ে হয়তো পূর্বের অধ্যায়গুলিতেও আলোচনা হয়েছে, এই উপসংহারে আরেকবার উঠে আসবে। সময়ের ছাপ বিজ্ঞাপনে ফুটে উঠেছে। কেবলমাত্র বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখে, পাঠক-ক্রেতার মধ্যে পণ্যের মোহ তৈরি করা হয়নি। সময়ের, সমাজের প্রভাব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বিজ্ঞাপনের অবয়বে, অন্তরে।

দুটি উদাহরণকে এখানে পাশাপাশি রাখতে চাই। একটি বিজ্ঞাপন হল প্রসাধনী পণ্যের এবং অপরটি স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়র। দুটি বিজ্ঞাপন দুটি ভিন্ন সময়েরও।

প্রসাধনের বিজ্ঞাপনটি গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের। 'টাটার কেশ তৈল' মেখে এক দম্পতির মাথায় কেশরাশি হয়েছে ঈর্ষা করার মতন। ফলে তাদের সঙ্গে গাড়ি না থাকলেও মুখে রয়েছে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাসি। অপরদিকে তাঁদের সুন্দর ঘন চুল দেখে গাড়িতে চড়া এক দম্পতি তাকিয়ে রয়েছেন মুগ্ধ নয়নে। অর্থাৎ তাঁরা গাড়িতে চড়লেও এমন বাহারি কেশরাশি থেকে তাঁরা বঞ্চিত কারণ তাঁরা নিশ্চয়ই 'টাটার কেশ তৈল' ব্যবহার করেননি।

চিত্র ৭.২ দেশ, ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

এহেন সরল বিজ্ঞাপনের কপি ও ছবি বা বিজ্ঞাপিত পণ্যটি নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। বলার বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্য।

বিজ্ঞাপনটিতে স্পষ্ট দেখা যায়, গাড়িতে বসে রয়েছেন দুটি মানুষ; যাঁরা সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী। স্বামীর হাতে ধরা রয়েছে গাড়ির স্টিয়ারিং। গাড়িটির যাত্রাপথ নির্ধারণ করছেন পুরুষটি। তিনিই রয়েছেন চালকের আসনে। মহিলাটি তাঁর সঙ্গী। তিনি বসে রয়েছেন পাশে।

ছয়ের দশকের একটি বিজ্ঞাপনের ছবিতে যে এই দৃশ্য দেখা যাবে, এতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নেই।

যদিও পাঁচ-ছয়ের দশকে এর বিকল্প ছবিও ধরা পড়েছে বিজ্ঞাপনে, যা নিয়ে 'বাংলা বিজ্ঞাপন ও মেয়েদের কথা' অধ্যায়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে, তবে গড় ছবিটি ছিল মোটামুটিভাবে এইরকমই; যেখানে যাত্রাপথের নিয়ন্ত্রক হয়েছেন পুরুষটি।

চিত্র ৭.৩ হরলিক্স, ২০২২

বহুদিন ধরে এই ছবিই দেখে অভ্যস্ত থেকেছেন বাঙালি সমাজ। কেন গতির চাবিকাঠিটি কেবলমাত্র ধরা থাকবে পুরুষের হাতে, তার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখতে পাননি তাঁরা। আমাদের সমাজে নারীর প্রধান অবস্থান যে পুরুষের বাম পাশটিতে, এইটা মেনে নিতে অসুবিধা বোধ হয়নি সেভাবে।

কিন্তু চিরকাল এই ছবিই থাকে না। সমাজে বদল এলে, নারীদের অবস্থানে পরিবর্তন এলে বিজ্ঞাপনের ছবিটিও (চিত্র ৭.৩) পালটে যায়।

বিজ্ঞাপনটি সমসাময়িক কালের। সমগ্র পৃথিবীতে হোক অথবা এই সমাজে, নারীমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসটি দীর্ঘ। দীর্ঘ যন্ত্রণা, বঞ্চনা, অত্যাচারের পথ পেরিয়ে আজ একবিংশ শতাব্দীতে কোনও কোনও মেয়েরা তাঁদের মতামত স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারছেন সমাজের সামনে। আরও বহু কণ্ঠস্বর অশ্রুত থেকে যাচ্ছে। তবে পরিবর্তমান সমাজের পথ ধরে সমস্ত নারী তাঁদের নিজের ইচ্ছায় বাঁচার অধিকার পাবেন একদিন, এই ভাবনা উৎসাহ দেয়।

বিজ্ঞাপনটি হরলিক্সের এবং একেবারেই সমসাময়িক কালের, যেখানে দেখতে পাওয়া যায় একটি কিশোরী, সম্ভবত রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে পথিমধ্যেই গাড়ি মেরামতে ব্যস্ত। সম্ভবত তার সঙ্গে কোনও পুরুষসঙ্গী নেই, সে একাই বেরিয়েছে তার নিজের গন্তব্যের লক্ষ্যে; অথবা তার সঙ্গে কোনও পুরুষসঙ্গী থাকলেও গাড়ির সুরক্ষা এবং পরিচর্যার দায়িত্ব মেয়েটির হাতে। এ বিষয়ে সে স্বাবলম্বী। কাজ করতে গিয়ে তার হাতে ধুলো-ময়লা লেগেছে ঠিকই, কিন্তু পেশীবহুল হাতটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে হাত তথাকথিত 'মেয়েলী', 'কোমল' নয়, বরঞ্চ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান।

ছয়ের দশকের ছবিটিতে পুরুষের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরার ছবিটি যেমন সত্য, ঠিক তেমনই একবিংশ শতাব্দীতে নারীর হাতে স্টিয়ারিং উঠে আসবার ছবিটিও একই রকম সত্যি। কেবলমাত্র সে স্টিয়ারিংই ধরছে না, তার পাশে সম্ভবত কোনও পুরুষসঙ্গী নেই, সে বেরিয়ে পড়েছে একলা পথের দীর্ঘ যাত্রায়, দীর্ঘ যাত্রা বলেই নিজের গাড়ি সারিয়ে নিতে হচ্ছে নিজেকেই, গন্তব্য নিকটে হলে সে কাছাকাছি পেতেও পারতো কোনও গাড়ির মেকানিক।

চালিকাশক্তি এখানে মেয়েটিরই হাতে, গাড়ির সঙ্গে তার নিজের মালিকানাও যে কার্যত অর্জন করেছে, এই কথা বিজ্ঞাপনে ছবির মাধ্যমেই লেখা হয়ে যায়। নারীর নিজের হাতে নিজের শরীর-মনের মালিকানা পাওয়ার পথটি ছিল অতীব দুর্গম। বিজ্ঞাপনের মেয়েটি সেই দুর্গমকে জয় করেছে।

সমাজে যেমন প্রতিক্রিয়া এবং প্রগতিশীলতার জগৎ প্রবাহিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনও এগিয়েছে ঠিক সেভাবেই। সমাজমন যেমন জটিল ও বহুমাত্রিক, বিজ্ঞাপনও ঠিক সেভাবেই বহুমাত্রিকতাকে তার দেহে ধারণ করে রাখে। তাকে একরৈখিকভাবে কোনও তত্ত্বের মাধ্যমে বুঝতে গেলে, সেই পাঠ অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রান্ত পাঠ হয়।

১৯৩৯ থেকে ২০০০, এই সাতটি দশকের ধারাবাহিক বিজ্ঞাপন পাঠের মধ্যে দিয়ে এই গবেষণাপত্রে বিজ্ঞাপনের কয়েকটি বিশেষ দিককে তুলে ধরতে চাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টির বহুমাত্রিকতার কারণেই বাকি থেকে গিয়েছে আরও বিভিন্ন দিক। বস্তুত বিজ্ঞাপনের মতো এই বিপুল পরিধির বিষয়কে একটি গবেষণাপত্রে ধরা সম্ভবও নয়। এর নানা আঙ্গিক নিয়ে নানাবিধ গবেষণার সুযোগ আছে। আপাতত এই 'উপসংহার' অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ববর্তী ছয়টি অধ্যায়ের আলোচনাকে শেষ করা হল।

তথ্যসূত্র :

১. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, *চলমান জীবন*, প্রথম পর্ব, কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১১২।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৩।

৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫৬।

৪. পরিমল গোস্বামী, *দ্বিতীয় স্মৃতি*, কলকাতা : গ্রন্থপ্রকাশ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৯-৬০।

৫. Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. "The Culture Industry : Enlightenment as Mass Deception". *Dialectic of Enlightenment : Philosophical Fragments.* Noerr, Gunzelin Schmid (Edited). Jephcott, Edmund (Translated). Stanford : Stanford University Press. 2002. Page 131.

৬. প্রাগুক্ত, Page 116.

৭. Adorno, Theodor W. *The Culture Industry.* Selected Essays on Mass Culture. Bernstein, J.M (Edited and with an Introduction). London and New York : Routledge. 2001. Page 71.

৮. প্রাগুক্ত, Page 69.

৯. সত্যজিৎ রায়, "বাংলা চলচ্চিত্রের আর্টের দিক", *বিষয় চলচ্চিত্র*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৪৩।

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪।

১১. সোমনাথ রায় (সম্পাদিত), "বিচিত্রা", সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় কৃত সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার, *এখন সত্যজিৎ*, দশম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৫০-৫১।

১২. Cardullo, Bert (Edited). “Master of Art : An Interview with Satyajit Ray”. *Satyajit Ray Interviews.* Jackson : University Press of Mississippi. 2007. Page 188-189.

১৩. প্রাগুক্ত, Page 189.

পরিশিষ্ট

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপন বিষয়ক তাত্ত্বিক বা ফিচারধর্মী লেখালেখি শুরু হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। যদিও, বিশ শতকের প্রথমভাগে এমন লেখালেখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সেইরকমই চারটি লেখা এই পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হল। লেখাগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং এই গবেষণার কাজে বারেবারে ব্যবহৃত হয়েছে। চারটি লেখা চারটি ভিন্ন সময়ের।

নীচে লেখাগুলির শিরোনাম, লেখকের নাম, প্রকাশকাল, কোন পত্রিকায় প্রকশিত, পৃষ্ঠাসংখ্যা ইত্যাদি কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হল। পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে লেখাগুলিতে যে বানান ব্যবহৃত হয়েছিল, তা এখানে অবিকৃত রাখা হল।

১. 'মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন'/ লেখকের নাম অনুল্লেখিত এবং 'এদেশের মাসিকে বিজ্ঞাপন কম কেন'/ লেখকের নাম অনুল্লেখিত,

প্রকাশ : এস পি চ্যাটার্জি (সম্পাদিত),*কাজের লোক*, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী, সন ১৯১৬, পৃষ্ঠা ১১-১২।

২. 'বিজ্ঞাপনের বাহন'/লেখকের নাম অনুল্লেখিত

প্রকাশ : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *প্রবাসী*, ২৩ ভাগ, ১ম খন্ড, ভাদ্র, ১৩৩০, ৭১৬-৭১৮।

৩. 'ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন'/ ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

প্রকাশ : বিনয়কুমার সরকার (সম্পাদিত), *আর্থিক উন্নতি*, ৫ম বর্ষ-২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮।

৪. 'বিজ্ঞাপনে বলো'/ দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

প্রকাশ : দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল (সম্পাদিত), *অচলপত্র*, কার্তিক, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

পরিশিষ্ট । এক

মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন, উচ্চ শ্রেণীর অবস্থাপন্ন পাঠকের নিকট যাইয়া থাকে সুতরাং বিজ্ঞাপিত সামগ্রীর বিক্রয়ের সম্ভাবনা অনেক। "Magazines appeal to a somewhat richer class of readers and it may appeal to the moneyed or leisured classes more freely."

ম্যাগাজিন বা মাসিক পত্রাদি বিশ্রাম সময়ে মনের সুস্থির অবস্থায় ধনী শ্রেণীর নরনারীগণ দ্বারা পঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী এবং অভিজ্ঞ গণের মতে "মাসিকে" বিজ্ঞাপন দেওয়ায় অধিক সুফল হইয়া থাকে।

এদেশের ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মস্তিষ্ক চালনা করেন না, বিজ্ঞাপন দিতে হয়, সেইজন্য দিয়া থাকেন মাত্র। সে বিজ্ঞাপনের কোন পরিবর্ত্তনও করেন না, করিতে জানেন না, সেইজন্য যত টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় হয়, তাহার আর পুনরুদ্ধার হয় না। ইঁহারা বলেন, মাসিক বা সাময়িক পত্রে একবার মাত্র বিজ্ঞাপন বাহির হয় সুতরাং তাহাদ্বারা বিশেষ সুফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এ যুক্তি ভ্রমাত্মক।

আমি আপনি প্রতিদিনই দৈনিক পত্র পাঠ করি, কিন্তু প্রাত্যহিক অসংখ্য বিজ্ঞাপনের মধ্যে কয়টা দেখিয়া থাকি ? আমরা কদাচিতই দৈনিকের বিজ্ঞাপনে মনোযোগ দিতে সক্ষম হই, কারণ সময়ে কুলায় না, পরদিবস নূতন কাগজ আসিয়া পড়ে। সুতরাং well written and catchy সুলিখিত এবং নয়নাকর্ষক ও বড় বিজ্ঞাপন ব্যতীত সহসা সে বিজ্ঞাপনে স্বেচ্ছায় মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু মাসিক পত্রিকা লোকে অবসর সময়ে পাঠ করেন, একখানা মাসিক পত্রে আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয়, বিষয়, গল্প উপন্যাসাদি থাকে, লোকে স্বযত্নে পাঠ ও করিয়া থাকে, এবং পাঠ শেষ হইলেও ভবিষ্যতের জন্য রক্ষাও করিয়া থাকেন। এদেশের পাঠকের হস্তে দৈনিক কাগজের পরমায়ু একদিন বা দুইদিন। পরদিনই বাতিল কাগজের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। মাসিকের বিজ্ঞাপন গৃহিণীদের হস্তেও যায়, বালকেও পড়ে। জগতের সর্ব্বত্রই ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ধারণা আছে যে, "women are best buyers" "স্ত্রীলোকগণই উৎকৃষ্ট খরিদদার"। মাসিকপত্র সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম, সুতরাং ব্যবসায়ীর চক্ষে মাসিক পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিবার উৎকৃষ্ট কাগজ, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

এদেশের মাসিকে বিজ্ঞাপন কম কেন

এদেশের Advertising Agency নাম ধারী কতকগুলি দেশীয় ব্যবসায়ী হইয়াছেন। অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীর অ্যামেরিকা এবং ইয়োরোপে স্বতন্ত্র কার্য্য। ইহারা বিজ্ঞাপন শাস্ত্রে সুদক্ষ, বিজ্ঞাপনের "কাপি" প্রস্তুত করিতে জানে। এদেশের যাঁহারা "বিজ্ঞাপন এজেন্ট" বলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া থাকেন, ইঁহারা সংবাদ পত্রের Space-Brokers বিজ্ঞাপনের স্তম্ভের দালান মাত্র। বিজ্ঞাপন জুটাইয়া কিছু কিছু কমিশন পাইয়া থাকেন। দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রের বিজ্ঞাপনের হার বেশী, সেইজন্য ইহারা মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিবার পরামর্শ পারক-পক্ষে বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে দেন না। এই জন্য এদেশের মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপনদাতাগণের মনোযোগ নাই। এইরূপ Space-Baoker গণের কথায় অনেক ব্যবসায়ী আস্থা স্থাপন করেন না, ইহাই রক্ষা। কারণ—অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিজ্ঞাপনের "কাপি" প্রস্তুত করিবার বা বিক্রয় বৃদ্ধির মতলব দিবার ইহাদের ক্ষমতাই নাই।

মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপনের হার কম, স্থান অধিক, দুইকথা বিক্রেয় জিনিস সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

পেটেন্ট ঔষধ, পোষাক পরিচ্ছদ, প্রভৃতির বিজ্ঞাপন মাসিক পত্রিকাতেও স্থান পাওয়া উচিত। দৈনিক পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় যে সুফল হয় না, তাহা যেন কেহ না মনে করেন। দৈনিকের গ্রাহক, পাঠক অধিক নিত্য পাঠ করিতে করিতে পাঠকের বিজ্ঞাপনে মনোযোগ নিশ্চয়ই পড়িয়া থাকে, কাজও হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য—সাময়িকপত্রও ব্যবসায়ীর উপেক্ষনীয় নহে। বেশ মোটা বর্ডার দিয়া মাসিকের বিজ্ঞাপনকে চিত্তাকর্ষক করিয়া দিলে তাহা পাঠকের চক্ষু এড়াইতে পারে না। সুফল হয়।

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞগণ বলেন, মাসিক পত্রের বামদিকের পৃষ্ঠাপেক্ষা দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠা মূল্যবান, প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাথার উপরও মূল্যবান স্থান। "The right handed page is better than left hand page. Top of colums or page will be generally better than elsewhere."

বিজ্ঞাপনের বাহন

খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রসমূহে সংবাদ থাকে, জ্ঞানপ্রদ লেখা থাকে, পড়িয়া সুখ হয় এরূপ গল্প থাকে, কবিতা থাকে, নানামতের বিবৃতি ও আলোচনা থাকে, ইত্যাদি। তা ছাড়া, তাহাদের দ্বারা আর-একটি কাজ হয়, এবং সেই কাজ নির্ব্বাহ হয় বিজ্ঞাপনের দ্বারা। বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের বিক্রী করিবার কিছু আছে, তাঁহারা জিনিষের নাম বর্ণনা, দাম ও প্রাপ্তিস্থান লিখিয়া বিজ্ঞাপন দেন; এবং অনেক সময় যাঁহারা কোন রকমের মাল প্রচুর পরিমাণে চান, তাহা কে কি দরে দিতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেন। যাঁহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে চান, শ্রমিক চান, তাঁহারাও বেতন প্রভৃতি সর্ত্তের উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপন দেন। আবার যিনি বেকার বসিয়া আছেন, তিনিও নিজের কিরূপ কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কর্ম্মপ্রার্থী হন। পাত্র বা পাত্রী বিবাহার্থী হইয়া স্বয়ং বিজ্ঞাপন দিতেছেন, পাশ্চাত্য দেশে ইহা দেখা যায়। আমাদের দেশেও বিবাহসম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা পাত্রপাত্রী দেন না—বিশেষতঃ পাত্রী।

বিজ্ঞাপন কেমন করিয়া দিতে হয়, সে-বিষয়ে কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কোন্ কাগজে কিরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া কোন লাভ নাই, তাহাও বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞাপনদাতারা ভাল করিয়া জানেন—নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বা নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের কাগজে কেহ বেকন্ ও হ্যামের বিজ্ঞাপন দেয় না, মেম্‌সাহেবদের কাগজে কেহ মল্ বা নোলকের বিজ্ঞাপন দেয় না। এগুলো খুব সহজ দৃষ্টান্ত। কিনতি এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার সম্বন্ধে বলা সহজ নহে, যে কোন্ কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে জিনিষের কাট্‌তি বেশী হইবে। বাংলা কোন্ কোন্ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে গহনা বেশী বিক্রী হয়, বা পুরুষোচিত খেলা ও ব্যায়ামের সরঞ্জাম বেশী বিক্রী হয়, কিম্বা ভাল বহি বেশী বিক্রী হয়, অথবা জঘন্য বহি বেশী কাটে, তাহা বলা সহজ নহে; কিন্তু ঐ ঐ জিনিষের বিজ্ঞাপনদাতারা বোধ হয় অভিজ্ঞতার দ্বারা এবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তবে একটা বিষয় সহজেই চোখে পড়ে— এদেশের কাগজপত্রে ঔষধের বিজ্ঞাপন, বিশেষতঃ কুৎসিত রোগের বিজ্ঞাপন বেশী। তাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দেশ অস্বাস্থ্যকর, এবং দেশের নৈতিক অবস্থা ভারতভূমির আধ্যাত্মিকতার অনুরূপ নহে। ফলিত জ্যোতিষ, কোষ্ঠি, কবচ, প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন হইতেও দেশের লোকদের বিশ্বাস সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে।

কোন্ কাগজে কোন্ জিনিষের বিজ্ঞাপন দিলে সুবিধা হইবে, তাহা ব্যবসাদারেরা নিজে পরীক্ষা দ্বারা বা অন্যের অভিজ্ঞতা হইতে স্থির করিতে পআরেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ কাগজের কাট্‌তি যত বেশী, তাহাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া তাঁহারা তত বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু এখানে তাঁহারা একটু মুস্কিলে পড়েন। কাহার কাট্‌তি কত, তাহা কেমন করিয়া জানিবেন? বিজ্ঞাপনের অনেক এজেণ্ট্ নিজেরা যে-কাগজের এজেণ্ট্ তাহার কাট্‌তি বেশী করিয়া বলে, ও অন্য কাগজের কাট্‌তি কমাইয়া বলে; এবং কাগজের স্বত্বাধিকারী বা প্রকাশকেরাও সব সময়ে ঠিক্ খবর দেন না। বিলাতে ও আমেরিকায় কোন্ কাগজের কাটতি কত, তাহা সর্ব্বসাধারণের জানিবার কি উপায় আছে বলিতে পারি না, কিন্তু তথাকার প্রধান প্রধান কাগজের কাট্‌তির কথা কোন কোন বহিতে দেখা যায়। যাহা হউক, আমাদের দেশেও, কোন্ কাগজের কাট্‌তি ঠিক কত, এবং কাহার কাট্‌তি নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা জানিতে না পারিলেও, বেশী রকম কাট্‌তি কোন্ কোন্ কাগজের আছে, তাহা চেষ্টা করিলে জানিতে পারা যায়।

কিন্তু যে-সব দেশের লোকে ব্যবসা বুঝে এবং বিজ্ঞাপনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে, তাহারা শুধু কাট্‌তি দেখিয়াই কোন কাগজের বিজ্ঞাপনের বাহন হইবার যোগ্যতার পরিমাণ নির্ণয় করে না। তাহারা আরও কিছু দেখে। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বজ্ঞান-ভাণ্ডার। ইহার একাদশ সংস্করণে যে তিনটি নূতন ভল্যুম যোগ করিয়া দ্বাদশ সংস্করণ করা হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়টিতে খবরের কাগজ (Newspapers) সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটিতে লিখিত হইয়াছে :—

In 1914, according to the government census figures, the total amount derived by American newspapers from subscriptions and sales was 99,541,860 dollars, while the advertising revenues were nearly double this amount, the exact figure being 184,047,106 dollars. One of the clearest evidences of the actual influence of advertising was in the changing attitude towards circulation. Mr. Whitelaw Reid, for many years editor-in chief of the New York Tribune, wrote in 1900 that a great circulation, no matter among what classes, was then regarded as the only evidence of success and the only way to make a newspaper sold below cost ultimately a source of profit. That was perhaps a natural theory to adopt in the days when the potency of advertising on a large scale was first

being tested and exploited. Its fallacy was discerned even then by farsighted publishers and advertisers. That the interests of advertising did not lie exclusively in a large circulation was perceived as early as 1891 by Mr. Adoloph Ochs, who not only profited greatly by his discovery, but in his administration of the New York Times set an example which was of salutary effect throughout the country. In a speech delivered before the National Educational Association, Mr. Ochs, then the proprietor of a newspaper in Chattanooga (Tenn.), said : "It is not alone the circulation that the newspaper has that fixes its value as an advertising medium. It is more the character and standing of its readers, the appearance of the paper, its news features, its editorial ability and its general standing in the community. That was in 1891, the very moment when the "yellow" press was making its first success. Five years later Mr. Ochs acquired the New York Times, and set about to rebuild it, a task of formidable proportions, for the Times, inspite of an honourable history, was then struggling along with the circulation of hardly more than 10,000. Within 20 years the Times had built up a circulation of 325,000 (1916) and its total annual revenue was in the neighborhood of 5,000,000 dollars, two-thirds from advertising.

The encouraging example of the New York Times and a few other newspapers notably the Chicago Daily News and the Kansas City Star, was coincident with an advance in the theory and practice of advertising which had widespread results. It came to be seen that the effect of an advertisement was influenced to a large degree by the character of the newspaper in which it appeared, and then an incredulous reader of the news columns was likely to be incredulous reader of the advertisements. Experience also showed that the character of the circulation was quite as vital as its extent.

Thus the influence of advertising, coupled with a natural desire for prestige and authority, to act as a corrective for some of the worst evils that had been noted in the American press. Towards the end of the decade their mas a marked improvement in the accuracy and impartiality of the news columns.

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহার সমস্তটির ঠিক অনুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক। আমেরিকার লোকেরা খুব ব্যবসা বুঝে এবং তাহাদের ব্যবসাও বহুবিস্তৃত ও অনেক টাকার। ১৯১৪ সালে তাহারা শুধু বিজ্ঞাপনেই প্রায় ৬০ কোটি টাকা খরচ করিয়াছিল, এখন আরও বেশী করে। ইহা হইতেই তাহাদের ব্যবসার পরিমাণ বুঝা যায়। খবরের-কাগজ-ওয়ালারা ১৯১৪ সালে বিজ্ঞাপন হইতে ৬০ কোটি টাকা পাইয়াছিল, কিন্তু গ্রাহক ও নগদ ক্রেতাদের নিকট হইতে ৩০ কোটি টাকা পাইয়াছিল। আমাদের দেশী কাগজগুলির বিজ্ঞাপনের আয় গ্রাহক ও ক্রেতাদের প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণ নহে। আমেরিকার ব্যবসাদারেরা কাগজের কি কি গুণ দেখিয়া তাহাতে বিজ্ঞাপন দেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য নীচে দিতেছি।

"কোনও সংবাদপত্রের কেবলমাত্র কাট্‌তিই উহার বিজ্ঞাপনের বাহন হইবার যোগ্যতা নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায় নহে। এই যোগ্যতা অধিকতর পরিমাণে নির্ভর করে, ইহার পাঠকগণ কিরূপ স্বভাবের, কি দরের, সামাজিক কি মর্য্যাদা ও অবস্থার মানুষ, তাহার উপর; কাগজখানার চেহারা কিরূপ, তাহার উপর; ইহার সম্পাদকের যোগ্যতার উপর; এবং দেশের লোকদের মধ্যে ইহার মর্য্যাদা কিরূপ তাহার উপর। এইরূপ ধারণা অনুসারে কাজ করিয়া নিউইয়র্ক টাইম্‌সের পরিচালক মিষ্টার অক্‌স্‌ উহার গ্রাহকসংখ্যা দশ হাজার হইতে সওয়া তিন লক্ষে পরিণত করেন, এবং ১৯১৬ সালে উহার আয় দেড় কোটি টাকা হয়, তন্মধ্যে বিজ্ঞাপন হইতেই এক কোটি।

"নিউইয়র্ক টাইম্‌স ও অন্য কয়েকটি কাগজের দৃষ্টান্ত হইতে ব্যবসাদারেরা বুঝিতে পারে, যে, কোন কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে তাহার ফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে কাগজটির 'চরিত্রে'র উপর, অর্থাৎ কাগজখানির উৎকর্ষ, শ্রদ্ধেয়তা প্রভৃতির উপর; যদি কোন কাগজের সংবাদ মন্তব্য প্রবন্ধাদিতে পাঠকের আস্থা স্থাপন করিতে না পারে, যদি তাহারা কাগজখানাকে অবিশ্বাস করে, তাহা হইলে উহাতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলিকেও অবিশ্বাস করিবে। অভিজ্ঞতা হইলে ইহাও প্রতীত হয়, যে, কি রকম লোকদের মধ্যে পত্রিকা-বিশেষের কাট্‌তি হয়, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

“এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ আমেরিকার অনেক কাগজের অনেক নিন্দনীয় বিশেষত্ব তিরোহিত হইয়াছে, এবং তাহাদের লিখিত বিষয়সকলে নিরপেক্ষতা, ভ্রমশূন্যতা, অত্যুক্তিহীনতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।”

পরিশিষ্ট । তিন

ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, এম্. এ

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মাল-বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য যে কত অধিক তাহা এখনো আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা দ্রব্য-নির্ম্মাতা বা ম্যানুফ্যাক্‌চারার তাহারাও যে বিজ্ঞাপনে খুব আস্থাবান তাহা মনে করাও শক্ত। তবে ইহা সত্য যে পাশ্চাত্য জগতেও শিল্প-বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় দ্রব্য-নির্ম্মাতারা বিজ্ঞাপনে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিতেন না। ঐতিহাসিক ভাবে দেখিতে গেলে বলা চলে যে, বাজারে বিক্রয়যোগ্য একই প্রকার জিনিষের যত প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে, দ্রব্য-নির্ম্মাতৃগণ বাধ্য হইয়া ততই বিজ্ঞাপনের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

অনেকের ধারণা যে বিজ্ঞাপনে অর্থ-ব্যয় করা অর্থ নষ্ট করা মাত্র। যত টাকা দিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তত টাকা খরচ কমাইয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিলে বাজারে মাল বিক্রয় হইবে বেশী। কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক না হইলেও যে ভাবে এ মতটী ব্যক্ত করা হয় তাহা একেবারেই অগ্রাহ্য। ইহা সত্য যে, যে মালের বিক্রয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে করা হইবে তাহার দাম যত কম হইবে বিক্রয় ততই বাড়িতে থাকিবে। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয়েরও মাল-বিশেষে, বাজার-বিশেষে এবং অনেক সময় কাল-বিশেষে একটা সীমা আছে, যাহা অতিক্রম করিলে মালের পড়তাই বাড়িয়া যায়, বিক্রয় বেশী হয় না। কিন্তু এ সব হইতেছে, ‘বিশেষ’ বা অসাধারণ অবস্থার ব্যাপার ; আপাততঃ এই সকল দৃষ্টান্তের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া এ কথা খুব বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় না। কারণ, প্রথমতঃ, উৎপন্ন হইলেই ত আর জিনিষ বিক্রি হয় না—প্রতি দ্রব্যের জন্যই একটী বিশেষ বিক্রি-ব্যবস্থা আছে। বাজারে মাল চালাইতে হইলে তাহার জন্য অর্থব্যয় করা চাই—নহিলে কোন ক্রেতা নির্ম্মাতার ফ্যাক্টরী হইতে মাল লইয়া যাইবে না। এমন কি কোন খুচ্‌রা বিক্রেতাও ফ্যক্টরী হইতে মাল যোগাড় করিতে আসিবে না। বিজ্ঞাপনের ব্যয় এই বিক্রি-ব্যবস্থার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয়েরই অঙ্গীভূত। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয় করিয়া যদি বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায় তবে উৎপন্ন দ্রব্যপ্রতি নির্ম্মাতার পড়তা কমিয়াই যায়, বাড়ে না। অর্থনীতির স্থূল তত্ত্বগুলির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনে খরচ বৃদ্ধি পায় এই যুক্তি সেই ব্যবসায়ীরাই দিয়া থাকেন যাঁহারা বিজ্ঞাপনের আর্থিক মর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই। তারপর, এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা বিজ্ঞাপন যে কি তাহা ভাল করিয়া বুঝেন না। এই সব ব্যবসায়ীদের অনেকে বিজ্ঞাপনে বহু অর্থব্যয় করিয়া নিরাশ হইয়াছেন এবং অবশেষে বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞান সম্বন্ধেই হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-প্রদান কেবল কতকগুলি বিনুনি কথার ফাঁকা আওয়াজ করাই নয়। ক্রেতার ঝাঁকে যেমন তেমন করিয়া দুটো কুচ্-কাওয়াজ করিলে খরিদ্দার শিকার করা যায় না। প্রকৃত বিজ্ঞাপন একটী পূর্ব্ব-কল্পিত অভিযান—এর পথঘাট গোড়া থেকেই বাঁধিয়া নিতে হয় ; কোন্ সুড়ঙ্গের পথে প্রবেশ করিয়া কোন্খানে নিষ্ক্রান্ত হইলে ক্রেতার সম্মুখীন হইতে পারা যাইবে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া আগেই ঠিক করা দরকার। চিন্তা না করিয়া যখন তখন যেমন তেমনভাবে বিজ্ঞাপন দিলে কাজত হয়ই না বরং তাহাতে প্রচুর অর্থনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

উপরে বিজ্ঞাপনকে অভিযানের যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। আয়োজন-হিসাবে বিজ্ঞাপন চালান সামরিক অভিযানের সঙ্গে তুলিত হইলেও ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য যে, বিজ্ঞাপনের সফলতা তখনই যখন ইহা জনসাধারণকে সম্মোহিত করিতে পারে—যখন অভিভূত করিতে পারে তখন নয়। ক্রেতার মনকে অধিকার করিবার একমাত্র উপায় তাঁহার নিকট আবেদন করা বা তাঁহাকে সাজেস্শান দেওয়া, কোনপ্রকার মানসিক বলপ্রয়োগ করা নায়। মানসিক বলপ্রয়োগে ক্রেতার মনে ক্রয়-ইচ্ছা না জন্মাইয়া বরং ক্রয়-বিমুখতাই জন্মাইয়া দেয়। এই ইচ্ছা-জন্মানেরও মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া একটী বিশিষ্ট নিয়ম আছে। বিজ্ঞাপনে প্রথম জন্মাইতে হইবে ক্রেতার মনোযোগ, তারপর অনুরাগ, তারপর ক্রয়েচ্ছা, পরিশেষে ক্রয়-চেষ্টা।

এসব কথা অনেকের জানা নাই বলিয়াই এদেশে সংবাদ পত্রের স্তম্ভে আমরা বিজ্ঞাপনের এত উদ্ভট নিদর্শন দেখিতে পাই। অনেক বিজ্ঞাপন-দাতাই দেখিতে পাই চীৎকার করিয়া বিজ্ঞাপিত জিনিষের গুণ-কীর্ত্তন করেন। ফলে বিজ্ঞাপন মানে দাঁড়াইয়াছে বিশেষণের ছড়াছড়ি আর অত্যুক্তির কসরৎ। আবার কোথায়ও দেখিতে পাই বিজ্ঞাপনদাতারা "অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা" "সুবর্ণ সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ" ইত্যাদি উত্তেজনাকারক শিরোনামা বা হেড্লাইন ব্যবহার করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। সম্প্রতি দেখিতেছি উদ্ভট রকমের চেহারা প্রভৃতি দিয়াও এই প্রকার চেষ্টা কখন কখন করা হয়। বলা বাহুল্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেই বিজ্ঞাপন কৃতার্থ হইতে পারে না। তা ছাড়া, অনেক বিজ্ঞাপনদাতাই বিজ্ঞাপন স্থানের স্বল্প কলেবরের মধ্যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

লিখিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। ইঁহারা ভাবিয়া ও দেখেন না যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের সমগ্র বংশ-তালিকা বা গুণের ফিরিস্তি লইবার অবকাশ কত কম। তা ছাড়া, অনেক সময় বেশী পাঠ্য-সামগ্রী থাকার দরুণ বিজ্ঞাপন দুরূহ-পাঠ্য হইয়া দাঁড়ায়। সব চাইতে আমাদের দেশীয় বিজ্ঞাপনে যে জিনিষটার বেশী অভাব সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের সজ্জা বা "লে আউটের" অভাব। বিজ্ঞাপন এক হিসাবে মুখ্যতঃ ছবিমাত্র। এই কথাটা আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাদের বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক। অবশ্য বাংলাতে বিজ্ঞাপনের বিশেষ অসুবিধা এই যে, বাংলা অক্ষরের চেহারার বৈচিত্র্য এবং আকারের পার্থক্য অতিশয় অল্প। ইংরাজী অক্ষরের এই হিসাবে সম্পদ্ অপর্য্যাপ্ত। ফলে বাংলাতে বিজ্ঞাপনের চিত্র-সজ্জা (ডিজাইন) তত ভাল হয় না যতটা ইংরাজীতে হয়। তবুও যিনি বিজ্ঞাপন-বিদ্ তিনি এই কলার বহু-কৌশল ব্যবহার করিয়া বাংলা-বিজ্ঞাপনকেও অনেকটা চিত্র-সজ্জা দান করিতে পারেন—ইংরাজীতে ত কথাই নাই। তবে কথা এই যে অক্ষর-ব্যবহার, ব্লক-ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপার এত বিশেষজ্ঞানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ ব্যক্তি—যিনি বিজ্ঞাপন-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নহেন—তাঁহার এই সকল বিষয় জানা আছে বলিয়া আশা করা যায় না। সেদিন দেখিলাম কোন এক তিন আনা দামের পুস্তকের বিজ্ঞাপন-দাতা বিজ্ঞাপনে পঞ্জিকার ছবি দিয়াছেন এবং বাংলা দৈনিক কাগজের স্তম্ভে দিয়াছেন তাহারই এক হাফ্টোন ব্লক। ব্যাপারটা কতটা যে অশোভন হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। লাইন ব্লক করাইতে হইলে পূর্ব্বে চিত্র করাইবার যে খরচ তাহা বাঁচাইবার জন্য বিজ্ঞাপন-দাতা ঐরূপ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কোন কোন কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই কোম্পানীর নাম অপেক্ষা কর্ম্মচারীর নাম কিংবা দ্রব্যের নাম অপেক্ষা স্বত্বাধিকারীর নাম বৃহত্তর অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। বলাবাহুল্য এই সব স্থলে বিজ্ঞাপনে-জ্ঞানের অভাবই সূচিত হয়।

বিজ্ঞাপন শুধু খবরের কাগজেই নয় আরও অনেক প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপনের রীতি দেখিয়া মনে হয় আমাদের দেশে যথার্থ বিজ্ঞাপন প্রদানের নিয়মকানুন আজ পর্য্যন্ত লোকেরজানা নাই। অথচ বিজ্ঞাপনই হইল বিক্রয়-ব্যবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

পরিশিষ্ট । চার

বিজ্ঞাপনে বলো

দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যাল

বিশ্বকবি বন্দিত দধি পান কোরতে কোরতে আমার প্রায়ই মনে হয় যে দই-এর সঙ্গে ভালো মিল দিতে ভালো কবির প্রয়োজন হয়ত আছে কিন্তু ভালো দই কোথায় মিলতে পারে কবির চেয়ে তা সাধারণ লোকেরই বেশী জানার কথা। কাব্যের রস না উপভোগ কোরতে পারলে যেমন কবি হওয়া যায় না, তেমনি রসনার কাব্যেরও সত্যিকারের সমজদার অতি বিরল। হয়ত রবীন্দ্রনাথ কাব্যের রসে এবং রসনার কাব্যে সমান অধিকারী ছিলেন এবং তর্কের খাতিরে তা স্বীকার কোরলেও ভেবে দেখতে হবে যে তাঁর মন্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাঁর কবিখ্যাতির ওপর লক্ষ্য রেখেই কী না?— এইখানেই বিজ্ঞাপনের ক্রীতদাস আমরা – বিজ্ঞাপনের পায়ের কাছে বিক্রীত।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিযুগেই মানুষ তার আগমনের সাক্ষ্য রেখে গেছে সোনার অক্ষরে। স্থাপত্যের যুগে সে তৈরী করেছে তাজমহল, সংস্কৃতির প্রথম দিনেই সে তক্ষশীলায় বিদ্যাকে বন্দনা জানিয়েছে। এমনি প্রতি যুগেই তার সৃষ্টির ইতিহাস স্মরণীয়। এই সেদিনও তার হাতে ঢাকাই মসলিন ছিলো সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের শেষ—কথা। কিন্তু বিংশ শতাব্দী কোন শিল্পের যুগ নয়, কোন শিল্পীরও নয়, এ হ’লো নিছক হৈ-হৈ-এর, সম্মিলিত হুজুগের দিন। এমনকি এই হুজুগ থেকেই হয়ত বলা যেতে পারে এ-যুগের শিল্পেরও আবির্ভাব। বিংশ শতাব্দী যদি সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সমস্ত চারুকলাকে নষ্ট কোরে দিতে উদ্যত হয়ে থাকে—ত’ সেই সঙ্গেই একটি নোতুন শিল্পের জন্মও সে দিতে সক্ষম হয়েছে : সে—হল বিজ্ঞাপনের আর্ট। এবং বলাই বাহুল্য সর্ব্বযুগের সমস্ত শিল্পকেই সুচারুভাবে কলা প্রদর্শন করেই—তবেই এই নোতুন শিল্পের আটচালার নয়া-শিল্পীর দল এগিয়ে চলেছে নিত্য প্রতিষ্ঠার পথে।

নিজেকে সকলের আড়ালে রেখে, সকলের চেয়ে বেশী জাহির করার যে আর্ট তারই নাম বিজ্ঞাপন। এ যুগের একটি মাত্র বাণীই আছে, একটি মাত্র কথাতেই এ-শতাব্দীর সব কথা শেষ। সে কেবলই বলছে : দিকে এবং বিদিকে, দিগ্বিদিকে নিজের বিজ্ঞাপন দিন, আপনার দিগ্বিজয়ের সচিত্র বিজ্ঞাপন।

সকাল বেলায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে যার নাম আপনি প্রথম টের পান, একটু পরেই অফিস ট্রামের সর্ব্বাঙ্গে তারই সচিত্র পরিচয় আপনাকে রোমাঞ্চিত করে। তারপর শুধু মাত্র কয়েকজনের মুখে তার নাম-কীর্ত্তনেই উত্তেজিত হতে আরম্ভ করেন। এবং বহু দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে দোলায়মান—অবস্থা থেকে কাটিয়ে উঠে কোন একদিন অফিস থেকে ফেরবার মুখে সেটি কিনে নিয়ে তবেই আপনার নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস পড়ে, আপনার মুখে পরম নির্ভরতার উজ্জ্বল হাসি দেখা দেয় অবশেষে।

বিজ্ঞাপনকে যে কত মুহূর্ত্তে এবং কী অজান্তে মাশুল জোগাচ্ছেন তা হয়ত আপনার নিজেরই জানা নেই। অফিসে মধ্যাহ্ন ভোজনের সঙ্গে আপনি হয়ত পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে একটি ডাক্তারী প্যামফ্লেট গলাধঃকরণ কোরেছেন। তাতে হয়ত আছে একটি বিশেষ অসুখের সবিস্তার বর্ণনা। পড়তে পড়তেই হয়ত আপনার নিজের কথা মনে পড়ছে এবং হ্যাঁ বিবরণ—বর্ণিত রোগের সমস্ত উপসর্গের সন্ধান আপনার শরীরেই পাচ্ছেন। ব্যাস তারপরই ভাবনা সুরু হল, ভাবনা আর ভয়ের জয়যাত্রার আরম্ভ ত তখন থেকেই। বিকেলে যখন বাড়ী ফিরছেন, তখন হঠাৎ চোখ পড়ল গিয়ে রাস্তার একটি সুদৃশ্য হোর্ডিংএর ওপর—একটি ওষুধের বিজ্ঞাপন। চমকে উঠলেন পড়েই। এইত দুপুরে পড়া রোগের অমোঘ প্রতিষেধকের সন্ধান ত পেয়েই গেছেন আপনি। কিন্তু দুপুরের সেই নাম-ধাম-হীন ডাক্তারী প্যামফ্লেট আর আর বিকেল বেলায় পড়া এই হোর্ডিংএর চতুর যোগাযোগের আবিষ্কার করার মত চোখ তখন আপনি হারিয়েছেন। বাড়ীতে যখন ফিরলেন তখন টেবিলের ওপর রয়েছে ওষুধের একটি নোতুন শিশি, খোলবার অপেক্ষায়। এবং হয়ত আপনার পার্সের বিপুল উদর বিজ্ঞাপনের মাশুল জোগাতে চুপসে একটু রোগা হয়ে গেছে কখন !

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এ অঘটন আজ দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাক-মাথাওয়ালা লোকের কাছ থেকে টাকের ওষুধ কিনে টাকা বিসর্জ্জন দেওয়ার ইতিহাস ত' আজ পুরাণো হয়ে গেছে। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে লক্ষ্মীর বর পাবার জন্যে রজত পুষ্পাঞ্জলি ঢালতে হচ্ছে আজ বিজ্ঞাপনের উপ-লক্ষ্মীর পায়ের কাছে।

বিজ্ঞাপন সত্যিই মোটাকে রোগা কোরতে পারে না (এ প্রবন্ধের লেখকই তার একমাত্র উদাহরণ নয়), বেঁটেকেও লম্বা কোরতে পারে না, কিন্তু চালাককে বোকা বানাতে সে পারে, পারে অত্যন্ত অনায়াসেই। তা—না হলে 'ঘোরকৃষ্ণ' কোন লোক পাউডার কেনে 'গৌর' হবার আশায়? লক্ষ্য কোরলে দেখবেন এই দৌর্ব্বল্য থেকে আবালবৃদ্ধবণিতা কোন গৌড়জনই মুক্ত নয়। অতীত যারন্ধকার ভবিষ্যতের আলেয়া তাকেই আকর্ষণ করে সব—চেয়ে বেশী। এই আকর্ষণ জ্যোতিষের বিজ্ঞাপন দ্বারা লালিত হয়। এবং বিজ্ঞাপন যে ভালো ভাবে দিতে পারে সে

পরের ভবিষ্যত না বলতে পারলেও নিজের ভবিষ্যত গড়ে তোলে। সত্যি কথা বলতে আমাদের জীবন আজ একরকম পরিচালিত হচ্ছে বিজ্ঞাপনের অঙ্গুলী সঙ্কেতে। ভাগ্যবিধাতারই দুর্ভাগ্য বলতে হয়। বিজ্ঞাপন আমাদের অর্থ লালসাকে যেভাবে 'ক্রমবর্দ্ধমান' কোরে চলছে তাতে যাঁরা বহুদিন আগে 'অর্থমনর্থম্'—এই কথা বলতে পেরেছিলেন তাঁদের প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়।

৩

কিন্তু 'বিজ্ঞাপন' সবচেয়ে নির্ম্মম কবিদের ওপর। রবীন্দ্রনাথের হাল্কাচালে লেখা "এসো চাতকদল—চাস্পৃহ চঞ্চল" চায়ের বিজ্ঞাপনে চমৎকার চলে। কিন্তু মনে করুন : "বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে" একটি পড়ে আপনার মনে যখন সবেমাত্র একটি অনুরণন আরম্ভ হয়েছে তখনই যদি জানতে হয় যে অতএব : "আষাঢ় আসার আগেই সাবধান হন। ওয়াটার-প্রফ কিনুন।" তখন কী মনে হয় আপনার? কেমন লাগে? রবীন্দ্রনাথকে হত্যা কোরবার জন্য এর চেয়ে ভীষণ অস্ত্র আর কি আছে?

"বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল" এ-কবিতা আর পড়তে ইচ্ছে হয় না যখন এই জ্ঞান পরিপক্ক হয় যে বেলা পড়ে এলেও ভয় নেই—অমুক পাম্প তৈরীই আছে—যখন খুসী জল তুলে নিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন মানুষের মনকে কতদূর মোহমুগ্ধ কোরেছে তার আরো কিছু নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। মেয়েদের প্রসাধনদ্রব্য আজকাল যদি সিনেমা অভিনেত্রীরাই বেছে না দেন তবে তা কে কিনবে? কিন্তু যাঁদের স্বাক্ষর এইভাবে আপনার বাড়ীর মহিলাদের শীকার কোরে থাকে তার পেছনেকতখানি সত্য আছে কখনো ভেবে দেখেছেন তা। অভিনয় যাদের পেশা, এটাও যে তাদের অভিনয় নয় তা জানলেন কেমন করে। চা— খেলে খেলবার উৎসাহ বাড়ে এ-কথা শুনে যত লোক চা খাচ্ছে, তাদের মধ্যে একশো জন কিছু খেলেই কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। এই দাসসুলভ মনোভাব থেকেই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞাপনের জন্ম এবং এদের জন্যেই ব্লেডের বিজ্ঞাপন যদি বুড়ো বর্ণড শ'র প্রশংসা স্বাক্ষর দেখা গিয়ে থাকে কওনদিন আশ্চর্য্য হবেন না।

কিন্তু বিজ্ঞাপনের মুখোস আরো বিচিত্র। বই-এর বিজ্ঞাপনে বহুদিন ধরে বহু লোকের বহু প্রশংসা জুড়ে দেওয়া হত। কিন্তু পাঠক যেই বুঝতে পারলে যে এর অনেকগুলি পত্রই না-পড়ে দেওয়া অম্নি তার রীতি গেলে বদলে এবং সেই সঙ্গেই নোতুন কিছুর জন্যে রীতিমত গবেষণা গেলো আরম্ভ হয়ে। হঠাৎ একদিন জানা গেলো অমুকের অমুক বইটি অতি-নিন্দিত হয়েছে সাহিত্যিক মহলে। ব্যস ! প্রশংসার আক্রমণ যদি বা সামলানো

গিয়েছিলো, নিন্দার আকর্ষণ আর ঠেকানো সম্ভব হল না। প্রশংসার মোহ যারা কাটিয়ে উঠেছিল, নিন্দায় মোহিত হল তারাই।

যুদ্ধের দিনে যখন কিছুই পাওয়া যায় না—তখনও বিজ্ঞাপন কেন? অনেকের দৃষ্টিতেই এই জিজ্ঞাসার চিহ্নে যত না অবাক হয়েছি—বিজ্ঞাপন দাতাদের দূরদৃষ্টিতে বিস্মিত হয়েছি তার চেয়েও বেশী। ‘রঙ্গীন পাড়ের অবস্থা সঙ্গীন’ বলে যত লোককে সাবধান করার চেষ্টা হয়েছে তার চেয়ে ঢের বড় প্রচেষ্টা হল ওই বিশেষ শাড়ীটী যাতে চোখের আড়ালে গেলেও মনের আড়ালে না যায় তারই জন্য। ‘ইউস লেস পেপার’ রি কথা জানাবার জন্যে যে কত পেপার useless হয়ে গেলে কে তার খবর রাখে।

জীবনানন্দের সেই আশ্চর্য্য দ্যুতিময় কটি কথা যা বিদ্যুতের মত মুহূর্ত্তে আমাদের আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায় : ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।”—সেই ক্ষণিক আলোককে মুহূর্ত্তে ম্লান কোরে দিতে এর পরেই তেলের একটি সুচারু বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট নয়—কি?

সাহিত্য—সাহিত্য , বিজ্ঞাপন হল বিজ্ঞাপন। যদি বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষ কোন সাহিত্য গড়ে তুলতে হয়ই—তাহলে সেই বিজ্ঞাপন সাহিত্যের জন্যেও প্রথম শ্রেণীর কলম যার হাতে—তারই ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো।

৪

এই জন্যেই ওদের দেশে ‘বিজ্ঞাপন’ আজ সত্যিই আর্টের পর্য্যায় উপনীত হতে পেরেছে। তার জন্যে আলাদা আর্টিষ্ট আলাদা লিটারেচার—তার জগৎই আলাদা। ওরা যখন বিজ্ঞাপন দেয়; Smoking is strictly prohibited, even if it is Havana—আমরা তখন তার অত্যন্ত নোংরা অনুকরণ করেই বাহবা পেতে চেষ্টা কোরি। আমাদের দেশেও ভালো লেখকের হাতে পড়লে ভালো বিজ্ঞাপনও যে লিখিত হতে পারে— কয়েক বছর আগেই তার একটি নমুনা পাওয়া গেছে : “বাজারে দু’রকম ঘি—শ্রী আর বিশ্রী” লেখার মধ্যে এই একটি লাইন একশো একটি বিজ্ঞাপনের কাজ করে। কিছুদিন আগে স্পোর্টসের একটি দোকান বিজ্ঞাপিন দিয়েছিলো : চোর—চোর, গাদি, কাপাটী—খেলা ছাড়া আর সমস্ত প্রকার ক্রীড়ার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষ এখানে পাবেন।” এটী কথঞ্চিৎ crude হলেও—ভালো বিজ্ঞাপন, সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞাপন ক্রমশ গল্পের পাতা থেকে ছায়া—ছবির পর্দ্দাতেও স্থান সংগ্রহ কচ্ছে। চা-পার্টিতে কয়েকটি লোকের মুখে একটি বিশেষ চায়ের বিজ্ঞাপন কায়দামাফিক জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে কিছুকাল থেকে। কিন্তু

এর একটিও উল্লেখযোগ্য হয়নি। প্রতিবারই দর্শকের কাছে ধরা পড়ে গেছে। বিজ্ঞাপন হ'ল সেই সূতোর মত যা ম্যাজিসিয়ানের টেবিলের ওপরের কাটা মুণ্ডুটাকে নাচায়—কিন্তু সূতোটা দেখতে পেলেই সর্ব্বনাশ।

৫

বিজ্ঞাপনের আরেকটি বাহন আবিষ্কৃত হয়েছে এই সেদিন। এই আবিষ্কার একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এম্যেরিকার একজন ক্রোড়পতি কোন এক সন্ধ্যাবেলায়—ক্রোড়পতিরা অকারণেই যেমন হয়ে থাকেন—ভারী বিমর্ষ বোধ কচ্ছিলেন। অকৃতদার সেই ক্রোড়পতির দুঃখ—ক্রোড়পত্নীর অভাবেই কী না কে জানে? এমন সময় রেডিওতে কে একজন তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করলেন। ভদ্রলোক যতই সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনেন ততই তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হতে থাকে যে এইখানে না যাওয়াই একটা ভ্রম। রেডিও— মারফৎই শোনবা গেল জাহাজ ছাড়ছে শিগ্‌গীর—ভাড়াও সামান্য। এ সুবিধে হাতে পেয়ে কেউ ছাড়ে না। নির্দ্দিষ্ট দিনে জাহাজে গিয়ে উপস্থিত হতে তিনি দেখলেন তিল ধারণের স্থান নেই। একটু পরেই হঠাৎ তিনি শুনলেন অপেক্ষমান দু'জন আলাপ কচ্ছে : "রিচার্ডসের বাহাদুরী আছে বলতে হবে।" ভদ্রলোক আরও একটু উৎসাহিত হয়ে কান পাতলেন !

অন্য জনের প্রশ্ন : "কেন?—বাহাদুরী কিসের?"

"আরে এ-জাহাজ কোম্পানী কোন দিন এত টিকিট বেচেছে না কি? ও ত এইচার্ডসের এডভাটাইসিং এজেন্স্যার দেওয়া রেডিও—বিজ্ঞাপনের ফলেই—আবার কী?"

একটু পরেও আলাপরত দু'জন দেখল তাদের স্মনের এক ভদ্রলোক তার হোল্ড-অল, জিনিষপত্তর সব নামাতে বলছেন, এবং আশ্চর্য্য নিজেও নেমে চলেছেন?

আরে? কী ব্যাপার?—হাঁ হয়ে গেলো তারা। কতক্ষণ তারপরেও হাঁ করে ছিলো কে জানে? তাদের সামনে দিয়ে এইমাত্র যিনি নেমে গেলেন—আমাদের সেই—রেডিও শ্রোতা বিমর্ষ ক্রোড়পতি কে—যদি তারা জানতে পারত? জানা অবশ্য এমন কিছু শক্তও ছিলো না। ঘাড় নীচু কোরলেই দেখতে পেতো ব্যাগের গাঁয়ে আঁটা একটা কার্ডে পরিষ্কার লেখা : William Richards :— New York Advertising Agencyর পনেরো আনা অংশের মালিক।

ব্যাপারটা আমার নিজের কাছে খুব ভালো ঠেকে না। বিজ্ঞাপন দিয়ে বিজ্ঞাপন রাজকেই এমনভাবে প্রতারিত করাটা মোটেই ভদ্র নয়।—ব্যাপারটাকে ফিফ্‌থ কলাম্নিষ্টের কাজের মধ্যেই গণ্য কোরতে হয় আমাকে, নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই বিমুখ হতে হয় তার প্রতি।

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি

১. অজিত কুমার খান (প্রকাশিত), *হাসির গোয়েন্দা গল্প*, কলকাতা : শৈব্যা পুস্তকালয়, ১৯৫৪।

২. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০০৯।

৩. অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮৬।

৪. অনাথগোপাল সেন, *টাকার কথা*, কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

৫. অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, *নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২।

৬. অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, *খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না : সুত-মিত বাঙালি সমাজে, কলকাতা : রাবণ, ২০২২।*

৭. অনির্বাণ রায়, *বই যখন বই*, কলকাতা : ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১০।

৮. অনীক (সম্পাদিত), *অনীক পঞ্চাশ বছর রচনা সংকলন*, প্রথম খন্ড (১৯৬৪-১৯৭২), কলকাতা : অনীক, ২০১৩।

৯. অনুপম অধিকারী, সন্দীপন দাশগুপ্ত এবং দেবলীনা চ্যাটার্জী, *বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ*, কলকাতা : আলপনা, ২০২১।

১০. অবনী লাহিড়ী, *তিরিশ চল্লিশের বাংলা : রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে*, রণজিৎ দাশগুপ্ত (সাক্ষাৎকার ও সম্পাদনা), কলকাতা : সেরিবান, ২০০১।

১১. অবনীনাথ রায়, *পাঁচমিশেলি*, কলকাতা : ডি, এম, লাইব্রেরী, ১৯৩১।

১২. অবনীনাথ রায়, *প্রবাসী বাঙালী*, কলকাতা : পি. সি. সরকার এন্ড কোং, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

১৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ১৯৭৫।

১৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত*, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭৬।

১৫. অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *শতপত্র*, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, শতবার্ষিকী স্মারক সংকলন, কলকাতা : দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।

১৬. অমিত ভট্টাচার্য, *বাংলার স্বদেশী নবজাগরণ,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৮।

১৭. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

১৮. অমিয়কুমার চক্রবর্তী (সম্পাদক), *হালকা হাসির গল্প,* কলকাতা : অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ১৯৫৯।

১৯. অমিয় বসু (সম্পাদিত), *বাংলায় ভ্রমণ,* প্রথম খন্ড, কলকাতা : পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ, ১৯৪০।

২০. অমিয় বসু (সম্পাদিত), *বাংলায় ভ্রমণ,* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা : পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ, ১৯৪০।

২১. অম্লান দত্ত, *প্রগতির পথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭।

২২. অম্লান দত্ত, *ব্যক্তি যুক্তি সমাজ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৯।

২৩. অম্লান দত্ত, *সমাজ সংস্কৃতি স্মৃতি,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৭।

২৪. অর্জুন গোস্বামী (সম্পাদিত), *বঙ্গভঙ্গ : ১৯০৫,* কলকাতা : চয়নিকা, ২০০৫।

২৫. অরিন্দম চক্রবর্তী, *এ তনু ভরিয়া: দর্শন আপাদমস্তক,* কলকাতা : অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০২০।

২৬. অরিন্দম চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *বাঙালির ইওরোপ চর্চা,* কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৬।

২৭. অরুণ ঘোষ (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বই যথা,* কলকাতা : অবভাস, ২০১২।

২৮. অরুণ সেন ও মফিদুল হক (সম্পাদিত), *ধ্বংসস্তূপে আলো : বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির বিবাদ,* কলকাতা : প্রতিক্ষণ, ১৯৯৩।

২৯. অশোক মিত্র, *অকথা কুকথা,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

৩০. অশোক মিত্র, *অচেনাকে চিনে চিনে,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬।

৩১. অশোক মিত্র, *আপিলা চাপিলা,* কলকাতা : আনন্দ, ২০০৩।

৩২. অশোক মিত্র, *আমার দেশ,* ভূদেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুদিত ও সংকলিত), কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৫৪।

৩৩. অশোক মিত্র, *কবিতা থেকে মিছিলে ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* কলকাতা : অয়ন, ১৯৮০।

৩৪. অশোক মিত্র, *কলকাতা প্রতিদিন,* মালিনী ভট্টাচার্য এবং মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুদিত), কলকাতা : রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৫।

৩৫. অশোক মিত্র, *তাল বেতাল,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।

৩৬. অশোক মিত্র, *নাস্তিকতার বাইরে ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯০।

৩৭. অশোক মিত্র, *পটভূমি,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২।

৩৮. অশোক মিত্র, *পুরানো আখরগুলি,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০।

৩৯. অশোক মিত্র, *প্রতিদিনের কথা,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

৪০. অশোক মিত্র, *প্রশ্ন উত্তর উত্তরহীনতা,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০১।

৪১. অশোক মিত্র, *সকলই তোমার ইচ্ছা,* কলকাতা : চিরায়িত প্রকাশন, ১৯৯৩।

৪২. অশোক মিত্র, *সমাজ সংস্থা আশা নিরাশা,* কলকাতা : রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৮।

৪৩. অশোক মিত্র, *সংকটের স্বরূপ ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২।

৪৪. অশোক মিত্র, *হ্রস্ব-দীর্ঘ,* কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৫।

৪৫. অশোক রুদ্র, *আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২।

৪৬. অশোক রুদ্র, *বিয়েবাড়ির বিভীষিকা ও অন্যান্য,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩।

৪৭. অশোক রুদ্র, *ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন,* কলকাতা : পিপলস্ বুক সোসাইটি, ১৯৮৭।

৪৮. অসিত পাল, *আদি পঞ্জিকা দর্পণ,* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৮।

৪৯. অসিত পোদ্দার, *ইউনিট সত্যজিৎ,* কলকাতা : লা স্ত্রাদা, ২০২২।

৫০. অসীম রায়, *জীবন মৃত্যু,* ১, রবিশংকর বল ও কুশল রায় (সম্পাদিত), কলকাতা : ৯ঋকাল বুক্স, ২০১৮।

৫১. অসীম রায়, *জীবন মৃত্যু,* ২, রবিশংকর বল ও কুশল রায় (সম্পাদিত), কলকাতা : ৯ঋকাল বুক্স, ২০১৮।

৫২. আনন্দবাজার পত্রিকা (সম্পাদিত), *আনন্দসঙ্গী,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৩।

৫৩. আশিস নন্দী এবং জয়ন্তী বসু, *ফুটপাথ পেরোলেই সমুদ্র : আশিসবাবু আপনি কি আত্মগত?,* কলকাতা : তালপাতা, ২০১৬।

৫৪. আহমেদ শরীফ, *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব,* ঢাকা : অনন্যা, ২০০৭।

৫৫. ইন্দুভূষণ সেন, *বাঙ্গালীর খাদ্য,* কলকাতা : আরোগ্য নিকেতন, ১৯২৮।

৫৬. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পাঁচুঠাকুর,* কলিকাতা : 'শ্রী নটবর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত', ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

৫৭. ইন্দ্রনাথ মজুমদার, *ঘটিগরম,* কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫।

৫৮. ইন্দ্রমিত্র, *ইতিহাসে আনন্দবাজার : আনন্দবাজার পত্রিকার অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫।

৫৯. উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, *ভারতের নারী,* নূতন সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত), কলকাতা : আর, ক্যাম্ব্রে এন্ড কোং, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

৬০. এইচ বসু, পারফিউমার (প্রকাশিত), *কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম,* কলকাতা : দেলখোস হাউস, ১ লা বৈশাখ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

৬১. এবিপি লিমিটেড (সম্পাদিত), *সাত দশক : সমকাল ও আনন্দবাজার,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

৬২. ঋত্বিক, *বাংলা বিজ্ঞাপন পরিক্রমা : ১৯৫০ পর্যন্ত,* কলকাতা : জয়ঢাক, ২০১৮।

৬৩. কল্যাণী দত্ত, *খাড়া বড়ি থোড়,* কলকাতা : থীমা, ২০০৮।

৬৪. কল্যাণী দত্ত, *থোড় বড়ি খাড়া,* কলকাতা : থীমা, ১৯৯২।

৬৫. কল্যাণী দত্ত, *পিঞ্জরে বসিয়া,* অভিজিৎ সেন (সম্পাদক), কলকাতা : স্ত্রী, ১৯৯৬।

৬৬. কমল চৌধুরী (তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থনা), *কলকাতা ৭৭*, শ্রী শ্রী কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা : নব যুবক সঙ্ঘ, ১৯৭৭।

৬৭. কমল চৌধুরী, *কলকাতা বণিক সমাজ*, শ্রী শ্রী কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা : নব যুবক সঙ্ঘ, ১৯৭৯।

৬৮. কার্তিক লাহিড়ী, *কলকাতার গ্রাম্যতা ও অন্যান্য*, কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

৬৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ, *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, অরুণ নাগ (সম্পাদিত), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮।

৭০. কিরণলেখা রায়, *বরেন্দ্র রন্ধন*, অরুণা চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা : কল্লোল, ১৯৯৯।

৭১. কিশোরীচাঁদ মিত্র, *দ্বারকানাথ*, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), কলকাতা : প্রকাশক অনুল্লেখিত, ১৯৬২।

৭২. কুমারেশ ঘোষ (সম্পাদিত), *একালের কার্টুন*, কলকাতা : গ্রন্থগৃহ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৭৩. কৃশানু ভট্টাচার্য, *সাংবাদিক দাদাঠাকুর*, কলকাতা : প্রকাশক অজ্ঞাত, ২০০১।

৭৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*, সুকুমার সেন এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা : আনন্দ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

৭৫. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *মহাভারত*, প্রথম খন্ড, সভাপর্ব, ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত, কলকাতা : সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৬।

৭৬. কৈলাশচন্দ্র সিংহ (সম্পাদিত), *আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর সংহিতা*, কলকাতা : সুরেশচন্দ্র সিংহ, ১২৯৩।

৭৭. কৌশিক বসু, *অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প*, ভবতোষ দত্ত (সম্পাদক), কলকাতা : আনন্দ, ২০১৬।

৭৮. কৌশিক মজুমদার (সম্পাদিত), *একাই ১০০*, কলকাতা : অন্তরীপ পাবলিকেশন, ২০২২।

৭৯. কৌশিক মজুমদার, *কুড়িয়ে বাড়িয়ে*, কলকাতা : সৃষ্টিসুখ, ২০১৯।

৮০. গম্ভীরানন্দ (স্বামী), *শ্রীমা সারদা দেবী*, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

৮১. গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *এক ডুব দুই ডুব,* কলকাতা : অভিজাত প্রকাশনী, ১৯৯৮।

৮২. গোপাল ভৌমিক (সম্পাদিত), *স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর,* কলকাতা : তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৩।

৮৩. গোলাম মুরশিদ, *কালান্তরে বাংলা গদ্য,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

৮৪. গৌতম ভদ্র, *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?,* কলকাতা : ছাতিম বুক্‌স, ২০১১।

৮৫. চিত্তপ্রসাদ, *ক্ষুধার্থ বাংলা,* কলকাতা : কথাবার্তা, ২০০২।

৮৬. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১।

৮৭. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ,* তৃতীয় খন্ড, আনন্দবাজার পত্রিকা (২২ মার্চ ১৯৩২- ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪১), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

৮৮. চিন্মোহন সেহানবীশ, *৪৬ নং : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে,* কলকাতা : রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশনস্ , ১৯৮৬।

৮৯. ছবি বসু, *একটি জীবনের কিছু চিত্র,* কলকাতা : স্ত্রী, ২০০৪।

৯০. জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী,* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা : বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৯৮৮।

৯১. জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *এক বহুমুখী প্রতিভা,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮।

৯২. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯।

৯৩. জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় *প্রবন্ধ লহরী,* কলকাতা : 'শ্রী শরচ্চন্দ্র তরফদার দ্বারা প্রকাশিত', ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।

৯৪. জ্যোৎস্না দেবী, *তরুর শ্বশুরবাড়ি,* কলকাতা : থীমা, ২০০৯।

৯৫. তাপস ভৌমিক (সম্পাদনা), *বাংলা পত্রপত্রিকা সম্পাদক ও সম্পাদনা,* কলকাতা : কোরক, ২০১৭।

৯৬. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, *কঙ্কাবতী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

৯৭. দক্ষিণারঞ্জন বসু, *বাজীমাৎ*, কলকাতা : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

৯৮. দিব্যেন্দু পালিত, *দশটি উপন্যাস*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯০।

৯৯. দীপংকর চক্রবর্তী, *অনীক পঁচিশ বছর প্রবন্ধ সংকলন*, কলকাতা : পিপলস্ বুক সোসাইটি, ১৯৮৯।

১০০. দীপেশ চক্রবর্তী, *মনোরথের ঠিকানা*, কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৮।

১০১. দেবব্রত ঘোষ (সম্পাদিত), *শতবর্ষের আলোয় বঙ্গভঙ্গ*, কলকাতা : সেতু প্রকাশনী, ২০০৫।

১০২. দেবব্রত চক্রবর্তী, *এবং আড্ডা*, ১ম খন্ড, কলকাতা : রক্তকরবী, ২০১১।

১০৩. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, *কফির কাপে সময়ের ছবি*, কলকাতা : ক্যাম্প, ১৯৮৯।

১০৪. দেবাশীষ দেব, *রং তুলির সত্যজিৎ*, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৪।

১০৫. দেবেশ রায়, *নিজস্ব সংবাদ*, কলকাতা : প্রতিক্ষণ, ১৯৯২।

১০৬. নন্দলাল ভট্টাচার্য, *বিজ্ঞাপন ও বিপণন*, কলকাতা : লিপিকা, ২০১৫।

১০৭. নন্দলাল ভট্টাচার্য, *সম্মুখ সমরে কলকাতার সংবাদপত্র*, কলকাতা : রাণার, ১৯৬০।

১০৮. নবনীতা দেবসেন, *সীতা থেকে শুরু*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

১০৯. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

১১০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *সরস গল্প*, কলকাতা : নতুন সাহিত্য ভবন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

১১১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সুনন্দর জার্নাল*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

১১২. নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (সম্পাদক), *স্বদেশী*, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা : কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, ১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দ।

১১৩. নিলয়কুমার সাহা (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), *বাংলা পঞ্জিকায় পুরানো কলকাতা,* কলকাতা : সেতু প্রকাশনী, ২০২২।

১১৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

১১৫. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *রূপ-রেখা,* কলকাতা : দেব-সাহিত্য-কুটীর, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

১১৬. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, *চলমান জীবন,* প্রথম পর্ব, কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬।

১১৭. পরিমল গোস্বামী, *দ্বিতীয় স্মৃতি,* কলকাতা : গ্রন্থপ্রকাশ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

১১৮. পরিমল রায়, *ইদানীং,* কলকাতা : বিকল্প প্রকাশনী, ২০০৬।

১১৯. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *রূপলহরী বা রূপের কথা,* কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।

১২০. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *প্রজা ও তন্ত্র,* কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০০৫।

১২১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *জনপ্রতিনিধি,* কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৩।

১২২. পূর্ণেন্দু পত্রী, *কলকাতার প্রথম,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১।

১২৩. পূর্ণেন্দু পত্রী, *কী করে কলকাতা হলো,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩।

১২৪. পূর্ণেন্দু পত্রী, *ছড়ায় মোড়া কলকাতা,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯।

১২৫. পূর্ণেন্দু পত্রী, *জোব চার্নক যে কলকাতায় এসেছিলেন,* কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ সাল অনুপস্থিত।

১২৬. পূর্ণেন্দু পত্রী, *পুরনো কলকাতার পড়াশোনা,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।

১২৭. পূর্ণেন্দু পত্রী, *সেনেট হলের স্মৃতিচিত্র,* কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭।

১২৮. প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও অভীককুমার দে (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : মাসিক বসুমতী,* কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০১৩।

১২৯. প্রণব বর্ধন, *স্মৃতিকণ্ডূয়ন,* কলকাতা : আনন্দ, ২০১৪।

১৩০. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, *আলেখ্যদর্শন,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯০।

১৩১. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, *দিনগুলি মোর,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

১৩২. প্রদোষ চৌধুরী, *সমাজচিত্রে ভারতীয় রেল,* কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৬।

১৩৩. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, *অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার,* কলকাতা : পার্ক বুক ব্যুরো, ১৯৬১।

১৩৪. প্রবোধকুমার মৈত্র (সম্পাদিত), *অনন্য সত্যজিৎ,* কলকাতা : নন্দন, ১৯৯৮।

১৩৫. প্রবোধকুমার মৈত্র (প্রকাশিত), *সত্যজিৎ রায় : সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি,* কলকাতা : নন্দন, মার্চ, ১৯৯২।

১৩৬. প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহামন্বন্তর,* কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৪।

১৩৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প সমগ্র,* প্রফুল্ল কুমার পাত্র (সম্পাদিত), কলকাতা : পাত্র'জ পাবলিকেশন, ১৯৮৭।

১৩৮. প্রমথনাথ মল্লিক, *কলিকাতার কথা (আদিকান্ড),* কলকাতা : প্রবোধ কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩১।

১৩৯. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খন্ড (১৩০৮-১৩১৪), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৮।

১৪০. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, *কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা,* দেবাশিস বসু (সম্পাদিত), কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯১।

১৪১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

১৪২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (সম্পাদিত), *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ,* অশোক মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সংকলন ও বিন্যাস), কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

১৪৩. বাদল বসু, *পিওন থেকে প্রকাশক,* কলকাতা : আনন্দ, ২০১৬।

১৪৪. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), *আরও কুন্তলীন,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫।

১৪৫. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), *আমন্ত্রিত কুন্তলীন,* কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৬।

১৪৬. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), *কুন্তলীন গল্প-শতক,* কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

১৪৭. বাসন্তী দেবমজুমদার, *অপরাজিতা রাধারাণী,* কলকাতা : পারুল প্রকাশনী, ২০০৮।

১৪৮. বিকাশকান্তি মিদ্যা, *বারোমেসে জীবের কায়দা কানুন-বদলবৃত্তান্ত,* কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০০৮।

১৪৯. বিজিত ঘোষ (সম্পাদিত), *সত্যজিৎ-প্রতিভা,* কলকাতা : র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৩।

১৫০. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ১৮৪০-১৯০৫ (প্রথম খন্ড),* কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

১৫১. বিনয় সরকার, *বিনয় সরকারের বৈঠকে (বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি),* দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা : চক্রবর্তী, চাটার্জ্জি এন্ড কোং লিমিটেড্, ১৯৪৫।

১৫২. বিপান চন্দ্র, *আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ,* কলকাতা : পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৬০।

১৫৩. বিপান চন্দ্র, *ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ,* কলকাতা : প্রাইমা পাবলিকেসনস্, ১৯৬১।

১৫৪. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, *মিষ্টান্ন-পাক,* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (সম্পূর্ণ), কলিকাতা : শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

১৫৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অপরাজিত,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪।

১৫৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আচার্য্য কৃপালনী কলোনি,* কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

১৫৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইছামতী,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

১৫৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

১৫৯. বুদ্ধদেব বসু, *কিশোর রচনা সমগ্র,* দ্বিতীয় খন্ড, অশোক সেন (সম্পাদিত), কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

১৬০. বুদ্ধদেব বসু, *তিথিডোর,* কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪৯।

১৬১. ভবতোষ দত্ত, *আট দশক,* কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫।

১৬২. ভারতী রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নারী ও পরিবার : বামাবোধিনী পত্রিকা,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯।

১৬৩. মলয় রায়, *বাঙালির বেশবাস বিবর্তনের রূপরেখা,* কলকাতা : মনফকিরা, ২০১৩।

১৬৪. মল্লিকা সেনগুপ্ত, *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

১৬৫. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,* তৃতীয় খন্ড, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা : দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

১৬৬. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *যে-পুতুল পালিয়ে গেলো,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

১৬৭. মানসী দাশগুপ্ত, *আশাপূর্ণা দেবী,* নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৬।

১৬৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ৩,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০।

১৬৯. মিলন দত্ত, *বাঙালির খাদ্যকোষ,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫।

১৭০. মীজানুর রহমান, *কমলালয়া কলকাতা বা তিরিশ ও চল্লিশের দশকের মহানগরীর শঙ্খরব,* ঢাকা : সাহানা, ১৯৯১।

১৭১. মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, *উপন্যাসে অতীত : ইতিহাস ও কল্পইতিহাস,* কলকাতা : থীমা, ২০০৩।

১৭২. মুকুল গুহ, *বাংলা প্রকাশনার সেকাল ও একাল,* কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।

১৭৩. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫),* সপ্তম খন্ড, কলকাতা : ভারবি, ১৯৯৮।

১৭৪. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, অষ্টম খন্ড, কলকাতা : ভারবি, ১৯৯৮।

১৭৫. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, নবম খন্ড, কলকাতা : ভারবি, ১৯৯৮।

১৭৬. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *দুই শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০০।

১৭৭. রঞ্জনকুমার দাস (সম্পাদিত), *শনিবারের চিঠি*, ব্যঙ্গ-সংকলন, কলকাতা : নাথ ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

১৭৮. রঘুনাথ গোস্বামী, *গদ্যসংগ্রহ*, কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৪।

১৭৯. রবিন ঘোষ, *বিজ্ঞাপনের ভাষা*, কলকাতা : আত্মজা পাবলিশার্স, ২০১৯।

১৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কবিতা সমগ্র* (প্রথম-পঞ্চম খন্ড), কলকাতা : আনন্দ, ২০১০।

১৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

১৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পসল্প*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

১৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, চতুর্দশ খন্ড, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলী, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

১৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

১৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

১৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ*, প্রথম খন্ড, (১৮৮১-১৯২১), কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

১৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খন্ড, (১৯২২-১৯৯৫), কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

১৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* দ্বাদশ খন্ড-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

১৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড-প্রবন্ধ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮।

১৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* ষোড়শ খন্ড, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ এবং অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।

১৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

১৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সে,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

১৯৩. রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন,* শক্তিরঞ্জন বসু (সম্পাদক), কলকাতা : গান্ধী স্মারক নিধি, ১৯৬৫।

১৯৪. রমেনকুমার সর, *রেল : উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সাহিত্যে,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২।

১৯৫. রঞ্জন কুমার দাস (সম্পাদিত), *শনিবারের চিঠি : ব্যঙ্গ-সংকলন,* কলকাতা : নাথ ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

১৯৬. রংগন চক্রবর্তী, *এক জীবন বিজ্ঞাপন,* কলকাতা : স্যাস পাবলিশার্স, ২০১৬।

১৯৭. রংগন চক্রবর্তী, *বিষয় বিজ্ঞাপন,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০২২।

১৯৮. রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, *অন্য কলকাতা,* কলকাতা : বাউলমন প্রকাশন, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

১৯৯. রাজশেখর বসু, *পরশুরাম গ্রন্থাবলী,* প্রথম খন্ড, কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

২০০. রাজনারায়ণ বসু, *সে কাল আর এ কাল,* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

২০১. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, *বাঙলা ও বাঙালী,* কলকাতা : রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

২০২. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, *কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

২০৩. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, *মাছ আর বাঙালি*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

২০৪. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, *শাঁটুল বাবু*, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংকলন, কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০২১।

২০৫. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, *স্থান কাল পাত্র*, কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ২০০০।

২০৬. রাম হালদার, *কলকাতা কমলালয় ও প্রসঙ্গ ফিল্ম সোসাইটি*, কলকাতা : অনুষ্টুপ, ১৯৮৯।

২০৭. রামমোহন রায়, *রামমোহন রচনাবলী*, প্রসাদরঞ্জন রায় (সম্পাদিত), কলকাতা : রামমোহন মিশন, ২০১৫।

২০৮. রামেশ্বর শ, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

২০৯. রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, *বাঙালীর খাদ্য*, কলকাতা : চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এন্ড কোং লিমিটেড, ১৯৪৯।

২১০. রুশতী সেন, *ছড়ানো শৃঙ্খল : জীবনে এবং বয়ানে*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং এবং মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।

২১১. রুশতী সেন, *প্রচ্ছন্নের আখ্যান*, কলকাতা : থীমা, ২০০২।

২১২. রেখা চট্টোপাধ্যায়, *স্মৃতির রেখার স্মৃতির ঝাঁপি*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

২১৩. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, পঞ্চম খন্ড, কলকাতা : মন্ডল বুক হাউস, ১৯৮১।

২১৪. শঙ্খ ঘোষ, *এখন সব অলীক*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

২১৫. শঙ্খ ঘোষ, *মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪।

২১৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *গল্পসংগ্রহ*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮।

২১৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *শরদিন্দু অম্‌নিবাস*, প্রথম খন্ড, ব্যোমকেশ, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদিত), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

২১৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *শরদিন্দু অম্‌নিবাস,* দ্বিতীয় খন্ড, ব্যোমকেশ, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদিত), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

২১৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *শরদিন্দু অম্‌নিবাস,* চতুর্থ খন্ড, কিশোর গল্প-সমগ্র, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদিত), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৭।

২২০. শংকর, *স্বর্গ মর্ত পাতাল,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬।

২২১. শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, উজ্জ্বলকুমার দাস (সম্পাদিত), *সত্যজিৎ পরিক্রমা,* কলকাতা : বুলবুল প্রকাশন, ১৯৯৪।

২২২. শান্তা দেবী, *পূর্বস্মৃতি,* কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৮৩।

২২৩. শিপ্রা সরকার ও অনমিত্র দাস (সংকলিত), *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮।

২২৪. শিবরাম চক্রবর্তী, *হাসির টেক্কা,* কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯৬।

২২৫. শিবরাম চক্রবর্তী, *হাসির ফোয়ারা,* কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

২২৬. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *গজাননের কৌটো,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১।

২২৭. শুদ্ধশীল বসু, *কলকাতার হালখাতা,* কলকাতা : বদ্বীপ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

২২৮. শুভেন্দু দাশমুন্সী, *টইপাড়াতে টহলদারের পুনরাগমন,* কলকাতা : সিসৃক্ষা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।

২২৯. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশী থেকে পার্টিশন : আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১১।

২৩০. শৈবাল মিত্র, *ষাটের ছাত্র আন্দোলন,* কলকাতা : আজকাল, ১৯৯০।

২৩১. শৈল চক্রবর্তী, *কার্টুন,* কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

২৩২. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, *সাধু কালাচাঁদ সমগ্র,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২।

২৩৩. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত (সংকলন ও সম্পাদনা), *বহুরূপে ভাষা : প্রয়োগের বাংলা ব্যবহারের বাংলা,* কলকাতা : প্রতিভাস, ২০১৬।

২৩৪. শ্রীপান্থ, *কেয়াবৎ মেয়ে,* কলকাতা : আনন্দ, ১৯৮৮।

২৩৫. শ্রীপান্থ, *বটতলা,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।

২৩৬. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি,* কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ১৯৯৬।

২৩৭. সত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষয়িক বাংলা,* কলকাতা : চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৯৬৪।

২৩৮. সত্যজিৎ রায়, *তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১।

২৩৯. সত্যজিৎ রায়, *ফেলুদা সমগ্র,* ১, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮।

২৪০. সত্যজিৎ রায়, *ফেলুদা সমগ্র,* ২, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮।

২৪১. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় চলচ্চিত্র,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২।

২৪২. সত্যব্রত ঘোষাল (সম্পাদিত), *শতপত্র* ২, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১২৮ বছরের স্মারক সংকলন, কলকাতা : দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।

২৪৩. সন্তোষ কুমার দে, *বিউটি ট্রিট,* কলকাতা : অভী প্রকাশন, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

২৪৪. সন্তোষকুমার দে, *উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন,* কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

২৪৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মিডিয়া আর আমাদের কালচার,* কলকাতা : অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২১।

২৪৬. সমরেন্দ্র দাস (সম্পাদিত), *কলকাতার আড্ডা,* কলকাতা : মহাজাতি প্রকাশন, ১৯৯০।

২৪৭. সমরেশ বসু, *বিবর,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬।

২৪৮. সমীর ঘোষ, *প্রসঙ্গ : বাংলা বিজ্ঞাপন,* কলকাতা : সূত্রধর, ২০২১।

২৪৯. সমুদ্র গুপ্ত, *শহর কলকাতার আদিপর্ব,* কলকাতা : নতুন সাহিত্য ভবন, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

২৫০. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে : উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা,* কলকাতা : স্ত্রী প্রকাশন, ১৯৯৫।

২৫১. সিদ্ধার্থ ঘোষ, *কলের শহর কলকাতা,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯১।

২৫২. সিদ্ধার্থ ঘোষ, *প্রবন্ধ সংগ্রহ ১,* কৌশিক মজুমদার ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা : বুক ফার্ম, ২০১৭।

২৫৩. সিদ্ধার্থ ঘোষ, *প্রবন্ধ সংগ্রহ ২,* কৌশিক মজুমদার ও সৌম্যেন পাল (সম্পাদিত), কলকাতা : বুক ফার্ম, ২০১৮।

২৫৪. সুকুমার রায়, *হ য ব র ল,* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

২৫৫. সুকুমার রায়, *হ য ব র ল,* ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

২৫৬. সুকুমার সেন, *রেলের পা-চালি,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০।

২৫৭. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *মেয়েদের কথাকল্প,* কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, ২০১০।

২৫৮. সুধীরচন্দ্র সরকার, *আমার কাল আমার দেশ,* কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

২৫৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি,* বিবিধবিদ্যাসংগ্রহ ১, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০২০।

২৬০. সুপ্রিয় সরকার, *প্রকাশকের ডায়েরি,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

২৬১. সুপ্রিয় সরকার, *স্মরণিকা,* এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ৭৫ বর্ষপূর্তি উৎসব (১৯১০-১৯৭৫), কলকাতা : এম সি সরকার, ১৯৮৫।

২৬২. সুবিমল মিশ্র, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৯৮৯।

২৬৩. সুবোধ ঘোষ, *সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প,* জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা : প্রকাশভবন, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

২৬৪. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *তেহিনো দিবসাঃ,* কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪।

২৬৫. সুমন ভট্টাচার্য (সংকলিত ও সম্পাদিত), *গ্রন্থজন,* কলকাতা : সুতানুটি বইমেলা, ২০১০।

২৬৬. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইয়ং বেঙ্গল থেকে কমিউনিস্ট বেঙ্গল,* প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা : অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২২।

২৬৭. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুদিত), *মনুসংহিতা,* কলকাতা : আনন্দ, ২০১৮।

২৬৮. সেলিনা হোসেন (সম্পাদক), *বাংলাদেশের গল্প,* কলকাতা : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৩।

২৬৯. সোমব্রত সরকার, *বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন : ১৭৭৮-২০১৪,* কলকাতা : বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২১।

২৭০. সোমেন্দ্রনাথ বসু, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ-প্রবাসী (১৩০৮-১৩৪৮ আষাঢ়),* কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৬।

২৭১. সৈয়দ মুজতবা আলী, *চাচা কাহিনী,* কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

২৭২. সৌম্যা রায়চৌধুরী ও অর্ণব নাগ (সংকলিত), *সুতানুটির বিজ্ঞাপনী পত্রিকা ও প্রকাশনী,* কলকাতা : সূত্রধর, ২০১৪।

২৭৩. সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা : রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ,* কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮।

২৭৪. স্বপন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই,* কলকাতা : অবভাস, ২০০৭।

২৭৫. স্বপন বসু ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত), *পুরোনো বাংলা বই,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৬।

২৭৬. স্বপন বসু (সম্পাদক), *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ,* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮।

২৭৭. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা : আনন্দ, ২০১২।

২৭৮. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৭।

২৭৯. হরিহর শেঠ, *প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় : কথায় ও চিত্রে*, কলকাতা : প্রকাশকের নাম অনুপস্থিত, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

২৮০. হিরণকুমার সান্যাল, *ছড়িয়ে ছিটিয়ে*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯১।

২৮১. হিরণকুমার সান্যাল, *পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৭৮।

২৮২. হিরন্ময় মাইতি, *রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন ও সেইসময়*, কলকাতা : দে বুক স্টোর, ২০১১।

২৮৩. হেমেন্দ্রকুমার রায়, *নীল সায়রের অচিন পুরে*, কলকাতা : এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, প্রকাশকাল অনুপস্থিত।

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

1. Adorno, Theodor W. *The Culture Industry.* Selected Essays on Mass Culture. Bernstein, J.M (Edited and with an Introduction). London and New York : Routledge. 2001.
2. Anderson, Benedict. *Imagined Communities*: *Reflections on the origin and spread of Nationalism.* London: Verso, 2006.
3. Bachchan, Amitabh, Padamsee, Alyque et. al. *Amul's India*, Based on 50 years of Amul advertising by daCunha Communications. Noida: Harper Collins. 2012.
4. Baker, Deborah. *The Last Englishmen : Love, War and the End of Empire.* Gurgaon : Penguin-Viking. 2018.
5. Bandyopadhyay, Aparna. *Desire and Defiance.* New Delhi: Orient BlackSwan.
6. Banerjee, Sumanta. *The Parlour and the Streets: Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta.* Calcutta: Seagull Books. 1989.
7. Banerjee, Sumanta. *Unravelling The Bengali Identity : Sub-Nationalism and Nationalism In Nineteenth-Century Bengal.* Kolkata : Purbalok Publication. 2020.
8. Bhadra, Gautam. *From An Imperial Product To A National Drink.* Calcutta : Centre for Studies in Social Sciences in association with Tea Board India. 2005.
9. Bose, Buddhadeva. *An Acre of Green Grass.* Calcutta : Orient Longmans Limited. 1948.
10. Bose, Buddhadeva. An Acre of Green Gras and other English Wiritings of Buddhadeva Bose. Chaudhuri, Rosinka (Edited). New Delhi : Oxford University Press. 2018.
11. Cardullo, Bert (Edited). *Satyajit Ray Interviews.* First Edition. Jackson : University Press of Mississippi. 2007.
12. Chakrabarty, Dipesh. *Provincializing Europe.* New Delhi: Oxford University Press. 2001.
13. Chakravarti, Sudeep. *The Bengalis: A Portrait of a Community.* New Delhi: Aleph. 2017.
14. Chakravorty, Anuradha and Biswas, Srabani. *Satapatra.* Das Gupta and Co. Private Limited. Centenary Commemorative Volume. Calcutta : Das Gupta and Co. Private Limited. 1987.
15. Chesterton, G.K. *Essays and Poems.* Great Britain: Penguin Books. 1958.

16. Chatterji. Joya. *The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967.* New Delhi: Cambridge University Press. 2007.
17. Chatterji. Soma A. *Woman at the window : The Material Universe of Rabindranath Tagore through the eyes of Satyajit Ray.* Noida : Harper Collins Publishers India. 2017.
18. Chatterjee, Sria & Renton, Jennie (Edited). *Kolkata, Bookcity : Readings, Fragments, Images.* Edinburgh : Textualities. 2009.
19. Chaudhuri, Amit (Edited). *Memory's Gold: Writings on Calcutta.* New Delhi: Penguin Books. 2008.
20. Chaudhuri, Arun. *Indian advertising Laughter & Tears.* New Delhi: Niyogi Books. 2014.
21. Chaudhuri, Nirad C. *Culture in the Vanity Bag.* Mumbai: Jaico. 2009.
22. Chaudhuri, Rosinka. *Freedom and Beef Steaks: Colonial Calcutta Culture.* New Delhi: Orient Black Swan. 2012.
23. Chaudhuri, Sukanta. *Calcutta : The Living City.* Volume I : The Past. Calcutta : Oxford University Press. 1995.
24. Chaudhuri, Sukanta. *Calcutta : The Living City.* Volume II : The Present and Future. Calcutta : Oxford University Press. 1995.
25. Chowdhury, Indira. *The Frail Hero and Virile History: Gender and the Politics of Culture in Colonial Bengal.* Delhi: Oxford University Press. 1998.
26. Das, Santi (Edited). *Satyajit Ray : An Intimate Master.* Kolkata : Allied Publishers. 1998.
27. Datta, Sudhindranath. *The World of Twilight.* Calcutta : Oxford University Press. 1970.
28. Dutt, Indrani. *A Calcutta Publisher's Daughter : A Memoir.* Kolkata : Power Publishers. 2017.
29. Eastern Bengal State Railway (Edited). *From the Hooghly to the Himalayas.* Bombay: Times Press. 1913.
30. Fennis, Bob M. and Stroebe, Wolfgang. *The Psychology of Advertising.* New York: Routledge. 2016.
31. Forceville, Charles. *Pictorial Metaphor in Advertising.* New York: Routledge. 2006.

32. Fruzetti, Lina and Akos. Ostor (Edited). *Calcutta Conversations*. New Delhi : Chronicles Books. 2003.
33. Furbank, P.N. and Cain, A.M. *Mallarme on Fashion*. Calcutta: Berg. 2004.
34. Ghatak, Ritwik. *On the Cultural 'Front' [A Thesis Submitted to the Communist Party of India in 1954]*. Calcutta : Ritwik Memorial Trust. 1996.
35. Ghosh, Anindita. *Power In Print*. New Delhi : Oxford University Press. 2015.
36. Ghosh, Neepabithi. *Uttam Kumar : The Ultimate Hero*. New Delhi : Rupa & Co. 2002.
37. Ghosh, Nityapriya (Edited). *Calcutta 300 : An Economic Times Special Feature*. Calcutta : Economic Times. 1990.
38. Ghosh, Semanti. *Different Nationalisms: Bengal 1905-1947*. New Delhi: Oxford University Press. 2017.
39. Guha-Thakurta, Tapati. *The City in the Archieve*. Calcutta : Seagull Arts and Media Resource Centre. 2011.
40. Gupta, Abhijit and Chakravorty, Swapan. *Print Areas : Book History in India*. Delhi : Permanent Black. 2004.
41. Gupta, Amit Kumar. *Crises and Creativities: Middle-Class Bhadralok in Bengal*. New Delhi: Orient Black Swan. 2009.
42. Gupta, Nilanjana (Edited). *Strangely Beloved : Witings on Calcutta*. New Delhi : Rainlight. 2014.
43. Gupta, Om. *Advertising in India: Trends and Impact*. Delhi: Kalpaz Publications, 2012.
44. Halve, Anand and Sarkar, Anita, *Adkatha : The Story of Indian Advertising* , Centrum : Goa, 2011.
45. Hobsbawm. E. J. *Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality*. Cambridge: Cambridge University Press. 2000.
46. Hobsbawm, Eric. *The invention of Tradition*, Cambridge: Cambridge University Press. 1983.
47. Hopkins, Claude C. *Scientific Advertising*. U.S.A: Martino Publishing. 2016.

48. Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. *Dialectic of Enlightenment.* Noerr, Gunzelin Schmid (Edited). Jephcott, Edmund (Translated). Stanford : Stanford University Press. 2002.
49. House, Humphry. *I Spy with my Little Eye.* Kolkata : Jadavpur University Press. 2018.
50. Hovland, Roxanne and Wolburg, Joyce M. *Advertising, Society, and Consumer Culture.* New York: M.E.Sharpe. 2010.
51. Judd, Denis. *The Lion and the Tiger: The Rise and Fall of the British Raj.* New Delhi: Oxford University Press. 2004.
52. Karlekar, Malavika. *Memories of Belonging : Images from the colony and beyond.* New Delhi : Niyogi Books. 2015.
53. Kumar, S.Ramesh and Krishnamurthy, Anup. *Advertising, Brands and Consumer Behaviour.* New Delhi: Sage. 2020.
54. Majumder, Niranjan. *The Statesman : An Anthology.* Calcutta : The Statesman LTD. 1975.
55. Majumdar, Rochona. *Marriage and Modernity: Family Values in Colonial Bengal.* Oxford: New Delhi. 2009.
56. Mazzarella, William. *Shovelling Smoke: Advertising and Globalization in Contemporary India.* New Delhi: Oxford University Press. 2003.
57. Mcleod, John. *Beginning Postcolonialism*, Manchester: Manchester University Press. 2000.
58. Milov, Sarah. *The Cigarette : A Political History.* United States of America : Harvard University Press. 2019.
59. Mitra, Ashok. *The Hoodlum Years.* Calcutta: Sangam Books. 1979.
60. Mitra, Ashok. *The Starkness of it.* New Delhi: Roli Books. 2008।
61. Mitra, Ashok (Edited). *The Truth Unites : Essays in Tribute to Samar Sen.* Calcutta : Subarnarekha. 1985.
62. Mitter, Partha. *The Triumph of Modernism : India's Artists and the Avant-Gard, 1922-1947.* New Delhi : Oxford University Press. 2007.
63. Moon, Penderal. *Divide and Quit.* New Delhi: Oxford University Press. 1998.

64. Mukherjee, Janam. *Hungry Bengal: War, Famine, Riots and the End of Empire.* Noida: Harper Collins. 2015.

65. Mukherjee, Uddalak. *আনন্দবাজার পত্রিকা : Words and Images over hundred year.* Kolkata : ABP. 2022.

66. Ogilvy, David. *Ogilvy on Advertising.* New York: Vintage Books. 1985.

67. Padgaonkar, Dileep (Edited). *Brand New Advertising Through The Times of India.* The Times of India Sesquicentennial. Faridabad : The Times of India. 1989.

68. Pal, Pratapaditya (Edited). *Changing Visions, Lasting Images Calcutta through 300 years.* Bombay : Marg Publications. 1990.

69. Parameswaran, Ambi. *Nawabs, Nudes, Noodles: India through 50 Years of Advertising.* New Delhi: Macmillan. 2016.

70. Paul, Ashit. *Woodcut Prints Of Nineteenth Century Calcutta.* Calcutta : Seagull Books. 1983.

71. Radhakrishnan, S and Others. *Basanta Kumar Mallik : A Garland of Homage from some who knew him well.* London : Vincent Stuart Limited. 1961.

72. Rangoonwalla, Firoze. *Satyajit Ray's Art.* Delhi : Clarion Books. 1980.

73. Ray, Parimal (Edited). *The Vision of Ray : Cineposters and Beyond.* Kolkata : Pratikshan. 2005.

74. Ray, Utsa. *Culinary Culture in Colonial India: A Cosmopolitan Platter and the Middle Class.* New Delhi: Cambridge University Press. 2015.

75. Ray Choudhury, Ranabir. *Calcutta A Hundred Years Ago.* Calcutta : Nachiketa Publications LTD. 1987.

76. Ray Choudhury, Ranabir. *Glimpses Of Old Calcutta.* (Period-1836-50). Calcutta : Nachiketa Publications LTD. 1978.

77. Rege, G.M. *Advertising Art & Ideas.* Bombay : Ashutosh Prakashan Publication. 1984.

78. Reichert, Tom. *The Erotic History of Advertising.* New York: Prometheus Books. 2003.

79. Robinson, Andrew. *Satyajit Ray : The Inner Eye.* London : Andredeutsch. 1989.

80. Robinson, Andrew. *The Apu Trilogy : Satyajit Ray and the making of an Epic.* London : I.B.Tauris and Co. Ltd. 2011.
81. Said, Edward W. *Representations of the Intellectual.* London : Vintage. 1994.
82. Sampson, Henry. *A History of Advertising from the Earliest Times.* London: Chatto and Windus, Piccadilly. 1874.
83. Sanyal, Sujit. *Life in a rectangle: The World Around 55B Mirza Ghalib Street.* New Delhi: Fingerprint. 2012.
84. Sarkar, Sumit. *The Swadeshi Movement in Bengal.* Ranikhet : Permanent Black. 2010.
85. Sarkar, Tanika and Bandopadhyay, Sekhar (Edited), *Calcutta: The Stormy Decades.* New Delhi: Social Science Press. 2015.
86. Sarkar, Tanika. *Rebels, Wives, Saints : Designing Selves and Nations in Colonial Time.* Ranikhet : Permanent Black. 2009.
87. Sen, Amartya. *The Argumentative Indian : Writings on Indian History, Culture and Identity.* London : Allen Lane. 2005.
88. Sen, Jayanti. *Looking Beyond : Graphics of Satyajit Ray.* New Delhi : Roli Books. 2012.
89. Sen, Jayanti (Edited). *The Art of Satyajit Ray.* Calcutta : Oxford Book Store. 1995.
90. Sen, Samar, Panda, Debabrata and Lahiri, Ashis (Edited). *Naxalbari and After : A Frontier Anthology.* Vol-I. Calcutta : Katha Shilpa. 1978.
91. ibid. Vol-II. Calcutta : Katha Shilpa. 1978.
92. Sengoopta, Chandak. *The Rays Before Satyajit : Creativity and Modernity in Colonial India.* New Delhi : Oxford University Press. 2016.
93. Seton, Marie. *Portrait Of A Director Satyajit Ray.* New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1976.
94. Shakespeare, William. *Othello.* New Delhi: Classic Paperback. 1988.
95. Sivulka, Juliann. *Ad Women.* New York: Prometheus Books. 2009.
96. Streitmatter, Rodger. *Sex Sells.* United States of America: Westview Press. 2004.

97. The British Library (Edited). *Try It! Buy It!: Vintage Adverts*. London: The British Library. 2015.

98. *The Times of India Annual*. Bombay. 1929.

99. Twitchell, James B. *Twenty ADS that shook the WORLD*. New York: Three Rivers Press. 2000.

100. Wolf, Naomi. *The Beauty Myth*. London: Chatto & Windus Ltd. 1991.

101. Woolf, Virginia. *A Room of One's Own*. Great Britain: Penguin. 1963.

102. Woolf, Virginia. *To the Lighthouse*. Great Britain: Penguin Books. 1974

বাংলা পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

১. অদ্রীশ বিশ্বাস (অতিথি সম্পাদক), *অনুষ্টুপ,* বটতলা বিশেষ সংখ্যা, ৪৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা, ২০১১।

২. অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *প্রতিদিন-রোববার,* স্মৃতির শহর, কলকাতা, ২০১৩।

৩. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *এককমাত্রা,* ত্রয়োদশ বর্ষ-তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, নভেম্বর, ২০১২।

৪. অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *অনুষ্টুপ,* সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ-৪ র্থ সংখ্যা, কলকাতা, প্রাক্ শারদীয় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৬।

৫. অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *অনুষ্টুপ,* তিন দশকের গণ আন্দোলন বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, প্রাক্ শারদীয়, ২০১৭।

৬. অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *অনুষ্টুপ,* বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ২য়, কলকাতা, শীত, ২০২২।

৭. অপর্ণা সেন (সম্পাদিত), *সানন্দা,* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ৩১ জুলাই, ১৯৮৬।

৮. অপর্ণা সেন (সম্পাদিত), *সানন্দা,* ১১শ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিল, ১৯৯৭।

৯. অপর্ণা সেন (সম্পাদিত), *সানন্দা,* ১১শ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, কলকাতা, ৯ মে, ১৯৯৭।

১০. অপর্ণা সেন (সম্পাদিত), *সানন্দা,* ১১শ বর্ষ, ২০শ সংখ্যা, কলকাতা, ২৩ মে, ১৯৯৭।

১১. অপর্ণা সেন (সম্পাদিত), *সানন্দা,* ১১শ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা, কলকাতা, ৬ জুন, ১৯৯৭।

১২. অমিতাভ চৌধুরী (সম্পাদিত), *দেশ,* ১৮ জানুয়ারি, ২০০২।

১৩. অরুণকুমার বসু (সম্পাদিত), *আকাদেমি পত্রিকা,* পঞ্চদশ সংখ্যা, কলকাতা, মে, ২০০৩।

১৪. অরুণাভ বিশ্বাস ও সঞ্জয় মজুমদার (সম্পাদিত), *একক মাত্রা,* বিংশতি বর্ষ-পঞ্চম সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ, ২০২০।

১৫. অরুণাভ বিশ্বাস ও সঞ্জয় মজুমদার (সম্পাদিত), *একক মাত্রা,* বিংশতি বর্ষ-ষষ্ঠ সংখ্যা ও একবিংশতি প্রথম যুগ্ম সংখ্যা, কলকাতা, নভেম্বর, ২০২০।

১৬. অরূপ বসু (সম্পাদিত), *বারণরেখা,* কলকাতা-অতীত ও বর্তমান, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১২।

১৭. অর্জুনদেব সেনশর্মা (অতিথি সম্পাদক), *অনুষ্টুপ,* বিশেষ পঞ্জিকা সংখ্যা, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৬।

১৮. অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), *আজকাল,* কলকাতা সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

১৯. অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), *আজকাল,* শারদীয়া সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

২০. অশোককুমার সরকার (সম্পাদিত), *আনন্দবাজার পত্রিকা,* সুবর্ণজয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

২১. উত্তম পুরকাইত (সম্পাদিত), *উজাগর,* ভাষা-সমাজভাষা সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।

২২. এস. পি. চ্যাটার্জী (সম্পাদিত), *কাজের লোক,* ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯১৬।

২৩. কল্যাণী সেন (সম্পাদিত), *মেয়েদের কথা,* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

২৪. গৌতম সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *চতুরঙ্গ,* বর্ষ ৭২, সংখ্যা ১,২, কলকাতা, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

২৫. গৌতম সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *চতুরঙ্গ,* বর্ষ ৭২, সংখ্যা ৩,৪, কলকাতা, কার্তিক-চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

২৬. জ্যোতির্ময় দত্ত (সম্পাদিত), *কলকাতা,* চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৮।

২৭. তুষারকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), *অমৃত,* শারদীয়া সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

২৮. তুষারকান্তি ঘোষ (সম্পাদিত), *যুগান্তর,* সুবর্ণজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৮৭।

২৯. দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল (সম্পাদিত), *অচলপত্র,* ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা, কলকাতা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৯৬০।

৩০. দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল (সম্পাদিত), *অচলপত্র,* সপ্তম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

৩১. দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল (সম্পাদিত), *অচলপত্র,* অষ্টম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

৩২. দুলেন্দ্র ভৌমিক (সম্পাদিত), *আনন্দলোক,* সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা, ১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা, কলকাতা, ৯ মে, ১৯৯২।

৩৩. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *পরিকথা,* সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, মে, ২০০৫।

৩৪. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *পরিকথা,* শিশু ও শিশুমন, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, মে, ২০০৭।

৩৫. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *পরিকথা,* অষ্টম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, মে, ২০০৬।

৩৬. ধনঞ্জয় ঘোষাল (সম্পাদিত), *বলাকা,* বাংলা বই ও ছাপাখানা (১৭৭৮-১৯০০), ১৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০০৮।

৩৭. নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার (সম্পাদিত), *বিভাব,* দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যা, কলকাতা, শীত, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

৩৮. নরেশ গুহ (আমন্ত্রিত সম্পাদক), *বিভাব,* ৮৪, টুকরো কথা সংকলন, ২৩ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, কলকাতা, জুন, ২০০২।

৩৯. নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত), *স্বদেশী,* তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, ১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দ।

৪০. নির্মাল্য আচার্য (সম্পাদিত), *এক্ষণ,* পঞ্চদশ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, শারদীয়, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

৪১. পুলিনবিহারী রায় (সম্পাদিত), *ধনধান্যে,* সপ্তম বর্ষ, সংখ্যা ১৪, কলকাতা, ১৯৭৬।

৪২. প্রদীপ্ত রায় (সম্পাদিত), *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৩।

৪৩. প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদিত), *গীতবিতান পত্রিকা,* রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৬১।

৪৪. বিনয়কুমার সরকার (সম্পাদিত), *আর্থিক উন্নতি,* ৫ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

৪৫. বিপ্লব দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), *নন্দন,* সত্যজিৎ সংখ্যা, ২৮ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, কলকাতা, জুলাই, ১৯৯২।

৪৬. ভুবনমোহন সরকার (সম্পাদিত), *বঙ্গমহিলা,* মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা, ২য় খন্ড, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, বৈশাখ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

৪৭. মানব চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *জলার্ক,* রাজশেখর বসু-পরশুরাম বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৭।

৪৮. মৌসুমী ঘোষ (সম্পাদিত), *শিলাদিত্য,* তৃতীয় বর্ষ-সপ্তম সংখ্যা, কলকাতা, পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

৪৯. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *প্রবাসী,* কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

৫০. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *প্রবাসী,* ২৩শ ভাগ, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ভাদ্র। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

৫১. লীনা চাকী (সম্পাদিত), *হৃদয়,* বাঙালির আড্ডা সংখ্যা, বার্ষিক সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৩।

৫২. লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ এবং সত্যজিৎ রায় (সম্পাদিত), *সন্দেশ,* শারদীয়া সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

৫৩. লীলা মজুমদার, বিজয়া রায় (সম্পাদিত), *সন্দেশ,* ফেলুদা ৩০, কলকাতা ১৯৯৫।

৫৪. শৈবাল চৌধুরী (সম্পাদিত), *নিউ ওয়েভ,* সত্যজিৎ স্মারক সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, চট্টগ্রাম, জানুয়ারি, ১৯৯৪।

৫৫. শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন দেব (সম্পাদক), *রবীন্দ্রবীক্ষা : রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন,* সংখ্যা ১৮, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৮৭।

৫৬. সমরেন্দ্র দাস (সম্পাদিত), *আত্মপ্রকাশ,* কবিতা সিংহ স্মরণ সংখ্যা, নব পর্যায়-তৃতীয় সংকলন, কলকাতা, আগস্ট-ডিসেম্বর, ২০১২-১৩।

৫৭. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *বিভাব,* ১৮, পঞ্চম বর্ষ-চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা, গ্রীষ্ম, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

৫৮. সমরেশ বসু (সম্পাদিত), *মহানগর,* প্রথম বর্ষ-ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা, জুন, ১৯৮২।

৫৯. সমরেশ বসু (সম্পাদিত), *মহানগর,* দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-এপ্রিল, ১৯৮৩।

৬০. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

৬১. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* ৫২ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, কলকাতা, ২৫ মে, ১৯৮৫।

৬২. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৮৫।

৬৩. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* কম্যুনিজম বিশেষ সংখ্যা, ৫৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর, ১৯৮৬।

৬৪. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।

৬৫. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* কবি ও কবিতা বিশেষ সংখ্যা, ৫৫ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

৬৬. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* বিনোদন সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

৬৭. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা, ৫৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, কলকাতা, ২৮ মার্চ, ১৯৯২।

৬৮. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৩।

৬৯. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* প্রিন্স দ্বারকানাথ সংখ্যা, বর্ষ ৬১, সংখ্যা ৮, কলকাতা, ১৯৯৪।

৭০. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* শীতের বৈঠকে, ৬২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

৭১. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশ,* ১৫ জুলাই, ১৯৯৫।

৭২. সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *চার্বাক,* সময় সংস্কৃতি-পপুলার কালচার সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

৭৩. সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *চার্বাক,* সময় সংস্কৃতি-পপুলার কালচার সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

৭৪. সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *চার্বাক,* সময় সংস্কৃতি-পপুলার কালচার সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ-তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, পৌষ-চৈত্র , ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

৭৫. সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *চার্বাক,* প্রথম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

৭৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *কৃত্তিবাস,* বিংশ সংকলন, কলকাতা, ১৯৬৫।

৭৭. সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), *তথ্যসূত্র,* বাঙালি ও বাংলা পঞ্জিকা সংখ্যা, ১৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

৭৮. সুমন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *এইসময়,* শারদীয়া, কলকাতা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

৭৯. সৈকত মুখার্জি (সম্পাদিত), *হরপ্পা,* পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, অক্টোবর, ২০২১।

৮০. সৈকত মুখার্জি (সম্পাদিত), *হরপ্পা,* পুজোর বই, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, অক্টোবর, ২০২২।

৮১. সোমনাথ রায় (সম্পাদিত), *এখন সত্যজিৎ,* দশম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৫।

৮২. সৌরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন চট্টোপাধ্যায় এবং সৌম্যকান্তি দত্ত (সম্পাদিত), *বিচিত্রপত্র,* সত্যজিৎ ১০০, সমাপ্তি সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২।

৮৩. স্বপন চক্রবর্তী (সম্পাদনা), *অবভাস,* বাংলা বইয়ের ২২৫ বছর, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৩।

৮৪. স্বপন চক্রবর্তী ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), *শিস,* উত্তর চব্বিশ পরগণা, শারদীয় ১৪০২।

৮৫. স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত), “অসীম রায় : প্রাসঙ্গিক তথ্য”, *জলার্ক,* দ্বাবিংশ সংকলন, কলকাতা, মাঘ ১৪০১- পৌষ ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

৮৬. স্বপ্না দেব (সম্পাদিত), *প্রতিক্ষণ,* দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চদশ সংখ্যা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

ইংরেজি পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

1. Datta Ray, Sunanda K. (Edited). *The Statesman*, Calcutta Tercentenary Issue. Calcutta. 1990.
2. Ganguli, Kalyan K. (Edited). *Art in Industry*. Vol. VII. No. 2. Calcutta. 1962.
3. Ghosh, Nityapriya (Edited). *An Economic Times*. Calcutta 300. Calcutta. 1990.
4. Singh, Khushwant (Edited). *New Delhi*. Vol. 2. Issue 20. New Delhi. 4 February. 1980.
5. Singh, Tejbir (Edited). *Seminar*. Soul City : Number. No. 559. New Delhi. March. 2006.
6. Tandon, Nidhi. "Growth of Advertising Industry In India". *International Journal of Recent Scientific Research*. Vol.9. January. 2018.
7. The Business India Group of Publication (Edited and Published). *The India Magazine*. Vol 10, No.12. Bombay. November. 1990.

বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে

অনুষ্টুপ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

অমৃত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

আনন্দমেলা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

আনন্দলোক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

উত্তরসূরী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

উল্টোরথ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

এক্ষণ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

ঐতিহাসিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

কলকাতা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

কল্লোল পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

কবিতা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

কিশোর ভারতী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

কিশোর মন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

কৃত্তিবাস পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

খেলার আসর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

গঙ্গোত্রী শারদীয়া সংখ্যা।

গল্পকবিতা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

গল্পভারতী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

গীতবিতান পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

ঘরোয়া পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

চতুরঙ্গ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

চিত্রবাণী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

চিত্রপঞ্জী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

চিত্রবীক্ষণ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

জলসা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

জিজ্ঞাসা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

ঝুমঝুমি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা।

দিপালী পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা।

দেশ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

নাচঘর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

নিরভ্র পত্রিকার একটি সংখ্যা।

নিরুপমা বর্ষ স্মৃতি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা।

পরশুরাম পত্রিকার একটি সংখ্যা।

পরিচয় পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

পূর্ব্বাশা রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা।

প্রতিক্ষণ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

প্রবাসী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

প্রসাদ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

বঙ্গশ্রী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা।

বসুধারা পত্রিকার শারদ সংখ্যা।

বিচিত্রা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

বিজলী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

বিভাব পত্রিকার নির্দিষ্ট সংখ্যা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা র বিভিন্ন সংখ্যা।

বেতার জগৎ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

ভারতবর্ষ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

ভারতী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

মন্দিরা পত্রিকার নির্দিষ্ট সংখ্যা।

মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

মুকুল পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

মেয়েদের কাগজ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

মৌচাক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

যষ্টিমধু পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

যুগান্তর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

রংমশাল পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

শনিবারের চিঠি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

শিশুসাথী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

শুকতারা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

সচিত্র ভারত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

সন্দেশ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

সানন্দা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

সাহিত্যপত্র পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

সিনেমাজগৎ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

সুন্দরম্ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

Art In Industry পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

Dramatic Club of Calcutta কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকা।

Illustrated Weekly of India পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

Marg পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

Quest পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

Visva Bharati Quarterly পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

এছাড়া *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় ১০০ বছর উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি ক্রোড়পত্র থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। (সোমবার-২৯ নভেম্বর, ২০২১। বুধবার-২৯ ডিসেম্বর, ২০২১। শুক্রবার-২৮ জানুয়ারি, ২০২২। বুধবার-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২। শুক্রবার-১৮ মার্চ, ২০২২... ইত্যাদি)